করে; রাত্রের অন্ধকারে সে মনিবের ঘরে সিঁদ কাটে এবং ভোর হইলে বড় অনুগত চাকরটির ন্যায় হাত বাঁধিয়া মনিবের সম্মুখে হাযির হয়। এই চাকরটি সম্পর্কে আপনি কি বলিবেন ? আপনি নিশ্চয়ই তাহাকে মুনাফিক, বিদ্রোহী ও নিমকহারাম প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কোন চাকর যখন এই ধরনের হাস্যকর আচরণ করিতে থাকে তখন তাহাকে 'আপনারা কি বলিতে থাকেন ? তখন আপনারা কাহাকেও 'পীর সাহেব' কাহাকেও 'হযরত মাওলানা', কাহাকেও 'বড় কামেল', 'পরহেযগার' প্রভৃতি নামে ভূষিত করেন। ইহার কারণ এই যে, আপনারা তাহাদের মুখে মাপ মত লম্বা দাঁড়ি দেখিয়া, তাহাদের পায়জামা পায়ের গিরার দুই ইঞ্চি উপরে দেখিয়ে, তাহাদের কপালে নামাযের কালো দাগ দেখিয়া এবং তাহাদের লম্বা লম্বা নামায ও মোটা মোটা দানার তসবীহ দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন; ইহাদেরকেও বড় দ্বীনদার ও ইবাদতকারী বলিয়া মনে করেন। এই ভুল শুধু এই জন্য যে, 'ইবাদত' ও দ্বীনদারীর অর্থই আপনারা ভুল বুঝিয়ে রাখিয়াছেন।

আপনি হয়তো মনে করেন, হাত বাঁধিয়া কেবলামুখী হইয়া দাঁড়ানো, হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া মাথা নত করা, মাটিতে মাথা রাখিয়া সিজদা করা এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা- শুধু এই কয়টি কাজই প্রকৃত ইবাদত। হয়ত আপনি মনে করেন, 'রমযানের প্রথম দিন হইতে শাওয়ালের চন্দ্রোদয় পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখার নাম ইবাদত। আপনি হয়তো ইহাও মনে করেন যে, কোনআন শরীফের কয়েক রুকু' পাঠ করার নামই ইবাদত, আপনি বুঝিয়া থাকেন মক্কা শরীফে গিয়া কা'বা ঘরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করার নামই ইবাদত। মোটকথা, এই ধরনের বাহ্যিক রূপকে আপনারা 'ইবাদত' মনে করিয়া লইয়াছেন এবং এই ধরনের বাহ্যিক রূপ বজায় রাখিয়া উপরোক্ত কাজগুলি কেউ সমাধা করিলেই আপনারা মনে করেন যে, ইবাদত সুসম্পন্ন করিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়াছে। তাই জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে সে একেবারে আযাদ-নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইতে পারে।[১]

(৩) ইসলামী সংস্কৃতি তথা ইসলামী লেবাস-পোষাক ও দাঁড়ি প্রসঙ্গঃ

ইসলামী লেবাস-পোষাক, দাড়ি প্রভৃতি ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এগুলি ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও প্রতীক বা শি'আর (Uniform/شعار)। ইসলামে ধর্মীয় শি'আর বা বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব এতখানি যে, ভিন্ন ধর্মের শিআর বা বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য গ্রহণকারী ব্যক্তি সম্বন্ধে হাদীছে এসেছে সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। ইরশাদ হয়েছেঃ

من تشبه بقوم فهو منهم - (احمد وابوداود)

অর্থাৎ, যে যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

১. خطبات : صفحہ ۱۳۶-۱۳۵، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی ۱۹۸۰। অনুবাদটুকু অনুবাদ গ্রন্থঃ ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, (১০৪-১০৫ ৪র্থ সংস্করণ, জুন ১৯৮৪) থেকে নেয়া হয়েছে ॥

অথচ মওদূদী সাহেব ইসলামী লেবাস-পোষাক সম্বন্ধে কিভাবে উপহাস করেছেন তার কিছু বর্ণনা একটু পূর্বেই শুনলেন, আর কিছু বর্ণনা ইমাম মাহ্‌দী সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে পেশ করা হয়েছে। এছাড়াও তার লেখনীর বহু স্থানে সুলাহা তথা বুযুর্গানে দ্বীনের লেবাস-পোষাক নিয়ে বিদ্রূপাত্মক ভাষার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। অথচ হাদীছে জামা নেসফে সাক তথা পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটা সুন্নাত। আবার বিধর্মীদের লেবাস-পোষাকের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ থেকেও বেঁচে থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ সবের ভিত্তিতে বুযুর্গানে দ্বীনের যে লেবাস-পোষাকের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে সমস্ত মুসলিম উম্মাহ সেটাকে সম্মানের দৃষ্টিতে স্বশ্রদ্ধ মূল্যায়ন করে আসছেন।

দাড়ি রাখা মুসলমানদের একটি গুরুত্বপুর্ণ শিআর (Uniform/شعار) বা প্রতীক। চার মাযহাবের সর্ব সম্মত মত অনুসারে দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এবং এটা রাসূল (সাঃ)-এর অনুসরণ যোগ্য সুন্নাত তথা আদর্শ। অর্থাৎ, দাড়ি রাখা সুন্নাতে হুদা।

দাড়ি সেভ করা কিংবা মুঠের ভিতরে দাড়ি কাটা, খাটো করা সম্পূর্ণ হারাম। হযরত ইব্‌নে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب -

অর্থাৎ, মুশরিকদের বিরোধিতা কর - মোচ খাটো কর দাড়ি লম্বা কর। (বুখারী শরীফ, ২য় ৮৭৫ পৃঃ)

হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে হুযূর (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ মোচ খাটো করা এবং দাড়ি লম্বা করা ইসলামের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য। যেহেতু অগ্নিপূজক মাজূসীরা মোচ লম্বা করে এবং দাড়ি খাটো করে। অতএব তোমরা তাদের বিরোধিতা করে মোচ খাটো কর, দাড়ি লম্বা কর। (সহীহ ইবনে হিব্বান)

তবে হ্যাঁ, সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে এক মুঠের অতিরিক্ত দাড়ি খাটো করার অনুমতি বুঝে আসে। বুখারী শরীফে হযরত ইবনে ওমরের আমল বর্ণিত আছে যে, তিনি হজ্জ বা ওমরা পালন করার সময় এক মুঠের অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলতেন। ইব্‌নে ওমর (রাঃ) ছাড়া হযরত ওমর (রাঃ) ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকেও এ ধরনের আমল বর্ণিত আছে। (তাবারী, ফতহুল বারী)

অথচ মওদূদী সাহেবের মতে দাড়ি রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতে হুদা অর্থাৎ, এমন কোন সুন্নাত বা আদর্শ নয় যা অনুসরণ করা জরূরী। তদুপরি তার মতে দাড়ি যে কোন পরিমাণ রাখলেই চলে।

তিনি বলেনঃ "রাসূল যতোবড় দাড়ি রেখেছেন, ততো লম্বা দাড়ি রাখাই হলো সুন্নাতে রাসূল বা উসওয়ায়ে রাসূল, আপনার এ ধারণার অর্থ এই দাঁড়ায় যে আপনি রাসূলের অভ্যাসকে হুবহু রাসূলের এই সুন্নাতের মর্যাদা সম্পন্ন মনে করেছেন যা জারি ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য নবী পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রেরিত হয়েছিলেন।"[১]

১. رسائل ومسائل ۱۲۲-۱۲۱، ۱۰۸-۱۰۷ অনুবাদ গ্রন্থ (রাসায়েল ও মাসায়েল) আব্দুস শহীদ নাসিম অনুদীত, ১ম খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ শতাব্দি প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ-২০০২ ॥

তিনি আরও বলেনঃ আমার মতে কারো দাড়ি ছোট কিংবা বড় হবার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সেই মূল জিনিস এটা নয় যা মানুষের ঈমান বেশী বা কম হবার প্রমাণবহ। আমার আশংকা হয়, ঈমানের কমতিকে এখনো যেভাবে কোন কোন বাহ্যিক জিনিসের আধিক্য দ্বারা পূর্ণ করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, জামায়াতে ইসলামীর কিছু লোকও সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে না পড়ে। কোন ব্যক্তির আনুগত্য ও প্রাণান্তকর সংগ্রাম যদি আল্লাহর পথে হয় 'দীর্ঘ', তবে তেমন কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না, যদি তার দাড়ি হয় হ্রস্ব। কিন্তু যদি তার আনুগত্য ও প্রাণান্তকর সংগ্রামই হয় হ্রস্ব, তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, দীর্ঘ দাড়ি তার কোন কল্যাণেই আসবে না। বরঞ্চ এটাও অসম্ভব নয় যে, খোদার দরবারে তার বিরুদ্ধে ধোঁকাবাজীর মোকাদ্দমা দায়ের হয়ে যাবে।[১]

তিনি আরও বলেনঃ শরীআত প্রণেতা দাড়ির ব্যাপারে কোন সীমারেখা নির্ধারণ করে দেননি। আলিমগণ যে সীমা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন, তা একটি গবেষণালব্ধ জিনিস মাত্র।[২] (অথচ এটা সহীহ হাদীছ বিরুদ্ধ কথা।)

(৪) তাসাওউফ ও পীর আউলিয়া প্রসঙ্গঃ

হক্কানী উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে নামায, রোযা প্রভৃতি শরী'আতের জাহিরী বিধি-বিধানের উপর আমল করা যেমন জরূরী, তদ্রূপ এখলাস, তাকওয়া, ছবর, শোকর প্রভৃতি কলবের গুণাবলী অর্জন এবং রিয়া, তাকাব্বুর, হাছাদ প্রভৃতি অন্তরের ব্যধি দূর করা তথা শরী'আতের বাতিনী বিধানাবলীর উপর আমল করাও জরূরী ও ওয়াজিব। এই বাতিনী বিধানাবলীর উপর আমল করাকে বলা হয় তায্‌কিয়া বা আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধির এই সাধনাকে আধ্যাত্মিক সাধনাও বলা হয়। আর এই শাস্ত্রকে বলা হয় তাসাওউফ।

কুরআনে কারীমে আত্মশুদ্ধির মৌলিকতার প্রতি ইংগিত করে এটাকে রাসূল (সাঃ)-এর মূল দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছেঃ

ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم ....

অর্থাৎ, সে (রাসূল) তাদেরকে শিক্ষা দিবে কিতাব ও হেকমত আর তাদের তায্‌কিয়া বা আত্মশুদ্ধি করবে। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১২৯)

প্রসিদ্ধ হাদীছে জিব্রীলে ইহ্‌ছান তথা তাসাওউফের বিষয়ে ইরশাদ হয়েছেঃ

ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك -

অর্থাৎ, (জিব্রাঈল [আঃ]) জিজ্ঞাসা করলেন ইহ্‌ছান কি? রাসূল (সাঃ) উত্তর দিলেন তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহ্‌কে দেখছ। তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনিতো তোমাকে দেখছেন।

আহ্‌লে হক কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত تزكيه এবং উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত احسان-এর ব্যাখ্যার আলোকে তাসাওউফকে জরূরী মনে করেন। তাদের মতে চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়া ইত্যাদি তাসাওউফের এই সিলসিলা

১. ১০৭-১০৮, ১২১-১২২ رسائل ومسائل অনুবাদ গ্রন্থ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭ ॥ ২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬ ॥

সমুহ হক্ব এবং এসব সিলসিলার পীর মুরিদী দ্বারা দ্বীন ও মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রভূত খেদমত সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

কিন্তু মওদূদী সাহেবের মতে তাসাওউফের প্রচলিত পীর-মুরিদী তরীকা এক অত্যন্ত ক্ষতিকর বিষয় এবং এ থেকে বেঁচে থাকা জরূরী। তিনি এ ব্যাপারে মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ)-এর পর্যন্ত সমালোচনা করেছেন। যদিও তিনি মূল তাসাওউফ বা ইহ্‌সানকে অস্বীকার করেন না বলে দাবী করেছেন কিন্তু চিরাচরিত ও সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি ও পীর মুরীদির প্রচলিত তরীকার এবং সর্বজন স্বীকৃত পীর-মাশায়েখগণের যেভাবে ঢালাও সমালোচনা করেছেন তাতে তাসাওউফের স্বীকৃত অংশ বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। এরূপ স্বীকৃতি বাস্তবে অস্বীকৃতিরই নামান্তর এবং বাস্তবেও তাই মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী জামাত শিবিরের লোকজন তাসাওউফের সাথে কোন রূপ সংশ্লিষ্টতা রাখেন না।[১]

এতক্ষণ আমল এবং ইবাদত বন্দেগী প্রসঙ্গে মওদূদী সাহেবের আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে বিচ্যুত হওয়ার বিবরণ পেশ করা হল। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস কুর-আন হাদীছ এবং তাফসীর ও ফেকাহ শাস্ত্র সম্পর্কিত ধারণা এবং কুরআন-হাদীছ থেকে জ্ঞান আহরণের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তিনি আহ্‌লে হকের গৃহীত ও অনুসৃত নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

(গ) ইসলামী জ্ঞানের উৎস কুরআন, হাদীছ, তাফ্‌সীর ও ফেকাহ শাস্ত্র প্রসঙ্গে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি

এ প্রসঙ্গে নিম্নে ৫ টি বিষয় তুলে ধরা হল।

(১) তাফসীর প্রসঙ্গঃ

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট কুরআনে কারীমের তাফসীর সেটাই গ্রহণযোগ্য যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন ও আসলাফ থেকে সনদ পরম্পরায় বর্ণিত বা তার আলোকে কৃত হবে। এর বাইরে কারও নিজস্ব মস্তিষ্ক প্রসূত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এটা "তাফসীর বির-রায়" (মনগড়া তাফসীর) যা সম্পূর্ণ হারাম। (আল-ইত্‌কান-আল্লামা সুয়ূতী [রহঃ], তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১ম খন্ড)

কিন্তু মওদূদী সাহেব তাঁর স্বরচিত- তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকায় লিখেছেনঃ কুর-আনের একটি আয়াত পাঠ করার পর যে অর্থ আমার বুঝে আসে এবং যা আমার অন্তরে উদয় হয়, যথা সম্ভব বিশুদ্ধ ভাষায় তাই নিজ ভাষায় বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।[২] এভাবে তিনি কুরআনের তাফ্‌সীরের ক্ষেত্রে এবং হাদীছের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আসলাফ ও পূর্বসূরী মনীষী তথা রিজালুল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। আর রিজালুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া গোমরাহীর সোপানে পা রাখা। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। কুরআন হাদীছ অনুধাবনের ক্ষেত্রে রিজালুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্পষ্ট ঘোষণা স্বরূপ মওদূদী সাহেব বলেছেনঃ

১. দ্রঃ তাজদীদ ও এহ্‌ইয়ায়ে দ্বীন; অনুবাদ গ্রন্থঃ ইসলামী রেনেসা আন্দোলন ॥ ২. تفهيم القرآن، جـ ১/

কুরআন ও সুন্নাতে রাসূল (হাদীছ)-এর শিক্ষা সবচেয়ে অগ্রগণ্য তবে তা তাফসীর ও হাদীছের পুরাতন ভাণ্ডার থেকে নয়। ... পুরাতন কিতাব কাজে আসবে না।[১]

তিনি আরও বলেছেনঃ কুরআন (বোঝা)-এর জন্য কোন তাফসীর গ্রন্থের প্রয়োজন নেই। একজন উঁচু স্তরের প্রফেসরই যথেষ্ট।[২]

❑ **খণ্ডনঃ**

প্রত্যেকের নিজস্ব মস্তিস্ক প্রসূত ব্যাখ্যাই যদি তাফসীর হয়, তাহলে প্রকৃত তাফসীর-আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যা কোন্‌টি হবে ? নিজস্ব বুঝ এবং নিজস্ব মস্তিস্ক প্রসূত ব্যাখ্যা পরিবেশন করার কারণেই মওদূদী সাহেব কৃত তাফহীমুল কুরআন একটি মনগড়া তাফসীর বৈ আর কিছু নয়।

(২) হাদীছ প্রসঙ্গঃ

হক্কানী উলামায়ে কেরামের নিকট হাদীছ বিশুদ্ধ হিসেবে গৃহীত হবার জন্য মুহাদ্দিছীন বা হাদীছ বিশারদদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত কথা। বর্ণনা সূত্র বা সনদের ভিত্তিতে মুহাদ্দিছগণ হাদীছের শুদ্ধা-শুদ্ধি নির্ণয় করে গেছেন। আটা থেকে পশম বিচ্ছিন্ন করার মতো ইলমে হাদীছের ইমামগণ সহীহ, মওযূ' ,শক্তিশালী ও দুর্বল বর্ণনাগুলো সব চিহ্নিত করে বড় বড় গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এ ব্যাপারে আর নতুন করে কারও কিছু বলার তেমন প্রয়োজন নেই। বর্ণনা সূত্র বা সনদের ভিত্তিকে বাদ দিয়ে শুধু নিজস্ব রুচি, বুঝ এবং উপলব্ধির দ্বারা হাদীছের শুদ্ধা-শুদ্ধি নির্ণিত করা যায় না। (উসূলে হাদীছের কিতাব সমূহ দ্রঃ)

কিন্তু মওদূদী সাহেব বলেছেনঃ মুহাদ্দিছীনে কেরাম যে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা স্বীকৃত। এও স্বীকৃত যে, তাঁরা হাদীছ বিচারের জন্য যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তা প্রথম যুগের হাদীছ ও আছারের সত্যতা নির্ধারণের ব্যাপারে খুবই ফলপ্রসূ। এ ব্যাপারে কোন কথা নেই। বরং তাঁদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা কতখানি সঙ্গত, কথা কেবল এ বিষয়টি নিয়েই। কারণ তাঁরাতো মানুষই ছিলেন। মানবীয় জ্ঞানের জন্যে আল্লাহ্ যে সীমারেখা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা অতিক্রম করতে তাঁরা সমর্থ ছিলেন না। মানবীয় কাজকর্মে স্বভাবতই যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়, তা থেকে তাঁদের কাজও মুক্ত ছিল না। তাহলে তাঁরা যাকেই সহীহ আখ্যা দিয়েছেন, তা বাস্তবেও সহীহ হবে একথা কী করে বলা যায় ? বস্তুতঃ কোন জিনিসের নির্ভুল বা সহীহ হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের নিজেদেরও পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল না। তাঁরাও বড় জোর এটুকুই বলতেন যে, এ হাদীছের বিশুদ্ধতা সংক্রান্ত অনুমানটা খুব প্রবল।[৩]

১. ١٩٩١ سنہ تنقیحات صفحہ/١۴٨امرکزی مکتبہ اسلامی دہلی ॥

২. ٢٣٨/تفہیم القرآن ، جـ/١، مکتبۂ تعمیر انسانیت ، لاہور، ایڈیشن اگست ,ایضا صفحہ ١٩٩١ ॥ ، صفحہ/١٠ -

৩. ١٩٦٨ تفہیمات حصہ اول، صفحہ/٣٥٦ اسلامک پبلیکشنز لاہور অনুবাদ গ্রন্থঃ নির্বাচিত রচনাবলী ১. (দ্বিতীয় ভাগ) ১৮৭ পৃঃ ॥

মওদূদী সাহেব আরো বলেছেন, এসব দৃষ্টান্ত পেশ করার মূলে আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, রাবীদের জীবনী সংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞান-তথ্যই ভ্রান্ত। বরং আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এটুকুই ব্যক্ত করা যে, যারা রাবীদের যাচাই-বিচার ও সমালোচনা করেছেন, তাঁরাও তো মানুষই ছিলেন। তাদের সঙ্গেও মানবীয় দুর্বলতার প্রশ্ন জড়িত ছিলো। এর কি নিশ্চয়তা রয়েছে যে, তারা যাঁকে ছিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন, তিনি সুনিশ্চিত ভাবে বিশ্বস্ত এবং তার বর্ণিত সমস্ত রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রেও তিনি নির্ভরযোগ্য, আর যাকে অবিশ্বস্ত বলেছেন, তিনি সুনিশ্চিত ভাবে অবিশ্বস্ত এবং তার সমস্ত বর্ণনাই বিশ্বাসের অনুপযোগী। তারপর এক একজন রাবীর স্মরণ শক্তি, তাঁর নেক নিয়ত, সিহ্‌হাতে যাব্‌ত্ বা সংরক্ষণ-বিশুদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভুল জ্ঞান লাভ করাতো আরো কঠিন ব্যাপার![১]

❑ **পর্যালোচনা ও খণ্ডন ঃ**

মওদূদী সাহেব হাদীছের শুদ্ধা-শুদ্ধি নির্ণয়ের ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের মতামতের উপর সম্পূর্ণ আস্থা করা যাবে না- এই মত পোষণ করেছেন। যুক্তি হিসেবে তিনি মূলতঃ চারটি কথার অবতারণা করেছেন।

(১) মুহাদ্দিছগণ মানুষ ছিলেন তারা মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে ছিলেন, না। নফ্‌স তাদের প্রত্যেকের সংগেই লেগেছিল। অতএব তাদের সিদ্ধান্ত দুর্বলতার উর্ধ্বে নয়। আর নফ্‌স যখন তাদের সাথে লেগেই আছে তখন তাদের সিদ্ধান্ত হবে নফস তাড়িত। কাজেই তাদের সিদ্ধান্ত আস্থাযোগ্য নয়।

এখন পাঠকগণই বলুন! এ যুক্তিতে মুহাদ্দিছগণের সিদ্ধান্ত অনাস্থাযোগ্য হয়ে গেলে মওদূদী সাহেবের সিদ্ধান্ত কি করে আস্থাযোগ্য হবে ? তিনি কি মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে ছিলেন ? তিনি কি নফ্‌স থেকে পূঁত পবিত্র ছিলেন ? কিংবা অন্য কেউ যারা এ যুগে হাদীছের বাছ-বিচার করবেন তারা কি ফেরেশ্‌তা হবেন ? উক্ত যুক্তি মেনে নিলে একমাত্র ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কারো সিদ্ধান্ত তো মেনে নেয়া যাবে না। আর ফেরেশ্‌তাদের সিদ্ধান্ত যখন জানা সম্ভব নয় তখন সব হাদীছই কি তাহলে অশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা হেতু পরিত্যাগ করতে হবে। এটা কি পুরো হাদীছ ভাণ্ডারের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টির পদক্ষেপ নয় ?

(২) তার যুক্তিগুলোর দ্বিতীয় সারমর্ম এই যে, কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে ভাল বা মন্দ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছগণের ব্যক্তিগত ঝোঁক-প্রবণতা প্রভাবশীল থাকতে পারে। অতএব তাদের সিদ্ধান্তকে নিরপেক্ষ বলে মেনে নেয়া যাবে না। বা তার উপর আস্থা স্থাপন করা যাবে না। মওদূদী সাহেবের এ বক্তব্য মেনে নিলেও মুহাদ্দিছগণের উপর থেকে আস্থা উঠে যাবে এবং গোটা হাদীছ ভাণ্ডার থেকে আস্থা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সমষ্টিগতভাবে মুহাদ্দিছদের সিদ্ধান্তকে যদি ঝোঁক-প্রবণতা মুক্ত বা নিরপেক্ষ বলে মেনে নেয়া না যায় তাহলে মওদূদী সাহেব বা সম্প্রতিক কালের কোন ব্যক্তি বিশেষের সিদ্ধান্তকে সর্ব প্রকার ঝোঁক-প্রবণতা মুক্ত এবং নিরপেক্ষ বলে কিভাবে মেনে নেয়া যাবে ?

১. ١٩٦٨ تفہیمات حصہ اول، صفحہ/٣٥٧ اسلامک پبلیکشنز لاہور অনুবাদ গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, ১৯০-১৯১ ॥

(৩) মওদূদী সাহেব তৃতীয় যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তাহল- মুহাদ্দিছগণ যে সব হাদীছকে সহীহ বা শুদ্ধ বলেছেন সে ব্যাপারে তাদের নিজেদেরও পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল না। তারাও বড় জোর সেটাকে একটা প্রবল অনুমান-ভিত্তিক মনে করতেন। সেটাকে তারাও নিশ্চিত মনে করতেন না। কাজেই আমরা কিভাবে এটাকে নিশ্চিত বলে মেনে নিতে পারি ?

প্রবল ধারণার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত যদি আস্থাযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে শরী'আতের বহু বিধি-বিধানই গ্রহণ যোগ্যতা হারাবে। শরী'আতের বহু বিধানের ভিত্তিই এই প্রবল ধারণা। বিবাহ-শাদী, তালাক, এমনকি হদ্দ-কেসাস ইত্যাদি বিষয়ক বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত সবই প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। সাক্ষীগণ সত্য সাক্ষ্য দিয়েছেন এরূপ পুরোপুরি নিশ্চয়তা লাভ করা সম্ভব নয়। প্রবল ধারণার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত যদি প্রত্যাখ্যান করা হয় তাহলে পৃথিবীর কোর্ট-কাচারী-আদালত কোন কিছুই চলতে পারবে না ? আশ্চর্যের বিষয়, মওদূদী সাহেব এমন একটি ঠুনকো যুক্তির অবতারণা করে মুহাদ্দিছগণের সিদ্ধান্তাবলীর প্রতি অনাস্থা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালালেন ?[১]

(৪) মওদূদী সাহেবের বক্তব্য থেকে চতুর্থ যে কথাটি বের হয় তাহলো হাদীছের শুদ্ধা-শুদ্ধি নির্ণয়ের মূল মাপকাঠি সনদ নয় বরং নিজস্ব রুচি, বুঝ ও উপলব্ধিই হল প্রকৃত মানদণ্ড।

যদি মওদূদী সাহেবের এ কথা মেনে নেয়া হয়, তাহলে যে কোন বাতিলপন্থীরাই তাদের মতাদর্শের বিপরীত বিশুদ্ধ হাদীছগুলোকে অশুদ্ধ বলে উড়িয়ে দিতে পারবে এবং যে কোন মতলববাজ তার মতলবের পক্ষে অশুদ্ধ হাদীছকেও শুদ্ধ বলে দলীল দাঁড় করাতে পারবে। আর এভাবে পুরো হাদীছের ভাণ্ডারই খেয়াল খুশির হাতিয়ারে পরিণত হবে (নাউযু-বিল্লাহ্)। তাইতো প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুবারক বলেছেন ঃ

الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء - (مقدمۂ مسلم)

অর্থাৎ, সনদ বা বর্ণনাসূত্র দ্বীনের অংশ। যদি সনদের নিয়ম না রাখা হত, তাহলে যার যা ইচ্ছা তা বলে যেত।

(৩) ফেকাহ, তাক্‌লীদ ও ইজতিহাদ প্রসঙ্গঃ

ফেকাহ, তাক্‌লীদ এবং ইজতিহাদ সম্পর্কেও মওদূদী সাহেব অত্যন্ত বল্গাহীন নীতি গ্রহণ করেছেন। তিনি জমহুরে উম্মতের বিপরীত বলেনঃ "আমার মতে দ্বীনী ইল্‌মের ক্ষেত্রে

১. কোন কোন সুক্ষ্মদর্শী সমালোচক বলেছেন, "বস্তুতঃ মুহাদ্দিছগণের সিদ্ধান্তের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করে মওদূদী সাহেব তার নিজস্ব মতামত চালিয়ে দেয়ার পথ খোলাসা করে নিয়েছেন। যাতে কোন সহীহ হাদীছ তার নিজস্ব মতামতের বিরুদ্ধে গেলে সহজেই তিনি সেটাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কিংবা বলতে হবে- গোটা হাদীছ ভাণ্ডারের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করে তিনি ইসলামের একটি বুনিয়াদকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ওরিয়েন্টালিষ্ট চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। তাই বুঝি তিনি এক দিকে মুহাদ্দিছগণের খেদমতকে স্বীকৃত আখ্যা দিয়েছেন, আবার তার প্রতি অনাস্থা সৃষ্টির জন্য এতসব কথার অবতারণা করেছেন। গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালা এই তো ওরিয়েন্টালিষ্টদের নীতি।" ॥

বুৎপত্তি রাখেন এমন ব্যক্তির জন্যে তাক্‌লীদ নাজায়েয এবং গুনাহ, বরঞ্চ তার চাইতেও সাংঘাতিক।[১] এছাড়াও তিনি তার লেখনীর বহু স্থানে মুক্ত বুদ্ধি প্রয়োগ এবং মুক্ত মনে কুরআন অধ্যায়ন ও গবেষণার প্রতি যেভাবে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাতে তার মতবাদ অনুসারীগণ তাক্‌লীদ তথা ইমামগণের অনুসরণ করার ব্যাপারে অত্যন্ত বল্গাহীনতার শিকার হয়ে পড়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা অত্যন্ত বিপদজনক বিষয়। যদিও তিনি সাধারণ লোকেরা তাক্‌লীদ করতে পারে বলে মত দিয়েছেন, কিন্তু তার মতে আলেমদের পক্ষে তাক্‌লীদ করা নাজায়েয আবার তার দৃষ্টিতে আলেম হওয়ার জন্য নিয়মতান্ত্রিক কোন আলেমের কাছে পড়াশুনারও প্রয়োজন না থাকায় কার্যতঃ সকলের জন্যই তাক্‌লীদ মুক্ত হয়ে যাওয়ার অবকাশ বেরিয়ে এসেছে। আর বাস্তবেও তার অনুসারীবৃন্দের মধ্যে তাক্‌লীদ বিষয়ে এমন বল্গাহীনতাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উম্মতের কেউ তাক্‌লীদের বিষয়ে এতখানি বল্গাহীন হওয়াকে জায়েয মনে করেন না।

বি ঃ দ্র ঃ তাক্‌লীদ প্রসঙ্গে পরবর্তিতে দলীল প্রমাণসহ একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ পেশ করা হয়েছে। দেখুন পৃঃ নং ৪১৯-৪৩১।

(৪) কুরআনের চারটি পরিভাষা সহ ইসলামের বহু মৌলিক পরিভাষার স্বরূপ বিকৃত করা প্রসঙ্গঃ

কুরআন নাযিল হওয়া থেকে সাহাবায়ে কেরাম তাবিঈন, তাবে তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ আজ পর্যন্ত সকলেই সব যুগে বলে আসছেন এবং বুঝে আসছেন যে, বিশেষ স্থানে বিশেষ কোন করীনা না থাকলে কুরআনের নিম্নোক্ত চারটি পরিভাষার অর্থ নিম্নরূপঃ

(এক)" ইলাহ" অর্থ মা'বূদ। অথচ মওদূদী সাহেব বলছেন "ইলাহ" অর্থ শাসক। "আল্লাহ" অর্থও তাই।[২]

(দুই) "রব" অর্থ প্রতিপালক। অথচ মওদূদী সাহেব "রব"-এর অর্থও করেছেন প্রায় ইলাহ্ এর মত।

(তিন) "দ্বীন" অর্থ ধর্ম। অর্থাৎ, ঈমান আমল তথা নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং ইহ্‌ছান তথা তাসাওউফ এই সবকিছুর সমন্বিত নাম হল দ্বীন তথা ধর্ম। যেমন প্রসিদ্ধ হাদীছে জিব্রীলে হযরত জিব্রীল (আঃ) ঈমান ইসলাম তথা নামায, রোযা, হজ্জ যাকাত এবং ইহ্‌ছান তথা তাসাওউফ সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর চলে গেলে নবী (সাঃ) বলেছিলেন যে,

اتاكم يعلمكم دينكم -

অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। এতে করে বোঝা গেল ঈমান ও আমল তথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং ইহ্‌ছান তথা তাসাওউফ এই সবকিছুকে

১. রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খণ্ড, আবদুস শহীদ নাসিম অনুদিত, শতাব্দি প্রকাশনী, মার্চ ২০০২ ॥

২. خطبات. صفحہ/۳۲۰. مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی سنہ ۱۹۸۰ ॥

"দ্বীন" বলা হয়। অথচ মওদূদী সাহেব বলছেন "দ্বীন" অর্থ রাষ্ট্র সরকার।[১] আর "শরীয়ত" অর্থ রাষ্ট্রের আইন-কানূন।[২]

(চার) "ইবাদত" হল নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধি-বিধান পালন করা। অথচ মওদূদী সাহেব বলছেন "ইবাদত" অর্থ আইন মান্যকরা।[৩]

এভাবে তিনি বহু সংখ্যক মৌলিক পরিভাষার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের রাজনৈতিক করণ করেছেন।

মওদূদী সাহেব "কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতেলাহেঁ" গ্রন্থে বলেছেনঃ

"কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এ শব্দগুলোর (ইলাহ্, রব দ্বীন, ইবাদত) যে মৌল অর্থ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী শতকে ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ তার সম্পূর্ণ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।" এর এক পৃষ্ঠা পর তিনি লিখেছেন- "এটা সত্য যে, কেবল এই চারটি মৌলিক পরিভাষার তাৎপর্য আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণেই কুরআনের তিন চতুর্থাংশের চেয়েও বেশী শিক্ষা এবং তার সত্যিকার স্পিরিটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।"[৪]

❑ **পর্যালোচনা ও খণ্ডন ঃ**

কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষার অর্থ যদি বিকৃত হয়ে যেয়ে থাকবে এবং তার কারণে কুরআনের তিন চতুর্থাংশের বেশী বরং মূল স্পিরিটই উধাও হয়ে গিয়ে থাকবে এবং মওদূদী সাহেব তা উদ্ধার করে থাকবেন, তাহলে বলতে হবে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম শতাব্দীর পর কুরআন তথা ইসলাম সঠিকভাবে সংরক্ষিত ছিল না। (নাউযুবিল্লাহ্) কুরআনের শাশ্বত্যের বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড় আঘাত আর কি হতে পারে ? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমি তা সংরক্ষণ করব। (সূরা হিজ্‌রঃ ৯)

মওদূদী সাহেবের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ তেরশ' বৎসরের অধিক কাল যাবত কুরআনের তিন চতর্থাংশেরও বেশী যদি কেউ বুঝে না থাকবেন অথচ আক্বাইদ, ফেকাহ ও হাদীছের কিতাবাদী সংকলণসহ ইসলামী দুনিয়ার যাবতীয় মৌলিক ও আনুষঙ্গিক কিতাবাদী প্রায় সবই এ যুগেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাহলে এসব কিতাবাদী ও তার লেখকগণ কুরআন তথা ইসলাম না বোঝার কারণে নির্ভযোগ্যতা হারাবেন। এমতাবস্থায় দুনিয়াবাসী ইসলাম পাবে কোথায় ? একমাত্র মওদূদী সাহেবের নিকট ?[৫]

---

১. ١٩٨٠ خطبات. صفحہ/٣٢٠. مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی ॥

২. ايضا صفحہ/٣١٩ ৩. প্রাগুক্ত॥

৪. قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، صفحہ/١٠-٨. مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی، ١٩٨٨ অনুবাদ গ্রন্থঃ কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা ঃ ১২-১৩ পৃঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশ, জুন ২০০২ ॥

৫. কোন কোন সমালোচক বলেছেনঃ সর্ব যুগের সমস্ত উলামায়ে কেরামের বিপরীতে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দেয়ার পথ খোলাসা করার জন্যেই কি মওদূদী সাহেব সকলকে কুরআন তথা ইসলাম না বুঝার দলে ফেলতে এই অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিলেন ? ॥

এভাবে তিনি ইবাদত-বন্দেগীর পরিচয় পাল্টে দিয়েছেন, দ্বীন ধর্ম এবং শরী'আতের পরিচয় পাল্টে দিয়েছেন। এমনকি পাল্টে দিয়েছেন ইলাহ বা মা'বূদের পরিচয়ও। ইসলামের এসব প্রধান মৌলিক বিষয়গুলির পরিচয় ও স্বরূপ পাল্টে দেয়ার ফলে মওদূদী সাহেবের পেশকৃত ইসলাম আর সেই ইসলাম থাকেনি, ইসলাম বলতে আজ পর্যন্ত যে ধর্মকে বুঝে আসা হচ্ছে। ইসলাম ও মুসলমানের পরিচয়ও পাল্টে গেছে। বস্তুতঃ মওদূদী সাহেব একথাটিও স্পষ্টতঃ বলেছেন যে, ইসলাম বলতে যে একটা ধর্ম এবং সেই ধর্মের অনুসারী জাতিকে মুসলমান বলা হয় এটা ঠিক নয়। তিনি বলেন ঃ

"কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইসলাম কোন 'ধর্ম' বা মুসলমান কোনো 'জাতির' নাম নয়। ইসলাম হচ্ছে মূলতঃ এক বিপ্লবী মতবাদ ও মতাদর্শের নাম। গোটা দুনিয়ার সামাজিক ও সামগ্রিক ব্যবস্থাকে (Social Order) পরিবর্তিত করে নিজস্ব মতবাদ ও মতাদর্শের ভিত্তিতে তাকে পুনর্গঠিত করাই হচ্ছে এর লক্ষ্য। আর মুসলমান হচ্ছে এক আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দলের (International Revolutionary party) নাম। নিজের ইপ্সিত বিপ্লবী প্রোগ্রামকে বাস্তবায়িত করার জন্যেই ইসলাম একে সংগঠিত করেছে। আর এই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে গৃহীত বিপ্লবী চেষ্টা-সাধনা (Revolutionary Struggle) ও চূড়ান্ত শক্তি-প্রয়োগেরই নাম হচ্ছে 'জিহাদ'।[১]

চারটি মৌলিক পরিভাষার কথিত অর্থের স্বপক্ষে মওদূদী সাহেবের দলীল প্রসঙ্গ ঃ

মওদূদী সাহেব উপরোক্ত চারটি পরিভাষার যে অর্থ করেছেন তার দলীল প্রদান করেছেন কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা গ্রন্থে। কিন্তু আশ্চর্য লাগে তিনি তার বক্তব্যের স্বপক্ষে সরাসরি কোন দলীল প্রদান করতে সক্ষম না হয়ে এমন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন যা কোন উসূল বা মূলনীতির পর্যায়ে পড়ে না। যেমন তিনি 'ইলাহ'-এর অর্থ করেছেন শাসক। আর এই বক্তব্যের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে যে সব আয়াত উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি বিশেষ আয়াত হল ঃ

ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ـ

অর্থাৎ, তাদের কি এমন শরীক রয়েছে, যারা তাদের জন্য এমন শরী'আত নির্ধারণ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। (সূরাঃ শুরা ঃ ২১)

মওদূদী সাহেব বলেছেন এখানে 'ইলাহ' এ অর্থে যে, তার নির্দেশকে আইন হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, তার আদেশ-নিষেধ মেনে নেয়া হয়েছে, তার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এ ধারণা করে নেয়া হয়েছে যে, তার নির্দেশ দেয়ার বা নিষেধ করার ইখতিয়ার রয়েছে, তার চেয়ে উর্ধ্বতন এমন কোন অথরিটি (Authority) নেই যার অনুমোদন গ্রহণ বা যার দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজন পড়তে পারে।[২]

---

১. تفہیمات حصہ اول، صفحہ/٧٧، اسلامک پبلیکشنز لمیٹڈ لاہور ١٩٧٦ অনুবাদঃ নির্বাচিত রচনাবলী ১ম (প্রথম ভাগ) আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বর-১৯৯১, পৃঃ ৭৫ ॥ ২. কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, পৃঃ ২১, ৮ম প্রকাশ জুন ঃ ২০০২ আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা। ॥

এভাবে মওদূদী সাহেব বোঝাতে চেয়েছেন যে, 'ইলাহ' পরিভাষাটি শাসক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'ইলাহ'-এর অর্থ "মা'বূদ" গ্রহণ করার পর আদেশ নিষেধ করার ও বিধান দেয়ার বিষয়কে মা'বূদের গুণ হিসেবে গ্রহণ করলে তাতে ইলাহের অর্থে কি কোন ত্রুটি এসে পড়ে ? মা'বূদ অর্থ কি এমন কোন সত্তা যার কোন আদেশ নিষেধ করার বা বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই ? ইলাহ পরিভাষাটি ব্যবহারের সাথে আদেশ নিষেধ প্রদান ও বিধান প্রদান জ্ঞাপক কোন বক্তব্য থাকলেই যদি 'ইলাহ'-এর অর্থ শাসক করতে হয়, তাহলে এক আয়াতে 'ইলাহ'-এর সাথে সৃষ্টি বিষয়ক কথার উল্লেখ রয়েছে, সে হিসেবে 'ইলাহ'-এর অর্থ করতে হবে খালেক বা সৃষ্টিকর্তা। যেমন বলা হয়েছে ঃ

واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون . الاية -

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব ইলাহদেরকে গ্রহণ করেছে, যারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না বরং তারাই সৃষ্ট। (সূরা ঃ ২৫-ফুরকান ঃ ৩)

সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যায় এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে-যারা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না তারা মা'বূদ আখ্যায়িত হতে পারে না। অতএব 'ইলাহ'-এর অর্থ শাসক করা সংগত নয়, কারণ কোন শাসক সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। 'ইলাহ'-এর মধ্যে যে সৃষ্টিকরার ক্ষমতাটি অন্তর্ভুক্ত, শাসকের মধ্যে সেটি অনুপস্থিত।

মওদূদী সাহেব এভাবে আরও বহু আয়াত উল্লেখ করার পর ইলাহ শব্দের সাথে উল্লেখিত অভাব পূরণ, আশ্রয় দান, সাহায্য করা ইত্যাদি আল্লাহ্‌র বিভিন্ন গুণবাচক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছেনঃ "ইলাহিয়াত ও ক্ষমতা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত-ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্পিরিট ও তাৎপর্যের দিক থেকে উভয়ই এক জিনিস। যার ক্ষমতা নেই, সে ইলাহ হতে পারে না-ইলাহ হওয়া উচিত নয় তার। যার ক্ষমতা আছে, কেবল সে-ই ইলাহ হতে পারে।"[১]

কিন্তু আবারও বলতে হয় অভাব পূরণ, আশ্রয় দান, সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়কে মা'বূদের গুণ হিসেবে গ্রহণ করলে তাতে ইলাহের অর্থে কি কোন ত্রুটি এসে পড়ে ? মা'বূদ অর্থ কি এমন কোন সত্তা যার এগুলো করার কোন ক্ষমতা নেই ?

মওদূদী সাহেব "রব" শব্দের অর্থও যা করেছেন সেটাও প্রায় 'ইলাহ'-এর অর্থের কাছাকাছি। তিনি "রব"-এর অর্থের মধ্যে নেতা, ক্ষমতাশালী কর্তা ব্যক্তি, কর্তৃত্বের অধিকারী, যিনি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন, যিনি হস্তক্ষেপ ও বল প্রয়োগের অধিকার রাখেন ইত্যাদি অর্থ অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করেছেন[২] এবং এখানেও তিনি তার দাঁড় করানো এসব অর্থের পক্ষে একক কোন দলীল দিতে না পেরে পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত 'রব' শব্দের সাথে উল্লেখিত আনুসঙ্গিক বিষয়াদির সমন্বয়ে উপরোক্ত অর্থ দাঁড় করেছেন। যদিও সেসব স্থানে 'রব' শব্দের প্রতিপালক অর্থ গ্রহণ করাতে কোন অসুবিধা নেই। তদুপরি তিনি 'রব' শব্দের উপরোক্ত অর্থে প্রযোজ্য ব্যবহার দেখাতে গিয়ে যে সব আয়াত উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মধ্যে 'রব' শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য প্রয়োগ হয়নি। অথচ এ সব অর্থে 'রব' শব্দের

১. কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, পৃঃ ২৯, ৮ম প্রকাশ জুন ঃ ২০০২ আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা। ॥ ২. দেখুন প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫। ॥

প্রয়োগ দেখিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন আল্লাহ্‌র যে পরিচয় "রব", তাও উপরোক্ত অর্থেই প্রযোজ্য। আর এ সব অর্থে 'রব' তথা আল্লাহ্‌কে মেনে নিলে মওদূদী সাহেবের কাংখিত বাসনা অনুযায়ী ধর্মের মৌলিক বিষয় রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। যেমন তিনি নেতা, ক্ষমতাশালী কর্তা ব্যক্তি, কর্তৃত্বের অধিকারী, যিনি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন, যিনি হস্তক্ষেপ ও বল প্রয়োগের অধিকার রাখেন ইত্যাদি অর্থে 'রব' শব্দের ব্যবহারের প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন[১] ৪ টি আয়াতঃ

اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله -

অর্থাৎ, তারা (ইয়াহুদী নাসারাগণ) আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের 'রব' রূপে গ্রহণ করেছে। (সূরাঃ ৯-তওবাঃ ৩১)

ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله - (সূরা ৩-আলু ইমরান ঃ ৬৪)

অর্থাৎ, আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ব্যতীত 'রব' রূপে গ্রহণ না করি।

اما احدكما فيسقى ربه خمرا ..... وقال للذى ظن انه ناج منهما اذكرنى عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه -

অর্থাৎ, সে তার রবকে (প্রভূ/সম্রাটকে) মদ্য পান করাবে ..... আর সে (ইউসুফ) তাদের (দুই কয়েদীর) মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল, তাকে বলল, তোমার রবের (প্রভূর) কাছে (অর্থাৎ, সম্রাটের কাছে) আমার কথা বলিও। কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভূর নিকট তার বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দিল। (সূরা ঃ ১২-ইউসুফ ঃ ৪১-৪২)

فلما جائه الرسول قال ارجع الى ربك فسئله ما بال النسوة التى قطعن ايديهن -

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তার (ইউসুফের) নিকট (সম্রাটের) দূত আসল, তখন সে বলল তুমি তোমার রব-এর (প্রভূর/সম্রাটের) নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে নারীগণ হাত কেটে ফেলেছিল, তাদের অবস্থা কী! (সূরা ঃ ১২-ইউসুফ ঃ ৫০)

পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এ সবগুলি আয়াতেই "রব" শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য প্রয়োগ হয়নি। বরং মানুষের জন্য প্রয়োগ হয়েছে। অতএব এ দ্বারা কিভাবে প্রমাণ করা যায় যে, আল্লাহ্‌র জন্য যে পরিভাষা "রব" ব্যবহৃত হয়েছে, তাও উপরোক্ত অর্থেই প্রযোজ্য ?

মওদূদী সাহেব "দ্বীন" পরিভাষাটির অর্থ করেছেন 'রাষ্ট্র সরকার'। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। "দ্বীন" শব্দের অভিধানিক অর্থ দেখে এবং বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত দ্বীন শব্দে সে সব অর্থ প্রয়োগ করে তিনি তার কথিত বক্তব্য প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার শুধু অভিধান দেখেই কুরআনের ব্যাখ্যা করা যায় না। কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হক্কানী উলামায়ে কেরামের সর্বজন স্বীকৃত নীতি হল কুরআনের ব্যাখ্যা

১. কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, পৃঃ ৩৭-৩৮, ৮ম প্রকাশ জুন ঃ ২০০২ আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা। ॥

প্রথম হবে কুরআন দ্বারা, তারপর হাদীছ দ্বারা, তারপর সাহাবাদের বক্তব্য দ্বারা, তারপর তাবিয়ীদের বক্তব্য দ্বারা, তারপর আরবদের ভাষা তথা অভিধান দ্বারা, তারপর সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা। এভাবে অনেক পরে গিয়ে অভিধান দেখে ব্যাখ্যা করার পর্যায়। আর পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী ঈমান, আমল (তথা নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত) এবং ইহ্ছান তথা তাসাওউফ-এই সবকিছুর সমন্বিত নাম হল দ্বীন তথা ধর্ম। যেমন প্রসিদ্ধ হাদীছে জিব্রীলে হযরত জিব্রীল (আঃ) ঈমান, ইসলাম তথা নামায, রোযা, হজ্জ যাকাত এবং ইহ্ছান তথা তাসাওউফ সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর নবী করীম (সাঃ) থেকে সেগুলির উত্তর শুনে চলে যাওয়ার পর নবী (সাঃ) বলেছিলেন যে,

اتاكم يعلمكم دينكم -

অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে "দ্বীন" শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

এ হাদীছ দ্বারা পরিষ্কার বোঝা গেল যে, ঈমান, আমল (তথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত) এবং ইহ্ছান তথা তাসাওউফ এই সবকিছুকে "দ্বীন" বলা হয়। সহীহ হাদীছে বর্ণিত "দ্বীন" পরিভাষাটির এই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও মওদূদী সাহেব তা উপেক্ষা করে নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র মতবাদ (ইসলামের রাজনৈতিক করণ মতবাদ) দাঁড় করানোর জন্য "দ্বীন" পরিভাষাটির অর্থ করেছেন 'রাষ্ট্র সরকার'।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে- মওদূদী সাহেব "ইবাদত" পরিভাষাটির অর্থ করেছেন "আইন মান্যকরা"। কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা গ্রন্থে তিনি সরাসরি এ রূপ বক্তব্য দেননি বরং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে তার স্বপক্ষে দলীল প্রদানের চেষ্টা করেছেন। তাই ঘুরানো ফিরানো সে বক্তব্য খণ্ডনের পশ্চাতে পড়ে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন মনে করলাম না।

(৫) কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ উভয়টার সু সমন্বয় জরূরী - এ প্রসঙ্গ ঃ

মূলতঃ মওদূদী সাহেবের সব বিভ্রান্তির মূলে হল তিনি পূর্বসূরী মনীষী তথা রিজালুল্লাহকে উপেক্ষা করে এবং রিজালুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব মন-মস্তিস্ক থেকে কুরআন হাদীছ অনুধাবন করতে গিয়েছেন। তিনি হেদায়েতের উপর থাকার জন্য রিজালুল্লাহকে জরূরী মনে করেননি। ফলে তিনি হক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, হেদায়েত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন।

কুরআনে কারীমে সূরা ফাতেহায় "সিরাতে মুস্তাকীম" (الصراط المستقيم)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে "অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পথ" (صراط الذين انعمت عليهم) কথাটা বলে বোঝানো হয়েছে যে, রিজালুল্লাহ্কে বাদ দিয়ে শুধু কিতাবুল্লাহ দ্বারা হক পথ নির্ণয় করা সম্ভব নয় এবং এরূপ নীতি বিধিবদ্ধও নয়। হেদায়েতের জন্য কিতাবুল্লাহ এবং রিজালুল্লাহ উভয়টাই জরূরী। কিতাবুল্লাহ এবং রিজালুল্লাহ এই দুটো হল হেদায়েতের দুই বাহু। হক অনুধাবন ও হেদায়েতের জন্য শুধু কিতাবুল্লাহ যথেষ্ট হলে নবী রাসূলদের প্রেরণের প্রয়োজন হত না। বরং আসমান থেকে লিখিত আকারে আল্লাহ্র বিধি-বিধান সম্বলিত কিতাব প্রেরণ করে দেয়াই যথেষ্ট হত।

"অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ" তথা রিজালুল্লাহ কারা তাদের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصلحين وحسن اولئك رفيقا -

অর্থাৎ, যারা আনুগত্য করবে আল্লাহ্র ও রাসূলের, তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথে থাকবে অর্থাৎ, আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালিহীনদের সাথে। আর বন্ধু হিসেবে তাঁরা কত উত্তম। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ৬৯)

উপরোক্ত আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী নবী, সিদ্দীকীন, শুহাদা, সালিহীন তথা উম্মতের হক্কপন্থী সমস্ত পূর্বসূরী হলেন রিজালুল্লাহ্-র অন্তর্ভুক্ত। উম্মতের সাহাবা, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন, আইম্মা, মুজতাহিদীন সকলেই এই রিজালুল্লাহ্-র জামা'আতের অংশ। সাহাবায়ে কেরাম হলেন এই জামা'আতের প্রথম ও প্রধান দিকপাল।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআনে কারীমে ঈমান আমল সবকিছুর ক্ষেত্রে সাহাবীদের ঈমান আমলকে নমূনা ও মাপকাঠি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এভাবে ঈমান আমল সবক্ষেত্রে রিজালুল্লাহ্র প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করা হয়েছে। বোঝানো হয়েছে যে, রিজালুল্লাহ্ ব্যতীত ঈমান আমল কোনটির সঠিকতায় পৌঁছা সম্ভব নয়। রিজালুল্লাহ ব্যতীত দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করাও সম্ভব নয়। রিজালুল্লাহ হল দ্বীনের সনদ। এজন্যই প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেছেনঃ

الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء - (مقدمة مسلم)

অর্থাৎ, সনদ দ্বীনের অংশ। যদি সনদের নিয়ম না রাখা হত তাহলে যার যেমন ইচ্ছা তেমন বলে যেত।

এ ছাড়াও নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে রিজালুল্লাহ্-র অনুসরণ ও আনুগত্যের তাগীদ প্রদান করা হয়েছে ঃ

(১) يايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدقين -

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যপন্থীদের সাথে থাক। (সূরাঃ ৯-তাওবাঃ ১১৯)

(২) واتبع سبيل من اناب الى -

অর্থাৎ, যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তুমি তার পথ অনুসরণ কর। (সূরাঃ ৩১-লুকমানঃ ১৫)

(৩) واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم -

অর্থাৎ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার কতৃত্বের অধিকারীদের। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ৫৯)

এই রিজালুল্লাহ তথা পূর্বসূরী মনীষীদের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই মওদূদী সাহেবের গোমরাহীর মূল কারণ। কুরআন-হাদীছ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিভাবে তিনি রিজালুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন তার বিবরণ পূর্বে "তাফসীর প্রসঙ্গ" উপ শিরোনামের অধীনে (পৃঃ ৩৮৩) আলোচনা করা হয়েছে।

সার কথা-মওদূদী সাহেব ও তার অনুসারী জামা'আত শিবিরের মতবাদ ও চিন্তাধারা ঈমান-আকীদা, ইবাদত-বন্দেগী থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত মৌলিক বিষয়ে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের চিন্তা-চেতনা থেকে বিচ্যুত। তারা সমগ্র উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব মস্তিস্ক ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভংগী থেকে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা ইসলাম ও মুসলমানের পরিচয়ও পাল্টে দিয়েছেন। ইবাদত-বন্দেগীর পরিচয়ও পাল্টে দিয়েছেন, দ্বীন ধর্মের এবং শরী'আতের পরিচয়ও পাল্টে দিয়েছেন। এমনকি পাল্টে দিয়েছেন ইলাহ বা মা'বূদের পরিচয়ও, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামের এসব প্রধান মৌলিক বিষয়গুলির পরিচয় ও স্বরূপ পাল্টে দেয়ার ফলে মওদূদী সাহেব ও তার অনুসারীদের পেশকৃত ইসলাম আর সেই ইসলাম থাকেনি, ইসলাম বলতে আজ পর্যন্ত যে ধর্মকে বুঝে আসা হচ্ছে। অতএব বলা যায় তারা এক নতুন ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছেন।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা
তাঁদের আদালত ও সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গ

পরবর্তী সকলের চাইতে সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রসঙ্গঃ

জমহুর এ বিষয়ে একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) পরবর্তীকালের সকলের চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান। প্রিয় নবীজী (সাঃ)-এর সামান্য সান্নিধ্যের সমান মর্যাদাপূর্ণ অন্য কোন আমল নেই। সেই সান্নিধ্যের মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছেন সাহাবায়ে কেরাম। তদুপরি মর্যাদা বিচার করে পাওয়ার বিষয় নয়, এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে খুশি দান করেন। সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার বিষয়টি কুরআন সুন্নাহ্ ও ইজ্‌মা দ্বারা প্রমাণিত।[১]

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য থাকা প্রসঙ্গঃ

কোন সাহাবীকে অন্য কোন সাহাবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া যাবে কি-না এ বিষয়টি বিতর্কিত। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কয়েকটি মত দেখা যায় ঃ

১. একদল মনে করেনঃ কোন সাহাবীকে অন্য কোন সাহাবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া যাবে না। বরং এ থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. জম্‌হুর শ্রেষ্ঠত্বদানের পক্ষে। তবে শ্রেষ্ঠত্বদানের ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

(১) আহ্‌লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের এক ফিরকার অভিমত হল সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত ওমর (রাঃ)।

(২) খাত্তাবিয়্যাহ্ ফিরকার অভিমত হল, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত ওমর (রাঃ)।

(৩) শী'আ সম্প্রদায় মনে করেন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আলী (রাঃ)।

(৪) আর আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐক্যমত্য হল, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ), তারপর ওমর (রাঃ)।

১. شرح النووى وغيره ॥

জমহুর আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে হযরত ওমর (রাঃ)-এর পর হযরত উছমান (রাঃ), তারপর হযরত আলী (রাঃ)। অবশ্য আহ্‌লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কেউ কেউ বলেছেনঃ হযরত আলী (রাঃ) হযরত উছমান (রাঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এটাই যে, হযরত উছমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আবূ মানছূর বাগদাদী (রহঃ) বলেছেনঃ আমাদের ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে চার খলীফা-ই উল্লেখিত তারতীব ও বিন্যাসসহ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের পর অবশিষ্ট আশারায়ে মুবাশ্‌শারা, তারপর আহ্‌লে বদর, তারপর ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, তারপর বায়আতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ। আর আনসারদের মধ্যে উভয় আকাবায় যারা শরীক ছিলেন তাঁদেরও বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। অনুরূপভাবে মর্যাদা রয়েছে তাঁদেরও, যারা ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী (السابقون الاولون) ছিলেন। হযরত সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব সহ অনেকের মতেই এই অগ্রণীগণ (السابقون الاولون) হলেন তাঁরা, যারা বাইতুল মুকাদ্দাস ও মক্কা মুকাররমা উভয় কিলামুখী হয়ে নামায আদায় করেছেন। হযরত শা'বী (রহঃ)-এর মতে,তাঁরা হলেন বাইআতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ। হযরত 'আতা ও হযরত মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ)-এর মতে অগ্রণীগণ হলেন আহ্‌লে বদর। কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেনঃ ইব্‌ন আব্দুল বার্ (রহঃ) সহ একদল আলিমের মতে হযরত (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় যেসব সাহাবী ওফাত লাভ করেন তাঁরা তাঁদের পরবর্তীগণের চেয়ে উত্তম। কিন্তু ইমাম নববী (রহঃ) এই মতকে অস্বীকার করে বলেছেনঃ এটা অসুন্দর ও অগ্রহণযোগ্য মত। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ- এ নিয়েও গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) শ্রেষ্ঠ না হযরত ফাতিমা (রাঃ)- এ বিষয়টিও।[১]

উল্লেখিত শ্রেষ্ঠত্বগত পার্থক্য সম্বলিত উক্তিগুলো কি অকাট্য ?

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মধ্যকার পরস্পর শ্রেষ্টত্বমূলক উল্লেখিত উক্তিগুলো কি অকাট্য (قطعى) না ধারণামূলক (ظنى)-এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহঃ)-এর মতে এগুলো সবই অকাট্য। তাঁর মতে ইমাম ও খেলাফতের বিন্যাসটাই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিন্যাস। অর্থাৎ, খেলাফতের ক্ষেত্রে যিনি অগ্রণী মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রেও তিনিই অগ্রণী। আবূ বকর ইবনুল বাকিল্লানী (রহঃ) বলেছেনঃ উল্লেখিত উক্তিগুলো ইজতিহাদী ও ধারণা প্রসূত। অনুরূপভাবে উল্লেখিত শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি কি জাহেরী দৃষ্টিকোণ থেকে না জাহেরী-বাতেনী উভয় বিচারে এ বিষয়েও উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। যেমনটি উল্লেখ করেছেন ইবনুল বাকিল্লানী (রহঃ)![২]

আদালতে সাহাবা ও সাহাবীদের সমালোচনা প্রসঙ্গ ঃ

আদালত বলা হয় ঃ

العدالة فى اللغة الاستقامة ، وعند اهل الشرع هى الانزجار عن محظورات دينية -

(كشاف اصطلاحات الفنون ج/٣)

১. شرح النووى والمرقاة ॥ ২. شرح النووى لمسلم ॥

অর্থাৎ, আদালত (العدالة)-এর আভিধানিক অর্থ হল অটল থাকা। আর শরী'আতের পরিভাষায় আদালত বলা হয় ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা তথা পাপ থেকে বিরত থাকা।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদায় সকল সাহাবী আদিল বা নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়নিষ্ঠ। অতএব তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বে। সাহাবীদের সমালোচনা করা এবং তাঁদের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা রাখা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতি। সাহাবীদের প্রতি মহব্বত ও ভক্তি শ্রদ্ধা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম শি'আর বা প্রতীক। সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসা নবী (সাঃ)কেই ভালবাসা। আকীদার প্রসিদ্ধ কিতাব "মুসামারা"তে বলা হয়েছে ঃ

اعتقاد اهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابةؓ وجوبا باثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم - (المسامرة)

অর্থাৎ, আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল- সকল সাহাবীর আদালত তথা ন্যায়নিষ্ঠতা প্রমাণিত করে তাঁদের সকলের পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং তাঁদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকা আর তাঁদের প্রশংসা করা।

আবূ বকর ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেছেনঃ আদালতে সাহাবার বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অবিসংবাদিত বিষয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাদের ন্যায়নিষ্ঠতা, আত্মিক-আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁদের নির্বাচিত চয়িত হওয়ার কথা পবিত্র কুরআনে আলোচিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ-

١. كنتم خير امة اخرجت للناس -

অর্থাৎ, তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ১১০)

٢. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا -

অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি মধ্যপন্থী (শ্রেষ্ঠ) উম্মত, যাতে তোমরা হতে পার মানুষের সাক্ষী, আর রাসূল তোমাদের সাক্ষী। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১৪৩)

٣. لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم - الخ

অর্থাৎ, মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাই'আত গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। (সূরাঃ ৪৮-ফাত্‌হঃ ১৮)

٤. والسابقون السابقون، اولئك المقربون، فى جنت النعيم -

অর্থাৎ, আর অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত, নেআমত সমৃদ্ধ জান্নাতে। (সূরাঃ ৫৬-ওয়াকিয়াঃ ১০-১২)

٥. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان -

অর্থাৎ, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাঁদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও তাতে সন্তুষ্ট। (সূরাঃ ৯-তাওবাঃ ১০০)

٦. يا ايها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين -

অর্থাৎ, হে নবী ! তোমার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ এবং যেসব মু'মিনরা তোমার অনুসরণ করেছে। (সূরাঃ ৮-আনফালঃ ৬৪)

٧. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون - والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم .....-

অর্থাৎ, (এই সম্পদ) অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। তাঁরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তাঁরাইতো সত্যপন্থী। মুহাজির আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বাস করে আসছে এবং ঈমান আনয়ন করেছে তাঁরা (অর্থাৎ, আন্‌সারীগণ) মুহাজিরদেরকে ভালবাসে .....। (সূরাঃ ৫৯-হাশ্‌রঃ ৮-৯)

অনুরূপভাবে হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ)ও তাঁদের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের সম্মান তা'যীম ও স্তুতি বর্ণনায় সুদীর্ঘ বাণী প্রদান করেছেন। আবূ বকর ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেনঃ সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও প্রশংসায় বর্ণিত বহু হাদীছের মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ-[১]

١. حديث عبد الله بن مسعودؓ مرفوعا : خير امتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .....-

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত - রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম আমার যুগের লোকেরা, তারপর যারা তাঁদের লাগোয়া (অর্থাৎ, তাবিয়ীন), তারপর যারা তাঁদের লাগোয়া (অর্থাৎ, তাবে তাবিয়ীন)। .... ।

٢. و حديث ابى سعيد الخدرىؓ مرفوعا : لا تسبوا اصحابى ، فوالذى نفسى بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه -

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত - রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীদের সমালোচনা কর না। ঐ সত্তার কছম, যার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করে, তবুও সে তাঁদের এক মুদ বা তার অর্ধ পরিমাণও পৌঁছতে পারবে না।

---

২. হাদীছগুলি العواصم من القواصم থেকে গৃহীত ॥

٣. و حديث ابن عباسؓ مرفوعا : مهما اوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لاحدكم فى تركه ، فان لم يكن فى كتاب الله فسنة منى ماضية فان لم يكن سنة منى ماضية فما قال اصحابى ، ان اصحابى بمنزلة النجوم فى السماء فايهم اخذتم به اهتديتم ، واختلاف اصحابى لكم رحمة -

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত - রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবে যা প্রদান করা হয়েছে তার প্রতি আমল করতে হবে, সেটা তরক করার ব্যাপারে কোন আপত্তি চলবে না। যদি আল্লাহ্র কিতাবে না থাকে তাহলে আমার সুন্নাত (তরীকা) বিদ্যমান রয়েছে। যদি আমার থেকে কোন সুন্নাত না পাওয়া যায়, তাহলে আমার সাহাবীদের বক্তব্য (অনুসরণীয়)। নিশ্চয় আমার সাহাবীগণ আকাশের নক্ষত্র তুল্য। তাঁদের যে কারও অনুসরণ করলে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। আর আমার সাহাবীদের মতবিরোধ তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ।

٤. و حديث عمر بن الخطابؓ مرفوعا : سالت ربى فيما اختلف فيه اصحابى من بعدى فاوحى الله الى : يا محمد ! ان اصحابك عندى بمنزلة النجوم فى السماء بعضها اضوأ من بعض ، فمن اخذ بشئ مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى -

অর্থাৎ, হযরত ওমর ইব্নে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত - রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ আমার পর আমার সাহাবীদের মধ্যে যে মতবিরোধ হবে সে ব্যাপারে আমি আমার প্রতিপালকের কাছে জানতে চেয়েছি। তখন আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, হে মুহাম্মাদ ! তোমার সাহাবী আমার নিকট আকাশের নক্ষত্র তুল্য। তার কতক অপর কতক থেকে উজ্জ্বল। অতএব কেউ তাঁদের মতবিরোধের ক্ষেত্রে যে কোন একজনের আদর্শ গ্রহণ করলে সে আমার নিকট হেদায়েতপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে।

٥. و حديث الامام الشافعىؒ بسنده الى انس بن مالكؓ مرفوعا : ان الله اختارنى واختار اصحابى فجعلهم اصهارى وجعلهم انصارى ، وانه سيجيئ فى اخر الزمان قوم ينتقصونهم ، الا فلا تناكحوهم ، الا فلا تنكحوا اليهم ، الا فلا تصلوا معهم ، الا فلا تصلوا عليهم ، عليهم حلت اللعنة -

অর্থাৎ, হযরত ইমাম শাফিঈ (রহঃ)-এর সনদে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত - রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ আমাকে মনোনীত করেছেন এবং আমার সাহাবীদেরকে মনোনীত করেছেন। সেমতে তিনি তাঁদেরকে আমার আত্মীয় বানিয়েছেন, আমার

সাহায্যকারী বানিয়েছেন। অচিরেই শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা তাঁদের সমালোচনা করবে। সাবধান তাদেরকে তোমরা বিবাহ করনা, সাবধান তাদের কারও সাথে বিবাহ দিও না। সাবধান তাদের পিছনে নামায পড় না, সাবধান তাদের জানাযা আদায় কর না। তাদের উপর লা'নত !

হাফিয আবূ বকর ইবনুল খতীব আল-বাগদাদী (রহঃ) বলেছেনঃ সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কিত হাদীছ প্রচুর। এর প্রতিটিই কুরআনে কারীমের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এর প্রতিটি-ই একথা প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ছিলেন আত্মিক পবিত্রতায় উন্নীত, অকাট্য ন্যায়পরায়ণতা ও উন্নত চরিত্রে ভাস্বর। সুতরাং যে আল্লাহ তাঁদের অন্তর জগত সম্পর্কে সম্যক অবগত, সেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁদেরকে তা'দীল ও ন্যায়পরায়ণতার সনদ প্রদানের পরও কি তাঁদের কারো সম্পর্কে অন্য কোন মাখ্লূকের সত্যায়নের কোন প্রয়োজন আছে ? তাছাড়া তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সাঃ) বর্ণিত যেসব সত্যায়ন ও প্রশংসা বাণী আমরা উল্লেখ করেছি সেগুলো যদি অবতীর্ণ ও বর্ণিত নাও হতো, তবুও তাঁদের অবস্থা, তাঁদের গুণাবলী, তাঁদের যাপিত জীবন - হিজরত, দ্বীনের সাহায্য, উদার প্রাণে সম্পদ বিসর্জন, মাতা-পিতা ও সন্তানদেরে বিসর্জন, দ্বীনের ক্ষেত্রে কল্যাণকামিতা, ঈমান-একীনের শক্তি ও দৃঢ়তার বিচারেও সন্দেহাতীতভাবেই একথাই বলতে হত যে, তাঁরা ন্যায়পরায়ণ, তাঁরা পবিত্র নিষ্কলূষ এক মানব গোষ্ঠী। তাঁরা তাঁদের পরবর্তীকালে আগত অনাগত সকল কালের সকল ন্যায়পরায়ণ আত্মিক পবিত্রতা ও উৎকর্ষতায় উন্নীত জনদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।[১]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেনঃ হকপন্থী আলিমগণ এবং ইজ্মার ক্ষেত্রে যাদের মত গ্রহণযোগ্য তাদের সকলেই সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষ্য, তাঁদের রেওয়ায়াত গ্রহণ এবং তাঁদের পূর্ণাঙ্গ আদালতের বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন।[২]

এই সব দলীলাদির ভিত্তিতে আহলে হকের অভিমত হল ঃ

الصحابة كلهم عدول-

অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সকলেই আদিল তথা ন্যায়পরায়ণ। অতএব তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বে।

সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা প্রসঙ্গ ঃ

সাহাবীদের সমালোচনা করা নিষেধ। কুরআন, হাদীছের আলোকে আহ্লে হক্কের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এটা নিষিদ্ধ। সাহাবীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

الله الله فى اصحابى لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم الحديث -(ترمذى)

১. العواصم من القواصم ॥
২. شرح النووى لمسلم ॥

অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমার পর তোমরা তাঁদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। বস্তুতঃ যে তাঁদেরকে ভালবাসল, সে আমার প্রতি ভালবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালবাসল। আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছসমূহের আলোকে সন্দেহাতীতভাবেই একথা বলা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সমালোচনার উর্ধ্বে। তাঁদের সমালোচনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাই সাহাবীদের সমালোচনা না করা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতি। আকীদাতুত্তাহাবীর শরাতে বলা হয়েছে ঃ

ولا نذكرهم الا بخير وحبهم دين وايمان واحسان -

অর্থাৎ, আমরা তাঁদের ভাল বৈ মন্দ চর্চা করি না। তাঁদের প্রতি ভালবাসা দ্বীন, ঈমান ও ইহছান।

সুতরাং যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার কৃত প্রশংসাবাণী ও রাসূল (সাঃ)-এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত অনুসৃত নীতির বাইরে গিয়ে সাহাবীদের সমালোচনায় লিপ্ত হবে সে গোমরাহ্, পথভ্রষ্ট ও অন্যদেরকে পথভ্রষ্টকারী।

ইমাম আবূ যুরআহ্ (রহঃ) বলেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তিকে দেখবে সে কোন সাহাবীর সমালোচনা করছে, তাহলে নির্ঘাত মনে করবে সে যিনদীক-ধর্মত্যাগী। কারণ, আমাদের দৃষ্টিতে রাসূল (সাঃ) হক, কুরআন হক। আর এই কুরআন ও হাদীছ সাহাবায়ে কেরাম-ই আমাদের কাছে পৌছিয়েছেন। তারা চায় আমাদের এই সূত্র-পরম্পরাকে বিক্ষত করতে- যাতে পরিণামে পুরো কুরআন-সুন্নাহ-ই বাতিল বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং এরাই সমালোচনার অধিক উপযুক্ত। কারণ, এরা যিনদীক, ধর্মত্যাগী।[১]

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে আছে, সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলা[২] জঘন্যতম হারামের অন্তর্ভুক্ত। কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেছেনঃ যেকোন একজন সাহাবীকে মন্দ বলাও গোনাহে কবীরার অন্তর্ভুক্ত। জমহুরের মাযহাব হলো, এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না তবে তা'যীর করা (দণ্ড প্রদান করা) হবে। আর মালেকী মাযহাবের কোন কোন ফকীহ বলেছেনঃ এমন ব্যক্তির শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) মিরকাতে লিখেছেনঃ আমাদের কোন কোন আলিম স্পষ্টই বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রাঃ)কে মন্দ বলবে তাকে মৃত্যুদণ্ড

১. العواصم من القواصم ॥

২. (السب)-এর অনুবাদ করা হয়েছে "মন্দ বলা"। এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। গাল মন্দ থেকে শুরু করে সব রকমের সমালোচনা ও মন্দ আলোচনাই এর শামিল। ইবরাহীম আল-হারবী বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনার উদ্দেশ্যে তার মধ্যে আছে বা নেই এমন সব ধরনের দোষ বর্ণনাই 'السب' -এর শামিল। ॥ فتح الملهم جـ ١

দেয়া হবে। যাইন ইব্‌ন নুজাইম (রহঃ) কৃত الاشباه والنظائر গ্রন্থের 'سير' অধ্যায়ে আছেঃ যেকোন কাফের যদি তওবা করে, দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানেই তার তওবা কবূল হবে। তবে সেই কাফের দলের তওবা কবূল হবে না- যারা কাফের প্রমাণিত হয়েছে নবী (সাঃ) কে মন্দ বলার কারণে, শাইখাইন (আবূ বকর ও উমর [রাঃ]) কে মন্দ বলার কারণে কিংবা তাঁদের যেকোন একজনকে মন্দ বলার কারণে। অথবা যাদু কিংবা নাস্তিকতার কারণে যারা কাফের হয়েছে, তাদের তওবা কবূল হবে না। যদি তওবার পূর্বেই তারা পাকড়াও হয়- এমনকি নারী হলেও- তার তওবা কবূল হবে না। তিনি আরও বলেছেনঃ শাইখাইনকে মন্দ বলা ও অভিসম্পাত করা কুফ্‌রী।

সাহাবায়ে কেরামের পরস্পর দ্বন্দ্ব-লড়াই ও তার জবাবঃ

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখে অনেকে সাহাবায়ে কেরামের আদালতের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেনঃ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মধ্যে পরস্পরে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক দলেরই এমন কিছু ধারণা ছিল যার আলোকে তাঁরা নিজেদেরকে সত্য ও হক বলে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁরা সকলেই উদূল বা ন্যায়পরায়ণ। তাঁদের পরস্পরে দ্বন্দ্ব-লড়াইয়ের বিষয়টি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ এবং এ কারণে তাঁদের কাউকে আদালতের সীমানা থেকে সরিয়ে ফেলা যাবে না। কারণ তাঁরা সকলেই মুজতাহিদ ছিলেন। আর ইজতিহাদযোগ্য মাসাইলের ক্ষেত্রেই তাঁরা ইজতিহাদ করেছেন। যেমন তাঁদের পরবর্তীকালের মুজতাহিদগণের মধ্যেও মতবিরোধ হয়েছে রক্তপন ইত্যাকার বিষয়ের ক্ষেত্রে। আর এতে করে কাউকেই ছোট বা হেয় করে দেখা যায় না।

তবে মনে রাখতে হবে- এসব যুদ্ধেরও কিছু কারণ ছিল। সেখানে এমন কিছু বিষয় ছিল যা অস্পষ্ট। আর ঘোরতর অস্পষ্টতার কারণেই তাঁদের ইজতিহাদগত বিরোধ দেখা দিয়েছে। ফলে তারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

১. এক শ্রেণীর ইজতিহাদ তাঁদেরকে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, এই পক্ষ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের বিরোধীরা বিদ্রোহী। সুতরাং তাঁদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে হক পক্ষকে সাহায্য করা ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আর এটা ছিল তাদের স্পষ্ট বিশ্বাস ও আকীদা। তাই এক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে ইমামে আদেল তথা হকপক্ষকে অসহযোগিতা করা তাঁদের জন্যে বৈধও ছিল না।

২. দ্বিতীয় শ্রেণীটি প্রথম শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইজতিহাদের আলোকে তাঁদের কাছে মনে হয়েছে দ্বিতীয় পক্ষ হক। সুতরাং এই হক পক্ষকে সহযোগিতা করা ও তার বিপক্ষ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা তাঁদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩. তৃতীয় শ্রেণীটির কাছে মূল বিষয়টি ধাঁধাঁপূর্ণ মনে হয়েছে। তারা সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে রয়েছেন। দুই পক্ষের কোন পক্ষের মতকেই তারা প্রাধান্য দিতে পারেননি। ফলে তাঁরা উভয় পক্ষ থেকে পৃথক থেকেছেন। আর এই পৃথক থাকাটাই তাঁদের কর্তব্য ছিল। কারণ, কোন মুসলমান যুদ্ধযোগ্য অপরাধী বলে প্রমাণিত না হলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা

বৈধ নয়। তবে দুই পক্ষের কোন এক পক্ষের প্রাধান্যতার বিষয়টি যদি তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতো তাহলে আর তাদেরকে সহযোগিতাদান ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা থেকে বিরত থাকা তাঁদের জন্যেও বৈধ হতো না। সুতরাং তাঁরা সকলেই ছিলেন মা'যূর। তাই ইজ্‌মার ক্ষেত্রে যাদের মত গ্রহণযোগ্য এমন সকল আহ্‌লে হকই মনে করেন সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষ্য, তাঁদের বর্ণনা ও তাঁদের পূর্ণ আদালত গ্রহণযোগ্যতা স্বকীয় বিভায় উজ্জ্বল। রাদিয়াল্লাহ আনহুম আজমাঈন। (شرح النووی لمسلم)

সাহাবায়ে কেরামের মি'য়ারে হক তথা সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গ ঃ

এতে কোন সন্দেহ নেই, সকল সাহাবী-ই ঈমান, আমল, আখলাক, আদর্শ সকল ক্ষেত্রেই সত্যের মাপকাঠি ও মি'য়ারে হকের দণ্ডে উত্তীর্ণ। ঈমানের ক্ষেত্রে তাঁরা সত্যের মাপকাঠি- তার দলীল হল কুরআনের আয়াত ঃ

واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس.....-

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হয়, এই লোকেরা যেমন ঈমান এনেছে, তোমরাও তদ্রূপ ঈমান আন। .....। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১৩)

মুফতীয়ে আ'যম মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) তদীয় বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ মা'আরিফুল কুর-আনে লিখেছেনঃ মুফাসসিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, বক্ষমান আয়াতটিতে 'الناس' বলে সাহাবায়ে কেরামকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ, কুরআন অবতরণ কালে কেবল তাঁরাই ছিলেন ঈমানদার। আর অত্র আয়াতে ঘোষিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র দরবারে ঈমান সেটাই গ্রহণযোগ্য যেটা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের অনুরূপ। প্রমাণিত হল, সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ঈমানের মাপকাঠি। উম্মতের অন্য সকলের ঈমানকে মাপা হবে তাঁদের (রাঃ)ই ঈমানের নিক্তিতে। যার ঈমান সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের মাপে উত্তীর্ণ হবে সেই হবে যথার্থ ঈমানদার। আর যার ঈমান এই মাপে উত্তীর্ণ হবে না তার ঈমানও যথার্থ বলে বিবেচিত হবে না।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেছেনঃ

فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا- وان تولوا فانما هم فی شقاق -

অর্থাৎ, যদি তারা ঈমান আনে যেমন তোমরা ঈমান এনেছ, তাহলে তারা হেদায়েত পেল, আর যদি বিমুখ হয়ে যায়, তাহলে তারা সুদূর বিরোধে রয়েছে। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১৩৭)

আমলের ক্ষেত্রেও সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি তার প্রমাণ হল -

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائت مصيرا -

অর্থাৎ, যে তার কাছে হেদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পর এই রাসূলের বিরোধিতা করবে এবং মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি ফিরিয়ে দিব যেদিকে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব। কত নিকৃষ্ট ঠিকানা সেটা ! (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ১১৫)

আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী (রহঃ) তদীয় عصمت انبياء وحرمت صحابہ পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেনঃ আয়াতটিতে উল্লেখিত 'المؤمنين' (মু'মিনীন) শব্দের প্রথম মিসদাক হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। আর আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের মত ও পথকেই মত ও পথের মাপকাঠিরূপে নির্বাচন করেছেন। আর তাঁদের মত ও পথের বিরুদ্ধাচরণকে রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অবশেষে রাসূল (সাঃ)-এবং সাহাবীগণের পথের যারা বিরোধী তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখিয়েছেন।

সুতরাং যখন এটাই প্রমাণিত হল, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ঈমান, আমল ও আদর্শের 'মাপকাঠি' তখন এটা প্রতিভাত হলো যে, সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি। কেননা, সত্য ঈমান আমলের বাইরে অন্য কিছু নয়।

এখানে আরও একটি কথা উল্লেখ্য যে, "সত্যের মাপকাঠি" বা মি'য়ারে হক কথাটি পূর্বসূরী মনীষীগণের পরিভাষা নয়। এটি জামা'আতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেবের সৃষ্ট। তিনিই সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর সত্যের মাপকাঠি হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। 'دستور جماعت اسلامی' (জামাআতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র) তে তিনি লিখেছেনঃ 'আল্লাহ্‌র রাসূল ছাড়া আর কেউ সত্যের মাপকাঠি নয় এবং কেউ সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। তার এই বক্তব্য সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে সমালোচনার পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছে। মুফাসসিরীনে কেরাম, ফোকাহায়ে কেরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ পবিত্র ইসলামের অন্যসব মনীষীদের বিরুদ্ধেও সমালোচনার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। মওদূদী সাহেব নিজেও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন। তার কঠিন সমালোচনার শিকার হয়েছেন হযরত উছমান ইব্‌নে আফফান (রাঃ), হযরত মু'আবিয়া ইব্‌নে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) সহ আরও অনেকেই। এমনকি তিনি ওহুদ যুদ্ধের সাময়িক পতনকে উপলক্ষ করে প্রথম সারির মুহাজির ও আনসারগণেরও কঠোর সমালোচনা করেছেন।

আল্লামা বিন্নৌরী (রহঃ) তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থে- "الاستاذ المودودی وشئی من افکاره" লিখেছেনঃ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পর্কে মওদূদী সাহেব বেশী জানেন-না আল্লাহ তা'আলা ? আল্লাহ তো সুক্ষ্মময় সর্বজ্ঞানের অধিকারী ! মওদূদী সাহেব রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীদের সম্পর্কে কি রাসূল (সাঃ)-এর চেয়েও বেশী জানেন ? আর যদি সাহাবায়ে কেরাম-ই সত্যের মাপকাঠি ও ইসলামের মানদণ্ড না হন, তাহলে আর কে সত্যের মাপকাঠি ও ইসলামের মানদণ্ড হবে ?

তিনি তাঁর গ্রন্থের অন্যত্র এও বলেছেনঃ এতে কোন সন্দেহ নেই, মওদূদী সাহেব তার এসব কদর্যপূর্ণ কুৎসিত মন্তব্য ও অপবাদ সমূহের দ্বারা আল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দিয়েছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পর্কে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের উচ্ছসিত প্রশংসাবাণীর প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করেননি। আমাদের সর্দার প্রিয়তম রাসূল (সাঃ) কি একথা বলেননি ঃ

الله الله فى اصحابى لا تتخذوهم غرضا من بعدى ، فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم - (ترمذى جـ/২)

অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমার পর তোমরা তাঁদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। বস্তুতঃ যে তাঁদেরকে ভালবাসল, সে আমার প্রতি ভালবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালবাসল। আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল।

এই জাতীয় হাদীছতো আরও অনেক, হাদীছ গ্রন্থগুলোর পাতায় পাতায় যা জ্বলজ্বল করছে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের আলোকিত ভাষ্যাবলীই তো যে কারও জন্যে যথেষ্ট! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যা বলেন সত্য-ই বলেন। তিনিই সত্য পথের দিশারী !!

ইস্‌মতে আম্বিয়া প্রসঙ্গ

ইস্‌মত (عصمت) শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থঃ

ইস্‌মত (عصمت) শব্দের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, পাপমুক্তি, সতীত্বরক্ষা, হেফাযত, সংরক্ষণ ইত্যাদি। পরিভাষায় ইস্‌মত বলা হয়।

১. আশআরীদের নিকট ঃ

العصمة عند الاشاعرة ان لا يخلق الله فى العبد ذنبا - وقيل : العصمة عند الاشاعرة هى خلق قدرة الطاعة - (كشاف اصطلاحات الفنون جـ/৩)

অর্থাৎ, আশআরীদের নিকট আল্লাহ বান্দার মধ্যে কোন পাপ সৃষ্টি করবেন না -এটাকেই বলা হয় ইস্‌মত। অথবা আশআরীদের নিকট ইস্‌মত বলা হয় (কারও মধ্যে) আনুগত্যের শক্তি সৃষ্টি করে দেয়াকে।

২. ইমাম আবূ মানসূর মাতুরিদী বলেন ঃ

ইসমত আল্লাহ তা'আলার এমন একটি নেয়ামত ও অনুগ্রহকে বলা হয় যা নবী রাসূলগণকে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পালনে প্রস্তুত রাখে এবং সামান্যতম পাপ থেকেও দূরে রাখে।[১]

উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী "নবী রাসূলগণ মা'সূম"-এর সার অর্থ হল-তাঁরা পাপমুক্ত, তাঁদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আনুগত্যের শক্তি সৃষ্টি করে দেন এবং তাদেরকে এমন অনুগ্রহ দান করেন যার ফলে তাঁরা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পালনে ব্যাপৃত ও সব ধরনের পাপ (পালন) থেকে নিবৃত্ত থাকেন। হযরত মাওঃ ইদ্রীস কান্দেহ্‌লভী (রহঃ) এই সার কথাটিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন- মা'সূম বা নিষ্পাপ বলা হয় এমন সত্তাকে যিনি

১. كذا فى ترجمان السنة جـ/৩ نقلا عن نسيم الرياض جـ/৩ ॥

আকীদা-বিশ্বাস, নিয়ত-ইচ্ছা, অবস্থান, স্বভাব-চরিত্র, ইবাদত-বন্দেগী লেন-দেন, কথা কাজ ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে পাপ ও পাপের উৎস নফ্‌স শয়তানের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকেন।[১]

ইসমত (عصمت) সম্পর্কে মাযহাবঃ

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে ও নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে সগীরা এবং কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে পবিত্র। শরহে ফেক্‌হে আকবার গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

والانبياء عليهم الصلوة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح يعنى قبل النبوة و بعدها - (شرح الفقه الاكبر لابى المنتهى صفحـ/১৬)

অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) সকলেই নবুওয়াতের আগে ও পরে সগীরা এবং কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে পবিত্র। উক্ত গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে ঃ

ولم يرتكب (النبى ﷺ) صغيرة ولا كبيرة قط يعنى قبل النبوة وبعدها -

অর্থাৎ, নবী (সাঃ) নবুওয়াতের আগে ও পরে সগীরা এবং কবীরা কোন ধরনের গোনাহ করেননি। মোল্লা আলী কারী মেরকাত শরহে মেশকাত গ্রন্থে বলেন ঃ

عصمة الانبياء من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها - (المرقاة جـ/১ تحت حديث رقم ৮১ فى باب الايمان بالقدر)

অর্থাৎ, নবুওয়াতের আগে ও পরে নবীগণ সগীরা কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে পবিত্র।

ফখরুদ্দীন রাযী عصمة الانبياء গ্রন্থে , আব্দুল কাহের বাগদাদী الفرق بين الفرق গ্রন্থে এবং আরও কেউ কেউ বিভিন্ন গ্রন্থে নবুওয়াতের পূর্বে সগীরা ও কবীরা ভুল বশতঃ হতে পারে বলে (কারও কারও বা অনেকের) মত বর্ণনা করেছেন। অনেকে এগুলো দেখে বিভিন্ন কিতাবে ইস্‌মত সম্পর্কে মায্‌হাব এভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল্লামা ইব্‌নে হাজার আসকালানী (রহঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর কবীরা বা সগীরা তো নয়ই, এমনকি নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে সগীরা পর্যন্ত প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয় বলে মত ব্যক্ত করেছেন এবং এটাকেই সঠিক মত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

فلم يمكن صدوره (صدور الذنب) منه ولو صغيرة قبل النبوة على الصواب - (نقله القارى فى المرقاة جـ/১ تحت حديث رقم ৪১৫ فى باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

অর্থাৎ, সঠিক মতানুসারে নবুওয়াতের আগেও নবী থেকে গোনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয় চাই সগীরা গোনাহ হোকনা কেন।

মুফতী শফী সাহেব লিখেছেনঃ চার ইমামসহ উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবীগণ ছোটবড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।[২]

১. معارف القرآن ادريسى جـ/১ ॥
২. معارف القرآن جـ/১ ॥

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, পূর্বোল্লেখিত যে সব কিতাবে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ভুল বশতঃ সগীরা ও কবীরা পাপ সংঘটিত হতে পারে বলে মতামত বর্ণনা করা হয়েছে, এতে মূলতঃ পাপ সংঘটিত না হওয়ার কথাই বলা হয়েছে। কেননা পাপ বা মা'সিয়াত বলা হয় ইচ্ছাকৃত ভাবে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করাকে। অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ কোন হুকুম অমান্য করাকে পাপ বা মা'সিয়াত বলা হয় না। এ হিসেবে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর নবী রাসূলগণ থেকে কোন ধরনের পাপ সংঘটিত না হওয়ার ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই।

ইসমতের দলীলঃ

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী عصمة الانبياء গ্রন্থে ইসমতের ১৫টি দলীল বর্ণনা করেছেন। হযরতুল আল্লামা ইদ্রীস কান্দেহ্‌লভী (রহঃ) তাঁর معارف القران جـ/১ এ ১৯ টি আয়াত দ্বারা ইস্‌মতের পক্ষে দলীল পেশ করেছেন। অন্যান্য আরও অনেকে আরও বহু দলীল বয়ান করেছেন। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি দলীল নিম্নে প্রদান করা হলঃ

(১) لقدكان لكم فى رسول الله اسوة حسنة -

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ। (সূরাঃ ৩৩-আহ্‌যাবঃ ২১)

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ বা اسوة حسنة থাকার কথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য-এখানে রাসূল (সাঃ)-এর গোটা জীবনকেই আদর্শ আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর দোষ-ত্রুটি ও পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত না হলে তাঁকে এরূপ আদর্শ ব্যক্তিত্ব আখ্যায়িত করা যেত না।

(২) واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون -

অর্থাৎ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং রাসূলের, আশা করা যায় তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরান ঃ ১৩২)

(৩) من يطع الرسول فقد اطاع الله -

অর্থাৎ, যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ৮০)

এ দুই আয়াতে রাসূলের যে অনুগত্যের কথা বলা হয়েছে তা দ্ব্যর্থহীন। রাসূল নিষ্পাপ না হলে এরূপ আনুগত্যের কথা বলা যেত না।

(৪) عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول -

অর্থাৎ, তিনি অদৃশ্য বিষয়ে অবগত। তিনি তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত আর কারও কাছে গায়েবের বিষয় ব্যক্ত করেন না। (সূরাঃ ৭২-জিন ঃ ২৬)

(৫) وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار -

অর্থাৎ, তাঁরা (নবীগণ) অবশ্যই আমার নিকট মনোনীত সন্তোষভাজন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরাঃ ৩৮- সাদঃ ৪৭)

এ দুই আয়াতে রাসূলগণকে আল্লাহর সন্তোষভাজন এবং মনোনীত ও নির্বাচিত বলে ব্যাক্ত করা হয়েছে। আর অবশ্যই তাঁরা সব দিক থেকেই সন্তোষভাজন ও মনোনীত এটাই

এখানে বোঝানো হয়েছে। অন্যথায় আংশিক সন্তোষভাজন তো নবী ছাড়া অন্যরাও। অতএব বোঝা গেল - নবীগণ নিষ্পাপ। কেননা কারও দ্বারা পাপ সংঘটিত হলে সে সর্বতো ভাবে আল্লাহর সন্তোষভাজন হতে পারে না। নবীদের দ্বারা পাপ হয় বললে আল্লাহ্‌র নির্বাচন সঠিক হয়নি বলতে হবে।

(৬) قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم -

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। (সূরাঃ ৩-আলু-ইমরানঃ ৩১)

এ আয়াতে রাসূলের অনুসরণকে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অর্জন ও ক্ষমা লাভের মাপকাঠি স্থির করা হয়েছে। অতএব রাসূল থেকে পাপ হলে বলতে হবে পাপীর অনুসরণকে আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন ও ক্ষমা প্রপ্তির মাপকাঠি বানানো হয়েছে। নাউজুবিল্লাহ !

৭. শরী'আত ও সাধারণ পরিভাষায় পাপীকে বলা হয় যালেম। নবী থেকে পাপ হতে পারে বললে নবীকে যালেম বলা যাবে। অথচ কোন যালেমকে নবুওয়াত দান করা হয় না।

لاينال عهدى الظالمين -

অর্থাৎ, আমার প্রতিশ্রুতি যালেমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১২৪)

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল - নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও কোন নবী থেকে পাপ সংঘটিত হয় না। কেননা পাপ হলে তারা যালেম সাব্যস্ত হয় আর যালেম নবুওয়াতের প্রতিশ্রুতি লাভের যোগ্য নয়।[১]

৮. হযরত মুফতী শফী সাহেব (রহঃ) বলেনঃ নবীগণ (আঃ) কে গোটা মানব জাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। যদি তাঁদের দ্বারা ছোট বড় কোন পাপ কাজ সম্পন্ন হত তাহলে নবীদের কথা ও কাজের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাবে এবং তাঁরা আস্থাভাজন থাকবেন না। আর যদি তাঁদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, তাহলে দ্বীন ও শরী'আতের স্থান কোথায় ?[২]

নবীগণের ইস্‌মত সম্বন্ধে একটি সংশয় ও তা নিরসন ঃ

কুরআনে কারীমের কয়েকটি আয়াত থেকে বাহ্যতঃ অনুমিত হয় যে, নবীগণ থেকে পাপ সংঘটিত হয়েছে। যেমন হযরত আদম (আঃ) প্রসঙ্গে এসেছেঃ

(১) فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه -

অর্থাৎ, অতঃপর আদম তাঁর প্রতিপালক থেকে কয়েকটি কথা অর্জন করলেন, অনন্তর তিনি তাঁর তওবা কবূল করলেন। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ৩৭)

---

১. اقول وفيه رد على ما قاله التفتازانى : اما قبل الوحى فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة -

২. معارف القرآن

(২) قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخسرين -
অর্থাৎ, তাঁরা (আদম ও হাওয়া) বলল হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছি যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং আমাদেরকে রহম না কর, তাহলে আমারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। (সূরাঃ ৭-আ'রাফঃ ২৩)

(৩) وعصى ادم ربه فغوى -
অর্থাৎ, আদম তাঁর প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হল। (সূরাঃ ২০- তাহাঃ ১২১)
হযরত মূসা (আঃ) প্রসঙ্গে এসেছেঃ

(১) ولهم على ذنب فاخاف انى يقتلون -
অর্থাৎ, আমার বিরুদ্ধে তাদের একটা পাপ (অভিযোগ) রয়েছে; আমি আশংকা করছি তারা আমাকে হত্যা করে দিবে। (সূরাঃ ২৬-শুআরাঃ ১৪)

(২) رب انى ظلمت نفسى فاغفرلى فغفرله -
অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার নিজের প্রতি অবিচার করেছি অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। অতঃপর তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। (সূরাঃ ২৮-কাসাসঃ ১৬)
হযরত ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে এসেছে তিনি বলেছিলেন ঃ

(১) لا اله الا انت سبحنک ان كنت من الظلمين -
অর্থাৎ, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি পবিত্র আমি অবশ্যই যালেমদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরাঃ ২১-আম্বিয়াঃ ৮৭)
নবী (সাঃ) প্রসঙ্গে এসেছেঃ

(১) واستغفر لذنبک وللمؤمنين والمؤمنات -
অর্থাৎ, তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার পাপের জন্য এবং মু'মিন নর-নারীদের পাপের জন্য। (সূরাঃ ৪৭-মুহাম্মাদঃ১৯)

(২) فسبح بحمد ربک واستغفره انه كان توابا -
অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের স্ব-প্রশংস তাসবীহ পাঠ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনিতো তওবা কবূলকারী। (সূরাঃ ১১০-নাস্‌রঃ ৩)

হাদীছ শরীফেও আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) থেকে পাপ সংঘটিত হওয়ার সংশয় উদ্রেক কারী কিছু বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। যেমনঃ-
নবী (সাঃ) প্রসঙ্গে এসেছেঃ

(১) غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر -
অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের সব গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

বাহ্যিকভাবে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) থেকে পাপ সংঘটিত হয়েছে বলে সংশয় উদ্রেককারী এসব আয়াত ও হাদীছের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের

উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে সর্বসম্মত ভাবে অনেক জওয়াব দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি জওয়াব নিম্নরূপ ঃ

১. কোন ভুল বুঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত[১] কারণে বা ভুলে[২] নবীদের থেকে কিছু কাজ সংঘটিত হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে নবীদের মাকাম ও মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ এবং মহান ব্যক্তিবর্গ থেকে ক্ষুদ্র ত্রুটি-বিচ্যুতি হলেও সেটাকে বড় বলে ধরা হয়।[৩] এ হিসেবে নবীদের সেসব কাজকে পাপ (معصيت / ذنب) ও অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও প্রকৃত পক্ষে সেগুলো পাপই নয়।[৪]

২. নবীগণ কর্তৃক সর্বোত্তম পর্যায়ের আমল/কাজ বর্জন করাকেই পাপ বলে আখ্যায়িত করতঃ তজ্জন্য তাঁদের তিরষ্কার করা হয়েছে। যদিও তাঁরা যেটা করেছেন সেটা উত্তম। তবে সর্বোত্তম নয়। আল্লাহ্‌র সাথে তাঁদের অতি নৈকট্যের সম্পর্কের কারণে তাঁদের দ্বারা সর্বোত্তমটা বর্জন করা যেন অন্যের দ্বারা ওয়াজিব বর্জন করার মত। شرح الفقه الاكبر গ্রন্থে এ কথাই বলা হয়েছেঃ

فعلوا الفاضل وترک الافضل فعوتبوا عليه لان ترک الافضل منهم بمنزلة ترک الواجب من الغير - (شرح الفقه الاكبر لابى المنتهى)
হযরত মাওলানা ইদ্রীছ কান্দেহলবী বলেনঃ

حضرات انبیاء کے حق میں ترک اولی ایسا ہے جیسا کہ دوسروں کے حق میں خطاء - (معارف القرآن ادریسی از حاشیہ ملا عبدا لحکیم علی الحیالی)
অর্থাৎ, নবীদের ক্ষেত্রে খেলাফে আওলা এমন, অন্যদের ক্ষেত্রে পাপ করা যেমন।

৩. নবীদের ইজতিহাদগত বিচ্যুতিকেই শব্দে "পাপ", "অপরাধ" ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এছাড়া উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহের সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীন ও মুহাদ্দিছীনে কেরামের বিস্তারিত আলোচনা দেখে নেয়া যেতে পারে।

মাহ্‌দবিয়া সম্প্রদায়

মাহ্‌দবী ফিরকা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরী (৮৭৪-৯১০ হিঃ)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরী এই ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী

১. যেমন হযরত মূসা (আঃ) শাসনের জন্য থাপ্পড় দিয়েছেন কিন্তু লোকটি মারা গেছে। فوكزه موسى فقضى عليه - এটা ছিল অনিচ্ছাকৃত। ॥
২. যেমন হযরত আদম কর্তৃক নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ ভুলে হয়েছিল এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছেঃ فنسى ولم نجد له عزما - অর্থাৎ, সে (আদম) ভুলে গিয়েছিল, আর আমি তাঁর সংকল্প পাইনি ॥
৩. যেমন বলা হয়ঃ حسنات الابرار سيئات المقربين - قاله ابو سعيد الجزار . كذا فى المقاصد الحسنة - ॥
৪. از معارف القرآن. مفتی شفیع و مباحثہ شاہجہان پور. قاسم نانوتوی ॥

হওয়ার দাবীদার ছিলেন বিধায় তার এই দলকে মাহ্দবিয়া সম্প্রদায় বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই সম্প্রদায়ের আরও বিভিন্ন নাম রয়েছে যথা দায়েরাওয়ালা, মুসাদ্দিক, দাইয়াহ (داعیہ), ত্বাইয়াহ (طائیہ), যিক্‌রিয়াহ (ذکریہ)।[১]

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরী আল কাজেমী আল হোসাইনী ১৪ জুমাদাল উলা সোমবার ৮৪৭ হিজরী,মোতাবেক ১০ ইং সেপ্টেম্বর ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের জৌনপূরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বংশ পরিক্রমায় বারতম পুরুষ মূসা কাযেম পর্যন্ত যেয়ে পৌঁছে। তার পিতার মূল নাম ইব্‌নে সাইয়্যেদ খান। বুড উয়াইসী নামে খ্যাত। তার মায়ের মূল নাম আগা মালিক। প্রতিশ্রুত মাহ্দী হওয়ার দাবী করার পূর্বে তিনি তার পিতার নাম পরিবর্তন করে রাখেন সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ এবং মায়ের নাম পরিবর্তন করে রাখেন আমীনা খাতুন ওরফে আগা মালিক। এই নাম পরিবর্তনের কারণ স্পষ্টতঃই অনুমিত হয় যে, মাহ্দী হওয়ার দাবী করলে যেন সে রাসূল (সাঃ)-এর ঐ হাদীছের বর্ণনা তার ব্যাপারে প্রযোজ্য দেখাতে পারে, যাতে রাসূল (সাঃ) প্রতিশ্রুত মাহ্দীর ব্যাপারে বলেছেন তার পিতার নাম হবে আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম হবে আমীনা।

সিন্ধুর জনগণ সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরীকে 'মীরাঁ সায়েঁ' (میراں سائیں) এবং মাকরান, কিল্লাত ও ইরানের যিক্‌রীরা 'নূরে পাক' উপাধীতে তার আলোচনা করে থাকেন।

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপুরী জুমাদাল উলা, ৮৮৭ হিজরীতে জৌনপুর ছেড়ে বিভিন্ন এলাকা হয়ে মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছেন। ৯ মাস মক্কা মুয়াজ্জমায় অবস্থান করেন। শায়খ মুহাম্মাদ আকরাম-এর "রোদে কাউসার" (رود کوثر) নামক গ্রন্থের বর্ণনা মোতাবেক ৯০১ হিজরীতে মক্কা মুয়াজ্জমায় থাকা অবস্থায় তিনি মাহ্দী হওয়ার দাবী করেন। বায়তুল্লাহ্‌র রোকন এবং মাকামে ইব্রাহীমের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন ঃ আমার সত্তাই সেটি, যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) ও পূর্ববর্তী নবীগণ যার আগমনের সংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমার সত্তাই আখেরী যামানার মাহ্দী।[২]

এরপর হিন্দুস্তান ফিরে আসেন। সর্বপ্রথম আহমদাবাদ (গুজরাট) প্রবেশ করেন। ৯০৫ হিজরীতে তিনি বর্তমান পাকিস্তানের ঠাঠ এলাকায় প্রায় ছয় মাস অবস্থান করেন। ঠাঠ থেকে তিনি এসে বেলুচিস্তানের অনাবাদী ও দুর্গম পথ অতিক্রম করে স্বীয় বিশাল অনুসারী দলবল সাথে নিয়ে কান্দাহার পৌঁছেন। কান্দাহার থেকে ফারাহ (যেটি তৎকালীন সময়ে ইরানের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বর্তমানে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) আগমন করেন।[৩]

তিনি বারলী (গুজরাট) থেকে ৯০৫ হিজরীতে প্রতিশ্রুত মাহ্দী হওয়ার দাবী করে বিভিন্ন আমীর-উমরা রাজা-বাদশাহ ও খানদের নামে পত্র জারি করেছিলেন। এরূপ একটি পত্রের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১. بدائع الکلام احسن الفتاوی-مہدوی تحریک صفحہ/ ۵ ॥
২. احسن الفتاوی جـ/۱، از تحریک مہدویت صفحہ/ ۴۴ ॥
৩. المصدر السابق ॥

'হে লোক সকল! তোমরা বুঝে নাও, আমি মুহাম্মাদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমনামী। আল্লাহ তা'আলা আমাকে বেলায়েতে মুহাম্মাদিয়ার মোহর এবং স্বীয় নবীর মহান উম্মতের খলীফা বানিয়েছেন। আমি সেই ব্যক্তি, যাকে আখেরী যামানায় প্রেরণ করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আমি সেই ব্যক্তি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার সংবাদ দিয়েছেন। আমি সেই ব্যক্তি, পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের সহীফাসমূহে যার আলোচনা করা হয়েছে। আমি সেই ব্যক্তি, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দলগুলো যার প্রশংসা করেছে। আমি সেই ব্যক্তি, যাকে রাহ্‌মানী খিলাফত দান করা হয়েছে। আমি অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে আল্লাহ্‌র হুকুমে আল্লাহ্‌র দিকে মাখলূককে আহ্বান করছি। আমি এই দাবীর সময় নেশাগ্রস্ত নই, বরং সম্পূর্ণ হুঁশ অবস্থায় আছি। আমাকে হুঁশে কিংবা চেতনায় আনার প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পবিত্র রিযিক লাভ করে থাকি। আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। আমি রাজত্ব ও রাষ্ট্রের প্রত্যাশী নই। রাষ্ট্র, নেতৃত্ব, রাজত্ব কায়েম করার খাহেশও আমার নেই। নেতৃত্ব, রাষ্ট্র ও রাজত্বকে আমি অপবিত্র মনে করি। দুনিয়ার মহব্বত থেকে মুক্ত করা আমার কাজ।

আমার এই দাওয়াতের কারণ একমাত্র এটাই যে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই দাওয়াত প্রদানের ব্যাপারে আদিষ্ট। তাগীদ সহকারে তোমাদের নিকট আমি এই দাওয়াত পৌঁছাচ্ছি। সাথে সাথে সতর্কও করে দিচ্ছি। আল্লাহ্ আমার আনুগত্য করা ফরয করে দিয়েছেন। আমি সমস্ত জিন ইনসানের নিকট আমার এই দাওয়াত পৌঁছাচ্ছি যে, আমি বেলায়েতে মুহাম্মাদিয়া সমাপনকারী। আমি আল্লাহ তা'আলার খলীফা। যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর যে আমার থেকে বিমুখ হয়ে গেল, সে যেন আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা থেকে বিমুখ হল। হে লোক সকল! আমার প্রতি ঈমান আন, যাতে তোমাদের মুক্তি নসিব হয়। আমার কথা শোন এবং দ্রুত আমার আনুগত্য কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। যে আমাকে অস্বীকার করবে, আমার বিধি-বিধান অমান্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করবেন। .... সংক্ষেপিত।[১]

জৌনপুরীর দাবী ও বক্তব্য খন্ডন ঃ

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরীর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং তার মায়ের নাম আমীনা ছিল না। বরং যখন তিনি প্রতিশ্রুত মাহ্দী হওয়ার দাবী করতে মনস্থ করলেন, তখন তিনি মাহ্দীর ব্যাপারে কৃত রাসূল (সাঃ)-এর বাণী নিজের ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে এভাবে স্বীয় মাতা-পিতার নাম পরিবর্তন করে দিলেন। যখন তাদের পরিবর্তিত নামগুলো প্রসিদ্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি মাহ্দী হবার দাবী করলেন। সমকালীন লেখকদের কেউ তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমীনা লেখেন না। আলী শের কানে' -কৃত

১. مصدر سابق از مہدوی تحریک بحوالہ قول المحمود ॥

'তুহফাতুল কিরাম' এবং খাইরুদ্দীন ইলাহাবাদী কৃত জৌনপুরনামা-তে তার মাতাপিতার নাম অনুরূপ লেখা হলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এগুলো পরবর্তীকালে লিখিত হয়েছে। সমকালীন উৎসগুলোর কোথাও তার মাতাপিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং আমীনা বলে উল্লেখ নেই।[১]

পূর্বে বলা হয়েছে তার মায়ের প্রকৃত নাম আগা মালিক। এবং তার পিতার নাম ইউসুফ। আল্লামা আব্দুল হাই ইব্‌নে ফখরুদ্দীন আল হুসাইনী তার খ্যাতনামা গ্রন্থ নুযহাতুল খাওয়াতির (نزهة الخواطر)-এর ৪র্থ খণ্ড ধারা নং ৩২৪ ও ৪৮৬- তে তার পিতার নাম ইউসুফ বলে উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তীতে তার পিতা-মাতার নাম পরিবর্তনের কথাও উল্লেখ করেছেন।

মোল্লা আব্দুল কাদির বাদায়ূনীর ফারসী ইতিহাস মুন্তাখাবুত্ তাওয়ারীখ (منتخب التوارخ)-এর অনুবাদক মাহ্‌মূদ আহমদ ফারূকীও উক্ত গ্রন্থের টীকায় তার পিতার নাম ইউসুফ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

মোটকথা, সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপুরীর পিতার নাম ইউসুফ হোক কিংবা সাইয়্যেদ খান কিংবা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ইউসুফ খান, এতটুকু বিষয় প্রমাণিত যে, তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ ছিল না এবং তার মাতার নামও আমীনা ছিল না বরং ছিল আগা মালিক। মাহ্‌দী হওয়ার আগ্রহ জাগার পরেই সে তার পিতার নাম পরিবর্তন করে রাখে আব্দুল্লাহ এবং মায়ের নাম রাখে আমীনা। এভাবে নাম পরিবর্তন করে প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী কেন নাউযুবিল্লাহ আখেরী নবীও সাজা যেতে পারে। মক্কার কেউ যদি নিজের নাম এবং মাতা-পিতার নাম পরিবর্তন করে রাসূল (সাঃ)-এর অনুরূপ রেখে শেষ নবী হওয়ার দাবী করে বসে তাহলে কি সে আখেরী নবী হয়ে যাবে? তাকে যেমন সকলে জাল নবী আখ্যায়িত করবে, তদ্রূপ এই মাহ্‌দী দাবীদারকেও জাল মাহ্‌দী বলা ছাড়া আর কি বলা হবে?

তদুপরি তার বক্তব্যে সে বলেছে ঃ "আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই দাওয়াত প্রদানের ব্যাপারে আদিষ্ট।" আরও বলেছে ঃ "আল্লাহ্ আমার আনুগত্য করা ফরয করে দিয়েছেন।" সে আরও বলেছে ঃ "হে লোক সকল! তোমরা আমার প্রতি ঈমান আন, যাতে তোমাদের মুক্তি নসিব হয়।" সে আরও বলেছে ঃ "যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল।" এ জাতীয় কথা একমাত্র কোন নবী রাসূলই বলতে পারেন। বস্তুতঃ এসব বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকারান্তরে সে নবুওয়াতের দাবী করেছে। মাহ্‌দবী সম্প্রদায়ের শাখা যিক্‌রী সম্প্রদায় জৌনপূরীকে নবী মনে করত। এ থেকেও স্পষ্ট হয় যে, জৌনপূরী মূলতঃ নবুওয়াতেরই দাবী করেছিল। আর আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পর আর কেউ নবুওয়াতের দাবী করলে সে কাফের।

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরী ১৯ জিলক্বদ ৯১০ হিজরীতে সোমবার দিন বর্তমান আফগানিস্তানের ফারাহে ইন্তেকাল করেন।

---

১. دائرۂ معارف اسلامیہ اردو ج/ ۷ صفحہ/ ۵۲۱-دانشگاہ پنجاب لاہور ॥

২. احسن الفتاوی جلد اول ॥

যিক্‌রী সম্প্রদায়

যিকরী সম্প্রদায় মূলতঃ মাহদবী সম্প্রদায়ের একটি শাখা। তারা নামাযকে অস্বীকার করত। নামাযের পরিবর্তে তারা পাঁচ ওয়াক্ত যিকির করত। সম্ভবতঃ এ কারণেই তাদের নাম যিক্‌রী হয়ে থাকবে। আবূ সাঈদ বালিদীর মাধ্যমে মাকরানে এই ফিতনার সূচনা হয়। সে সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপুরীর হাতে বাই'আত ছিল। এটা ১৫০০ শতাব্দীর কথা। যখন মাকরান অঞ্চলে বালিদীর রাজত্ব ছিল।

যিক্‌রী সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতি ঃ

১. তারা বলত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরী আখেরী যামানার মাহ্‌দী।

খণ্ডন ঃ এই দাবীর খণ্ডন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

২. তারা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরীকে রাসূলও মনে করত।

তারা স্বীয় পয়গম্বরকে সাধারণতঃ মুহাম্মাদ মাহ্‌দী আটকী বলে। "মুহাম্মাদ মাহ্‌দী আটকী" বলে তারা মুহাম্মাদ জৌনপূরীকেই বোঝাত। তাদের ধারণা, তাদের পয়গম্বর (মুহাম্মাদ মাহ্‌দী জৌনপূরী) আটক (পাঞ্জাব) থেকে মাক্‌রান এসেছেন। তিনি ছিলেন একটি জ্যোতি। যিনি প্রকাশিত হয়ে তাদের বড়দেরকে দ্বীনের পথ নির্দেশ করে আত্মগোপন করেছেন।[১]

খণ্ডন ঃ তাদের এই ধারণা ভ্রান্ত। সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপূরীর গমন কখনও মাকরান এলাকায় হয়নি; বরং তিনি যখন পাঞ্জাব (ভারত) থেকে বেরিয়েছেন তখন বেলুচিস্তানের সে রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করেছেন যেটি কান্দাহার গিয়েছে। প্রথমে কান্দাহার অতঃপর ফারাহ চলে গেছেন এবং ফারাহতেই তার ইন্তেকাল হয়েছে। এ কারণে মাকরানে তার আগমনের প্রশ্নই আসে না।

৩. তাদের কালিমা ছিল ভিন্ন, যা মুসলমানদের কালিমার পরিপন্থী। তাদের কালিমা ছিল নিম্নরূপ ঃ[২]

প্রথমতঃ তারা কালিমায়ে তায়্যিবাকে এভাবে পড়ত ঃ[৩]

لا اله الا الله محمد مهدى رسول الله

পরবর্তীতে তারা কালিমার মধ্যে نور پاک শব্দটি সংযুক্ত করে এভাবে কালিমা পড়ত ঃ[৪]

لااله الا الله نور پاک محمد مهدى مراد الله

উল্লেখ্য যে, তারা রাসূলুল্লাহ্‌র স্থলে امر الله অথবা مراد الله (আল্লাহর হুকুম বা তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি)ও বলে।

---

১. احسن الفتاوی از ملت بیضاء صفحہ/ ۲۷ ॥

২. সূত্রঃ আহ্‌সানুল ফাতাওয়া- বেলুচিস্তান গেজেটার, ৭ম খণ্ড, আরহিউজ বেলার ১৯৭০ ইং, মাকরান পৃষ্ঠা- ১১৬ ॥

৩. عمدة الوسائل ص ١٢ ॥

৪. সূত্র ঃ ملة بيضاء صفحہ/ ۱۰ ॥

তারা তাদের পাঞ্জেগানা তাসবীহাতে নিম্নোক্ত কালিমা পাঠ করত ঃ

لا اله الا الله الملک الحق المبين نور محمد مهدی رسول الله صادق الوعد الامين -

অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি রাজা, তিনি বরহক, তিনি প্রকাশমান। নূর মুহাম্মাদ মাহদী আল্লাহ তা'আলার রাসূল। যার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তিনি আমানতদার।[১]

খণ্ডন ঃ এভাবে তারা মুহাম্মাদ জৌনপূরীকে নবী মেনে নেয়ায় কুফ্‌রীতে লিপ্ত হয়েছে।

৪. তারা নামাযকে অস্বীকার করত। নামাযের পরিবর্তে তারা পাঁচ ওয়াক্ত যিকির করত।[২]

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে অস্বীকার করার পশ্চাতে তাদের যুক্তি ছিল নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্তে নামায আদায় করার কোন প্রমাণ নেই। বরং আল্লাহ তা'আলা নামাযের ধারে কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন। কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يايها الذين امنوا لا تقربوا الصلوة -

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নামাযের ধারে কাছেও যেও না।[৩] (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ৪৩)

খণ্ডন ঃ নামায শরীআতের বদীহী বিষয় (ضروريات دين)-এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব নামায অস্বীকার করা কুফ্‌রী। لا تقربوا الصلوة -এর সাথেই উক্ত আয়াতে وانتم سكارى কথাটা (যার অর্থঃ নেশাগ্রস্থ অবস্থায়। পুরো আয়াতের অর্থ হবে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় হুশ ফেরার আগ পর্যন্ত নামায পড়া যাবে না) উহ্য রেখে শুধু لا تقربوا الصلوة-এর অর্থ করা জেনে বুঝে বিভ্রান্তি ছড়ানো ব্যতীত আর কিছু নয়। তাছাড়া বহু সংখ্যক আয়াতে যে নামাযের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে তারা কি বক্তব্য দিতে চায় ?

৫. তারা রমযানের রোযা অস্বীকার করত।

তারা রমযানের রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করত। তারা বলত, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

كلوا واشربوا -

অর্থাৎ, তোমরা খাও এবং পান কর। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ৬০) তারা বলতঃ আল্লাহ তা'আলা রমযানের মধ্যে যেসব আমলের কথা বলেছেন আমরা তাই করি। আল্লাহ তা'আলা খাওয়া এবং পান করার কথা বলেছেন। রমযান মাসে সেসবই আমরা করি।[৪] তারা রমযানের পরিবর্তে অন্যান্য দিনে তিন মাস আট দিন রোযা রাখার প্রবক্তা। অর্থাৎ প্রতি সোমবার, আইয়ামে বীয তথা ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে এবং যিলহজ্জের ৮ দিন। সর্বমোট তিন মাস ৮ দিন।

১. সূত্র ঃ ذكر توحيد ومهدوى تحريک ॥
২. সূত্র ঃ میں ذکری ہوں صفحہ ۷ ॥
৩. عمدۃالوسائل. مولانا محمد موسی صفحہ ۲۰ ॥
৪. المصدر السابق صفحہ ۲۸

খণ্ডন ঃ রমযানের রোযাও শরী'আতের জরূরী ও বদীহী বিষয় (ضروريات دين)-এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব রমযানের রোযা অস্বীকার করাও কুফ্‌রী। কুরআনে পানাহারের নির্দেশ তাদের নজরে পড়ল, কিন্তু রোযা রাখার নির্দেশটি তাদের চোখে পড়ল না কেন?

৬. তারা বাইতুল্লাহর হজ্জকে অস্বীকার করত।

তারা বাইতুল্লাহর হজ্জকে অস্বীকার করে। কা'বা ঘরকে কিবলা মনে করে না। বাইতুল্লাহর হজ্জের পরিবর্তে "কোহে মুরাদ"-এ যেয়ে হজ্জ করে। যেটি তুরবত (জেলা মাকরান) থেকে এক মাইল দূরবর্তী একটি পাহাড়।[১]

খণ্ডন ঃ হজ্জ করাও শরী'আতের বদীহী বিষয় (ضروريات دين)-এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব হজ্জ ফরয হওয়াকে অস্বীকার করাও কুফ্‌রী।

৭. তারা কা'বা শরীফকে কিবলা বলে স্বীকার করে না।

মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা 'উমদাতুল ওয়াসাইল' কিতাবে লিখেছেন ঃ তারা ইবাদতের উদ্দেশ্যে কা'বাকে সামনে নেয়া প্রয়োজন মনে করে না। তাদের মোল্লাই বলে।

فاينما تولوا فثم وجه الله -

অর্থাৎ, তুমি যেদিকেই ফের না কেন, সেখানেই আল্লাহ্‌র সত্তা আছে। অতএব তারা কা'বার দিকে ফেরার প্রয়োজন মনে করে না।[২] (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১১৫)

খণ্ডন ঃ কা'বা শরীফ কেবলা হওয়া কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। অতএব এটা অস্বীকার করা কুরআনকেই অস্বীকার করা।

৮. তারা চৌগান নামক এক ধরনের নাচের প্রবক্তা।

চৌগান এক ধরনের সামাজিক নাচ, যাকে ধর্মীয় রূপ দেয়া হয়েছে। এই চৌগান চাঁদনী রাতে এবং পবিত্র রাতগুলোতে সাধারণতঃ খোলা ময়দানে হয়ে থাকে। যুবক, শিশু বৃদ্ধ সবাই তাতে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করে। চৌগানে অংশগ্রহণকারীরা একটি বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়। আর মাঝখানে কোন সুকণ্ঠের অধিকারী পুরুষ বা নারী-যে চৌগানের পা এবং অঙ্গ সঞ্চালন সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল -দাঁড়িয়ে মাহ্‌দীর গুণগান এবং আল্লাহ্‌র স্তুতিমূলক কাব্য পাঠ করতে থাকে এবং সমস্ত অংশগ্রহণকারী -যাদেরকে জওয়াবী বলা হয়- কবির মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দাবলীর ঝংকারে আন্দোলিত হতে থাকে। কাব্যের শেষ চরণে এলে সবাই সমস্বরে সেটার কোরাশ টানতে শুরু করে। যখন চৌগানের কথা বলা হয়, তখন তারা নাচের ন্যায় তারা গোল গণ্ডির ভিতরে থেকে উপর নিচে লাফায় এবং সন্মুখ ও পশ্চাতে আগ পিছ করতে থাকে।

যিক্‌রী সম্প্রদায়ের মতে এই নাচের অনেক বড় ছওয়াব রয়েছে। তাদের মতে এতে যারা অংশগ্রহণ করে, তারা অনেক বড় ছওয়াবের অধিকারী হয়- এত ছওয়াব যে, তার কল্পনাই করা যায় না।[৩]

খণ্ডন ঃ নারী পুরুষের পর্দাহীন সম্মিলন ও নাচ-গান শরীআতে হারাম। আর হারাম কাজে ছওয়াব আছে মনে করা শরীআতের বিধানের সাথে চরম উপহাসের শামিল, যা কুফ্‌রী।

১. مہدوی تحریک صفحہ ۷۱ ॥ ২. عمدۃالوسائل. صفحہ ۳۱/ ॥ ৩. مہدوی تحریک ॥

৯. যিকরীগণ সহবাস ও স্বপ্নদোষের পর গোসলে বিশ্বাসী নয়। তারা শুধু দোআ করে, যা যিকিরখানায় করা হয়।[১]

খণ্ডন ঃ সহবাস ও স্বপ্নদোষের পর কোন শরী'আত সম্মত ওযর না থাকলে গোসল করা ফরয। আর কোন ফরয কাজের ফরযিয়্যাতকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী।

১০. ইবাদত সম্পর্কে অদ্ভুত যিক্‌রী ধারণা

তাদের ইবাদত হল আল্লাহর যিক্‌র পাঁচ ওয়াক্ত। রুকু আর সিজদা তিন ওয়াক্ত। আর রোযা বছরে ৩ মাস ৮ দিন।[২]

একটি বিভ্রান্তিকর বক্তব্য

যিক্‌রীগণ একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তন করলেও তারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটা অদ্ভুত ব্যাখ্যা দেয় যে, আমাদের সকল মুসলমানের দ্বীন বা ধর্ম একটি। তা হল ইসলাম। ধর্মে আমাদের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান। কিন্তু মায্‌হাব ভিন্ন। যেমন- হানাফী, হাম্বলী, মালিকী, শাফিঈ, জাফরী, শশ ইমামী, যিক্‌রী, আহলে হাদীছ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের এবং তাদের সবার ধর্ম ইসলাম। আর যে ইসলাম থেকে খারেজ সে কাফের।

এ এক অদ্ভুত ইসলামী ঐক্য যে, তাদের কালিমা মুসলমানদের থেকে ভিন্ন, নামায, রোযা, হজ্জের ন্যায় ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীকে অস্বীকার, তবুও মুসলমান!

যিক্‌রী সম্প্রদায় সম্পর্কে শর্‌য়ী ফতওয়া ঃ

যিক্‌রী সম্প্রদায় যেহেতু মুহাম্মাদ জৌনপূরীকে রাসূল বলে মানে, তার নামের কালিমাও পাঠ করে এবং ইসলামের মূলনীতি - নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদিকে অস্বীকার করে, অন্যান্য আরও অনেক ফরয ও দ্বীনের জরূরী ও বদীহী বিষয় (ضروریات دین)কে অস্বীকার করে, এজন্য তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।[৩]

আহ্‌লে হাদীছ বা গায়রে মুকাল্লিদীন

"গায়রে মুকাল্লিদ" বলতে বোঝায় যারা তাক্‌লীদ বা আইম্মায়ে মুজ্‌তাহিদীনের অনুসরণ করার গুরুত্ব অস্বীকার করেন। তারা বলতে চান সরাসরি কুরআন-হাদীছ থেকেই মাসআলা-মাসায়েল চয়ন করে আমল করতে হবে। কোন ইমামের তাক্‌লীদ করা যাবে না। তারা নিজেদেরকে "আহ্‌লে হাদীছ" বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ইসলামের চতুর্থ বুনিয়াদ হল কিয়াস। অর্থাৎ, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের কিয়াস। তাদের কিয়াস মানার অর্থ তাদের তাকলীদ করা। তাক্‌লীদের সারকথা হল কোন বুযুর্গ ও বিজ্ঞ আলেম ব্যক্তির হক্কানিয়্যাতের প্রতি আস্থা রেখে -যে, তিনি কুরআন ও হাদীছ থেকে কিয়াস করে যে উক্তি করেছেন এবং সে মোতাবেক নিজেও এ কাজটি করেছেন- তাঁর সেই কথা ও কাজের অনুসরণ করা। আর কিয়াস বলা হয় ঃ

১. ۴۵ / صفحہ / ج / میں ذکری ہوں ॥ ২. ۲ / صفحہ / ج / میں ذکری ہوں ॥
৩. যিক্‌রী সম্প্রদায় সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য (খণ্ডন ব্যতীত) احسن الفتاوی جلد اول থেকে গৃহীত ॥

القياس فى اللغة عبارة عن التقدير يقال قست النعل بالنعل اذا قدرته وسويته - وعند الاصوليين هو تقدير الفرع بالاصل فى الحكم والعلة - (قواعد الفقه)

অর্থাৎ, আভিধানিক অর্থে কিয়াস বলা হয় - পরিমাপ করাকে। যেমন বলা হয়ঃ

قست النعل بالنعل -

অর্থাৎ, একটা জুতা থেকে আর একটা জুতার পরিমাপ করেছি। আর শরী'আতের পরিভাষায় কিয়াস বলা হয় হুকুম ও কারণের ক্ষেত্রে কোন শাখাগত বিষয়কে মূল বিষয়ের অনুরূপ করে দেয়া।

কিয়াসকে অস্বীকার করে গায়রে মুকাল্লিদগণ মূলতঃ শরী'আতের একটি বুনিয়াদকেই অস্বীকার করেছে। তদুপরি গায়রে মুকাল্লিদগণ উম্মতের এমনকি সাহাবায়ে কেরামের ইজ্‌মাকেও কার্যতঃ অস্বীকার করেন। তারা তারাবীহ বিশ রাকআত হওয়ার বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের যে ইজ্‌মা হয়েছে, তা অস্বীকার করেন। তিন তালাকে এক তালাক নয় বরং তিন তালাক হওয়ার বিষয়ে সমস্ত আইম্মায়ে কেরামের যে ঐক্যমত্য রয়েছেও তাও অস্বীকার করেন। এভাবে ইজ্‌মাকে অস্বীকার করে তারা শরী'আতের আরও একটি বুনিয়াদকে অস্বীকার করল। শরী'আতের এই দলীলদ্বয়-কিয়াস ও ইজ্‌মাকে অমান্য করার বিষয়টি নিয়েই মৌলিকভাবে গায়রে মুকাল্লিদদের সাথে অন্যদের বিরোধ।

যারা কিয়াসকে সনদ মনে করেন না অর্থাৎ, কিয়াসকে দলীল হিসেবে মানেন না এবং আইম্মায়ে কেরামের তাকলীদে বিশ্বাস করেন না, তাদেরকে বলা হয় জাহিরিয়্যা, যাদের সর্দার হলেন দাউদ জাহিরী। গায়রে মুকাল্লিদগণ এই জাহিরিয়্যা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইব্‌নে তাইমিয়া, ইব্‌নে হাজ্‌ম এবং আল্লামা শওকানীও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্যঃ সম্প্রতি গায়রে মুকাল্লিদ বা আহ্‌লে হাদীছ বলে যারা পরিচিত, তারা মুখে তাকলীদের বিরুদ্ধে বললেও কার্যতঃ উপরোক্ত উলামাদের তাক্‌লীদ করে থাকেন। পরবর্তিতে তাক্‌লীদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কুরআন-হাদীছের আলোকে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদী মতবাদের সূচনা ঃ

مظاہر حق গ্রন্থকার নওয়াব কুতুবুদ্দীন সাহেবের বর্ণনা মতে ১২৪৬ হিজরীর পর হিন্দুস্তানে গায়রে মুকাল্লিদ ফিরকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর অগ্রনী ছিলেন মওলভী আব্দুল হক বেনারসী। তাকেই গায়রে মুকাল্লিদী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা হয়। সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহঃ) তার এই তাকলীদ বিরোধী ভূমিকা বনাম ফ্যাসাদের পথ গ্রহণের কারণে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করে দেন। তিনি আইম্মায়ে দ্বীনের তাক্‌লীদ করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন। তিনি ফোকাহায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিশেষতঃ হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে জনমনে বিদ্বেষের বীজ বপন করেন। এ মর্মে হারামাইনের উলামায়ে কেরাম থেকে ফতওয়া চাওয়া হলে সেখানকার চার মাযহাবেরই মুফতিয়ানে কেরাম এবং আবেদ সিন্ধীর ন্যায় অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এরূপ লোকদেরকে গোমরাহ ও অন্যকে গোমরাহকারী আখ্যায়িত করে ফতওয়া প্রদান করেন।

পরবর্তিতে ১২৫৪ হিজরীতে শাহ ইসহাক দেহলভীর নিকট এ মর্মে আবার ফতওয়া তলব করা হয়। তিনিও তার জওয়াবে নির্দিষ্ট ইমামের তাক্লীদকে ওয়াজিব (واجب مخیّر) এবং তা অস্বীকার কারীকে গোমরাহ আখ্যায়িত করেন। দেশের অন্যান্য বহু উলামা তাতে স্বাক্ষর করেন। অতপর হারামাইনের উলামা কর্তৃক প্রদত্ত ফতওয়ার সাথে এই ফতওয়াকে একত্রিত আকারে تنبیہ الضالین নামে প্রকাশ করা হয়।[১]

গায়রে মুকাল্লিদী মতবাদ সৃষ্টির পশ্চাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের বিরোধিতা পূর্বক এবং মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি পূর্বক ইংরেজদের মনস্তুষ্টি সাধন একটা বড় কারণ ছিল বলে ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ মুহাম্মাদ মুবারক বলেন ঃ

جماعت غرباء اہل حدیث (اہل حدیث کی ایک شاخ) کی بنیاد محدثین کی مخالفت پر رکھی گئی تھی صرف یہی مقصد نہیں بلکہ تحریک مجاہدین یعنی سید احمد کی تحریک کی مخالفت کر کے انگریز کو خوش کرنے کا مقصد پنہا تھا ۔ (رد غیر مقلدیت. بحوالہ علماء احناف اور تحریک مجاہدین صفحہ / ۴۸)

অর্থাৎ, জামা'আতে গুরাবায়ে আহ্লে হাদীছ (আহ্লে হাদীছের একটি শাখা)-এর বুনিয়াদ রাখা হয়েছিল মুহাদ্দিছীনে কেরামের বিরোধিতার উপর। শুধু এতটুকুই উদ্দেশ্য নয়, মুজাহিদ আন্দোলন অর্থাৎ, সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের আন্দোলনের বিরোধিতা করে ইংরেজদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যও প্রচ্ছন্ন ছিল।

গায়রে মুকাল্লিদগণের মুরব্বী ও সেরপোরস্ত নওয়াব সিদ্দীক হাসান সাহেবের স্বীকৃতি নিম্নরূপ ঃ

یہ آزادگی ہماری مذاہب جدیدہ سے (یعنی تحریک اہل حدیث، ناقل) عین مراد قانون انگلیشہ ہے۔ (رد غیر مقلدیت. بحوالہ ترجمان وہابیہ مصنفہ نواب صاحب)

অর্থাৎ, ধর্ম থেকে এই স্বাধীনতা বনাম আমাদের নতুন ধর্ম ইংরেজ শাসনের উদ্দেশ্যের সমার্থবোধক।

نیز فرماتے ہیں : فرمان رواں بھوپال کو ہمیشہ آزادگی مذہب (یعنی عدم تقلید) میں کوشش رہی ہے جو خاص منشا گورنمنٹ انڈیا کا ہے۔ (رد غیر مقلدیت. بحوالہ مذکور)

অর্থাৎ, ভূপালের শাসকও সর্বদা ধর্মীয় স্বাধীনতা (অর্থাৎ, তাক্লীদ না করা)-এর ব্যাপারে স্বচেষ্ট ছিলেন, যা ইণ্ডিয়ান গভর্নমেন্টের খাস উদ্দেশ্য ছিল।

গায়র মুকাল্লিদগণের সকলের শায়খ (شیخ الکل فی الکل) মিয়াঁ নযীর হুসাইনের খাস শাগরেদ মওলভী মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী - যাকে আহ্লে হাদীছদের ওকীল বলা হত- তার স্বীকৃতি নিম্নরূপ ঃ

اس گروہ اہل حدیث کے خیر خواہ وفادار رعایا، برٹش گورنمنٹ ہونے پر ایک بڑی روشن اور قوی دلیل ہے کہ یہ لوگ برٹش گورنمنٹ کے زیر حمایت رہنے کو اسلامی سلطنتوں کے زیر سایہ رہنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ (رد غیر مقلدیت. بحوالہ الحیاۃ بعد الممات صفحہ / ۹۳)

১. تنبیہ الضالین بحوالہ طائفہ منصورہ و تحفۃ العرب والعجم بحوالہ النجاۃ الکاملۃ۔ ॥

অর্থাৎ, প্রজাহিতৈষী বৃটিশ সরকার যে এই আহ্লে হাদীছ দলের শুভাকাংখী, তার একটা বড় এবং জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ হল এরা বৃটিশ গভর্নমেন্টের ছায়াতলে থাকাকে ইসলামী শাসনের ছায়াতলে থাকার চেয়েও ভাল মনে করে।

মওলভী হুসাইন বাটালবী ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ না করার মর্মে যে কিতাব লিখেছিলেন, তার জন্য ইংরেজদের পক্ষ থেকে তাকে জায়গীর প্রদান করা হয়েছিল।[১]

নামকরণ প্রসঙ্গ ঃ

গায়রে মুকাল্লিদগণের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব নওয়াব সিদ্দীক হাসান সাহেবের যুগ পর্যন্ত গায়রে মুকাল্লিদগণ নিজেদেরকে "মুওয়াহ্হিদীন" (موحدین/তাওহীদপন্থী) বলে পরিচয় দিতেন। কখনও তারা নিজেদেরকে "মুহাম্মাদী" বলে পরিচয় দিতেন। এই পরিচয় গ্রহণের পশ্চাতে একটা কারণ এও ছিল যে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদেরকে ওহাবী বলে পরিচয় দিত। তখন তারা নিজেদেরকে মুহাম্মাদী বা মুওয়াহ্হিদীন বলে পরিচয় দিতে শুরু করেন। ১৮১৮ সনে সর্বপ্রথম তারা নিজেদেরকে "আহ্লে হাদীছ" নামে পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু এরপরও অনেকে তাদেরকে ওহাবী বলে আখ্যায়িত করা অব্যাহত রাখায় সরকারীভাবে তারা "আহ্লে হাদীছ" নামটিকে নিজেদের জন্য রেজিষ্ট্রেশন করে নেন। ১৮৮৬ সনে "এশাআতুস সুন্নাহ" পত্রিকার সম্পাদক প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ ব্যক্তিত্ব আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ লাহোরী তৎকালীন ইংরেজ গভর্নমেন্টের কাছে তার পত্রিকার মাধ্যমে এই মর্মে আবেদন করেন যে, ওহাবী শব্দটি আহ্লে হাদীছ নামে খ্যাত দলটির ব্যাপারে -যারা সর্বদা ইংরেজ সরকারের নেমক হালাল এবং কল্যাণ কামী এবং এ বিষয়টা সুপ্রমাণিত এবং সরক-ারী কাগজ পত্রেও স্বীকৃত- সংগত নয়। সে মর্মে এই দলের লোকজন অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন করছে যে, সরকারী ভাবে তাদের জন্য ওহাবী শব্দটি বর্জন পূর্বক তাদের জন্য "আহ্লে হাদীছ" শব্দটি ব্যবহার করা হোক। এই বিষয়টা আবেদন আকারে মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের নিকট পেশ করেন এবং তখনকার পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর সে আবেদনকে মঞ্জুর করেন অতঃপর মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবীকে অবগত করেন যে, আপনাদের জন্য এই নামের এ্যালটমেন্ট দেয়া গেল।[২]

তাক্লীদ প্রসঙ্গ

তাক্লীদ (تقلید)-এর আভিধানিক অর্থ গলায় হার পরিধান করানো। তাক্লীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা হল ঃ

التقليد اتباع الانسان غيره فيما يقول او يفعل معتقدا للحقية من غير نظر الى الدليل كان هذا المتبع جعل قول الغير اوفعله قلادة فى عنقه من غير مطالبة دليل-

১. ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک. مسعود عالم ندوی ॥

২. رد غیر مقلدیت . مولانا محمد راشد صاحب اعظمی استاد فقہ دار العلوم دیوبند. بحوالہ اشاعت السنۃ شمارہ نمبر ۲، جلد ۱۱ صفحہ / ۳۹-۳۲۔ ॥

অর্থাৎ, পরিভাষায় তাক্‌লীদ বলা হয় অন্যের কোন উক্তি বা কর্ম সঠিক-এরূপ সুধারণার ভিত্তিতে কোন দলীল প্রমাণ না দেখে তার অনুসরণ করা। যেন এই অনুসরণকারী ব্যক্তি অন্যের কথা বা কাজকে প্রমাণ তলব করা ছাড়া নিজের গলার হার বানিয়ে নিল।[১]

তাক্‌লীদের সারকথা হল কোন বুযুর্গ ও বিজ্ঞ আলেম ব্যক্তির হক্কানিয়্যাতের প্রতি আস্থা রেখে -যে, তিনি কুরআন ও হাদীছ মোতাবেক এ উক্তিটি করেছেন এবং সে মোতাবেক তিনি এ কাজটি করেছেন- তাঁর কথা ও কাজের অনুসরণ করা। আর এই অনুসরণকে সংশ্লিষ্ট কথা ও কাজের দলীল/প্রমাণ জানার উপর ঝুলন্ত না রাখা। কিন্তু তার দলীল/প্রমাণ যদি তখন জানা হয় অথবা পরবর্তীতে জানা যায়, তাহলে এটি তাক্‌লীদের পরিপন্থী নয়। মোটকথা, তাক্‌লীদে দলীল/প্রমাণ অন্বেষণ অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দলীল/প্রমাণ জানা এর পরিপন্থী নয়।[২]

তাক্‌লীদের প্রয়োজনীয়তা ঃ

১. প্রত্যেক মুসলমানের উপর মূলতঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ করা ফরয। কুরআন এবং হাদীছের অনুসরণের মাধ্যমেই এ ফরয আদায় হবে। কিন্তু সরাসরি যারা কুরআন-হাদীছের ভাষা-আরবী বোঝেন না, কিংবা আরবী ভাষা বুঝলেও কুরআন-হাদীছ যথাযথ ভাবে অনুধাবন ও তা থেকে মাসআলা-মাসায়েল চয়ন ও ইজতিহাদ করার জন্য আরবী ব্যাকরণ, আরবী অলংকার, আরবী সাহিত্য, উসূলে ফেক্‌হ, উসূলে হাদীছ, উসূলে তাফ্‌সীর ইত্যাদি যে সব আনুসঙ্গিক শাস্ত্রগুলো বোঝা প্রয়োজন নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সেগুলো পাঠ করেননি বা পাঠ করলেও গভীরভাবে এসব বিদ্যায় পারদর্শী হতে পারেন নি, তাদের পক্ষে সরাসরি সব মাসআলা-মাসায়েল কুরআন হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতিহাদ (গবেষণা) করে বের করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি তা নিরাপদও নয় বরং গভীর বুৎপত্তি ও দক্ষতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর শিকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই স্বভাবিক। এ কারণেই উম্মতের বড় বড় আলেম, মুহাদ্দিছ যেমন ইমাম গাযালী (রহঃ) ইমাম রাযী, তিরমিযী, তাহাবী, মুযানী, ইবনে হুমাম, ইব্‌নে কুদামা প্রমুখ পূর্ব যুগের ও পরবর্তী যুগের লক্ষ লক্ষ আলেমগণ আরবী ইল্‌মে, শরী'আতের ইল্‌মে পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের

---

১. كشاف اصطلاحات الفنون - থেকে গৃহীত ॥

২. কাশশাফু ইস্‌তিলাহাতিল ফুনূন, শরহে হুসামী ও শরহে মানার প্রভৃতি গ্রন্থে "তাক্‌লীদ"-এর এরূপ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এখন যদি কেউ নিজে নিজেই তাকলীদের এমন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন যা আমাদের তাক্‌লীদ পন্থীদের বিরূদ্ধে আপত্তি হিসেবে দাঁড় হয়, তাহলে তা হবে তাদের নিজস্ব পরিভাষা, যা আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ নয়। পরিভাষায় কোন বিতর্ক নেই। এতে করে মওলভী সানাউল্লাহ অমৃতসরীর ঐই প্রশ্নেরও উত্তর হয়ে গেল, যা তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'তাকলীদে শখ্‌সী ও সলফী' পৃষ্ঠা ৫১-৫২ তে উত্থাপন করেছেন যে, তাকলীদের অর্থ দলীল সূত্রে জানার পরিপন্থী। অতএব তাকলীদের জন্য অজ্ঞতা আবশ্যক। احسن الفتاوى جـ١ ॥

ইজতিহাদযোগ্য মাসায়েলের মধ্যে সর্বদা আইম্মায়ে মুজতাহেদীনগণের তাকলীদের প্রবক্তা রয়েছেন এবং তাঁদের পাবন্দী করেছেন। মুজতাহিদীনের খেলাফ নিজেদের মতে কোন ফতওয়া দেয়া জায়েয মনে করেননি। সাধারণ শ্রেণীর লোকদের জন্য বিস্তারিত মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধানের জন্য এমন কোন বিজ্ঞ আলেমের স্মরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই, যিনি উপরোক্ত বিদ্যাসমূহে পারদর্শী ও দক্ষ হওয়ার ফলে সরাসরি সব মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধান কুরআন হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতিহাদ করে বের করতে সক্ষম। এরূপ বিজ্ঞ ও ইজতিহাদের ক্ষমতা সম্পন্ন আলেম তথা মুজতাহিদ ইমামের স্মরণাপন্ন হওয়া এবং তিনি কুরআন-হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতিহাদ করে সব মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধান যেভাবে বলেন তার অনুসরণ করাকেই বলা হয় উক্ত ইমামের তাকলীদ করা বা উক্ত ইমামের মাযহাব অনুসরণ করা।

২. আমলী যিন্দেগীর প্রয়োজনীয় সকল মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধানের জন্য সরাসরি কুরআনের আয়াত বা হাদীছ পাওয়া কঠিন। এ কারণেই ইজ্‌তিহাদের তথা ইজ্‌তিহাদকৃত ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। আর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এত পরিমাণ ইল্‌ম হয় না যে, সে নিজের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েলগুলি কুরআন-হাদীছ থেকে সরাসরি ইজ্‌তিহাদ করে বের করতে পারেন। এ কারণে বড় আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করতে হয় এবং তারা যেভাবে মাসআলা-মাসায়েল বলেন সেভাবে আমল করতে হয়। এটাকেই তাক্‌লীদ বলা হয়। কুরআনে কারীমে না জানা লোকদেরকে জানা লোকদের থেকে জিজ্ঞেস করে আমল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون -

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান তবে যারা জানে তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। (সূরাঃ ১৬-নাহ্‌লঃ ৪৩)

যদিও এই আয়াত কোন বিশিষ্ট বিষয় সম্পর্কে এসেছে কিন্তু এর শব্দ ব্যাপক, যা সমস্ত কাজ-কারবার, আচার-ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করছে।

৩. এমন অনেক আহকাম ও মাসায়েল রয়েছে যে সম্পর্কিত কুরআন এবং হাদীছের রেওয়ায়েত বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী দৃষ্ট হয়, কিংবা যাতে সাহাবা ও তাবেঈনের মধ্যে অর্থ এবং উদ্দেশ্য নির্ণয় করা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এসব আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন মুজ্‌তাহিদের তাকলীদ করা বৈ গত্যন্তর নেই। কেননা নিজের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকার কারণে তিনি নিজের ব্যক্তিগত মতের উপর ভরসা করে কোন এক আয়াত কিংবা কোন রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিবে এবং অন্য আয়াত কিংবা রেওয়ায়েতকে অপ্রাধান্য প্রদান করে তা ত্যাগ করতে পারছেন না এবং সেটা তার জন্য জায়েযও নেই। একমাত্র বিজ্ঞ মুজ্‌তাহিদ আলেমই তার যোগ্যতা থাকার কারণে কোন এক আয়াত কিংবা কোন রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দেয়া এবং অন্য আয়াত কিংবা রেওয়ায়েতকে অপ্রাধান্য প্রদান করার কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন।

তাক্‌লীদের প্রকার ঃ

১. তাক্‌লীদে গায়রে শখসী। অর্থাৎ, নিদৃষ্ট কোন ইমামের তাক্‌লীদ না করে যে মাসালায় যে ইমামের তাক্‌লীদ করতে মনে চায় সেটা করা।

২. তাক্‌লীদে শখ্‌সী। অর্থাৎ, সবক্ষেত্রে নির্দিষ্ট যে কোন একজন ইমামের তাক্‌লীদ করা। তবে অন্যান্য ইমামকেও সে সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় মনে করবে, তাঁদের মতকেও সঠিক মনে করবে। কিন্তু বিবিধ দ্বীনী ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য অনুসরণ শুধু একজনেরই করবে।

তাক্‌লীদের হুকুম ঃ

তাকলীদ করা সাধারণ লোকদের জন্য ওয়াজিব। সাধারণ লোক বলতে বোঝায় যারা একেবারেই আরবী ও ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়, চাই অন্য শাস্ত্র সম্বন্ধে যতই পণ্ডিত হোকনা কেন, কিংবা আরবী ভাষা সম্বন্ধে অবগত কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইমলামী শিক্ষা অর্জন করেননি। অথবা নামকা ওয়াস্তে ইসলামী শিক্ষা অর্জন করলেও গভীর পাণ্ডিত্য এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। এই সকল শ্রেণীর লোকই সাধারণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের উপর সর্বাবস্থায় তাক্‌লীদ করা ওয়াজিব।

সাধারণ লোকদেরকে নির্দিষ্ট কোন সাহাবীর তাকলীদ করা থেকে বাঁধা দেয়ার ব্যাপারে মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের ইজ্‌মা' বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বরং সাধারণ লোকদের উপর আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের অনুসরণ করা ওয়াজিব।[১]

তাক্‌লীদ যে ইমামেরই হোক যে কোন এক জনেরই তাকলীদ করা ওয়াজিব। এক এক মাসআলায় এক এক জনের অনুসরণ করার অবকাশ নেই এবং সেরূপ করা জায়েযও নয়, কারণ তাতে সুবিধাবাদ ও খাহেশাতের অনুসরণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তার ফলে গোমরাহী-র পথ উন্মুক্ত হয়।

ইতিহাসে মুজতাহিদ ইমাম অনেকেই অতিবাহিত হয়েছেন। তবে তম্মধ্যে বিশেষভাবে চার জন ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছেন এবং তাদের চয়ন ও ইজতিহাদকৃত মাসআলা-মাসায়েল তথা তাঁদের মাযহাব ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। উক্ত চার জন ইমাম হলেন হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ), হযরত ইমাম শাফিঈ (রহঃ), হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) ও হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)। তাঁদের মাযহাবকেই যথাক্রমে হানাফী মাযহাব, শাফিয়ী মাযহাব, মালেকী মাযহাব, ও হাম্বলী মাযহাব বলা হয়ে থাকে। উপমহাদেশের মুসলমানসহ পৃথিবীর অধিক সংখ্যক মুসলমান হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর তথা হানাফী মাযহাব-এর অনুসারী।

চার ইমামের তাকলীদ করার ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারো কারো ভিন্ন মত পোষণ এই ঐক্যমত্যের পরিপন্থী নয়। সম্প্রতি চার ইমামের (ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল)-এর অনুসরণ করার

১. بدائع الكلام. مولانا المفتى يوسف التاؤلوى থেকে গৃহীত ॥

মধ্যে হক্কানিয়্যাত সীমাবদ্ধ। তাই অন্য কোন ইমামের অনুসরণ করাকে বাঁধা দেয়া হবে।[১] কারণ অন্য কোন ইমামের মায্‌হাব সম্পর্কিত রেওয়ায়েত সংরক্ষিত নেই।

قال ابن الهمام فى فتح القدير : انعقد الاجماع على عدم العمل بالمذاهب الاربعة المخالفة للائمة الاربعة -

অর্থাৎ, ইব্‌নে হুমাম "ফাতহুল কাদীর" গ্রন্থে বলেন ঃ চার ইমাম বিরোধী চার মায্‌হাবের বিপরীত কোন আমল না করার ব্যাপারে ইজ্‌মা সংঘটিত হয়েছে।

وقال ابن حجر المكى فى فتح المبين : اما فى زماننا فقال ائمتنا لا يجوز تقليد غير الائمة الاربعة . الشافعى ومالك وابى حنيفة واحمد بن حنبل -

অর্থাৎ, ইব্‌নে হাজার মক্কী 'ফাতহুল মুবীন" গ্রন্থে বলেন ঃ আমাদের ইমামগণ বলেন, এই যুগে শাফিঈ, মালেক, আবূ হানীফা ও আহমদ ইব্‌নে হাম্বাল-এই চার ইমাম ব্যতীত অন্যের তাক্‌লীদ করা জায়েয নয়।

وقال ملا جيون فى التفسيرات الاحمدية : والانصاف ان انحصار المذاهب فى الاربع فضل الهى وقبولية من عند الله تعالى لا مجال فيها للتوجيهات والادلة - وقال النبى صلى الله ﷺ : اتبعوا السواد الاعظم وايضا قال : من شذ شذ فى النار واتباع السواد الاعظم فى تقليد الائمة الاربعة وهلك كثير من المتفردين ونزعوا ربقة الاسلام كما ادعاه مولانا محمد حسين البتالوى امام غير المقلدين فى اشاعة السنة فى شتى المواضع - وهذا التفرد من البعض غير خارق للاجماع لانه لا اعتداد بهم -

অর্থাৎ, তাফ্‌সীরাতে আহমাদিয়াতে আছে ঃ ইনসাফের কথা হল চার মায্‌হাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া আল্লাহ্‌র এক অনুগ্রহ এবং আল্লাহ্‌র কবূলিয়্যাত। এর মধ্যে কোন ব্যাখ্যা ও দলীল-প্রমাণের অবকাশ নেই। আর নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা বৃহৎ দলের অনুসরণ কর। তিনি আরও বলেছেন ঃ যে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হল সে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাহান্নামে পতিত হল। বলা বাহুল্য- চার ইমামের তাক্‌লীদের মধ্যেই বৃহৎ দলের অনুসরণ। এই বৃহৎ দল থেকে বিচ্ছিন্ন বহু লোক ধ্বংস হয়েছে এবং ইসলামের রজ্জু থেকে ছুটে গেছে। গোমন গায়রে মুকাল্লিদগণের ইমাম মাওলানা হুসাইন বাটালবী "ইশাআতুস সুন্নাহ" গ্রন্থের বহু স্থানে এ কথা ব্যক্ত করেছেন। আর এই গুটিকতক লোকের বৃহৎ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ইজ্‌মার পরিপন্থী হয় না। কেননা, তারা গ্রহণযোগ্য নয়।

১. بدائع الكلام. مولانا المفتى يوسف التاؤلوى থেকে গৃহীত ॥

সাধারণ ভাবে তাক্‌লীদের দলীল

তাক্‌লীদের ব্যাপারে কুরআন, হাদীছ, ইজ্‌মা ও কিয়াস চার ধরনের দলীল বিদ্যমান। যথাঃ

কুরআন থেকে দলীলঃ

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فاسئلو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون -

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান তাহলে যারা জানে তাদের থেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। (সূরাঃ ১৬-নাহ্‌লঃ ৪৩)

আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে সাধারণ তাকলীদকে ফরয করে দিয়েছেন। এই তাকলীদের দু'টি অংশ রয়েছে। একটি শখ্‌সী, অপরটি গায়রে শখ্‌সী। আয়াত কোন বিশেষ ধরনের তাক্‌লীদকে খাস করে উল্লেখ করেনি। ফলে এ আয়াত দ্বারা উভয় প্রকার তাক্‌লীদই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট এবং ফরয বলে প্রমাণিত হয়। অতএব যে ব্যক্তি তাকলীদে শখ্‌সীকে শিরক অথবা বিদআত বলবে সে অজ্ঞ ও গোমরাহ। কারণ, সে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ফরয কৃত বিষয়কে শির্‌ক বলে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট কোন বিষয়কে বিদআত অথবা শির্‌ক বলা জঘন্য ধরনের পাপ।

২. সূরা নিসা-র মধ্যে বলা হয়েছে ঃ

واذا جائهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم -

অর্থাৎ, যখন তাদের কাছে ভয় বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন সংবাদ পৌঁছে, তখন তারা তা (হুট করে) প্রচার করে দেয়। যদি তারা তা রাসূল ও মু'মিনদের মধ্যকার কর্তাব্যক্তিদের কাছে পৌঁছাত, তাহলে তাদের মধ্যে যারা তথ্যানুসন্ধানী তারা সেটাকে ভালভাবে জেনে নিত (এবং জেনে নিয়ে সংগত মনে করলে তা প্রচার করত, অন্যথায় তা প্রচার থেকে বিরত থাকত)। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ৮৩)

এ আয়াতের প্রেক্ষাপট হল ঃ যুদ্ধ কালীন কোন সংবাদ শোনা মাত্রই তাহ্‌কীক তদন্ত না করে মুনাফিকরা তা প্রচার করত এবং সরল প্রাণ মুসলমান তাতে বিশ্বাস করে সর্বত্র তা ছড়িয়ে দিত, ফলে রাষ্ট্রীয় ও যুদ্ধ সংক্রান্ত শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটত। আয়াতে এটা নিষেধ করে বলা হয়েছে এরূপ না করে তাদের উচিত ছিল ফকীহ বা সমঝদার সাহাবীদের কাছে সে সংবাদ পৌঁছে দেয়া। তাহলে তারা যথাযথ তদন্ত পূর্বক যেটা সংগত তাই করত। আয়াতটি যদিও যুদ্ধ প্রসঙ্গে, তবে তাফসীরের স্বতসিদ্ধ নীতি হল প্রেক্ষাপট বিশেষ বিষয়ের হলেও তা ধর্তব্য নয় বরং ধর্তব্য হল শব্দের ব্যাপকতা। অতএব শব্দের ব্যাপকতা থেকে এ আয়াত দ্বারা তাক্‌লীদের বৈধতা প্রমাণিত হয়। ইমাম রাযী তাফসীরে কবীরে, ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস আহ্‌কামুল কুরআনে এ আয়াত দ্বারা তাক্‌লীদের নীতি প্রমাণ করেছেন। স্বয়ং গায়রে মুকাল্লিদগণের সর্বজনমান্য ব্যক্তি নওয়াব সিদ্দীক খান তাফসীরে ফাতহুল বয়ানে এ আয়াত দ্বারা কিয়াস দলীল-এই নীতি প্রমাণ করেছেন। এ আয়াত দ্বারা কিয়াস-এর নীতি প্রমাণ করা যদি দূরের বিষয় না হয়, তাহলে তাক্‌লীদ-এর নীতি প্রমাণ করাও দূরের বিষয় হওয়ার কথা নয়।[১]

হাদীছ থেকে দলীল ঃ

১. তিরমীযী, ইব্‌নে মাজা, মুসনাদে আহ্‌মদ প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত আছে ঃ

قال رسول الله ﷺ : انى لا ادرى ما قدر بقائى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر وعمر رضى الله عنهما -

অর্থাৎ, রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ আমার জানা নেই আর কতদিন তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান থাকবে। অতএব আমার পরে তোমরা আবূ বকর ও ওমরের ইক্তিদা (অনুসরণ) করবে। এখানে আবূ বকর ও ওমর (রাঃ)-এর ইক্তেদা করার কথা বলা হয়েছে। আর বলা বাহুল্য - ইক্তেদা বলা হয় দ্বীনী বিষয়ে আনুগত্য করাকে। এটাইতো তাক্‌লীদ।[২]

২. বোখারী শরীফের হাদীছে আছে ঃ

ائتموا بى وليأتم بكم من بعدكم -

অর্থাৎ, তোমরা আমার ইক্তেদা করবে এবং তোমাদের পরবর্তীরা তোমাদের ইক্তেদা করবে। হাফেজ ইব্‌নে হাজার আসকলানী (রহঃ) ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেন ঃ

وقيل معناه تعلموا منى احكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذالك اتباعهم الى انقراض الدنيا -

অর্থাৎ, এর অর্থ হল তোমরা আমার থেকে শরীআতের আহকাম শিক্ষা করবে এবং তোমাদের পরবর্তী তাবীঈগণ তোমাদের থেকে শিক্ষা করবে। এভাবে তাদের অনুসারীগণ কিয়ামত পর্যন্ত শিক্ষা করতে থাকবে।[৩]

ইজ্‌মা' থেকে দলীল ঃ

সাহাবায়ে কেরামের যুগে যে সব সাহাবী সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইজ্‌তিহাদ করতে সক্ষম ছিলেন না, তাঁরা ফকীহ সাহাবী থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস পূর্বক আমল করতেন। প্রত্যেক ফকীহ সাহাবী নিজ নিজ হালকায় ফতওয়া প্রদান করতেন। এরকম সাহাবী সংখ্যায় অনেক ছিলেন। আল্লামা ইব্‌নে কাইয়্যেম اعلام الموقعين গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

والذين حفظت عنهم الفتوى من اصحاب رسول الله ﷺ مأة ونيف وثلثون نفسا ما بين رجل وامرأة -

---

১. درس ترمذى. تقى عثمانى - ॥
২. ايضا ॥
৩. ايضا ॥

অর্থাৎ, এরকম যে সব সাহাবী থেকে ফতওয়া সংরক্ষিত আছে তাঁদের সংখ্যা একশত তিরিশের উর্ধ্বে। সাহাবা কর্তৃক এরূপ ফতওয়া প্রদান এবং অন্যদের তা মান্য করা তাক্‌লীদ বৈ আর কি? এ ব্যাপারে কোন সাহাবী বিরোধ করেননি তাই এটাকেও তাক্‌লীদ বিষয়ে সাহাবাদের এক প্রকারের ইজ্‌মা বলা হবে।

কিয়াস থেকে দলীল ঃ

পূর্বে বলা হয়েছে কুরআন-হাদীছ মান্য করা জরূরী। কিন্তু যারা সরাসরি কুরআন হাদীছ থেকে মাসআলা চয়ন করতে সক্ষম নন, তাদের জন্য তাক্‌লীদ ব্যতীত কুরআন হাদীছ মান্য করা সম্ভব নয়। তাই তাক্‌লীদ করা জরূরী সাব্যস্ত হল।

বিশেষভাবে তাক্‌লীদে শখ্‌সীর দলীল

তাক্‌লীদে শখ্‌সী-র ব্যাপারেও কুরআন, তা'আমুলে সাহাবা, ইজ্‌মা ও কিয়াস -এই চার ধরনের দলীল বিদমান। যথা ঃ

কুরআন থেকে দলীল ঃ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فاسئلو اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون -

অর্থাৎ, যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নাও, যদি তোমরা না জান। (সূরাঃ ১৬-নাহ্‌লঃ ৪৩)

এ দলীলটি সাধারণ তাক্‌লীদ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ স্বরূপ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা যদি না জান তাহলে যারা জানে তাদের থেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে সাধারণ তাক্‌লীদকে ফরয করে দিয়েছেন। এই তাকলীদের দু'টি অংশ রয়েছে। একটি শখ্‌সী, অপরটি গায়রে শখ্‌সী। আয়াতে কোন বিশেষ ধরনের তাক্‌লীদকে খাস করে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে এ আয়াত দ্বারা উভয় প্রকার তাক্‌লীদই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট এবং ফরয বলে প্রমাণিত হয়। কোন দলীল আম (عام) হলে সেই আম-এর অংশ - খাস (خاص)-এর জন্যেও সেটাকে দলীল গণ্য করা হয়। অতএব এ আয়াত তাক্‌লীদে শখ্‌সীর ব্যাপারেও দলীল।

তা'আমুলে সাহাবা থেকে দলীল ঃ

মদীনাবাসী সাহাবীগণ তাক্‌লীদে শখ্‌সী করতেন। দলীল ঃ

روى البخارى رح فى (باب اذا حاضت المرأة بعد ما افاضت) عن ايوب عن عكرمة ان اهل المدينة سألوا ابن عباس رضى الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد (الى قوله) رواه خالد وقتادة عن عكرمة قال الحافظ رحمة الله تعالى زاد الثقفى فقالوا لانبالى افتيتنا او لم تفتنا، زيدبن ثابت يقول لا تنفر، وفى رواية قادة فقالت الانصار لانتابعك يا ابن عباس وانت تخالف زيدا-

এই রেওয়ায়েত দ্বারা যেরূপভাবে প্রমাণিত হল যে, মদীনাবাসী হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ)-এর অনুসরণ করতেন বিশেষভাবে এবং তার বিপরীতে কারো কথা শুনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এরূপভাবে এটাও জানা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অথবা অন্য কোন সাহাবী সেসব মুকাল্লিদদের উপর শিরক অথবা কবীরা গুনাহে লিপ্ততার ফতওয়া দেননি।

হাফিজ ইব্‌নুল কায়্যিম (রহঃ) রচিত اعلام الموقعين গ্রন্থে এবং সুনানে দারিমী-তে বর্ণিত আছে- হযরত ওমর (রাঃ) এই মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন যে, যে মাসআলায় কোন হাদীছ পাওয়া যাবে না, তাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ফতওয়ার উপর আমল করা হবে। যদি তার ফতওয়া না পাওয়া যায়, তাহলে উলামায়ে কেরামের পরামর্শে যে সিদ্ধান্ত হবে তার উপর আমল করা হবে। এতে স্পষ্টতঃই দেখা গেল হযরত ওমর (রাঃ) একজন মুহাদ্দিছ, ফকীহ্ এবং মুজতাহিদ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর তাকলীদকে আবশ্যক করে নিয়েছেন এবং সারা জীবন তিনি তাঁর ফতওয়া মোতাবেক নির্দেশ দিয়ে গেছেন।[১]

ইজ্‌মা থেকে দলীল ঃ

তাক্‌লীদে শখ্‌সীর উপর সাহাবীদের ইজ্‌মা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাহাবীগণ সকলেই তাক্‌লীদে শখ্‌সী করতেন। এভাবে তাকলীদে শখ্‌সীর উপর সাহাবীদের ইজ্‌মা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ (রহঃ) ازالۃ الخفاء নামক গ্রন্থে (مقصد دوم-য়ে) তাক্‌লীদে শখ্‌সীর উপর সাহাবাদের ইজ্‌মা-এর প্রমাণ এভাবে দিয়েছেন যে, তখন ইজ্‌তিহাদের অবকাশ আছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদীছ আছে কি না তা তালাশ করার সুযোগ আছে-এতদসত্ত্বেও সে জাতীয় বিষয়ে খলীফা কোন দৃঢ় সংকল্প করলে তারপর আর কেউ সে ব্যাপারে কোন বিরোধ করতেন না। কারো বিরোধিতার অবকাশ ছিল না। খলীফার রায় জানার পূর্বে কোন কাজে তারা সংকল্পও করতেন না। সবাই তখন এক মাযহাবের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। একই মত ও পথে সমবেত ছিলেন। আর তা হল খলীফার মাযহাব এবং তার মত ও পথ।[২]

এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নির্ধারিত কানূন এবং আদর্শ যুগে মদীনাবাসীর আমল (تعامل مدینہ) কেও প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যায়। এই কানূন ও আমলের উপর কোন সাহাবীর কোন অভিযোগ ছিল না। এটা (একই সাথে সাধারণ তাক্‌লীদ ও) তাক্‌লীদে শখ্‌সীর ব্যাপারে সাহাবীদের ইজ্‌মার সুস্পষ্ট প্রমাণ।[৩]

কিয়াস থেকে দলীল ঃ

তাক্‌লীদে শখ্‌সী বর্জন করলে বহুবিধ ক্ষতি ও ফিত্‌না দেখা দিবে। এই ক্ষতি ও ফিত্‌না থেকে বাঁচার জন্য তাক্‌লীদে শখ্‌সী আবশ্যক। যেমন ফিত্‌নার আশংকায় হযরত

---

১. احسن الفتاوى ج/١ থেকে গৃহীত ॥ ২. احسن الفتاوى ج/١ থেকে গৃহীত ॥ ৩. احسن الفتاوى ج/١ থেকে গৃহীত ॥

উছমান (রাঃ) কুরআন সংকলন করার সময় সাত লোগাত বাদ দিয়ে এক লোগাত অর্থাৎ, কুরাইশদের লোগাতের উপর কুরআন সংকলন করেছিলেন এবং সর্বত্র একমাত্র সেটাই চালু করেছিলেন।

দুটো প্রশ্ন ও তার উত্তর

(১) এখন একটা প্রশ্ন হল কুরআন-হাদীছে খাস করে তাক্‌লীদে শখ্‌সী ওয়াজিব এ কথা কোথাও বলা হয়নি। তাহলে আমরা কিভাবে তাক্‌লীদে শখ্‌সীকে ওয়াজিব বলতে পারি? কুরআন-হাদীছে যেটাকে ওয়াজিব বলা হয়নি সেটাকে ওয়াজিব আখ্যায়িত করা যায় কি?

এ প্রশ্নের জওয়াব হল ঃ ওয়াজিব দুই প্রকার- লিআইনিহী, লিগাইরিহী। ওয়াজিব লিগাইরিহী অর্থ স্বয়ং সে কাজটির তাগিদ শরী'আত দেয়নি, কিন্তু শরী'আত যে সব জিনিসকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে, সেগুলোর বাস্তবায়ন এটি ছাড়া স্বভাবতঃ অসম্ভব। এজন্য এ বিষয়টিও ওয়াজিব হয়ে যাবে। কারণ, ওয়াজিবের ভূমিকাও ওয়াজিব। যেমন- কুরআন ও হাদীছের সংকলন এবং লিপিবদ্ধ করণের তাগিদ শরী'আতের কোথাও নেই। তা সত্ত্বেও এটাকে ওয়াজিব বলা হয়। এরূপভাবে তাক্‌লীদে শখ্‌সী হল ওয়াজিব লিগাইরিহী। কারণ, তাক্‌লীদে শখ্‌সী বর্জন করাতে এরূপ কতকগুলো অনিষ্ট রয়েছে যেগুলো থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব। মোটকথা ওয়াজিবের ভূমিকাও ওয়াজিব হয়ে থাকে।

তাক্‌লীদে শখ্‌সী বর্জন করায় যে ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু তাকলীদে শখসী এ ক্ষতি থেকে হেফাযতের জন্য ভূমিকা আর এরূপ ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব, এজন্য তাক্‌লীদে শখ্‌সীও 'ওয়াজিবের ভূমিকা ওয়াজিব'-মূলনীতি অনুসারে ওয়াজিব হয়ে যাবে।

'ওয়াজিবের ভূমিকা ওয়াজিব'-মূলনীতিটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হাদীছে এসেছে ঃ

عن عقبة بن عامر رضـ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علم الرمى ثم تركه فليس منا اوقد عصى- (رواه مسلم)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিখে তারপর তা ছেড়ে দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা তিনি বলেছেন সে নাফরমানী করল।

প্রকাশ থাকে যে, তীরন্দাজী দ্বীনে কোন উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌র কালিমাকে বুলন্দ করা ওয়াজিব এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে তীরন্দাজী এর জন্য ভূমিকার মর্যাদা রাখে এজন্য এটাকেও ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এটা শিখে যে ভুলে ফেলবে তাকে অবাধ্য বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাকলীদ বর্জনে ধর্মীয় ব্যাপারে আশংকার নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও এটা থেকে বিরত থাকা নাফরমানীর অন্তর্ভুক্ত, যেটি এর চেয়েও মারাত্মক নাফরমানীর দিকে নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এ থেকে হেফাজতে রাখুন।

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন হল যে কোন ইমামের তাক্‌লীদ করা জায়েয ছিল এখন এক ইমাম বাদে অন্য ইমামের তাক্‌লীদ করাকে না জায়েয সাব্যস্ত করা হলে তা কি শরী'আতের জায়েয জিনিসকে না জায়েয সাব্যস্ত করার ন্যায় অপরাধ নয় ?

এ প্রশ্নের জওয়াব হল ঃ অবস্থার তাগিদে এরূপ করা খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে প্রমাণিত আছে। অতএব এটা খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের অনুসরণ। যেমন- হযরত উছমান (রাঃ) সাহাবীগণের ঐক্যমতে কুরআনের সপ্ত গোত্রীয় ভাষা হতে শুধু এক (কোরাইশ) ভাষাকে কুরআনে পাকের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যদিও সপ্ত গোত্রীয় ভাষা কুরআনেরই ভাষা ছিল। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের মারফত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাহেশ ও মনের আকাংক্ষা অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু কুরআনে কারীম যখন আরব দেশ ছেড়ে অন্যান্য অনারব দেশে বিস্তার লাভ করল এবং বিভিন্ন গোত্রীয় ভাষায় পড়া হলে কোরআনের রদ-বদলের আশংকা দেখা দিল, তখন সাহাবীদের ঐক্যমতে সকল মুসলমানদের জন্য অবধারিত করে দেয়া হল যে, এখন হতে একমাত্র কোরাইশ ভাষায় কুরআনে কারীম লিখতে এবং পড়তে হবে। হযরত উছমান গনী (রাঃ) ঐ একই ভাষা অনুযায়ী সমস্ত কুরআন লিখে জগতের দিকে দিকে পাঠিয়ে দিলেন এবং আজ পর্যন্ত সমগ্র উম্মত তারই পা-বন্দী করছে। এর অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য গোত্রীয় ভাষাগুলি হক ছিল না। বরং দ্বীনের নেযাম ও শৃংখলা এবং রদ-বদল হতে কুর-আনের হেফাযত ও সংরক্ষণের জন্য শুধু এক ভাষাকে অবলম্বন করা হয়েছে।

তাক্‌লীদে শখ্‌সীর প্রবর্তন কখন কিভাবে হয়?

রাসূল (সাঃ)-এর যামানা থেকে নিয়ে দ্বিতীয় হিজরীর শেষ পর্যন্ত তাকলীদে গায়রে শখ্‌সীর প্রচলন ছিল। যেহেতু তখন পর্যন্ত মুজতাহিদদের মূলনীতিগুলো সুসংবদ্ধ আকারে রূপ নেয়নি, ফলে কোন সুনির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদে জটিলতাও ছিল। তাছাড়া সে যুগে অনুসারীদের মধ্যে তাক্‌ওয়া এবং ইখ্‌লাসের আগ্রহ পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকায় একাধিক মুজতাহিদের উক্তি গ্রহণ করার মধ্যে নফ্‌সের ধোঁকারও কোন লেশ ছিল না।

অবশেষে হিজ্‌রী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে হক্কানী উলামায়ে কেরাম মূল ও শাখাগত মাসায়েলগুলোর সংকলন আরম্ভ করেন এবং তাদের যোগ্য শিষ্যরা এ ধারার আরও সংকলন সংস্কার করেন। আর তৃতীয় শতাব্দীর অধিকাংশ লোক তাকলীদে শখসী রূপে তাদেরকে গ্রহণ করেন। মূল ও শাখাগত বিষয়গুলো কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে সংকলন করা হয়েছে এবং এগুলোকে পরখ করার মত এ রকম উলামায়ে রব্বানী এবং মুজতাহিদীন ছিলেন যাদের জ্ঞান এবং নির্ভরযোগ্যতা ছিল স্বীকৃত ও সর্বজন বিদিত। তাদের এই সংকলিত মাসায়েলগুলো সহজলভ্য হওয়ায় লোকজনের জন্য তার অনুসরণ অনেক সহজ হয়ে যায়।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত চার মাযহাব ছাড়া অন্যান্য মুজতাহিদেরও অনুসরণ করা হত। কিন্তু অন্যান্য মুজতাহিদের মাযহাবগুলো এরূপে সংরক্ষিত হয়নি, যার ফলে সেগুলো

অনেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংকলিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। ফলে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পর চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মাযহাব অবশিষ্ট থাকেনি। আর আল্লাহ্‌র রহমতে এই মাযহাব চতুষ্টয়ে তাকলীদে শখ্‌সী সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।[১]

তাক্‌লীদে শখ্‌সী সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ

১. আমলের জন্য নির্দিষ্ট কোন এক ইমামের তাক্‌লীদ তথা নির্দিষ্ট কোন এক মুজতাহিদকে নির্ধারণ করার অর্থ হল ঃ সে যে ইমামের তাক্‌লীদ করছে, সে ইমাম ব্যতীত অন্য কোন ইমাম তার নিকট তাক্‌লীদের যোগ্য নন কিংবা অন্যান্য ইমাম তার ইমামের ন্যায় সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় নন। এতে করে অন্যান্য ইমামকে অযোগ্য আখ্যায়িত করা হয় এবং অন্যান্য ইমামকে হেয় করা হয়।

জওয়াব ঃ

আমল করার জন্য নির্দিষ্ট কোন এক ইমামের তাক্‌লীদ তথা নির্দিষ্ট কোন এক মুজতাহিদকে নির্ধারণ করার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, সে যে নির্ধারিত ইমামকে গ্রহণ করল, সে ইমাম ব্যতীত অন্য কোন ইমাম তার নিকট তাকলীদের যোগ্য নন। বরং নিজের মতে যে ইমামকে সে সঠিক এবং যার তাকলীদ করাকে সে নিজের জন্য ভাল মনে করেছে তাঁকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু অন্যান্য ইমামকেও সে সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় মনে করছে। এটা হুবহু এমন, যেমন কোন এক রুগ্ন ব্যক্তি নিজের চিকিৎসার জন্য শহরের নাম করা হেকীম-ডাক্তারের মধ্য থেকে কোন একজন হেকীম বা ডাক্তারকে নির্ধারিত করা প্রয়োজনীয় মনে করল। কেননা রোগী যদি নিজের মতে এক সময় এক ডাক্তার অন্য সময় অন্য ডাক্তারের নিকট জিজ্ঞাসা করে করে ঔষধ ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে সেটা তার জীবন নাশের কারণ হতে পারে। তাই সে নির্দিষ্ট কোন একজন হেকীম বা ডাক্তারকে নিজের চিকিৎসার জন্য নির্বাচন করল। কিন্তু তার অর্থ কিছুতেই এ নয় যে, অন্য হেকীম বা ডাক্তার অভিজ্ঞ নয়, কিংবা তাদের মধ্যে চিকিৎসা করার যোগ্যতা নেই।[২]

২. নির্দিষ্ট কোন এক ইমামের তাক্‌লীদ তথা নির্দিষ্ট কোন এক মুজতাহিদকে নির্ধারণ করার ফলে অন্যান্য ইমামের অনুসারীদের সাথে তার আমলগত বিরোধ দেখা দেয় এবং এর ফলে অনেক সময় দলাদলী, ফির্কাবন্দী ও ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। যার ফলে তর্ক, বাহাছ ও মুনাযারাও হতে দেখা যায়।

জওয়াব ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নির্দিষ্ট কোন এক ইমামের তাক্‌লীদ তথা নির্দিষ্ট কোন এক মুজতাহিদকে নির্ধারণ করার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, অন্য কোন ইমাম তাক্‌লীদের যোগ্য নন বা সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় নন। হানাফী, মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী সব মাযহাবকেই হক বলে ফতওয়া দেয়া হয়েছে এবং সব ইমামকেই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে বলা হয়েছে।

১. احسن الفتاوى جـ/١ من الانصاف و عقد الجيد للشاه ولى الله الدهلوى ॥

২. মা'আরিফুল কুরআন, ৫ম খণ্ড, থেকে সংক্ষেপিত ॥

এতদসত্ত্বেও এসব মাযহাবের নামে যে বিভক্তি উম্মতের মধ্যে কায়েম হয়েছে এবং এটা নিয়ে যে দলাদলি, ফির্কাবন্দী এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদের তুফান ছুটানো হয়েছে, তা কাম্য নয় এবং সুধী আলেমগণ কখনও সেটাকে ভাল মনে করেননি। কোন কোন অজ্ঞ অতি উৎসাহী লোক কর্তৃক অন্য মাযহাবের লোকদেরকে ভ্রান্ত আখ্যায়িত করার ফলে এ নিয়ে ইল্‌মী আলোচনা এবং সত্য ও হক উদঘাটনের নিমিত্তে তর্ক-বাহাছ ও মুনাযারার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এবং এসব ইল্‌মী আলোচনা এবং সত্য ও হক উদঘাটনের নিমিত্তে পরিচালিত এসব আলোচনাই তর্ক-বাহাছ ও মুনাযারার রূপ ধারণ করেছে এবং পরে একে অপরের প্রতি ধিক্কার-তিরস্কারের ঘটনার উদ্ভব হয়েছে।[১]

ওয়াহ্‌হাবী বা সালাফীগণ

"ওয়াহ্‌হাবী" মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল ওয়াহ্‌হাব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামী সম্প্রদায়ের নাম। আরবস্থ এ দলটি নিজেদেরকে "সালাফিয়া" পরিচয় দিতে পছন্দ করেন।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল ওয়াহ্‌হাব ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে "উয়ায়না"-তে তামীম গোত্রের শাখা গোত্র বনূ সিনান বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ৮৯ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি বসরা, বাগদাদ ও কুর্দিস্তানে বহু বৎসর বসবাস করেছেন। নাদির শাহের শাসনামলে (১১৪৮/১৭৩৬) ইসফাহানে গমণ করেন এবং এরিস্টোটলিয় দর্শন, ইশরাকিয়া মতবাদ ও সুফিতত্ত্ব চর্চা করেন। সেখান থেকে কুম গমন করেন। এখানে তিনি হাম্বলী মাযহাবের উৎসাহী সমর্থকে পরিণত হন। এখান থেকে তিনি তার জন্মস্থান উয়ায়নায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং তার রচিত "কিতাবুত তাওহীদ"-এ লিপিবদ্ধ মতবাদ প্রচার শুরু করেন। এতে তিনি কিঞ্চিত সাফল্য অর্জন করলেও প্রচন্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন। বিরোধীদের মধ্যে তার ভাই সুলাইমান এবং চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ হুসাইন -এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক বর্ণনা অনুসারে চাচাতো ভাইয়ের সাথে তার এই বিবাদের সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত ইয়ামামা-র তামীম গোত্রের মধ্যে খুনাখুনি পর্যন্ত শুরু হয়। অবশেষে উক্ত অঞ্চলের গভর্নরের নিকট তার নির্বাসনের দাবী উত্থাপিত হয়। ফলে তিনি পরিবার পরিজন সহ সেখান থেকে বিদায় নিয়ে দারইয়ায় গমন করেন। সেখানকার সর্দার মুহাম্মাদ ইব্‌নে সাঊদ তার চিন্তাধারা গ্রহণ করেন এবং তার সংরক্ষণ ও প্রচারের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। এভাবে উক্ত অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব ইব্‌নে সাঊদের হাতে থাকলেও মুহাম্মাদ ইব্‌নে আবদিল ওয়াহ্‌হাব ধর্মীয় ব্যাপারে নেতৃত্বের অবস্থানে চলে আসেন। ১৭৬৫ সালে ইবনে সাউদের ইন্তেকালের পর তার পুত্র আব্দুল আযীযও মুহাম্মাদ ইব্‌নে আবদিল ওয়াহ্‌হাবকে ধর্মীয় নেতারূপে বহাল রাখেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌নে আবদিল ওয়াহ্‌হাব শিক্ষা দানের সাথে অগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষাও দিতে আরম্ভ করেন। এভাবে গড়ে তোলা তার প্রশিক্ষিত অনুসারী দলটি রিয়াদ দখলের জন্য ১৭৪৭ সনে রিয়াদের শায়খ দাহ্‌হামের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আবদুল আযীয এই যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ করার পর ১৭৭৩ সালে আব্দুল আযীয

১. মা'আরিফুল কুরআন, ৫ম খণ্ড থেকে সংক্ষেপিত ॥

রিয়াদ দখল করেন। ১৮০৩ সালে এই ওয়াহ্হাবী নেতা (প্রথম আব্দুল আযীয) নিহন হন। তারপুত্র সাউদ পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক পিতার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হন। গালেব পাশা মক্কা ত্যাগের (১৮০৩ সাল) পর এই সাউদ বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। ১৮০৪ সালে তিনি মদীনা এবং ১৮০৬ সালে জেদ্দা দখল করেন। ১৮14 সালে সাউদের ইন্তেকাল হয়। তার পুত্র আব্দুল্লাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তীতে ইব্রাহীম পাশার নেতৃত্বে এই আব্দুল্লাহ্র বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল আব্দুল্লাহ আত্মসমর্পন করেন। এভাবে ওয়াহ্হাবী রাজ্যের পতন হয়। পরবর্তীতে সাউদের তুর্কী বামীয় এক চাচাতো ভাই বিদ্রোহ পরিচালনা পূর্বক আবার ওয়াহ্হাবী রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। সামান্য কিছু উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ওয়াহ্হাবী রাজ্য চলতে থাকে। অবশেষে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আব্দুল আযীয পূনরায় নাজদের আধিপত্য অর্জনে সক্ষম হন এবং তারই বংশে অদ্যাবধি সাউদী শাসন করায়ত্ব রয়েছে। এই রাজকীয় ফ্যামিলী কর্তৃক মদদপুষ্ট ও আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়ে ওয়াহ্হাবী বনাম সালাফী মতবাদ অগ্রসর হয়ে চলেছে।

মিসর, ইরাক, আফগানিস্তান, হিন্দুস্তান প্রভৃতি দেশের কিছু উলামায়ে কেরামও তাদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন। মুহাম্মাদ আব্দুহু মিসরী, জামাল উদ্দীন আফগানী, খায়রুদ্দীন তিউনিসী, সিদ্দীক হাছান খান ভূপালী (ভারত), আমীর আলী (কলিকাতা) প্রমুখ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এই ওয়াহ্হাবী বা সালাফী মতবাদের সূচনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব বিদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। তৎকালে ইসলামে যে সব বিদআত অনুপ্রবিষ্ঠ হয়েছিল যেমন ওলি-আল্লাহদের কবরে সৌধ নির্মান করা, কবরকে সেজদার স্থানে পরিণত করা, ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। এতটুকু পদক্ষেপকে জমহুরে উম্মত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেন।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি ও তার অনুসারীগণ বেশ কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলেন যা জমহুরে উম্মত মেনে নেননি। যেমনঃ রাসূল (সাঃ) ও সাহাবাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান সমূহকেই সমূলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা, এসব স্থান থেকে কোনরূপ বরকত লাভ করা (تبرک بالمکان)-এর ধারণাকে সমূলে অস্বীকার করা, পীর মুরীদীর বাড়াবাড়িকে প্রতিহত করতে যেয়ে সমূলে আধ্যাত্মিক সাধনার সিলসিলাকেই অস্বীকার করে বসা, বুযুর্গদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে নাজায়েয সাব্যস্ত করা, তাকলীদকে খারাপ মনে করা এবং চার মাযহাবের বাইরে ইজতিহাদ করাকে আলেমদের কর্তব্য বলে সাব্যস্ত করা ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ্য যে, বৃটিশ ভারতের রায়বেরেলী জেলার অধিবাসী হযরত সাইয়্যেদ আহমদ (রহঃ) যে সংস্কার ও আযাদী আন্দোলন পরিচালনা করেন আরব দেশীয় উপরোক্ত ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাঁর এই আযাদী আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার এটাকে ওয়াহ্হাবী আন্দোলন নামে অভিহিত করে। পরবর্তীতে এই সূত্রে সূর মিলিয়ে যে কোন বিদআত ও কুসংস্কার

বিরোধী উলামাকে ওয়াহ্হাবী বলে আখ্যায়িত করার একটা অপপ্রয়াস এই উপমহাদেশে পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। যদিও বিদআত ও কুসংস্কার বিরোধী এই উলামা হযরাত আরব দেশীয় ওয়াহ্হাবীদের সাথে কোনভাবেই জাড়িত নন এবং তাদের বাড়াবাড়ি ও জমহুর উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা পোষণের সাথেও আদৌ একমত নন। নাচ-গান ও মদ পন্থী বেশরা লোকেরাও সুন্নী লোকদেরকে ওহাবী বলে গালী দিত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ذخیرۂ کرامت - গ্রন্থের বর্ণনা মতে হিন্দুস্তানের এক শহরে ওহাবী অভিযোগে গ্রেফতার হওয়ার পর তার সম্পর্কে আর একজন তাড়ী পান করতে দেখেছে বলে সাক্ষী দেয়ার পর তাকে ওহাবী অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার কথা এবং অন্য একজনের ব্যাপারে তাকে নাচ দেখতে দেখা গেছে সাক্ষী দেয়ার পর তাকে ওহাবী অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ওয়াহ্হাবী বা সালাফিগণ জমহুরে উম্মতের চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন যে সব চিন্তাধারা পোষণ করেন তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ওয়াহ্হাবী বা সালাফীগণ প্রধানতঃ ৬ টি বিষয়ে জমহুরে উম্মতের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন।

১. তাক্লীদ প্রসঙ্গ
২. তাসাওউফ প্রসঙ্গ
৩. দু'আর মধ্যে ওসীলা প্রসঙ্গ
৪. তাবীজ-কবচ প্রসঙ্গ
৫. تبرک بالمکان বা বুযুর্গানে দ্বীন ও অলী-আউলিয়াদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ প্রসঙ্গ
৬. রওযায়ে আতহার যিয়ারতে যাওয়ার নিয়ত প্রসঙ্গ

এ ৬ টি বিষয়ের মধ্যে পূর্বে তাক্লীদ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তাসাওউফ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হবে। অবশিষ্ট চারটি বিষয়ের প্রত্যেকটা সম্বন্ধে নিম্নে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা পেশ করা হল।

দুআর মধ্যে ওসীলা প্রসঙ্গ

দুআর মধ্যে ওসীলা কয়েক ধরনের হতে পারে। যথা ঃ

১. কোন নেক আমলের ওসীলা দিয়ে দুআ করা। চাই নিজের আমলের দ্বারা হোক, অথবা অন্যের আমলের দ্বারা। অর্থাৎ, দুআর মধ্যে এভাবে বলা যে, হে আল্লাহ! আমার অথবা অন্যের অমুক নেক আমল, যে আমলকে আপনি পছন্দ করেন, তার ওসীলায় আমার দুআকে কবূল করুন।
২. কোন জীবিত নেককার মকবূল বান্দার (নবী হোক বা ওলী) ওসীলা দিয়ে দু'আ করা যে, হে আল্লাহ! অমুক মকবূল বান্দার ওসীলায় অর্থাৎ, তাঁর উপর তোমার যে রহমত রয়েছে তার ওসীলায় দু'আ করি।
৩. কোন মৃত নেককার মকবূল বান্দার (নবী হোক বা ওলী) ওসীলা দিয়ে দুআ করা।

প্রথম দুই প্রকার ওসীলা জায়েয বরং মুস্তাহাব- তা নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই। নেক আমলের ওসীলা দিয়ে দু'আ করা জায়েয এ বিষয়ে দলীল হল প্রসিদ্ধ ঐ হাদীছ, যাতে তিন ব্যক্তির এক গুহায় আটক হওয়া এবং তিন জনের বিশেষ তিনটি নেক আমলের ওসীলা দিয়ে দু'আ করার পর দু'আ কবূল হওয়া এবং গুহার মুখ থেকে পাথর সরে যাওয়ার কথা বর্ণিত আছে। (হাদীছটি মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ডের كتاب العلم অধ্যায়ের শেষ باب-এ হযরত ইব্নে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।)

দ্বিতীয় প্রকার ওসীলা-এর দলীল ঃ

(এক) এক অন্ধ ব্যক্তিকে রাসূল (সাঃ) নিজে তাঁর ওসীলা দিয়ে দুআ করতে শিক্ষা দেন এবং সেভাবে দু'আ করায় তার চোখ ভাল হয়ে যায়। হাদীছটি নাসায়ী, তিরমীযী ও ইব্নে মাজায় সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি এই ঃ

عن عثمان بن حنيف ان رجلا ضريرا اتى النبى ﷺ ، فقال ادع الله ان يعافينى ، فقال : ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لک - قال فادعه ، قال فامره ان يتوضأ فيحسن الوضوء . ويدعو بهذا الدعاء اللهم انى اسألک واتوجه اليک بنبيک محمد نبى الرحمة انى توجهت بک الى ربى ليقضى لى فى حاجتى هذه . اللهم فشفعه فى - (مشكوة) قال فى انجاح الحاجة والحديث اخرجه النسائى والترمذى فى الدعوات مع اختلاف يسير وقال الترمذى حسن صحيح وصححه البيهقى وزاد وقد ابصر وفى رواية ففعل الرجل فبرى -

(দুই) বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর ওসীলা দিয়ে বৃষ্টি কামনা করেছিলেন এবং এটা ছিল আব্বাস (রাঃ)-এর জীবিত থাকাকালীন সময়ে।

عن انس ؓ ان عمر بن الخطاب كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليک بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليک بعم نبينا فاسقنا فيسقوا - (مشكوة)

গায়রে মুকাল্লিদদের ইমাম শাওকানী (রহঃ) উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন-

ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع باهل الخير والصلاح واهل بيت النبوة (نيل الاوطارص ٩ جه/ ٤ وكذا فى عمدة القارى ص ٤٣٧ جـ/ ٣ وفتح البارى ص ٣٧٧ جـ/ ٢)

অর্থাৎ, হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়, নবী পরিবার ও নেককার বুযুর্গদের ওসীলায় সুপারিশ অন্বেষণ করা মুস্তাহাব।

তৃতীয় প্রকার ওসীলা জায়েয কি-না এ বিষয়েও কোন মতবিরোধ ছিল না। সর্বপ্রথম ইব্নে তাইমিয়া (রহঃ) এ বিষয়ে মতবিরোধের সূচনা করেন। তিনি মৃত এবং জীবিতদের ওসীলার মধ্যে পার্থক্য করেন এবং বলেন জীবিত নবী বা ওলীর ওসীলা প্রদান জায়েয, তবে মৃত নবী বা ওলীর ওসীলা প্রদান জায়েয নয়। ইব্নে তাইমিয়া (রহঃ)-এর পূর্বে ওসীলার ক্ষেত্রে জীবিত ও মৃতদের মাঝে পার্থক্য করার এই নীতি উম্মতের কেউ গ্রহণ করেননি। তিনিই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে ভিন্ন মত সৃষ্টি করে উম্মতের মাঝে বিভেদের সূচনা করেন। এবং বর্তমানে ইব্নে তাইমিয়ার ভক্ত সালাফিয়া ও গায়রে মুকাল্লিদগণ এ মতটির সপক্ষে প্রচার করছেন এবং এরূপ ওসীলা জায়েয হওয়ার প্রবক্তা জমহুরে উম্মতকে এ কারণে মুশরিকদের পর্যায়ভুক্ত সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। তারা বলতে চান ওসীলা জায়েয হওয়া সম্পর্কিত উক্ত রেওয়ায়েত সমূহ জীবিতদের দ্বারা ওসীলা গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মৃতদের দ্বারা ওসীলা গ্রহণ করা হয়েছে-এমন কোন স্পষ্ট রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না এবং মৃতদের দ্বারা ওসীলা জায়েয হওয়ার কোন দলীল নেই। অথচ তাদের বক্তব্য অজ্ঞতার পরিচায়ক। কারণ এ ব্যাপারে জমহুরে উম্মতের কুরআন, হাদীছ ও কিয়াস - এই তিন ধরনের দলীল রয়েছে। যথা ঃ

মৃতদের দ্বারা ওসীলা জায়েয হওয়ার দলীল

কুরআন থেকে দলীল ঃ

ولما جائهم كتب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا . الاية -

অর্থাৎ, আর যখন তাদের কাছে আসল তাদের নিকটস্ত কিতাবের সত্যায়নকারী কিতাব, (তারা তা প্রত্যাখ্যান করল) যদিও তারা পূর্বে কাফেরদের বিরুদ্ধে এর সাহায্যে বিজয় কামনা করত। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ৮৯)

এ আয়াতে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণ করার পূর্বে ইয়াহূদীরা তাঁর ওসীলায় মুশরিকদের বিরুদ্ধে সফলতা ও সাহায্য লাভের দু'আ করতো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম এ পদ্ধতিকে অস্বীকার করেনি। যার দ্বারা বোঝা যায় রাসূল (সাঃ)-এর ওসীলায় দু'আ করার বিষয়টি শুধু তাঁর জীবদ্দশার সাথেই খাস নয়।

হাদীছ থেকে দলীল ঃ

وفى مجمع الزوائد جـ/٢ صفحـ/٢٧٩ عن عثمان بن حنيف ان رجلا كان يختلف على عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فى حاجة له فكان لا يلتفت اليه ولا ينظر فى

حاجته فلقى عثمان بن حنيف فشكا ذلک اليه فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضاة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم انى اسألک واتوجه اليک بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة يا محمد انى اتوجه بک الى ربى فيقضى لى حاجتى وتذكر حاجتک ورح الى حين اروح معک فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم اتى باب عثمان فجاء البواب حتى اخذ بيده فادخله على عثمان بن عفان فاجلسه معه على الطنفسة وقال حاجتک ؟ فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له ما ذكرت حاجتک حتى كانت هذه الساعة وقال ماكانت لک من حاجة فائتنا ثم ان الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له جزاک الله خيرا ماكان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت الى حتى كلمته فىّ فقال عثمان بن حنيف والله ماكلمته ولكن شهدت رسول الله ﷺ واتاه رجل ضرير فشكا اليه ذهاب بصره فقال له النبى ﷺ او تصبر فقال يا رسول الله انه ليس لى قائد وقد شق على فقال له النبى ﷺ : ائت الميضاة و توضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الكلمات ـ فقال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا و طال بنا الحديث حتى دخل عليه الرجل فكان لم يكن به ضرر قط ـ قلت روى الترمذى وابن ماجة طرفا من اخره خاليا عن القصة وقد قال الطبرانى عقبه : والحديث صحيح بعد ذكر طرقه التى روى بها ـ وقال صاحب انجاح الحاجة : رواه البيهقى من طريقين نحوه واخرج الطبرانى فى الكبير والمتوسط بسند فيه روح بن سلام وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح ـ

এ হাদীছে রাসূল (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর সাহাবী হযরত উছমান ইব্‌নে হানীফ (রাঃ)-এর শেখানো মোতাবেক জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর ওসীলা দিয়ে দু'আ করায় তাঁর দু'আ কবূল হওয়ার কথা স্পষ্টতঃ বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য এই হযরত উছমান ইব্‌নে হানীফ সেই সাহাবী যার সামনে রাসূল (সাঃ) জনৈক অন্ধকে রাসূল (সাঃ)-এর ওসীলা দিয়ে দু'আ করার কথা শিক্ষা দিয়েছিলেন। হযরত উছমান ইব্‌নে হানীফ (রাঃ) তা থেকে বুঝেছিলেন যে, রাসূল (সাঃ)-এর ওসীলায় দুআ করার বিষয়টি শুধু রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশার সাথেই খাস নয়। তাই রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তিনি হাদীছে উল্লেখিত ব্যক্তিকে অনুরূপ রাসূল (সাঃ)-এর ওসীলা দিয়ে দু'আ করার শিক্ষা দিলেন।

কিয়াস থেকে দলীল ঃ

মৃতদের দ্বারা ওসীলা গ্রহণকে জীবিতদের দ্বারা ওসীলা গ্রহণের উপর কিয়াস করা যায়। বস্তুতঃ ওসীলা চাই জীবিতদের দ্বারাই হোক, অথবা মৃতদের দ্বারা, সত্তার দ্বারা হোক, অথবা আমলের দ্বারা; নিজের আমলের দ্বারা হোক, অথবা অন্যের আমলের দ্বারা সর্বাবস্থায়

এর হাকীকত এক। সবগুলো পদ্ধতিগুলোর মূলকথা হল আল্লাহ তা'আলার রহমতের ওসীলা ধারণ করা। এভাবে যে, অমুক মাকবূল বান্দার উপর যে রহমত রয়েছে তার ওসীলায় দু'আ করি। এ ক্ষেত্রে মৃত ও জীবিতদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকার কথা নয়।

সালাফীগণ রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ওসীলা অবলম্বন থেকে বলছেন যে, ওসীলা জীবিতদের সাথে খাস বা বিশেষিত। নতুবা হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর ওসীলা বাদ দিয়ে আব্বাস (রাঃ)-এর ওসীলা দিতে গেলেন কেন? কিন্তু হাদীছ দ্বারা যখন জীবিত মৃত উভয় দ্বারা ওসীলা ধারণ করা বৈধ সাব্যস্ত হল, তখন এই যুক্তির বৈধতা কোথায় ?

তবে হ্যাঁ এই প্রশ্ন অবশিষ্ট রয়ে গেল যে, হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর পরিবর্তে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর দ্বারা কেন ওসীলা গ্রহণ করলেন ? এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা ঃ[১]

১. হযরত আব্বাস (রাঃ) দ্বারা ওসীলা ধারণ করার সাথে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর দু'আও উদ্দেশ্য ছিল।
২. এ ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য ছিল যে, রাসূল (সাঃ)-এর ওসীলা ধারণ করার দুটি পদ্ধতি। প্রথমতঃ তাঁর সত্তার ওসীলা ধারণ করা, দ্বিতীয়তঃ তাঁর নিকটাত্মীয়ের ওসীলা ধারণ করা।
৩. এটা বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ছাড়া আউলিয়া এবং নেক্‌কারদেরকেও ওসীলা বানিয়ে দু'আ করা যায়, তাঁদের ওসীলাও বরকতের কারণ ও রহমত আকর্ষক।
৪. মানুষের মাঝে এই স্বভাব বিদ্যমান যে, যাকে দেখা যায় এবং অনুভব করা যায়, তার উপরই তাদের মনের প্রশান্তি বেশী হয়। এ কারণেই রাসুল (সাঃ)-এর খেদমতে সালাম প্রেরণ এবং দু'আর দরখাস্ত পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও মানুষের মাধ্যমের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। অথচ ফেরেশতাদের মাধ্যমে সালাম পৌঁছান হলে তা নেহায়েত দ্রুত হয়, সাথে সাথে এ মাধ্যমটি শক্তিশালীও। তাদের কাছে সালাম পৌঁছানোর আমানত রাখা হলে না তাদের দ্বারা সেই আমানত আদায়ের ব্যাপারে উদাসীনতার আশংকা আছে না তাদের ভুলে যাওয়ার কোন ভয় আছে। এতদসত্ত্বেও মানুষের মাধ্যমে সালাম পৌঁছানোর বিষয়টাতে বেশী মনের প্রশান্তি হয়, কেননা দেখা এবং অনুভব হলে বেশী প্রশান্তি হয়ে থাকে।

সালাফী এবং গায়রে মুকাল্লিদগণ এরপরও যদি জীবিত এবং মৃতদের মাঝে পার্থক্য করতে চান, তাহলে আমরা বলব যদি জীবিত এবং মৃতদের মাঝে কিছু পার্থক্য করতেই হয় তাহলে মৃতদের ওসীলা গ্রহণের বিষয়টি বেশী গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। কারণ, জীবিত মানুষ অবস্থার পরিবর্তন থেকে নিরাপদ নয়। এ জন্য হাদীছ শরীফে আছে, যদি কারো অনু-সরণ করতে চাও তাহলে মৃতদের অনুসরণ কর। হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

১. احسن الفتاوى جـ١/ থেকে গৃহীত ॥

عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه (قال) من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحى لاتؤمن عليه الفتنة. الحديث - رواه رزين (مشكوة)

অর্থাৎ, কেউ যদি কারো আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, তাহলে সে যেন মৃতদের আদর্শের অনুসরণ করে। কারণ, জীবিত ব্যক্তি ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়।

সারকথা - নেক আমল দ্বারা এবং জীবিতদের দ্বারা ওসীলা গ্রহণের মত মৃতদের দ্বারাও ওসীলা গ্রহণ কুরআন, হাদীছ ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি বলা যায় সাহাবীদের ঐক্যমত দ্বারা জীবিতদের ওসীলা ধারণ করা মুস্তাহাব বলে প্রমাণিত। কারণ উছমান ইব্‌নে হানীফের আমলের ব্যাপারে কোন সাহাবীর বিরোধিতা (نكير) বর্ণিত হয়নি। অতএব মৃত নেককার ওলী আউলিয়া এবং নবীগণের ওসীলা ধারণ করা উত্তমরূপে মুস্তাহাব হবে।

ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ-কবচ প্রসঙ্গ

এখানে দুটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছেঃ

১. ঝাড়-ফুঁকের বিষয় ঃ

কুরআনের আয়াত, আল্লাহ্‌র নাম ও দু'আয়ে মাছূরা (যে সব দু'আ হাদীছে বর্ণিত আছে) দ্বারা ঝাড় ফুঁক করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। বহু সহীহ হাদীছে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম ঝাড় ফুঁক করতেন তার প্রমাণ রয়েছে।

وهي جائزه بالقران والاسماء الالهية وما فى معناها بالاتفاق - (اللمعات)

অর্থাৎ, ঝাড়-ফুঁক কুরআন, আল্লাহ্‌র আসমায়ে হুছনা ও অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট কিছু দিয়ে জায়েয। (লুমআত)

তবে পাঁচ ধরনের ঝাড়-ফুঁক জয়েয নয়।

(এক) যে কালামের অর্থ জানা যায় না (অবোধগম্য ভাষা) তার দ্বারা।

(দুই) আরবী ছাড়া অন্য ভাষায়।

(তিন) কুরআনের আয়াত, আল্লাহর নাম ও সিফাত এবং দু'আয়ে মাছূরা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা।

(চার) শির্‌ক যুক্ত কালাম দ্বারা।

(পাঁচ) ঝাড়-ফুঁকের মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতা আছে (موثر بالذات) মনে করে তার উপর ভরসা করলে।

যে সব হাদীছে ঝাড়-ফুঁককে নিষেধ করা হয়েছে বা ঝাড়-ফুঁককে শির্‌ক বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য এই পাঁচ ধরনের ঝাড় -ফুঁক, সব ধরনের ঝাড়-ফুঁক নয়। যেমন আবূ দাঊদ শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছেঃ

ان الرقى والتمائم والتولة شرك -

অর্থাৎ, ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ শির্‌ক।

২. তাবিজ-কবচের বিষয়ঃ

বর্তমান যুগের গায়রে মুকাল্লিদ ও সালাফীগণ তাবীজ কবচকে নিষিদ্ধ এমনকি শির্‌ক বলে আখ্যায়িত করেন। পক্ষান্তরে অন্য সকলের নিকট তাবীজ-কবচ ও ঝাঁড়-ফুঁকের হুকুম একই রকম। যে ধরনের কালাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক জায়েয নয়, সেগুলো লিখে তাবীজ-কবচ ব্যবহার করাও জায়েয নয়। পক্ষান্তরে যে ধরনের কালাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক জায়েয সে ধরনের কালাম বা তার নকশা[১] দ্বারা তাবীজও জায়েয। সব শ্রেণীর উলামায়ে কেরাম এ ধরনের তাবীজ-কবচকে জায়েয বলেছেন। এমনকি সালাফীগণ পদে পদে যার তাক্‌লীদ করেন সেই ইব্‌নে তাইমিয়া (রহঃ)ও বলেছেনঃ

ويجوز ان يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى - (فتاوى ابن تيميه جـ/١٩ صفحه/ ٦٤)

অর্থাৎ, অসুস্থ প্রমুখ বিপদগ্রস্ত লোকদের জন্য কালি দ্বারা আল্লাহ্‌র কিতাব, আল্লাহ্‌র যিক্‌র লিখে দেয়া এবং ধুয়ে পান করানো জায়েয।

গায়রে মুকাল্লিদগণ যে আল্লামা শাওকানীকে ইমাম হিসেবে মান্য করেন, তিনিও বলেছেনঃ সমস্ত ফকীহের নিকট এ ধরনের তাবীজ জায়েয।[২]

তাবীজ জায়েয হওয়ার পক্ষে জমহুরের দলীলঃ

(১) اخرج ابن ابى شيبه في مصنفه عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ : اذا فزع احدكم فى نومه فليقل بسم الله اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وسوء عقابه ومن شر عباده ومن شر الشياطين وان يحضرون فكان عبد الله (يعنى بن عمروؓ) يعلمها ولده من ادرك منهم ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه -

এ হাদীছে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর ইব্‌নুল আস (রাঃ) কর্তৃক তার অবুঝ বাচ্চাদের জন্য তাবীজ লিখে দেয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

(২) واخرج ابو داؤد فى سننه ايضا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله ﷺ كان يعلمهم من الفزع كلمات اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون - وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه - (اخرجه ابو داؤد فى الطب - باب كيف الرقى ؟)

---

১. ابجد-এর হিসেবে তাবীজ লেখাও জায়েয। এটাও এক ধরনের বোধগম্য ভাষা। (احسن الفتوى ॥ ২. نيل الاوطار (ج/৮ ॥

এ হাদীছেও হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর ইব্নুল আস (রাঃ) কর্তৃক তার অবুঝ বাচ্চাদের জন্য তাবীজ লিখে দেয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

(৩) واخرج ابن ابى شيبة ايضاعن مجاهد انه كان يكتب الناس التعويذ فيعلقه عليهم ـ واخرج عن ابى جعفر ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عمر و الضحاك ما يدل على انهم كانوا يبيحون كتابة التعويذ وتعليقه او ربطه بالعضد ونحوه ـ

এ রেওয়ায়েতে হযরত মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্নে সীরীন (রহঃ) প্রমুখ কর্তৃক অন্যদেরকে তাবীজ লিখে দেয়ার কথা, তাবীজ হাতে বা গলায় বাঁধা ও তাবীজ লেখা বৈধ হওয়ার মর্মে তাদের মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

(৪) قال عبد الله بن احمد قرأت على ابى ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن محمد بن ابى ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اذا عسر على المراة ولا دتها فليكتب بسم الله لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، كأنهم يوم يرونها لم يلبثو ا الا عشية او ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفسقون ـ

এ রেওয়ায়েতে হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বাচ্চা প্রসবের সময় প্রসূতীর প্রসব বেদনা লাঘব করা ও সহজে প্রসব হওয়ার জন্য বিশেষ তাবীজ শিক্ষা দেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ রেওয়ায়েতটি সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণের সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্ব ইব্নে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর ফাতাওয়াতে উল্লেখ করেছেন।[১]

সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণের দলীল ও তার জওয়াব

দলীল ঃ

সালাফীগণ তা'বীজ-কবচ নাজায়েয হওয়া সম্পর্কে পুস্তক-পুস্তিকাও প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে একটি পুস্তিকা হল التمائم فى ميزان العقيدة . د. على بن نفيع العلياني অনুবাদ "আকীদার মানদণ্ডে তা'বীজ"। এর মধ্যে লেখক প্রধানতঃ যে দলীলগুলি পেশ করেছেন নিম্নে জওয়াবসহ সেগুলো তুলে ধরা হল ঃ

১. তাদের একটা দলীল হল কুরআনের ঐ সব আয়াত, যার মধ্যে দুঃখ কষ্ট ও বিপদ-আপদ দূর করাকে আল্লাহ্র শান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ

وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত কেউ তা হটানোর নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। (সূরাঃ ১০-ইউনুসঃ ১০৭)

১. দ্র ঃ فتاوى ابن تيميه جـ١٩/ صفحـ٦٤

জওয়াব ঃ

তাবীজ গ্রহণ করা এ আয়াতের পরিপন্থী হবে যদি তাবীজের মধ্যে নিজস্ব প্রভাব আছে বলে মনে করা হয় অর্থাৎ, এ বিশ্বাস করা হয় যে, তাবীজই সবকিছু করে। এরূপ মনে না করলে তাবীজ এ আয়াতের পরিপন্থী হবে না। নতুবা বলতে হবে বৈধ পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ করাও এ আয়াতের পরিপন্থী। এ আয়াত দ্বারা তাবীজ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল দেয়া অনেকটা শিশু সুলভ ও ভাসা জ্ঞানের পরিচায়ক।

২. তাদের আরেকটা দলীল কুরআনের ঐ সব আয়াত ও হাদীছ যাতে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। যেমনঃ

(১) وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্রই উপর তোমরা ভরসা কর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ২৩)

(২) و على الله فليتوكل المؤمنون ـ

অর্থাৎ, মু'মিনগণ যেন আল্লাহ্রই উপর ভরসা করে। (সূরাঃ ১৪-ইবরাহীমঃ ১১)

(৩) ومن تعلق شيئا وكل اليه ـ (رواه احمد وابن ماجه والحاكم)

অর্থাৎ, যে কোন কিছু লটকায়, তার দিকে তাকে অর্পন করা হয়।

জওয়াব ঃ

তাবীজ গ্রহণ করা এ আয়াতের পরিপন্থী হত যদি তাবীজ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাবীজের উপরই ভরসা করা হত। কিন্তু যদি ভরসা আল্লাহ্র উপর থাকে এবং তাবীজকে শুধু ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করা হয় যেমনটি করা হয় ঔষধ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, তাহলে আদৌ তা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী হবে না। নতুবা বলতে হবে বৈধ পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ করাও এ আয়াতের পরিপন্থী। এ জাতীয় আয়াত দ্বারাও তাবীজ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল দেয়া অনেকটা শিশু সুলভ ও ভাসা জ্ঞানের পরিচায়ক।

৩. তাদের আরেকটা দলীল ঐ সব আয়াত, যাতে শিরকের নিন্দাবাদ করা হয়েছে। যেমনঃ

(১) ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না। অন্য গোনাহ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরাঃ ৪-নিছাঃ ১১৬)

(২) ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوى به الريح فى مكان سحيق ـ

অর্থাৎ, যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে। (সূরাঃ ২২-হজ্জঃ ৩১)

জওয়াবঃ

তাবীজের মধ্যে নিজস্ব প্রভাব আছে (অর্থাৎ, তাবীজ مؤثربالذات -এরূপ) মনে করলেই শির্কের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এরূপ মনে না করলে তাবীজ কেন শির্ক হবে তা কোনভাবেই বোধগম্য নয়। অথচ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, যে ধরনের তাবীজ গ্রহণ করা জায়েয, তাও কিছু শর্ত সাপেক্ষে, আর সেই শর্তের মধ্যে রয়েছে তাবীজের মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস না থাকা।

৪. তাদের আরেকটা দলীল ঐ সব হাদীছ, যাতে ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজকে শির্ক বলা হয়েছে। যেমনঃ

(١) من علق تميمة فقد اشرک - (رواه احمد و الحاكم)

(٢) ان الرقى والتمائم والتولة شرک - (ابو داؤد وابن ماجة)

(٣) ان رسول الله ﷺ اقبل اليه رهط فبايع تسعة وامسک عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال ان عليه تميمة فادخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد اشرک - (مسند أحمد والحاكم)

তর্জমা ঃ

(১) যে তাবীজ লটকালো, সে শির্ক করল।

(২) অবশ্যই ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ[১] ও জাদু শির্ক।

(৩) এ হাদীছে বলা হয়েছে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে একদল লোক উপস্থিত হল। অতপর তিনি নয় জনকে বাই'আত করালেন এবং একজনকে বাই'আত করালেন না। তারা বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ"! নয় জনকে বাইআত করালেন আর একজনকে বাদ রাখলেন? রাসূল (সাঃ) বললেন তার সাথে একটি তা'বীজ রয়েছে। তখন তার হাত ভিতরে ঢুকালেন এবং সেটা ছিড়ে ফেললেন। অতপর তাকেও বাই'আত করালেন এবং বললেন ঃ যে ব্যক্তি তা'বীজ ব্যবহার করল সে শির্ক করল।

জওয়াব ঃ

এখানে প্রথম হাদীছদ্বয়ে যে তাবীজের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা শির্কপূর্ণ তাবীজ উদ্দেশ্য। তার প্রমাণ হল এখানে উল্লেখিত দ্বিতীয় হাদীছে ঝাড়-ফুঁককেও শির্ক বলা হয়েছে, অথচ সব ঝাড়-ফুঁক শির্ক নয়; স্বয়ং রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামও ঝাড়-ফুঁক করতেন, যা পূর্বে সহীহ হাদীছের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এখানে ঝাড়-ফুঁকের ক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা দেয়া হবে তাবীজের ক্ষেত্রেও সেই ব্যাখ্যাই দেয়া হবে। বিশেষতঃ এ ব্যাখ্যা দিতে আমরা বাধ্য এ কারণেও যে, সহীহ হাদীছে সাহাবা ও তাবিয়ীগণ কর্তৃক তাবীজ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. تمائم শব্দের আর একটা অর্থ হল পুঁতি। এ অর্থ গ্রহণ করলে এ হাদীছ দ্বারা তাবীজ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল দেয়া যাবে না ॥

তৃতীয় হাদীছে তা'বীজ থাকার কারণে যে ব্যক্তির বাইআত না করা এবং তার তা'বীজ খুলে ফেলার কথা বর্ণিত হয়েছে এ দ্বারা কোনভাবেই সব রকম তা'বীজ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল দেয়া যায় না। কারণ সে লোকটা ইসলাম গ্রহণের জন্যই এসেছিল অতএব মুসলমান হওয়ার পূর্বে সে তা'বীজ লাগিয়েছিল তা নিশ্চিতই শির্ক পূর্ণ তা'বীজ ছিল। আর এই শির্কপূর্ণ হওয়ার কারণেই সে তা'বীজ নিষিদ্ধ ছিল।

বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী-আল্লাহ্দের নিদর্শন থেকে বরকত লাভের প্রসঙ্গ

বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের নিদর্শন থেকে বরকত লাভ تبرک بآثار الصالحين। এটা দুই ভাবে হয়ে থাকে।

১. তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত বস্তু দ্বারা বরকত লাভ। এটাকে বলা হয় تبرک بالاشياء। যেমন নবী করীম (সাঃ)-এর চুল মুবারক, তাঁর জুব্বা মুবারক, ইত্যাদি। এমনিভাবে ওলী-আউলিয়াগণের এ জাতীয় কোন বস্তু।

২. তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ। এটাকে বলা হয় تبرک بالمكان। যেমন নবী করীম (সাঃ)-এর জন্মস্থান, তাঁর উপর প্রথম ওহী আগমন ও তাঁর সুদীর্ঘ ধ্যানমগ্ন থাকার স্থান হেরা গুহা, হাজার বার ওহী আগমনের স্থান খাদীজা (রাঃ)-এর গৃহ, হিজরতের সময় তাঁর আত্মগোপন থাকার স্থান গারে ছাওর, দারে আরকাম, আবূ বকর, ওমর প্রমুখ সাহাবীদের গৃহ ইত্যাদি।

প্রথম প্রকার অর্থাৎ, বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের স্মৃতি বিজড়িত বস্তু দ্বারা বরকত লাভ (تبرک بالاشياء)-এর বিষয়ে উম্মতের কারও কোন মতবিরোধ নেই। কেননা নবী করীম (সাঃ)-এর চুল মুবারক কাটার পর তা সাহাবাদের মধ্যে বন্টনের কথা এবং তাঁর উযূর পানি সাহাবাগণের গায়ে মাখানোর কথা সহীহ হাদীছের বর্ণনায় বিদ্যমান। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمكان)-এর বিষয়েও উম্মতের মাঝে অতীতে কোন মতবিরোধ ছিল না। সর্ব প্রথম ইব্নে তাইমিয়া ও তার শাগরেদ ইব্নে কাইয়্যেম এ বিষয়ে মতবিরোধের সূচনা করেন। তারপর সালাফিয়াগণ এ বিষয়টি প্রচারে তৎপর ভূমিকা রাখতে শুরু করে। বর্তমানের সৌদি কর্তৃপক্ষ অনুরূপ মতপোষণ ও প্রচার করছে। তাদের মতে নবী ও ওলী-আউলিয়াগণের স্মৃতি বিজড়িত বস্তু দ্বারা বরকত লাভের বিষয়টি সহীহ, তবে তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভের বিষয়টি সহীহ নয় বরং বিদ'আত।

বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمكان)-এ বিষয়টি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আমাদের জমহুরের পক্ষে কুরআন, হাদীছ, ইজমা' ও কিয়াস-এই সব প্রকার দলীল বিদ্যমান। এতসব দলীল থাকা সত্ত্বেও যারা এটাকে অস্বীকার করেন এবং নিজেদের মতে গো ধরেন, তাদেরকে শরী'আত প্রিয় বলা যেতে পারে না।

কুরআন থেকে দলীল ঃ

سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله . الاية -

অর্থাৎ, মহান ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমনে নিয়ে যান মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার আশ-পাশকে আমি বরকতময় করেছি। (সূরাঃ ১৭-বানী ইসরাঈলঃ ১)

ونجيناه ولوطا الى الارض التى باركنا فيها للعلمين -

অর্থাৎ, আর আমি লূতকে উদ্ধার করে এমন এলাকায় নিয়ে যাই, যাতে জগৎবাসীর জন্য আমি বরকত রেখেছি। (সূরাঃ ২১-আম্বিয়াঃ ৭১)

এই উভয় আয়াতে শাম ও বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকাকে রবকতময় এলাকা বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য-অত্র এলাকা বহু সংখ্যক নবী রাসূলের আগমনের এলাকা হওয়ার কারণেই সেটাকে বরকতময় এলাকা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এ আয়াতদ্বয়ই বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের স্মৃতি বিজড়িত স্থান বরকতময় হওয়ার দলীল। এর থেকে *تبرک بالمکان* এর নীতিটি সুপ্রমাণিত হয়।

হাদীছ থেকে দলীল ঃ

১. বোখারী শরীফের হাদীছে এসেছে ঃ

عن عتبان بن مالک انه اتى رسول الله ﷺ فقال قد انكر بصرى وانا اصلى لقومى فاذا كانت الامطار سال الوادى الذى بينى وبينهم لم استطع ان اتى مسجدهم فاصلى و وددت يا رسول الله انک تاتينى فتصلى فى بيتى فاتخذه مصلى قال فقال له رسول الله ﷺ سافعل ان شاء الله - قال عتبان فغدا رسول الله ﷺ وابو بكر حين ارتفع النهار ..... فصلى ركعتين . الحديث - (رواه البخارى فى باب المساجد فى البيوت)

অর্থাৎ, হযরত ইত্বান ইব্নে মালেক (রাঃ) একবার রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি খারাপ হয়ে গেছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের সাথে নামায পড়তাম। বৃষ্টি হলে সেখানে যাওয়ার পথ পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। যার ফলে আমি তাদের মসজিদে নামায পড়তে যেতে পারি না। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আন্তরিক কামনা-আপনি আমার গৃহে তাশরীফ এনে (এক জায়গায়) নামায পড়বেন, সেই স্থানকে আমি আমার নামাযের স্থান বানাব। রাসূল (সাঃ) বললেন অচিরেই আমি তা করব। হযরত ইত্বান ইব্নে মালেক (রাঃ) বলেনঃ পরের দিন সকাল বেলা আলো পরিষ্কার হতেই আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)কে সাথে নিয়ে রাসূল (সাঃ) আমার গৃহে তাশরীফ আনলেন এবং দুই রাকআত নামায আদায় করলেন ..... ।

এ রেওয়ায়েত থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় রাসূল (সাঃ)-এর নামায পড়া স্থানে নামায পড়ে বরকত লাভ করার জন্যই তিনি এমন আবেদন করেছিলেন এবং রাসূল (সাঃ)ও তা সমর্থন পূর্বক তাকে সেরূপ বরকত লাভ করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

২. বোখারী শরীফের হাদীছে আরও এসেছে ঃ

হযরত ইব্নে উমার (রাঃ) মক্কা মদীনার পথে সফরকালে রাসূল (সাঃ) যে সব স্থানে নামায পড়েছেন সেসব স্থান খুঁজে খুঁজে সেসব স্থানে নামায পড়তেন।[১] বলা বাহুল্য-বরকত লাভ করা ছাড়া এরূপ করার পিছনে ইব্নে উমার (রাঃ)-এর আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

৩. নাসায়ী শরীফের হাদীছে এসেছে ঃ

عن انس بن مالک ان رسول الله ﷺ قال اوتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعى جبرئيل عليه السلام فسرت فقال انزل فصل ففعلت فقال اتدرى اين صليت ؟ صليت بطيبة واليها المهاجر - ثم قال انزل فصل فصليت فقال اتدرى اين صليت ؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى عليه السلام - ثم قال انزل فصل فصليت فقال اتدرى اين صليت ؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام - ثم دخلت الى بيت المقدس ..... الحديث -

(رواه النسائى فى اول كتاب الصلوة)

এ হাদীছে মে'রাজের রাত্রে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পথে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক রাসূল (সাঃ)কে তূর পর্বতে আল্লাহ তা'আলা যেখানে মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন সেখানে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মস্থান বাইতে লাহামে (বেতেলহামে) বোরাক থেকে অবতরণ করিয়ে নামায পাঠ করানোর উল্লেখ এসেছে। এটা স্পষ্টতঃই এসব স্থানের বরকতের কারণ। অতএব এটা স্থানের বরকতময় হওয়ার (تبرک بالمکان)-এর স্পষ্ট দলীল।

মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেছেনঃ এ হাদীছটি নাসাঈ শরীফ ছাড়াও ১০ খানা হাদীছের কিতাবে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। তার মধ্যে রয়েছে বায্যার, ইব্নে আবী হাতিম, তাবরানী, বায়হাকী প্রভৃতি। আল্লামা সুয়ূতীর খাসায়েসে কুব্রা, ঝার্কানীর মাওয়াহেব প্রভৃতিতেও হাদীছটি উল্লেখিত হয়েছে।[১] এতদসত্ত্বেও ইব্নে কাইয়্যেম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে বলেছেন বেতেলহামে নেমে নামায পড়ার রেওয়ায়েত মোটেই সহীহ নয়। তিনি কি নাসাঈ শরীফের সনদকেও অনির্ভরযোগ্য বলতে চান যা উম্মতের কেউ বলেননি ?

১. البخارى . باب المساجد فى طريق مكة والمدينة ॥

বরং নাসাঈ শরীফের কোন কোন সনদকে সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে বোখারী শরীফ থেকেও উপরের স্বীকার করা হয়েছে।

ইজমা' থেকে দলীল ঃ

ইব্নে তাইমিয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা' তথা ঐক্যমত চলে আসছিল। অতঃপর তিনি এবং পরবর্তীতে তার শাগরেদ ইব্নে কাইয়্যেম এ বিষয়ে নতুন মতের সূচনা করেন। এভাবে এক দু'জনের বিরোধ উম্মতের ইজমা'কে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। তদুপরি তাদের মত কোন শক্তিশালী দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হচ্ছে।

কিয়াস থেকে দলীল ঃ

স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এর বিষয়কে বস্তু দ্বারা বরকত লাভ (تبرک بالاشیاء)-এর উপর কিয়াস করা হবে। বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের স্মৃতি বিজড়িত হওয়ার কারণে বস্তু যদি বরকতময় হতে পারে তাহলে তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত হওয়ার কারণে স্থান কেন বরকতময় হতে পারবে না ? তদুপরি শরীআতে স্থান বরকতময় হওয়ার নমুনাও রয়েছে। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশমীরী (রহঃ) বলেন[২] হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলো আম্বিয়া ও সুলাহাদের স্মৃতি বিজড়িত হওয়ার কারণেই সেগুলো আজমত ও মর্যাদার স্থান পেয়েছে। নতুবা এ স্থানগুলোর পবিত্রতা ও মর্যাদার আর কি কারণ থাকতে পারে? এটাকে স্থানের মর্যাদাপূর্ণ হওয়া ও স্থান থেকে বরকত লাভ করা ছাড়া আর কি বলা যায় ? এ কারণেই সমস্ত আকাবিরে উম্মত ফয়সালা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) যেহেতু সমগ্র মাখলূকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই তাঁর চির শায়িত থাকার পবিত্র স্থানটিও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান। অথচ ইব্নে তাইমিয়া (রহঃ) রাসূল (সাঃ)কে সমগ্র মাখলূকাতের শ্রেষ্ঠ স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর চির শায়িত থাকার স্থানটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হিসেবে স্বীকার করেননি। বরং তিনি সমূলে কোন স্থানের বরকতময় হওয়াকেই অস্বীকার করে বসেছেন। আর আফসূস সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণও এই মতবাদ পোষণ করে চলেছেন।

স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এর বিষয়কে অস্বীকারকারী সালাফীদের দলীল ও তার জওয়াব ঃ

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৪৪ হিজরীতে মক্কা মোআজ্জমায় বাদশাহ আব্দুল আযীয কর্তৃক আহুত মু'তামারে আলমে ইস্লামী-এর আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। সেই কনফারেন্সে উপস্থিত আমাদের উলামায়ে কেরাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহ্মদ ওছমানী প্রমুখ সালাফী ও নজ্দী উলামায়ে কেরামের সামনে সন্মেলনে এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে উপরোক্ত দলীল সমূহ তুলে ধরেন। তারা এসব দলীলের কোন উত্তর না দিয়ে শুধু তাবাকাতে ইব্নে সা'দ-এর একটা রেওয়ায়েত

২. ملفوظات محدث کشمیری ॥ ১. প্রাগুক্ত ॥

পেশ করেন। যে রেওয়ায়েতে আছে হযরত ওমর (রাঃ) বাইয়াতুর রেদওয়ান যে বৃক্ষের নীচে হয়েছিল সে বৃক্ষ কেটে ফেলেছিলেন। অথচ এ রেওয়ায়েতের অনেকগুলি জওয়াব রয়েছে। যথা ঃ

১. রেওয়ায়েতটি মুন্কাতি' (منقطع) কেননা এর সনদে হযরত নাফে' ইব্নে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন অথচ হযরত ইব্নে উমারের সাথে হযরত নাফে'-এর সাক্ষাৎ হয়নি।[১]

২. এটা মারফূ' (مرفوع) হাদীছের পর্যায়ভুক্ত নয়। মারফূ' হাদীছের মোকাবিলায় এটা দলীল হতে পারে না।

৩. হযরত ওমর (রাঃ) এ কারণে বৃক্ষটি কেটে দেননি যে, স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان) জায়েয নয় বরং তিনি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রোধ করার জন্য এটা করেছেন। স্বয়ং ইব্নে কাইয়্যেমও স্বীকার করেছেন যে, ওমর (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করা। (زاد المعاد جـ١/) হযরত ওমর (রাঃ)-এর উপরোক্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সমর্থন পাওয়া যায় এর থেকে যে, হযরত ওমর (রাঃ) স্বয়ং স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এর প্রবক্তা ছিলেন। তার প্রমাণ হল যখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলেন, তখন কা'বে আহ্বারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি কোথায় নামায পড়ব ? কা'বে আহ্বার বলেছিলেন বড় পাথর (صخرہ)-এর কাছে পড়ুন। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন ঃ না, আমিতো সেখানে পড়ব যেখানে নবী করীম (সাঃ) পড়েছিলেন।

৪. হযরত আনওয়ার শাহ কাশমীরী (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক বৃক্ষ কর্তনের মূল কারণ ছিল সে বৃক্ষ নির্দিষ্ট কোন্টি তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। এমনকি দুজন সাহাবীও সে ব্যাপারে একমত ছিলেন না। এমতাবস্থায় প্রশ্ন ছিল যে বৃক্ষটি বরকতময় নয় সেটিকে বরকতময় মনে করা হয়ে যায় কি-না। তাই তিনি সেখানকার বৃক্ষ কেটে ফেলেন। কারণ নির্দিষ্ট ঐতিহ্যবাহী পবিত্র স্থানকে যেমন মর্যাদা ও গুরুত্ব না দেয়া ঠিক নয়, তদ্রূপ অনির্দিষ্ট স্থানকেও ঐতিহ্যবাহী পবিত্র স্থানের মত মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করা ঠিক নয়।

অতএব হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক বৃক্ষ কর্তনের ঘটনার এতসব জওয়াব থাকা সত্ত্বেও যদি সালাফীগণ কর্তৃক উপরোক্ত আয়াত, হাদীছ ও কিয়াসকে বর্জন করে শুধু হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক বৃক্ষ কর্তনের দূর্বল ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হাদীছের (ঘটনার) ভিত্তিতে স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এর বিষয়কে অস্বীকার করার উপর হটকারিতা প্রদর্শন করা হয়। উপরন্তু স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এর প্রবক্তা জমহুর উম্মতের মাসলাককে বিদআত বা আরও আগে বেড়ে শির্ক পর্যন্ত বলা হয়, তাহলে তা হবে অবশ্যই বাড়াবাড়ি, সেটা কোনক্রমেই হক সন্ধানী মনোবৃত্তির পরিচায়ক হবে না।

১. كذا فى التهذيب ॥

রওযায়ে আতহার যিয়ারতে যাওয়ার নিয়ত প্রসঙ্গ

কেউ যখন মদীনা মুনাওয়ারা গমন করেন, তখন তিনি মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়তে নয় বরং রাসূল (সাঃ)-এর রওযায়ে আতহার যিয়ারতের নিয়তেই গমন করে থাকেন। এ বিষয়ে উম্মতের মধ্যে কোন মতবিরোধ ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি সালাফীগণ নতুন বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। তারা বলছেন কেউ যখন মদীনা মুনাওয়ারা গমন করবেন, তখন তিনি রাসূল (সাঃ)-এর রওযায়ে আতহার যিয়ারতের নিয়ত করবেন না বরং মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়তে গমন করবেন।

সর্ব প্রথম কাজী ইয়াজ মালিকী নিম্নোক্ত হাদীছের আলোকে বলেন যে, কোন কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা জায়েয নয়। হাদীছটি এই ঃ

لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى -

অর্থাৎ, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা-এই তিন মসজিদের উদ্দেশ্য ব্যতীত সফর করা যাবে না।

ইব্নে তাইমিয়া (রঃ) এ বিষয়ে আরও অতিরঞ্জন করেছেন এবং বলেছেন যে, নবী (সাঃ)-এর রওযায়ে আত্হার যিয়ারতের উদ্দেশ্যেও সফর করা জায়েয নয়। তিনি বলেন মসজিদে নববীর যিয়ারতের নিয়তে সফর করবে, তারপর আনুষঙ্গিকভাবে রওযায়ে আত্হারেরও যিয়ারত করে নিবে। অথচ চিন্তা করার বিষয় হল - তাহলে হাজীগণ মক্কার মসজিদে হারামের এক লক্ষ্যগুণ ছওয়াব ছেড়ে মসজিদে নববীর এক হাজার (অন্য বর্ণনা মতে পঞ্চাশ হাজারগুণ ছওয়াব)-এর জন্য কেন মদীনা গমন করবেন? ইব্নে তাইমিয়া (রহঃ) বলতে চান হাদীছের অর্থ হল-মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা -এই তিন মসজিদ ব্যতীত 'অন্য কোন কিছুর উদ্দেশ্যে' সফর করা যাবে না। কিন্তু জমহুর উম্মত ইব্নে তাইমিয়া (রহঃ)-এর এই অভিমতকে গ্রহণ করেননি। বরং তার তারদীদ (খণ্ডন) করেছেন, এমনকি আল্লামা তাকিউদ্দীন সুবকী (রহঃ) তাঁর বক্তব্যের খণ্ডনে شفاء السقام নামক একখানা বিশদ গ্রন্থও রচনা করেছেন।

জমহুর এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এখানে বলা হয়েছে - মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা-এই তিন মসজিদ ব্যতীত 'অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে' সফর করা যাবে না। কেননা অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করার মধ্যে কোন অতিরিক্ত ফায়দা নেই। তবে হ্যাঁ এই তিন মসজিদের ছওয়াব বেশী থাকায় এই তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করার মধ্যে অতিরিক্ত ফায়দা অর্জনের দিক রয়েছে। ইব্নে তাইমিয়া যে অর্থ করেছেন যে, এই তিন মসজিদ ব্যতীত 'অন্য কোন কিছুর উদ্দেশ্যে' সফর করা যাবে না। এ অর্থ গ্রহণ করা হলে ইল্ম তলব করার উদ্দেশ্যে সফর, জিহাদের উদ্দেশ্যে সফর, কোন আলেমের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর - এগুলি সব নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অথচ তা নিষিদ্ধ নয়। সারকথা এখানে উহ্য مستثنى منه টি الى شئ নয় বরং الى مسجد । এ বক্তব্যের অনুকূলে পাওয়া যায় মুসনাদে আহমদের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত ঃ

لا ينبغى للمطى ان يشد رحاله الى مسجد يبتغى فيه الصلوة غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدى هذا -

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার মসজিদ (মসজিদে নববী) ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে নামায পাঠের উদ্দেশ্যে সফর করা কোন মুসাফিরের জন্য সংগত নয়।

আল্লামা আইনী عمده القارى গ্রন্থে (جـ৩/) এবং হাফিজ ইব্নে হাজার আসকালানী فتح البارى গ্রন্থে (جـ৩/) এই হাদীছ দ্বারা জমহুরের মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ (استدلال) করেছেন। এ হাদীছের বর্ণনাকারীদের মধ্যে শাহ্র ইব্নে হাওশাব রয়েছেন, যার সম্পর্কে কিছুটা দূর্বলতার অভিযোগ রয়েছে। তবে আল্লামা আইনী তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وشهر بن حوشب وثقه جماعة من الائمة -

অর্থাৎ, ইমামদের এক জামা'আত শাহ্র ইব্নে হাওশাবকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। ইব্নে হাজার তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وشهر حسن الحديث وان كان فيه بعض الضعف -

অর্থাৎ, শাহ্র ইব্নে হাওশাব-এর মধ্যে কিছুটা দূর্বলতা থাকলেও তিনি حسن পর্যায়ের রাবী।

জমহুরের মাসলাকের পক্ষে আরও দলীল হল নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত ঃ

عن ابى الدرداءؓ قال : ان بلالا رأى فى منامه رسول الله ﷺ وهو يقول له ما هذه الجفوة يا بلال؟ اما آن لک ان تزورنى يا بلال ؟ فانتبه حزينا وجلا خائفا فركب راحلته وقصد المدينة فاتى قبر النبى ﷺ فجعل يبكى عنده ويمرغ وجهه . الحديث - (آثار السنن للنيموى صفحـ٢٧٩/. وقال رواه ابن عساكر، وقال التقى السبكى اسناده جيد)

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- হযরত বেলাল (রাঃ) রাসূল (সাঃ)কে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি বেলালকে বলছেন ঃ হে বেলাল এ কি অবিচার! বেলাল ! এখনওকি সময় হয়নি যে, তুমি আমার যিয়ারতে আসবে ? অতঃপর বেলাল (রাঃ) চিন্তিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হলেন। তিনি সওয়ারী নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। অবশেষে নবী (সাঃ)-এর কবরে এসে রোদন করতে থাকলেন এবং চেহারায় ধূলি মারতে লাগলেন ..... ।

এখানে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বেলাল (রাঃ)-এর সফর ছিল রাসূল (সাঃ)-এর তথা রাসূল (সাঃ)-এর রওযায়ে আত্হার যিয়ারত করার।

এ ছাড়া নিম্নোক্ত হাদীছসমূহও জমহুরের মতের স্বপক্ষে দলীল। যদিও এ হাদীছগুলি ضعيف তবে এ হাদীছগুলিতে যিয়ারতের নেছবত রাসূল (সাঃ)-এর দিকে করা থেকে

অন্ততঃ এগুলো দ্বারা এতটুকু استدلال অবশ্যই করা যায় যে, যিয়ারতের নিয়ত একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। হাদীছগুলি এই ঃ

من زار قبری وجبت له شفاعتی -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে গেল।

من حج ولم یزرنی فقد جفانی -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হজ্জ করল আর আমার যিয়ারত করল না, সে আমার প্রতি যুলুম করল।

من زار قبری او قال زارنی کنت له شفیعا او شهیدا الخ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল, (অথবা যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করল), আমি তার জন্য সুফারিশকারী হব।

শেষোক্ত হাদীছটি ইব্নে হাজার আছকালানী (রহঃ) আবূ দাউদ তায়ালিছী-র বরাতে المطالب العالیة গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার তাহ্কীক করতে গিয়ে মুহাদ্দিছে কাবীর হাবীবুর রহমান আজমী সাহেব বলেছেন ঃ

وله شاهد عند ابی یعلی والطبرانی بسند صحیح -

অর্থাৎ, মুসনাদে আবী ইয়া'লা ও তাবরানী গ্রন্থে সহীহ সনদে এ হাদীছের অর্থের অনুকূলে বর্ণনা (شاهد) পাওয়া যায়। (যা এ হাদীছকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।)

ন্যাচারিয়া দল

(স্যার সৈয়দ আহমাদ ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ)

ফিরকার নাম ঃ

এ দলের নাম "ফিরকায়ে ন্যাচারিয়া" বা প্রকৃতি পূজারী দল। এখানে "ফিরকায়ে ন্যাচারিয়া" বলে "ফিরকায়ে দাহ্রিয়াহ" বা নাস্তিকদেরকে বোঝানো হয়নি, যাদের ধ্যান-ধারণা ও আকীদা এই যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে এবং যা কিছু হয় তা সবই প্রাকৃতিক ভাবেই আপনা আপনি হয়, এর পিছনে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দখল নেই এবং এ দৃশ্যমান জগতের কোন স্রষ্টা নেই, বরং প্রাকৃতিক ভাবেই এ জগত সংসার তৈরী হয়েছে ও চলছে।

এখানে "ফিরকায়ে ন্যাচারিয়া" দ্বারা বোঝানো হয়েছে ঐ দলকে, যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করে শরী'আতের প্রতিটি হুকুম আহকামকে গ্রহণ করা বা বর্জন করার ব্যাপারে নিজেদের সীমিত মেধা ও খোড়া যুক্তিকে মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করেছে এবং পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতিকে সত্য-অসত্য ও ভাল-মন্দ বিচারের কষ্টিপাথর বানিয়েছে। অর্থাৎ শরী'আতের যে সমস্ত বিধানাবলী তাদের সীমিত বুদ্ধি-বিবেক ও খোড়া যুক্তিসম্মত হয়, সেগুলোকে তারা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য বলে

মেনে নেয়। অন্যথায় সেগুলোকে তারা মিথ্যা, অকার্যকর ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। এমনিভাবে ইসলামী শরী'আতের যে সমস্ত বিষয়াদি ইউরোপীয় সভ্যতার পরিপন্থী বা বিরোধী ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর নিকট অপছন্দনীয় বা মনোপুত নয় সেগুলোও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত নয়। যদিও বা কুরআন- হাদীছ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়।

ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা ঃ

এ ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন সাইয়্যেদ আহ্মদ ইব্নে মুত্তাকী কাশ্মীরী (ছুম্মা আলীগড়ি) [মৃ. ১৩১৫ হিঃ]। তিনি স্যার সৈয়দ আহমাদ খান নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মূলতঃ কাশ্মিরী বংশোদ্ভূত। এক সময় তিনি ভারতের রাজধানী দিল্লীতে বসবাস করতেন বিধায় তাকে সাইয়্যেদ আহ্মদ দেহ্লবীও বলা হয়।

প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ঃ

এই উম্মতের মাঝে আল্লাহ তা'আলার নীতি চালু রয়েছে যে, প্রতি শতাব্দীতে একজন ধর্মীয় সংস্কারক (মুজাদ্দিদে মিল্লাত) আগমন করবেন, যিনি ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার, সামাজিক রুছূম-প্রথাকে মূলোৎপাটন করে তদস্থলে ধর্মীয় বিধান প্রতিষ্ঠা করবেন। এই নীতির আওতায় এই উম্মতের মাঝে সর্ব প্রথম মুজাদ্দিদ হিসেবে হিজরী প্রথম শতাব্দীতে আগমন ঘটে হযরত ওমর ইব্নে আব্দুল আযীয (রঃ)-এর এবং হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে আগমন ঘটে হযরত ইমাম শাফেঈ (রঃ)-এর। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন করে মুজাদ্দিদ এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও ধারাবাহিক ভাবে আসতে থাকবেন।

ঠিক এর বিপরীত ধারাও চালু রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক শতাব্দীতে এমন একজন বিখ্যাত যালেম-ফাসেক ব্যক্তির আগমন ঘটবে যে দ্বীনের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। এ ধারার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে হিজরী প্রথম শতাব্দীতে আগমন ঘটে জগদ্বিখ্যাত যালেম শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ-এর। যার যুলুম-নির্যাতনের কাহিনী সকলেরই জানা আছে

হিজরী দ্বিতীয় শতকে আগমন ঘটে বাদশাহ মামুনুর রশীদের। তিনি আলেমদের উপর এমন অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন যা শোনামাত্রই গা শিউরে ওঠে। এই বিপরীত ধারারই একজন স্যার সৈয়দ আহমদ। যিনি বিগত হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে পাক ভারত উপমহাদেশে ফিরকায়ে ন্যাচারিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এবং তার অনুসারীবৃন্দ সমস্ত উলামায়ে কেরামের সুচিন্তিত মতামত ও সিদ্ধান্তকে ভুল হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। শরীআতের মৌলিক ও আনুষঙ্গিক (اصول وفروع) নীতিমালাকে দুমড়ে মুচড়ে নিশ্চিহ্ন করতে শুরু করলেন এবং ইসলামী শরী'আতের নির্ভেজাল হুকুম আহকামকে মিথ্যা ও মনগড়া ব্যাখ্যার সাথে সংমিশ্রন ঘটিয়ে ইসলামের আসল রূপকে বিকৃত করে দিতে লাগলেন। সর্বোপরি কুরআন ও হাদীছ বিশারদ মুফাসসিরীন ও মুহাদ্দিছীনে কেরামের সরাসরি

অযৌক্তিক সমালোচনা শুরু করে দিলেন। আর এ জাতীয় জঘন্য কাজকেই তাঁরা ভাল কাজ মনে করতে লাগলেন।

নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত সূত্র মতে এই ফিরকার আত্মপ্রকাশের ইতিহাস এরূপ। এই ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমাদ মূলতঃ কাশ্মীরী বংশোদ্ভূত। তিনি এমন এক সময়ে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে বসবাস শুরু করলেন যখন দিল্লীতে আহলে হাদীছের প্রভাব ছিল। তাদের সঙ্গ পেয়ে তিনিও মুজতাহিদ বনে গেলেন। ধর্মীয় বিষয়ে নিজেই মতামত পেশ করতে লাগলেন।

এরই মাঝে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানরা বিদ্রোহ করে বসল। তখন স্যার সৈয়দ আহমদ ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বিজনৌর জেলায় ইংরেজদের অধীনে কর্মরত ছিলেন। কিছু দিন পর বিদ্রোহের দাবানল স্তিমিত হয়ে পড়ল ও ইংরেজ শাসকরা মুসলমানদের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়ল। স্যার সৈয়দ আহমদ এটাকে ইংরেজদের আস্থাভাজন হওয়ার মোক্ষম সুযোগ মনে করে তাদেরকে খুশী করার মানসে একটি গ্রন্থ লিখলেন। যার মাঝে বিদ্রোহ দমনের কিছু প্রস্তাব, শাসকদের প্রতি জনগণের আনুগত্য ও বিদ্রোহীদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করার কথাসহ ইংরেজদের খুশি করার বহু কথা লিখলেন। এই গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তাঁর প্রতি ইংরেজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন। ইংরেজরা তার সেই গ্রন্থ থেকে কিছু প্রস্তাব বাস্তবায়ন করে তার যথার্থ মূল্যায়ন করল। এতে তার আসন পাকাপোক্ত হল এবং মর্যাদাও বৃদ্ধি পেল।

এরপর তিনি ইংরেজদের খুশি করার জন্য মুসলমানদেরকে ইংরেজদের আনুগত্য করায় উৎসাহ দিতে লাগলেন এবং মুসলমানদের চোখে ইংরেজদের যে সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক দোষত্রুটি ধরা পড়ছিল, সেগুলোর সাফাই গাইতে শুরু করলেন। তিনি বাইবেলের অনুবাদ করে প্রচার করলেন। কুরআনের মাঝে তথাকথিত সংশোধন শুরু করে দিলেন। তাঁর এ সমস্ত কাজের কুফল এই দাঁড়াল যে, মুসলমানদের ঈমান-আকীদা দূর্বল হয়ে পড়ল। তারা ইংরেজদের ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতির দিকে ঝুকে পড়ল। বহু মুসলমান সঠিক আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হতে লাগল। স্যার সৈয়দ আহমদের এ সমস্ত পদক্ষেপের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের খুশি করা।

কিন্তু! আল্লাহর রাসূলের বাণীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত না হয়ে পারে না। من تشبه بقوم فهو منهم -অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যে জাতির (দলের) সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে সেই জাতির (দলের) অন্তর্ভুক্ত বলে গন্য বে। স্যার সৈয়দ আহমদের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি ধীরে ধীরে ইংরেজদের রং গ্রহণ করতে শুরু করলেন এবং এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ বিপথগামী হয়ে গেলেন।

হাদীছের বাণী তাঁর বেলায় এভাবে সত্য প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছেলেকে ব্যারিষ্টার বানানোর মানসে ইংরেজ মূলুকে (লন্ডন) পাঠান। এই সুবাদে তারও লন্ডন যাওয়ার সুযোগ হল। লন্ডনে পূর্ব হতেই বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের হাওয়া জোরেসোরে বইছিল। সেখানকার

ইংরেজদের সাথে কিছুদিন মেলামেশার দরুন তাঁর স্বাধীন ও মুক্ত বুদ্ধির এতটা উন্নতি সাধিত হল যে, তিনি ধর্মীয় প্রভাব ও বাধ্যবাধকতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ফিরকায়ে ন্যাচারিয়ার দাওয়াত প্রকাশ্যভাবে দিতে শুরু করলেন। তিনি নিজস্ব উদ্ভট ও বাতিল ধ্যান-ধারণা এবং ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-এতদুভয়ের সমন্বয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করলেন যার নাম দিলেন-"علوم واقعيه وتحقيقات نفس الامارية وتهذيب الاخلاق" সংক্ষেপে "তাহযীবে আখলাক"। এ গ্রন্থকেই ফিরকায়ে ন্যাচারিয়ার আকীদা-বিশ্বাসের মুখপত্র সাব্যস্ত করলেন এবং শরী'আতের বিধান সমূহ গ্রহণ করা বা না করার মাপকাঠি হিসেবে এই গ্রন্থকে নির্ধারণ করলেন। শরী'আতের কোন বিধান এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী সঠিক প্রমাণিত হলে তা গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিতেন, অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যান করতেন। মোটকথা তিনি কুরআন, হাদীছ, ইজমা, কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত শরী'আতের হুকুম আহকামকে স্বীয় বল্গাহীন চিন্তা-চেতনা, ও ইউরোপীয় সভ্যতার নিরিখে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। কোথাও এর ব্যতিক্রম হলে সেটাকে মিথ্যা, বানোয়াট, অমূলক ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। দূর্বল আকীদার মুসলমান তার উদ্ভাবিত মতাদর্শ ও ধ্যান-ধারণাকে মনে প্রাণে মেনে নিয়ে তার ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে পড়ল এবং ধীরে ধীরে তাদের একটা বৃহৎ দল দাঁড় হয়ে গেল।

নিম্নে এই ফিরকার কিছু মৌলিক ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস তাদের লিখিত গ্রন্থ ও বক্তব্যের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হল। সাথে সাথে তার খন্ডনও পেশ করা হল।

ফিরকায়ে ন্যাচারিয়ার মৌলিক ধ্যান-ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস ও তার খন্ডন ঃ

১. ফেরেশতা ও শয়তান এবং জান্নাতের বৃক্ষকে অস্বীকার !

খন্ডন ঃ

সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে এ সবের অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

(১) واذقلنا للملئكة اسجدو الادم فسجدوا .. الاية - (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ৩৪)

(২) ولا تقربا هذه الشجرة - (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ৩৫)

২. কবর আযাবকে অস্বীকার !

খন্ডন ঃ

কুরআন ও অসংখ্য হাদীছ দ্বারা কবরের আযাব প্রমাণিত। যেমন ঃ

(১) النار يعرضون عليها غدوا وعشيا - (সূরাঃ ৪০-মু'মিনঃ ৪৬)

(২) اذا قبر الميت اتاه ملكان .... الخ (مسلم)

৩. পৃথিবীর মানচিত্রে জান্নাতের অবস্থান না থাকার অজুহাতে জান্নাতকে অস্বীকার !

খন্ডন ঃ

জান্নাতের অস্তিত্বের কথা কুরআনের বহু আয়াতে আলোচিত হয়েছে। যথাঃ

(১) وجنة عرضها السموت والارض اعدت للمتقين- (সূরাঃ ৩-আলু-ইমরানঃ ১৩৩)

৪. কিয়ামত সংঘটিত হওয়া ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার!

খণ্ডন ঃ

এ দুটো বিষয়ও সরাসরি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত !

(১) ان الساعة لاتية لاريب فيها - (সুরাঃ ৪০-মু'মিনঃ ৫৯)

(২) ثم انكم يوم القيمة تبعثون - (সূরাঃ ২৩-মু'মিনঃ ১৬)

৫. জান্নাতের হুর ও গিলমানকে অস্বীকার !

খণ্ডন ঃ

এ দুটো বিষয়ও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সত্য !

(১) حورمقصورت فى الخيام - (সূরাঃ ৫৫-আর-রাহমানঃ ৭২)

(২) يطو فون عليهم ولدان مخلدون - (সূরাঃ ৭৬-দাহ্‌রঃ ১৯)

৬. তাকদীরকে অস্বীকার !

খণ্ডন ঃ

এটাও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সত্য বিষয় !

(১) وما تشاء ون الا ان يشاء الله رب العلمين - (সূরাঃ ৮১-তাক্‌বীরঃ ২৯)

৭. আম্বিয়ায়ে কিরামের মু'জিযা ও আওলিয়ায়ে কেরামের কারামতকে অস্বীকার !

খণ্ডন ঃ

এ দুটো বিষয়ও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সত্য বিষয় !

(১) ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات - (সূরাঃ ৫৭-হাদীদঃ ২৫)

(২) انى لک هذا قالت هو من عند الله - (সূরাঃ ৩-আলু-ইমরানঃ ৩৭)

৮. পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থে (ইঞ্জীল ও তাওরাত) অর্থগত পরিবর্তন হয়েছে। কোন শব্দগত পরিবর্তন হয়নি !

খণ্ডন ঃ

এ কথা কুরআন হাদীছ বিরোধী। কুরআন দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থগুলোতে শব্দগত পরিবর্তনও হয়েছে। যথা ঃ

(১) يحرفون الكلم عن مواضعه - (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ১৩)

(২) يلوون السنتهم بالكتب لتحسبوه من الكتب - (সূরাঃ ৩-আলু-ইমরানঃ ৭৮)

(৩) يكتبون الكتب بايديهم ثم يقولون هذا من عندالله ...(সূরাঃ ২বাকারাঃ ৭৯)

৯. ইসলামে দাস প্রথা বলতে কোন কিছু নেই।

খণ্ডন ঃ

অসংখ্য আয়াত ও হাদীছ দ্বারাও এ বিষয়টি প্রমাণিত। যথা-

(১) وانكحوالايامى منكم والصالحين من عبادكم واماء كم (সূরাঃ ২৪-নূরঃ ৩২)

১০. আসমান সমূহের কোন অস্তিত্ব নেই !

খণ্ডন ঃ

এ বিষয়টিও সরাসরি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত! যথা

(১) وبنينا فوقكم سبعا شدادا- (সূরাঃ ৭৮-নাবাঃ ১২)

(২) االنتم اشد خلقا ام السماء بناها - (সুরাঃ ৭৯-নাযি'আতঃ ২৭)

১১. "ইজমায়ে উম্মত" কোন শরঈ দলীল নয়।

খণ্ডন ঃ

"ইজমায়ে উম্মত" শরঈ দলীল হওয়াও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। যথা ঃ

(১) ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ..(সূরাঃ ৪-নিসাঃ ১১৫)

১২. কুরআনের কোন হুকুম রহিত (نسخ) হয়নি।

খণ্ডন ঃ

এ ধারণা-বিশ্বাসও সরাসরি কুরআন বিরোধী। কুরআন দ্বারা نسخ সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যথা ঃ

(১) واذا بدلنا اية مكان اية - (সূরাঃ ১৬-নাহ্‌লঃ ১১১)

(২) ما ننسخ من اية اوننسها. الخ - (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১০৬)

১৩. প্রাণীর ছবি আকা জায়েয।

খণ্ডন ঃ

প্রাণীর ছবি আকা হারাম হওয়ার বিষয়টি অসংখ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত! যথা ঃ

(১) اشدالناس عذا با عند الله المصورون- (متفق عليه)

(২) لايدخل الملئكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير- (متفق عليه)

(৩) قال ابن عباسؓ فان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه -

১৪. মদ পান করা ও শুকরের গোশত খাওয়া হালাল।

খণ্ডন ঃ

মদ ও শুকর হারাম হওয়া কুরআনী আয়াত দ্বারা প্রমাণিত! যথা

(১) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير - (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ৩)

(২) انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان .... (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ৯০)

১৫. ঢালাওভাবে সহীহ হাদীছকে অস্বীকার করা।

খণ্ডন ঃ

যদি কোন হাদীছ সহীহ না হত, তাহলে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের কি অর্থ ?

وما اتاكم الرسول فخذوه - (সূরাঃ ৫৯-হাশ্‌রঃ ৭)

১৬. আবরাহা বাদশাহর হস্তি বাহিনীকে প্রস্তরাঘাতে ধ্বংস করাকে অস্বীকার করা।

খণ্ডন ঃ

এ ঘটনাটিও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সত্য। যথা ঃ

(১) ترميهم بحجارة من سجيل -(সূরাঃ ১০৫-ফীলঃ ৪)

১৭. জিন জাতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা।

খণ্ডন ঃ

জিন জাতির অস্তিত্বও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সত্য। যথা ঃ

(১) والجان خلقنه من قبل من نار السموم - (সূরাঃ ১৫-হিজ্‌রঃ ২৭)

১৮. হযরত ঈসা (আঃ)কে স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেয়াকে অস্বীকার করা এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে বিশ্বাস করা।

খণ্ডন ঃ

তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া এবং তাঁর জীবিত থাকা - উভয়টা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। যথা ঃ

(১) وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه - (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ১৫৭-১৫৮)

(২) اذ قال الله يعيسى انى متوفيك ورافعك الى .. (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ৫৫)

১৯. হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিনা বাপে জন্ম হওয়াকে অস্বীকার করা।

খণ্ডন ঃ

তাঁর বিনা বাপে জন্ম লাভের বিষয়টিও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সত্য। যথাঃ

(১) ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم .... (সূরাঃ ৩-আলু-ইমরানঃ ৫৯)

(২) لم يمسسنى بشر ولم اك بغيا - قال كذالك قال ربك هو على هين ... (সূরাঃ ১৯-মারয়ামঃ ২০-২১)

২০. নামাযের ভিতর উর্দূ ও অন্যান্য ভাষায় কুরআন পড়া উত্তম।

খণ্ডন ঃ

আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় কুরআনের তরজমা পাঠ করলে নামাযই হবে না। কারণ নামাযের মাঝে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর কুরআন বলা হয় শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টিকে। অবশ্য শব্দের মাঝে অর্থ আপনা-আপনিই পাওয়া যায় কিন্তু অর্থের মাঝে শব্দ পাওয়া যায় না। অতএব অন্য ভাষায় কুরআন পাঠ করলে নামায হবে না।

আরবীতেই পাঠ করতে হবে। এটাও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। যথাঃ

(১) فاقرؤا ما تيسر من القران - (সূরাঃ ৭৩-মুয্‌যাম্মিলঃ ২০)

(২) انا انزلنه قرانا عربيا - (সূরাঃ ১২-ইউসুফঃ ২)

(৩) لسان الذين يلحدون اليه اعجمى وهذا لسان عربى مبين - (সূরাঃ ১৬-নাহ্‌লঃ ১০৩)

২১. কাফেরদের সাদৃশ্য (تشبه بالكفار) অবলম্বন করা জায়েয।

খণ্ডন ঃ

অসংখ্য হাদীছ দ্বারা কাফেরদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা নাজায়েয প্রমাণিত হয়েছে। যেমন ঃ

(১) من تشبه بقوم فهو منهم - (ابو داؤد)

(২) ان هذه من ثياب الكفار فلا يلبسها -

(৩) ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم -

অর্থাৎ, (১) যে বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে। (২) এটা কাফেরদের পোষাক, অতএব এটা যেন পরিধান না করে। (৩) ইয়াহুদ ও নাসারাগণ রং করে না, অতএব তাদের বিরোধিতা কর।

একটি ঘটনা - হযরত কাসেম নানুতূবী (রহঃ) ফিরকায়ে ন্যাচারিয়ার জনৈক অনুসারীকে বললেন তুমি তোমার স্ত্রীর কাপড় পরিধান করে এ মজলিসে এসে বস। হযরতের কথা শুনে সে ব্যক্তি হতবাক হয়ে গেল। তখন হযরত বললেন ঃ আমার কাছে তোমাদের এ বিষয়টি অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক মনে হয় - তোমাদের কাছে একজন মু'মিন নারীর লেবাস পরিধান করা লজ্জার বিষয় ও অবৈধ, অথচ কাফেরদের লেবাস পরিধান করা গৌরবের ও বৈধ!

২২. যে ব্যক্তি হুজুর (সাঃ)-এর বক্ষবিদারণের ঘটনাকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলবে সে সঠিক মুসলমান।

খণ্ডন ঃ

বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী (রহঃ) প্রমূখ মুহাদ্দিছসহ বহু মুহাদ্দিছ বর্ণনা করেছেন।

২৩. রাসূল (সাঃ)-এর মে'রাজ স্বপ্নযোগে ঘুমন্ত অবস্থায় হয়েছিল। স্ব-শরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় হয়নি।

খণ্ডন ঃ

রাসূল (সাঃ)-এর মে'রাজ স্বশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল। এটা মশহুর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সত্য ও সঠিক। এর অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ।

২৪. একজনের নেক আমলের ছওয়াব অন্য কোন ব্যক্তি পায় না।

খণ্ডন ঃ

হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, একজনের নেক আমলের ছওয়াব অন্যজন পায়। যেমনঃ

(١) عن سعد بن عبادة قال يا رسول الله ان ام سعد ماتت فاى الصدقة افضل؟ قال: الماء - فحفر بئراو قال هذه لام سعد - (ابوداؤد)

অর্থাৎ, সা'দ ইব্নে উবাদাহ থেকে বর্ণিত - তিনি বলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! উম্মে সা'দ মৃত্যুবরণ করেছে, (তার জন্য) কোন্ সদকা উত্তম ? তিনি বললেন ঃ পানি। সেমতে তিনি একটা কূঁয়া খনন করে বললেন এটা উম্মে সা'দের জন্য।

তাদের মৌলিক কিছু ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে কয়েকটা তুলে ধরা হল। এ ছাড়াও তাদের আরো বহু বাতিল ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা রয়েছে। যা তাদের লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করলে জানা যাবে!

এই ফিরকা সম্বন্ধে উলামাদের ফতওয়া ও সিদ্ধান্তঃ

এ সম্পর্কিত ফতওয়া বোঝার পূর্বে স্যার সৈয়দ আহমাদের চিন্তাধারা ও মতবাদে মৌলিকভাবে কি কি দোষ পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে বুঝে নেয়া সংগত। স্যার সৈয়দ আহমদের চিন্তাধারা ও মতবাদে নিম্নোক্ত বিষয় পাওয়া যায় ঃ

১. কুরআন দ্বারা স্বীকৃত বিষয়কে অস্বীকার করা বা কুরআনের মাঝে অস্বীকৃত বিষয়কে স্বীকার করা।

২. কুরআনে বর্ণিত বিষয়ে সংশয় সন্দেহ পোষণ করে এমন কথা বলা বা এমন উক্তি করা যার দ্বারা আল্লাহ অথবা রাসূলকে অস্বীকার করা বুঝায় অথবা রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা বুঝায়।

৩. শরী'আতের সুস্পষ্ট বিধান সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্রূপ করা।

৪. জরূরিয়াতে দ্বীনকে অস্বীকার করা।

৫. উম্মতের ইজমাকে অস্বীকার করা।

৬. বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য গড়ে তোলা।

এখন আমরা নিম্নের কয়েকটি ফতওয়ার এবারত লক্ষ্য করিঃ

(১) كتاب الاعلام بقواطع الاسلام গ্রন্থে আছে ঃ

من كذب بشئ مما صرح به فى القران من حكم اوخبر او اثبت ما نفاه او نفى ما اثبته على علم منه بذالك اوشك فى شئ من ذالك كفر-

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে কুরআনে বর্ণিত সুস্পষ্ট কোন বিধান বা খবরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথবা কুরআন দ্বারা স্বীকৃত বিষয়কে অস্বীকার বা কুরআনের মাঝে অস্বীকৃত বিষয়কে স্বীকার করে কিংবা এ বিষয়ে সংশয় সন্দেহ পোষণ করে, নিঃসন্দেহে সে কাফের হয়ে যায়।

(২) حجة الله البالغه গ্রন্থে আছে ঃ

وتثبت الردة بقول يدل على نفى الصانع او الرسل او تكذيب رسول او فعل تعمد به استهزاء صريحا بالدين وكذا انكار ضروريات الدين -

অর্থাৎ, এমন কথা বলা বা উক্তি করা যার দ্বারা আল্লাহ অথবা রাসূলকে অস্বীকার করা বুঝায় অথবা রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা বুঝায়, অথবা শরী'আতের সুস্পষ্ট বিধান সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্রূপ করা, এমনিভাবে শরীআতের জরূরী বিষয়াদীকে অস্বীকার করা, এ সবের দরুন সে ব্যক্তি মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাবে।

(৩) فتاوى ظهيريه গ্রন্থে আছে ঃ

ان الاخبار المروية من رسول الله ﷺ على ثلث متواتر ، فمن انكره كفر ومشهور، فمن انكره كفر الا عند عيسى بن ابان فانه يضلل ولا يكفر، وخبرالواحد، فلا يكفر جاحده غير انه يأثم بترك القبول ومن سمع حديثا فقال سمعناه كثيرا بطريق الا ستخفاف كفر -

অর্থাৎ, রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ তিন প্রকার -

(এক) মুতাওয়াতির ঃ এ প্রকার হাদীছকে অস্বীকার কারী কাফের হয়ে যাবে।

(দুই) মাশহুর ঃ অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে এ প্রকার হাদীছ অস্বীকার কারীও কাফের হয়ে যাবে। তবে হযরত ঈসা ইবনে আবান (রহঃ) তাকে কাফের বলেন না বরং তাকে গোমরাহ বলেন। এ মতটাই বিশুদ্ধ।

(তিন) খবরে ওয়াহেদ ঃ এ প্রকার হাদীছকে অস্বীকার কারী কাফের হবে না বটে, তবে হাদীছকে গ্রহণ না করার অপরাধে সে অবশ্যই গোনাহগার হবে। আর যে ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর কোন হাদীছ শোনার পর তাচ্ছিল্যভরে বলবে যে, আমি অনেক শুনেছি সেও কাফের হয়ে যাবে।

(৪) আল্লামা ইব্নে হুমাম (রহঃ) বলেন ঃ

انكار حكم الاجماع القطعى يكفر عند الحنفية وطائفة -

অর্থাৎ, হানাফী মতাবলম্বীদের নিটক অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইজ্মার হুকুমকে অস্বীকার কারী কাফের।

(৫) আল্লামা সুবকী (রহঃ) তার جمع الجوامع গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر مطلقا -

অর্থাৎ, জরূরিয়াতে দ্বীন[১] যার উপর সকলের ইজমা হয়েছে, তার অস্বীকারকারী এক বাক্যে কাফের।

উপরের মতামত সমূহ দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, স্যার সৈয়দ আহমদ ও তার অনুসারীদের কিছু আকীদা কুফ্রী এবং কিছু বিদআত বা ভ্রান্ত আকীদা।

অবশ্য তাদের ব্যাপারে কারও সংশয় দেখা দিতে পারে এ কারণে যে, কুরআন হাদীছের যে সব ভাষ্য অস্বীকার পূর্বক যে ধ্যান-ধারণা তারা পোষণ করেছে তা শরঈ

১. জরূরিয়াতে দ্বীন একটি পরিভাষা। এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ১৯৪ পৃষ্ঠা ॥

বিধানের মাঝে তাবীল বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে করেছে, আর কুরআন হাদীছের কোন ভাষ্যের অস্বীকৃতি যদি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়, তাহলে তাকে কুফরী বলা যায় না। নিদেন পক্ষে সেটাকে মুজতাহিদ ব্যক্তির ইজতিহাদী ভুল বলে গণ্য করা যেতে পারে।

এ ধরনের সংশয় পোষণ করা ঠিক হবে না এ কারণে যে, প্রথমতঃ তাদের অনেকেই কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই বেধড়ক কুরআন-হাদীছের ভাষ্যকে অস্বীকার পূর্বক মনগড়া মতামত ব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয়তঃ তাদের মধ্যে যারা শরঈ হুকুমের মাঝে ব্যাখ্যা মূলক মতামত (تاويل) দিয়েছে তাও আবার (تاويل)-এর নিয়ম নীতি অনুসরণ করে দেয়নি। সুতরাং তারা যে ব্যাখ্যা (تاويل)-এর আলোকে নিজেদের ধ্যান-ধারণা পোষণ করেছে তা শরীআতের নীতি মাফিক না হওয়াতে তারা কুফ্‌রীতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এ কারণেই যখন মৌলভী বখশ সাহেব এই ফিরকার কিছু আক্বীদা তাদের ব্যাখ্যা (تاويل) সহ মক্কা মদীনার উলামায়ে কেরামের নিকট উপস্থাপন করে ফতওয়া তলব করেন তখন মক্কা মদীনার উলামায়ে কেরাম তার উত্তরে লিখেছিলেনঃ

اعتقاده فاسد واليهود والنصارى اهون حالا منه ضال مضل هو خليفة ابليس اللعين ويكفر هذا الاعتقاد ـ

অর্থাৎ, তাদের এ ধরনের আকীদা পোষণ করা শরী'আত বিরোধী। ইয়াহুদ নাছারাও আকীদাগত দিক থেকে তাদের তুলনায় কম জঘন্ন। তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে। তারা অভিশপ্ত ইবলীছের খলীফা। এ ধরনের আকীদা পোষণের ফলে তারা কাফের হয়ে যাবে। এই ফতওয়ায় মক্কা মদীনার উলামায়ে কেরামের স্বাক্ষর আছে।

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন ঃ উপরোক্ত উলামাদের মতামতের ব্যাপারে আমার পুর্ণ আস্থা রয়েছে। তথাপিও যেহেতু কারও উপর কুফ্‌রীর হুকুম আরোপ করা খুবই জটিল ও কঠিন বিষয়, তাই আমি নিজে তাদেরকে জঘন্য ও নিকৃষ্ট "বিদআতী" ও "গোমরাহ" আখ্যায়িত করি এবং তাদের ব্যাপারে কুফরী শব্দ প্রয়োগ করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছি।[১]

* * * * *

১. উল্লেখ্য ঃ এই ফিরকার আকীদা-বিশ্বাস সমূহ ইমদাদুল ফাতাওয়া ৬ষ্ট খণ্ড থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। হযরত থানবী (রহঃ) সার সাইয়্যেদ আহমদের লিখিত কিতাব ও পত্রিকার বরাত উল্লেখ পূর্বক তার আকীদা-বিশ্বাস সমূহ উল্লেখ করেছেন। অবশিষ্ট তথ্যসূত্রঃ

(১) عقائد الاسلام. مولنا ادريس كاندهلوى - ।

(২) امداد الفتاوى جلد ٦ - ।

(৩) شرح العقائد النسفيه. تفتازانى ॥

তৃতীয় অধ্যায়

(দেশীয় বাতিল ফিরকা বিষয়ক)

সুরেশ্বরী

(সুরেশ্বরী পীরের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা)

"সুরেশ্বর" বৃহত্তর ফরিদপুরের শরীয়তপুর জেলার অন্তর্গত নড়িয়া থানার একটি গ্রাম। এখানকার শাহ সূফী সৈয়্যেদ আহম্মদ আলী ওরফে হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ জান্ শরীফ শাহ "সুরেশ্বরী" পীর নামে খ্যাত। তিনি ২রা অগ্রহায়ণ, ১২৬৩ বাংলা, মোতাবেক ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শরীফ শাহ মেহেরউল্লাহ। ৯ বৎসর বয়সের সময় তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১০ বৎসর বয়সে তিনি পীর শাহ সূফী সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী -এর নিকট বাইআত গ্রহণ করেন। ১৭ বৎসর বয়সে ফতেহ্ আলী ওয়াইসী তাকে খেলাফত দান করেন এবং বলেন, "হে বাবা জান্ শরীফ! আমি দেখিতেছি, আরশে মুয়াল্লায় আপনার নাম শাহ্ আহম্মদ আলী লেখা হইয়াছে। আজ হইতে আপনাকে এই লক্‌ব প্রদান করা হইল। আপনাকে কুতবুল এরশাদের নেসবত দান করা হইল। আপনার লেখায় যে আহম্মদী ভাব ও নূরী ধর্মের বিকাশ ঘটিবে, তাহা আপনার বংশ পরম্পরায় আপনার আওলাদগণ কর্তৃক আপনি শেষ যামানার হযরত ইমাম মেহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সম্পূর্ণ অধিকারী এবং সুবিকাশী হইবেন।"[১]

১. তথ্যসূত্র ঃ ভূমিকা-ছফিনায়ে ছফর, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯ ॥

সুরেশ্বরী পীর সাহেব ১৮৯২-১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় হেড মোদাররেছ পদে চাকুরী করেন। তিনি ৯ খানা পুস্তক রচনা করেন। সেগুলোর নাম হল ঃ

১. সির্‌রে হক জামে নূর।
২. নূরে হক গঞ্জে নূর।
৩. লতায়েফে সাফিয়া
৪. মাতলাউল উলূম।
৫. ছফিনায়ে ছফর।
৬. কৌলুল কেরাম।
৭. সরহে সদর।
৮. আইনাইন।
৯. মদীনা কল্‌কি অবতারের ছফিনা।

এ পুস্তকগুলোর বেশ কয়েকখানা সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে সুরেশ্বরীর অধস্তন উত্তরাধীকারীগণ কর্তৃক "খানকায়ে সুরেশ্বরী" ৩৮৫/সি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৭ থেকে "সুরেশ্বর" নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

সুরেশ্বরী পীরের লিখিত উপরোল্লেখিত পুস্তকাদি ও মাসিক সুরেশ্বর থেকে সুরেশ্বরীদের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে যা জানা যায় তা খণ্ডনসহ উল্লেখ করা হল ঃ

১. তাদের মতে সামা, নাচ, গান-বাদ্য সবই জায়েয। সুরেশ্বরী পীরের অনুসারীগণ বলেন ঃ সুরেশ্বরী সূরকে ভালবাসতেন। সুরের মূর্ছনায় তিনি পরমাত্মার মাঝে লীন হয়ে যেতেন। সূরের প্রতি তার ভালবাসার কারণে সকলেই তাকে সূরের ঈশ্বর বা সুরেশ্বর নামে অভিহিত করেন।[১] মাসিক সুরেশ্বরে গান-বাদ্যের উপর একটা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। তার শেষে লেখা হয়েছে ঃ গান, সামা, বাজনা, হাতের তালি বাজানো ও নৃত্য সবই বৈধ।[২]

খণ্ডন ঃ

নাচ গান শরীআতে হারাম। এ সম্পর্কে "গান-বাদ্য প্রসঙ্গ" শিরোনামে প্রতিপক্ষের দলীলাদি খণ্ডনসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৫৫০-৫৬১।

২. তারা সেজদায়ে তাহিয়্যা (সম্মানের সেজদা)-এর প্রবক্তা।

খণ্ডন ঃ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে সেজদা করা হারাম। চাই ইবাদতের উদ্দেশ্যে সেজদা হোক বা সম্মানের উদ্দেশ্যে হোক।

৩. তারা মাযারে গিলাফ, ফুল, আগরবাতি, মোমবাতি ও গোলাপ জল দেয়ার প্রবক্তা।

খণ্ডন ঃ

এগুলো বিদআত। দেখুন ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠা।

১. তথ্যসূত্র ঃ ভূমিকা-ছফিনায়ে ছফর, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯। মদিনা কলকী অবতারের ছফিনা, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৮ ॥

২. মাসিক সুরেশ্বর, পৃষ্ঠা ৩৪, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, এপ্রিল, ২০০৩ ॥

৪. সুরেশ্বরী লিখেছেন ঃ কবরের মাটি নরম কিংবা সময় গতিকে তাহাতে জল কাদা থাকিলে তাহাতে বিছান কিংবা খাট দেওয়া কর্তব্য। নেক লোকের কবরে খাট দিলেও কোন দোষ নেই।[১]

খণ্ডন ঃ

কুরআন-হাদীছ ও পূর্বসূরীদের থেকে এর কোন প্রমাণ নেই।

৬. সুরেশ্বরী লিখেছেন ঃ মরণের পর যে কয়েকদিন রূহ দোয়া দানের জন্যে আসে তাহার নাম তিজা, চাহারম, সপ্তমী, দশই, সাতাইশা, চল্লিশা, ছমাসি ও সাল্‌ইয়ানা।[২]

খণ্ডন ঃ

চাহারাম ইত্যাদি দিনে মৃতের রূহ দুনিয়াতে আসা সম্পর্কে হযরত থানবী (রহঃ) লিখেছেন ঃ কোন কোন লোকের আকীদা হল শবে বরাত ইত্যাদিতে মৃতের রূহ ঘরে আগমন করে ..... এ জাতীয় বিষয় কোন نقلى দলীল ব্যতীত অন্য কোন ভাবে প্রমাণিত হতে পারে না। আর এ জাতীয় বিষয়ে কোন দলীল নেই। কারও কারও আকীদা হল এ রাতে কেউ মুরদাদেরকে ছওয়াব বখশে না দিলে মৃতগণ তাকে অভিশাপ দেন - এগুলো ভিত্তিহীন।[৩]

৫. তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল ঃ

(১) সুরেশ্বরী লিখেছেন ঃ পীরের নিকট দীক্ষিত না হইলে কোন বন্দেগী কবূল হয় না।[৪]

খণ্ডন ঃ

এখানে বাইআত হওয়াকে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য শর্ত তথা ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ কোন কিছুকে ফরয সাব্যস্ত করতে হলে কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা (نص صريح) থাকা আবশ্যক। যা এখানে অনুপস্থিত। বাইআত হওয়াকে উলামায়ে কেরাম সুন্নাত বলেছেন। বাইআত হওয়া বা পীর ধরাকে ফরয বলা শরী'আতের মধ্যে কোন দলীল ছাড়া অতিরঞ্জন ঘটানো। যা শরী'আত বিকৃত করার ন্যায় জঘন্য অপরাধ। তবে এসলাহে বাতিন বা আধ্যাত্মিক সংশোধন ফরয। সেটা স্বতন্ত্র কথা।

(২) সুরেশ্বরীর মতে কামেল ওলীর কোন ইবাদত বন্দেগীর প্রয়োজন হয় না। সুরেশ্বরী লিখেছেন ঃ

মালামতি দেখ যারে, রোযা নামায নাহি পড়ে,
আওয়ারেফে দেখ বন্ধুগণ ॥[৫]

১. ছফিনায়ে ছফর, পৃষ্ঠা ৮৫, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ (মাহবুবে খোদা) ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯ ॥ ২. ছফিনায়ে ছফর, পৃষ্ঠা ৮৭, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ (মাহবুবে খোদা) ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯ ॥ ৩. اغلاط العوام ॥ ৪. নূরে হক গঞ্জে নুর, পৃষ্ঠা ২৫, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ (মাহবুবে খোদা) ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ ১৯৯৮ ॥ ৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৩ ॥

মাসিক সুরেশ্বরে সুরেশ্বরী রচিত "মাতলাউল উলূম" গ্রন্থ থেকে (অনুবাদক- মাওলানা ফরীদ উদ্দিন আত্তার) উদ্ধৃত করে এ সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার করে লেখা হয়েছে ঃ "আহ্লুল্লাহ-যাঁরা পুরাপুরিভাবে মহান আল্লাহ পাকের একত্ববাদের সাথে মিশে গেছেন, তাঁদের নিকট তো ফরজ বলতে কিছু নেই। এমতাবস্থায় যাহেরী শরিআতের কোন বালাই থাকে না।" পত্রিকাটিতে আরও লেখা হয়েছে ঃ আউলিয়া দুই ধরনের। ১. তাসাউফ চর্চাকারী, সূফী- তারা যাহেরী শরিআতের সাধারণত খিলাফ কোন কাজ করেন না, তবে সময় সময়....। ২. মুলামাতিয়াহ্- তাঁরা সাধারণ মানুষের তিরস্কার পছন্দ করেন। তাঁরা যাহেরী শরিয়তের খিলাফ কাজকাম করেন। পোষাক-আশাক, খাদ্য-খোরাকী, বাসস্থান-অবস্থান কোন ব্যাপারেই তাদের শরিয়তের পাবন্দী দেখা যায় না। অথচ, তাঁদের মধ্যেই অধিকাংশ গাউস, কুতুব, আবদাল, আখইয়ার হয়ে থাকেন।[১]

খণ্ডন ঃ

ইবাদত করা আমরণ দায়িত্ব। কোন স্তরেই এ দায়িত্ব থেকে অব্যহতি পাওয়া যায় না। দলীল কুরআনের আয়াত ঃ

واعبد ربک حتی یأتیک الیقین -

অর্থাৎ, মৃত্যু পর্যন্ত তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। (সূরাঃ ১৫-হিজ্‌রঃ ৯৯)

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে অধিক বিশ্বাস আর কারও হতে পারে না। তথাপি তাদের উপর আমরণ শরী'আত পালনের দায়িত্ব ছিল। এবং তাঁরা আমরণ ইবাদত-বন্দেগী পালন করে গিয়েছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে কুরআনে মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

قال انی عبد الله اتانی الکتب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا این ما کنت واوصانی بالصلوة والزکوة ما دمت حیا -

অর্থাৎ, সে বলল, আমি (ঈসা) আল্লাহ তা'আলার দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরাঃ ১৯-মারইয়ামঃ ৩০)

মোটকথা, আল্লাহ্‌র নবীর সমান ইয়াকীন-বিশ্বাস অর্জন করা কোন উম্মতের পক্ষে সম্ভব নয়। তদুপরি নবীকে আজীবন শরী'আতের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। সেখানে একজন উম্মত এই ক্ষমতা ও স্বাধীনতা কোত্থেকে পেল যে, সে শর'আতের বিধান হতে মুক্ত, স্বাধীন ?[২]

* তাদের মতবাদ অনুসারে বলতে হবে সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল (সাঃ) বুযুর্গির উচ্চস্তরে উন্নিত হননি, নতুবা তাঁরা কেন ইবাদত করতেন? যদি তারা মেনে নেন

১. মাসিক সুরেশ্বর, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৩ পৃষ্ঠা ১৭ ॥ ২.তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, ১৬৮ পৃঃ ॥

এবং অন্ততঃ রাসূল (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই বলতে বাধ্য হবেন যে, রাসূল (সাঃ) বুযুর্গির উচ্চস্তরে উন্নিত হয়েছিলেন, তাহলে তিনি এই স্তরে উন্নিত হওয়া সত্ত্বেও ইবাদত করে পা মোবারক ফোলাতে গেলেন কেন?

সূফীকুল শিরোমণি হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)কে কোন একজন লোক জিজ্ঞাসা করেছিল, কেউ কেউ বলে থাকে, আমরা তো পৌঁছে গেছি। এখন আর আমাদের শরী'আতের অনুসরণের প্রয়োজন নেই। তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ وصلوا ولکن الی سقر- অর্থাৎ, 'হ্যাঁ, তারা পৌঁছে গেছে, তবে জাহান্নামে।'[১]

তিনি একথাও বলেছিলেন যে, "এমনটি বলা যিনা ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপান অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।"[২] কেননা, এ সব কাজ গোনাহ এবং মস্ত বড় অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও কুফরী তো নয়। পক্ষান্তরে পুর্বোক্ত মতবাদটি সরাসরি কুফরী ও ধর্মহীনতা।[৩]

হযরত ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বিশদ ব্যাখ্যাসহ যুক্তির নিরিখে মাজমূউল ফাতাওয়ায় আলোচ্য আকীদা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যারা বলে আমাদের অন্তর পরিষ্কার হয়ে গেছে, এখন আমরা যে কাজই করব তাতে কোন অসুবিধা নেই অথবা এ কথা বলে যে, আমাদের এখন আর নামাযের প্রয়োজন নেই। কেননা, আমরা মূল লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। অথবা এরূপ বুলি ছাড়ে যে, আমাদের এখন আর হজ্ব করার দরকার নেই। কেননা, স্বয়ং কা'বা আমাদের তওয়াফ করে থাকে। কিংবা এমন বলে থাকে যে, আমাদের এখন রোযার প্রয়োজন নেই। কেননা, আমাদের এর কোন দরকার নেই কিংবা এ ধরনের উক্তি করে যে, আমাদের জন্যে মদ্যপান বৈধ। এটা কেবল সাধারণ লোকদের জন্য হারাম। এ ধরনের কথাবার্তা যারা বলে অথবা এ ধরনের আকীদা যারা পোষণ করে, তারা সকল ইমামের মতে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের, মুরতাদ। তাদেরকে তওবা করতে বলা হবে। যদি তওবা করে তাহলে তো ভালই, অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর যদি এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস অন্তরে লুকিয়ে রাখে, তাহলে সে হবে মুনাফিক ও যিন্দিক। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে একবার এ আকীদা প্রমাণের পর তওবার সুযোগ দেয়া ছাড়াই কতল করে দেয়া হবে। তবে কেউ কেউ তওবার সুযোগ দেয়ার পর হত্যা করার অভিমতও ব্যক্ত করেছেন।'[৪]

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেনঃ

من زعم ان له مع الله تعالی حالا اسقط عنه نحو الصلوة او تحریم شرب الخمر وجب قتله ، وان کان فی الحکم بخلوده نظر ، وقتل مثله افضل من قتل مأة کافر ، لان ضرره اکثر -

১. তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, বরাত - শরহু হাদীছিল ইলম, ইবনে রজব (রহঃ)ঃ ১৬, সিরাতুল মুসতারশিদীনঃ ৮৩ টিকা ॥

২. মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াঃ ১১/৪২০ ॥ ৩. প্রাগুক্ত ॥

৪. প্রাগুক্তঃ ১১/৪০১-৪০৩ ॥

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন বিশেষ অবস্থা বা সম্পর্কের দাবী করে ও বলে যে, এ অবস্থায় তার জন্য নামাযের বিধান এবং শুরাপান হারামের বিধান রহিত হয়ে গেছে, তাহলে তাকে কতল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যদিও তার চিরকাল জাহান্নামে থাকার ব্যাপারে কিছু কথা আছে। উপরোক্ত মতাবলম্বী লোককে হত্যা করা শত কাফেরকে হত্যা করার চেয়েও উত্তম। কেননা, এ ধরনের লোক দ্বারা প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে।[১]

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর উক্ত উক্তিটি উল্লেখ পূর্বক বলেনঃ

ولا نظر فى خلوده لانه مرتد ، لاستحلاله ما علمت حرمته او نفيه وجوب ما علم وجوبه ضرورة فيهما ، ومن ثم جزم فى " الانوار " بخلوده -

অর্থাৎ, এ ধরনের ব্যক্তির জাহান্নামে চিরকাল থাকার ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই। কেননা, সে মুরতাদ ও ধর্মত্যাগী। তার কারণ হল সে এমন বস্তুকে হালাল মনে করেছে যার হারাম হওয়া শরী'আতে অকাট্য ও অতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আর এমন বিষয় ফরয হওয়ার কথা অস্বীকার করেছে, যা ফরয হওয়াও শরীআতে অকাট্য এবং অতি সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত। তাই 'কিতাবুল আনওয়ার'-এ দৃঢ়তার সাথে লেখা হয়েছে যে, এরূপ ব্যক্তি জাহান্নামে চিরকাল থাকবে।[২]

* পূর্বে বলা হয়েছে তাদের মতবাদ মেনে নিলে বলতে হবে সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল (সাঃ) বুযুর্গির উচ্চস্তরে উন্নিত হননি। নতুবা বলতে হবে তাঁরা বুযুর্গির উচ্চস্তরে উন্নিত হওয়া সত্ত্বেও ইবাদত করে কুফ্‌রীতে লিপ্ত হয়েছিলেন। আর যে উক্তি দ্বারা রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামকে কাফের বলা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, নিঃসন্দেহে সেটা কুফ্‌রী উক্তি। আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত আকীদা হল - আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ)-এর মর্যাদা সকলের উর্ধ্বে। অতপর সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সকল উম্মতের উর্ধ্বে এবং সকল সাহাবী জান্নাতী।

একটি ভ্রান্তির অপনোদন ঃ

বাতিলপন্থীরা কামেল ও বুযুর্গ হয়ে গেলে ইবাদত লাগে না- এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদের পক্ষে দলীল দিয়ে থাকে ঃ

واعبد ربك حتى يأتيك اليقين -

অর্থাৎ, তোমরা মুত্যু পর্যন্ত ইবাদত করতে থাক। (সূরাঃ ১৫-হিজ্‌রঃ ৯৯)

তারা এ আয়াতের অপব্যাখ্যা করে বলে থাকে যে, এখানে "ইয়াকীন" (يقين) শব্দটি পরিচিতি ও বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেমতে আয়াতের অর্থ হল তোমরা মারেফত বা পরিচিতি অর্জন হওয়া পর্যন্ত ইবাদত কর। অতএব খোদার সাথে গভীর পরিচিতি লাভ হওয়ার পর আর ইবাদতের প্রয়োজন থাকে না।

১. রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৯ ॥ ২. তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, বরাত -রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৯ ॥

তাদের এ অপব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে ইব্‌নে কাছীরে বলা হয়েছে ঃ

ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى ان المراد باليقين المعرفة فمتى وصل احدهم الى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم وهذا كفر وضلال وجهل، فان الانبياء عليهم السلام كانوا هم واصحابهم اعلم الناس بالله واعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم وكانوا مع هذا اعبد واكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات حين الوفاة ، وانما المراد باليقين ههنا الموت - (تفسير ابن كثير جـ٢/ صفحـ٥٦٠، سورة حجر)

অর্থাৎ, এ আয়াত দ্বারা কাফেরদের ভ্রান্ত আকীদা খন্ডন করা হয়েছে, যারা বলে যে, ইয়াক্বীন অর্থ মা'রেফত (পরিচিতি)। তাদের মতে কারও মা'রেফত হাসিল হলে তার ইবাদত মওকূফ হয়ে যায়। তাদের এ আকীদা কুফ্‌র, পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা। কারণ নিশ্চয়ই নবী (আঃ)গণ এবং তাঁদের সাহাবাগণ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার হক, তাঁর ছিফাত এবং তাযীমের মুস্তাহিক হওয়ার মা'রেফাত তাঁদের সবচেয়ে বেশী ছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁরা মৃত্যুপর্যন্ত সকলের চেয়ে বেশী ইবাদতকারী ছিলেন, সর্বদা নেক কাজ করে গেছেন। বস্তুতঃ এখানে 'ইয়াক্বীন' অর্থ মউত ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে ঃ

حتى يأتيك اليقين اى الموت كما روى عن ابن عمر والحسن وقتادة و ابن زيد .... فليس المراد به ما زعمه بعض الملحدين مما يسمونه بالكشف والشهود وقالوا : ان العبد متى حصل له ذالك سقط عنه التكليف بالعبادة وهى ليست الا للمحجوبين ولقد مرقوا بذالك من الدين وخرجوا من ربقة الا سلام وجماعة المسلمين - (روح المعانى ٨ : ٨٧)

অর্থাৎ, حتى يأتيك اليقين বাক্যে ইয়াক্বীন অর্থ যে মৃত্যু, একথা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) ও ইব্‌নে যায়েদ হতে বর্ণিত আছে। এখানে ইয়াক্বীনের ঐ অর্থ নয় যা কাফেররা (মুলহিদরা) বলে থাকে; অর্থাৎ কাশ্‌ফ ও মোশাহাদা। তারা বলে যে, বান্দার যখন কাশ্‌ফ ও মোশাহাদা হাসিল হয়, তখন আর তার কোন ইবাদত লাগে না। ইবাদত হল কাশ্‌ফ মোশাহাদা যাদের নেই তাদের জন্য। তারা এ আকীদার দরুন ইসলাম ধর্ম হতে বের হয়ে গেছে।

তারা এ কথা বুঝতে পারেনি যে, উক্ত আয়াতে প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ, আপনি ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত

স্বীয় প্রভূর ইবাদত করতে থাকুন। এখন যদি ইয়াকীন দ্বারা মারেফাতের কোন নির্দিষ্ট স্তর বুঝানো হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে স্তর হাছিল ছিলই। তদুপরি তিনি ওফাত পর্যন্ত ইবাদতে অটল ছিলেন এবং কঠিন রোগেও নামাযের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন।

আর যদি (নাউযুবিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে স্তর হাসিল না থেকে থাকে, তাহলে সে স্তর কোন উম্মতের হাসিল হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, কোন উম্মত আল্লাহ তা'আলার ঐ মারেফাত ও বিলায়াত স্তরে পৌঁছতে পারে না, যে স্তরে নবী-রাসূলগণ পৌঁছেছেন!। বুঝা গেল- এখানে ইয়াক্বীন দ্বারা মা'রেফাতের কোন স্তর উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব নয়, বরং ইয়াক্বীন দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হল মৃত্যু; যা হাদীছ ও উম্মতের ইজ্‌মা' দ্বারা প্রমাণিত[১]

এ আয়াত দ্বারা তারা দলীল দিতে পারে না বরং আহ্‌লে হক এ আয়াত দ্বারা দলীল দিতে পারেন এবং দিয়ে থাকেন। তাদের মতে এ আয়াতই প্রকৃষ্ট দলীল যে, মানুষ আমরণ আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের মুকাল্লাফ (আদিষ্ট)। কারণ উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, উক্ত আয়াতে ইয়াক্বীন শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটি সূরা মুদ্দাছছিরে (আয়াতঃ ৪৭) ইয়াকীন শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, প্রত্যক্ষ ইয়াক্বীন তথা বিশ্বাস মৃত্যুর পরই হাসিল হয়ে থাকে। স্বয়ং মৃত্যুই এমন এক বিশ্বাস্য বস্তু, যার ব্যাপারে মানুষের সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয় নেই।

তারা যাহেরী শরী'আত ও বাতেনি শরী'আত বলে দুইটা শরী'আত দাঁড় করেছেন। এর কোন দলীল কুরআন-হাদীছে নেই। তদুপরি শরী'আত থেকে তরীকতকে পৃথক করে নিলে শরী'আত তথা শরী'আতের বিধি-বিধানকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়, যা শরী'আতকে রহিত সাব্যস্ত করার নামান্তর। এ ধরনের বিকৃতি সাধনকারী লোকদেরকে বলা হয় মুলহিদ বা যিন্দিক।

এ প্রসঙ্গে সহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যাকার ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী (রহঃ)-এর একটি যুক্তিপুর্ণ বিশদ আলোচনার সারাংশ সামান্য ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হল। তিনি বলেন ঃ

"যিন্দীকদের একটি দল এমন তাসাওউফের কথা বলে, যার ফলে শরী'আতের বিধানাবলীকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়। তারা বলে, "শরীআতের এসব বিধান নির্বোধ ও সাধারণ লোকদের জন্যে। আওলিয়ায়ে কেরাম ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ শরী'আতের এসব বিধানের মুখাপেক্ষী নন। (বরং তারা এ সব কিছুর উর্ধ্বে) কারণ তাঁদের অন্তঃকরণ স্বচ্ছ ও নির্মল। তাই তাদের অন্তরে যা কিছুর উদ্রেক হয়, তাই তাঁদের থেকে কাম্য'-এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কুফ্‌রী কথা। এ ধরনের কথাবার্তা যারা বলে, তাদেরকে কতল করে দিতে হবে। তওবাও তলব করা হবে না। কেননা, এ মতবাদের মধ্যে শরী'আতের একটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য আকীদার অস্বীকৃতি পাওয়া যায়। সে আকীদাটি হল- আল্লাহ

১. মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ১১/৪১৮-৪২০, শরহুল ফিক্‌হিল আকবার- মোল্লা আলী কারী ঃ ১২২, তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ ২/৬১৭, রুহুল মা'আনী ঃ১৪/ ৮৭-৮৮ ॥

তা'আলার বিধানাবলী আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অবগতির কোন উপায় নেই। আর শরী'আতের কোন সুস্পষ্ট ও অকাট্য আকীদার অস্বীকৃতি পরিষ্কার কুফ্‌র।"[১]

যা হোক, শরী'আত ও তরীকতের মধ্যে ব্যবধানকারী, শরী'আত-পরিপন্থী কোন তরীকত অবলম্বনকারী দ্বীন হতে খারেজ।

(৩) দেওয়ানবাগী, চন্দ্রপুরী ও মাইজভাণ্ডারীদের ন্যায় এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা মনে করেন আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, সুরেশ্বরীর বক্তব্য থেকেও বোঝা যায় তিনি অনুরূপ আকীদা পোষণ করেন। তিনি "সির্‌রে হক্ক জামে নুর" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "আহাদ ও আহমাদ-এর মীমের মধ্যে পার্থক্য কেবল হামদ ও নাতের জন্য।"[২]

খণ্ডন ঃ

আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে পার্থক্য না করার ব্যাখ্যা যদি এই হয় যে, তাঁদের সত্তা এক ও অভিন্ন, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে কুফ্‌রী আকীদা। আর যদি এটার ব্যাখ্যা হয়ে থাকে এই যে, আল্লাহ্ রাসূলের মধ্যে অবতারিত হন বা আত্মপ্রকাশিত হন, অর্থাৎ, রাসূলগণ হচ্ছেন আল্লাহ্‌র প্রকাশ বা আল্লাহ্‌র অবতার, তাহলে এটাকে বলা হয় حلول-এর আকীদা। এই আকীদাও কুফ্‌রী।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল আল্লাহ্‌র সত্তা কারও সত্তার মধ্যে মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হন না বা প্রবেশ (حلول) হন না এবং তাঁর সত্তার মধ্যেও কেউ মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হয় না। খৃষ্টানদের ধারণায় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে প্রবেশ حلول করেছিলেন অর্থাৎ, অবতারিত হয়েছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাস মতে ঈশ্বর মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষ পাথর সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ (حلول) করেন অর্থাৎ, অবতারিত হন। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারীদেরকে হুলূলিয়া (حلوليه) বলা হয়। এরূপ বিশ্বাস কুফ্‌রী। মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী বলেন ঃ যেসব মূর্খ লোক বলে, আল্লাহ্‌র খাস ওলীগণ আল্লাহ্‌র সত্তার মধ্যে এমনভাবে লীন হয়ে যান, যেমন বরফ পানির মধ্যে এবং বিন্দু দরিয়ার মধ্যে লীন হয়ে যায়, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং স্পষ্ট কুফ্‌র।[৩]

উল্লেখ্য ঃ যারা আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য না করার মত পোষণ করেন, বা মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রবেশ করার মত পোষণ করেন, তারা এ বিষয়ে সাধারণত وحدة الوجود বা "সর্বেশ্বরবাদ"-দর্শনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এটা করে থাকেন। এ সম্পর্কে পরবর্তিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৫২৫।

(৪) রাসূল (সাঃ) ইল্‌মে গায়েবের অধিকারী। মাসিক সুরেশ্বরে লেখা হয়েছে ঃ সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বিষয়ই তাঁর মোবারক নয়নের সামনে বিদ্যমান। তিনি এল্‌মে গায়েবের অধিকারী।[৪]

১. القرطبي جـ/١١ . صفحـ/٢٩-٢٨ ، فتح البارى جـ/١. صفحـ/٢٦٧ ॥ ২. তথ্যসূত্র ঃ মাসিক সুরেশ্বর, পৃষ্ঠা ২৭, ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, মার্চ ২০০৩ ॥ ৩. عقائد الاسلام عبد الحق حقانى ॥ ৪. মাসিক সুরেশ্বর, পৃষ্ঠা ৮, ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারী, ২০০৩ ॥

খণ্ডন ঃ

এ সম্পর্কে "নবী করীম (সাঃ)-এর গায়েব জানা প্রসঙ্গ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃঃ ৫৬৯-৫৭৬।

সারকথা সুরেশ্বরী পীর একাধিক কুফ্‌রী আকীদা পোষণকারী। যা পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

এনায়েতপুরী

(এনায়েতপুরী পীর ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস)

"এনায়েতপুরী" বলতে বোঝানো হয়েছে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপূরের পীর মাওলানা শাহ ছূফী মোহাম্মাদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরীকে। তার পিতার নাম মাওলানা শাহ ছূফী আবদুল করীম। তিনি ১৩০০ হিজরীর ১১ই জিলহজ্জ মোতাবেক ২১শে কার্ত্তিক ১২৯৩ সাল সিরাজগঞ্জ (সাবেক পাবনা) জেলার চৌহালী থানার এনায়েতপূর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ৫ই জুমাদাস সানী ১৩৭১ হিজরী মোতাবেক ১৮ই ফাল্গুন ১৩৫৮ সাল ইন্তেকাল করেন। তিনি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (কলিকাতা)-এর মুরীদ ও খলীফা ছিলেন।[১]

এনায়েতপুরীদের মতে হযরত মাওলানা শাহসুফী মোহাম্মাদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী ১৩০০ হিজ্‌রীর মোজাদ্দেদ।[২]

নিম্নে এনায়েতপূরের পীর মাওলানা শাহ ছূফী মোহাম্মাদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী ও তার অনুসারীদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও বিদআত-কুসংস্কার মূলক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কিছুটা বিবরণ প্রদান করা গেল।

১. এনায়েতপূরী সাহেব মনে করেন তার বংশের সকলেই মাদারজাত ওলী। এনায়েতপূরী সাহেব ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বে বলেছেন, "আমার বংশের তেফেল শিশু বাচ্চাকেও যদি তোমরা পাও, তাহাকে মাদারজাত ওলি মনে করিও।"[৩]

২. কিছু কিছু বাতিল ফিরকার ভ্রান্ত ধারণা হল আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ হলেন "আহাদ" আর রাসূল হলেন "আহমদ"। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল একটা "মীম" হরফের। এনায়েতপূরীদের ধারণাও অনুরূপ বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের রচিত নিম্নোক্ত কবিতা তার প্রমাণ ঃ

১. তথ্যসূত্র ঃ "ওজিফা ও উপদেশ", সম্পাদক ঃ পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দীন - সাজ্জাদনসীন এনায়েতপুর ও "খাজা ইউনুসিয়া নকসেবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার ওজিফা", সম্পাদনায় ঃ এম মাকবূল হোসেন - খাদেম খাজাবাবা এনায়েতপূরী ॥

২."ওজিফা ও উপদেশ", সম্পাদক ঃ পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দীন - সাজ্জাদনসীন এনায়েতপুর, পৃঃ ৯ ॥

৩. "খাজা ইউনুসিয়া নকসেবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার ওজিফা", সম্পাদনায় ঃ এম মাকবূল হোসেন - খাদেম খাজাবাবা এনায়েতপূরী, ২য় সংস্করণ, অক্টোবর-২০০২ পৃঃ ২৫ ॥

বানাইয়া নূর নবী দেখাইলেন আপনা ছবি
সেই নবীজীর চরণ বিনে নাইগো পরিত্রাণ।
আহাদে আহম্মদ বানাইয়ে, মিমকা পদ মাঝে দিয়ে
খেলতিয়াছেন পাক বারি হইয়া বে-নিশান।[১]

খণ্ডন ঃ

নবী রাসূলদের সম্বন্ধে সহীহ ঈমান হল তাঁরা মানুষ, তাঁরা খোদা নন বা খোদার পুত্র নন বা খোদার রূপান্তর (অবতার) নন বরং তাঁরা খোদার প্রতিনিধি ও নায়েব-আল্লাহর বাণী অনুসারে জিন ও মানুষ জাতিকে হেদায়েতের জন্য তাঁরা দুনিয়াতে প্রেরিত হন। অতএব উপরোক্ত ধারণা ঈমান পরিপন্থী ধারণা।

রাসূল (সাঃ) আল্লাহ্‌র মাখলূক। তারা আল্লাহ্‌র সাথে মাখলূকের অভিন্নতার মত পোষণ করে মাখলূককে খালেক সাব্যস্ত করেছে। আর খোদার কোন মাখলূককে খোদা সাব্যস্ত করা কুফ্‌রী। তাছাড়া রাসূল (সাঃ) সম্পর্কিত ধারণা জরূরিয়াতে দ্বীন (ضروريات دين)-এর[২] অন্তর্ভুক্ত। হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্দহ্‌লবী বলেনঃ এ ধরনের ক্ষেত্রে কোন ভিন্নতর ব্যাখ্যা প্রদান (تاويل) এটাকে অস্বীকার করার নামান্তর। আর এ ধরনের বিষয়কে অস্বীকার করা কূফ্‌রী।[৩]

রাসূল আর খোদার ভিতর কোন পার্থক্য নেই বললে আল্লাহ্‌র স্ত্রী ও সন্তানাদি আছে বলতে হবে। কেননা রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রী ও সন্তানাদি তখন আল্লাহ্‌র স্ত্রী ও সন্তানাদি বলে আখ্যায়িত হবে। নাউযুবিল্লাহ"

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল আল্লাহ্‌র সত্তা কারও সত্তার মধ্যে মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হননা বা প্রবেশ (حلول) করেন না এবং তাঁর সত্তার মধ্যেও কেউ মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হয় না। খৃষ্টানদের ধারণায় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে প্রবেশ حلول করেছিলেন অর্থাৎ, অবতারিত হয়েছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাস মতে ঈশ্বর মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষ পাথর সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ (حلول) করেন অর্থাৎ, অবতারিত হন। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারীদেরকে হুলুলিয়া (حلوليه) বলা হয়। এরূপ বিশ্বাস কুফ্‌রী। মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী বলেন ঃ যেসব মুর্খ লোকেরা বলে, আল্লাহ্‌র খাস ওলীগণ আল্লাহ্‌র সত্তার মধ্যে এমনভাবে লীন হয়ে যান, যেমন বরফ পানির মধ্যে এবং বিন্দু দরিয়ার মধ্যে লীন হয়ে যায়, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং স্পষ্ট কুফ্‌র।[৪]

উল্লেখ্য ঃ পূর্বেও বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য না করার মত পোষণ করেন, বা মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রবেশ করার মত পোষণ করেন, তারা এ বিষয়ে সাধারণত وحدة الوجود বা "সর্বেশ্বরবাদ"-দর্শনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এটা করে থাকেন। এ সম্পর্কে "সর্বেশ্বরবাদ/সর্বখোদাবাদ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৫২৫।

১. পুষ্পহার, মৌঃ মোঃ আব্দুর রহমান মোজাদ্দেদী, মোয়াজ্জেম- দরবার শরীফ এনায়েতপুর, পৃঃ ৩৬, ১২তম সংস্করণ, বাং ১৪০৮ ॥ ২. এটি একটি পরিভাষা, এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ১৯৪ পৃষ্ঠা ॥ ৩. عقائد الاسلام ॥ ৪. عقائد الاسلام عبد الحق حقانی ॥

৩. "একশত ত্রিশ ফরয" শিরোনামে লেখা হয়েছেঃ হযরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর ৪ কুরছি জানা ৪ ফরয। চার কুরছীর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে রাসূল পিতৃ পুরুষ ৪জন।

১। মোহাম্মদ (ছঃ) আব্দুল্লাহর পুত্র।

২। আব্দুল্লাহ আব্দুল মোতালেবের পুত্র।

৩। আব্দুল মোতালেব হাসেমের পুত্র।

৪। হাসেম আব্দুল মন্নাফের পুত্র।

আরও লেখা হয়েছে চার মাজহাব মানা ৪ ফরয।[১]

উপরোক্ত নামগুলি জানাকে তারা ফরয সাব্যস্ত করেছেন। অথচ কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা ব্যতীত কোন কিছুকে ফরয বলে সাব্যস্ত করা যায় না। আর এ ব্যাপারে কুরআনের কোন বর্ণনা নেই। এটা শরী'আত সম্পর্কে তাদের চরম অজ্ঞ থাকার প্রমাণ। যেটা ফরয নয় সেটাকে ফরয সাব্যস্ত করা শরী'আতে বিকৃতি সাধনের অপরাধ। আর মাযহাব মান্য করা তথা তাক্লীদ করাকে আইম্মায়ে কেরাম ওয়াজিব বলেছেন। যে ইমামেরই হোক যেকোন একজনেরই তাকলীদ করা ওয়াজিব। এটাকেও ফরয সাব্যস্ত করা তদুপরি চার ইমামের তাক্লীদকে চার ফরয সাব্যস্ত করা শরী'আত সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ থাকার প্রমাণ।

৪. তারা পীর সম্পন্ধে অতিরঞ্জনের শিকার। যেমন ঃ

(১) তাদের মতে পীর ধরা ফরয। অথচ কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা ব্যতীত কোন কিছুকে ফরয বলে সাব্যস্ত করা যায় না। এনায়েতপুরী বলেনঃ "পীর ধরা সবার জন্য ফরয।"[২]

"পীরের অছিলা ধরার বয়ান" শিরোনামে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা পীর ধরার স্বপক্ষে তারা দলীল পেশ করেছেনঃ

يايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة . الاية

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর ওছীলা অর্থাৎ, নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর। (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ৩৫)

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও পীর ধরা ফরয এ মর্মে দলীল পেশ করেছেন ঃ

ومن يضلل فلن تجد له وليا .مرشدا ـ

অর্থাৎ, তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার কোন পথপ্রদর্শনকারী পাবে না। (সূরাঃ ১৮-কাহ্ফঃ ১৭)

তারা বলেন ঃ পবিত্র কালামে মাজীদের এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাহার কোন কামেল মোরশেদ নাই, সে নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট।[৩]

১. শরীয়তের আলো, খাজা বাবা এনায়েতপুরী (রঃ)-এর অনুমোদন ক্রমে মওলানা মোঃ মকিম উদ্দিন প্রণীত। প্রকাশক পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) পুনঃ মুদ্রণঃ ১৪০৭ সাল, পৃঃ ৩৮-৩৯॥

২. তরিকতের ওজিফা শিক্ষা, মৌঃ মোঃ আবদুর রহমান মধুপুরী, মোয়াজ্জেম দরবার শরীফ এনায়েতপুর, প্রকাশনায় লেখক, ৭ম সংস্করণ, ১৪০৫ সন, পৃঃ ২৬ ॥ ৩. গাঞ্জে আছরার বা মা'রেফাত তত্ত্ব, খাজাবাবা এনায়েতপুরী (রঃ)-এর অনুমোদন ক্রমে মোঃ মকিম উদ্দীন প্রণীত, প্রকাশক পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) ১০ম সংস্করণ, ১৪০৯ সাল, পৃঃ ৪৩ ॥

রাসূল (সাঃ)-এর হাতে কোন কোন সাহাবী কর্তৃক জিহাদ করা, চুরি, যেনা না করা প্রভৃতি বিষয়ের উপর বাই'আতের কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে উলামায়ে কেরাম বাইআতে সুলূক তথা পীর-মুরীদির বাইআত প্রমাণিত করেছেন। অতএব পীর গ্রহণ করাকে সুন্নাত বলা যেতে পারে। কিন্তু কোনক্রমেই ফরয নয়। পীর ধরাকে ফরয় বলা শরী'আতে বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়। পূর্বোক্ত আয়াতে যে الوسيلة শব্দটি এসেছে, সাধারণভাবে মুফাসসিরিনে কেরাম তার দ্বারা ইবাদত-বন্দেগী উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কোন কোন মুফাস্সির তার মধ্যে শায়খ গ্রহণের বিষয়টিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায় মর্মে মত দিয়েছেন। এর অর্থ হল শব্দটি পীর ধরার ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন নয়। আর কুরআনের দ্ব্যর্থহীন অর্থ বিশিষ্ট কোন ভাষ্য ছাড়া কোন ফরয প্রমাণিত করা যায় না। আর দ্বিতীয় আয়াতের সাথে মুর্শিদ ধরার বিষয়টি কোন ভাবেই সম্পর্কিত নয়।

(২) এনায়েতপূরীগণ পীরের মধ্যে তাওয়াজ্জুহ দিয়ে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয়ার ক্ষমতার প্রবক্তা। তাদের মতে এনায়েতপূরী পীর সাহেবের মধ্যে "তাওয়াজ্জুহে ইত্তেহাদী"-র ক্ষমতা ছিল। এ সম্বন্ধে তারা লিখেছেন ঃ "তাওয়াজ্জুহে এত্তেহাদীর শক্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক। যে সে পীরে তাওয়াজ্জুহ্ দিতে পারে না। যাঁহাকে আল্লাহ এত্তেহাদী তাওয়াজ্জুহ্ দানের ক্ষমতা দিয়াছেন, তিনি যদি ঐ তাওয়াজ্জুহ্ কাহাকেও দান করেন, তবে প্রবল অগ্নির ন্যায় মুহূর্তের মধ্যে তাহার দেলের যাবতীয় ময়লা জ্বালাইয়া দিয়া তাহার দেল পাক ও ছাফ করিয়া দেয়। তখন লতীফা আল্লাহ আল্লাহ নামে হেলিতে (নড়া চড়া করিতে) থাকে।[১]

তার মধ্যে এমন ক্ষমতা থাকলে দুনিয়ার সকলকে তিনি পাক ছাফ করে দিলেন না কেন? এরূপ ক্ষমতা কি রাসূল (সাঃ)-এর ছিল? থাকলে তিনি কেন সকলকে হেদায়েত করতে পারলেন না ? কেন আল্লাহ তাআলা বললেনঃ তুমি চাইলেই কাউকে হেদায়েত করতে পার না বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত করেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء ـ

অর্থাৎ, তুমি যাকে চাও হেদায়েত করতে পার না বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত করেন। (সূরাঃ ২৮-কাসাসঃ ৫৬)

(৩) এক শ্রেণীর ভ্রান্ত লোক আছেন যারা মনে করেন আল্লাহ তা'আলা পীর বুযুর্গদেরকে সন্তান দান করা, ব্যবসা-বাণিজ্যে আয়-উন্নতি দান করা, মানুষের মাকসূদ পূর্ণ করা ইত্যাদির ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। পীর সাহেবদের কাছে চাইলে তারা মানুষের এসব মাকসূদ পূর্ণ করে দিতে পারেন। ভাল-মন্দের ক্ষমতা পীরের হাতে আছে। এনায়েতপুরী-গণও অনুরূপ ধারণা রাখেন বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের নিম্নোক্ত কবিতা তার প্রমাণ। পীর সাহেব এনায়েতপূরীর উদ্দেশ্যে তার সাহেবজাদা লিখেছেন ঃ

১. গাঞ্জে আছরার বা মা'রেফাত তত্ত্ব, খাজাবাবা এনায়েতপুরী (রঃ)-এর অনুমোদন ক্রমে মোঃ মকিম উদ্দীন প্রণীত, প্রকাশক পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) ১০ম সংস্করণ, ১৪০৯ সাল, পৃঃ ৭৯ ॥

খাজা তোমার দরবারে কেউ ফিরে না খালি হাতে
খাজা তোমার পাক রওজায় এসে যদি কেউ কিছু চায়
চাইতে জানলে রয়না কাঙ্গাল অফুরন্ত ভাণ্ডারে।[১]

এনায়েতপূরীর মুরীদ ও খলীফা আটরশির পীর সাহেব বলেছেন ঃ এনায়েতপুরী (কুঃ) ছাহেব তিরোধানের পূর্বে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন, " বাবা, তোর ভাল-মন্দ -উভয়টাই আমার হাতে রইল। তোর কোন চিন্তা নাই।" [২]

খণ্ডন ঃ

এটা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা পরিপন্থী। এটা কুরআন ও সহীহ্ হাদীছে পরিষ্কার ভাবে যা বলা হয়েছে, তার বিরোধী। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে ঃ

قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا -

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, সবকিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। এই সম্প্রদায়ের কী হল যে, এরা কোন কথা বুঝতেই পারে না। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ৭৮) হাদীছে বলা হয়েছে ঃ

والخير والشر كله بيديك -

অর্থাৎ, ভাল-মন্দ সবই তোমার (আল্লাহ্‌র) হাতে।
অতএব সকলের ভাল-মন্দ আল্লাহ্‌র হাতে, কোন মানুষের হাতে নয়।

(৪) তারা এনায়েতপূরী পীরকে প্রায় নবীর সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করেন। তাদের ধারণায় যে ব্যক্তি এনায়েতপূরীর সাক্ষাৎ পেয়েছে, সে জান্নাতী। তাদের রচিত নিম্নোক্ত কবিতা তার প্রমাণ ঃ

গৌছল আজম খাজা তুমি আউলিয়া ছরদার
তোমাকে দিয়াছেন আল্লাহ রহমতের ভাণ্ডার।
পাইলে তোমার দেখা জান্নাত নছীব তার।[৩]

৫. তাদের মতে সামা জায়েয।[৪] সামা সম্পর্কে "সামা প্রসঙ্গ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃঃ ৫৫৮।

৬. তারা ওরস-এর প্রবক্তা। শুধু প্রবক্তাই নয়, ওরস সম্পর্কিত ধারণার ব্যাপারে তাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রয়েছে। আটরশির পীর সাহেব এনায়েতপুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ ওরস

১. পুষ্পাদ্যান, পীর জাদা খাযা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৭৬ ॥

২. শাহসূফী হযরত ফরিদপুরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত, ক্রমিক নং ৩, পৃঃ ১১১, প্রকাশকঃ পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর, ৩য় মুদ্রণ, ১লা মে -১৯৯৯ ॥

৩. পুষ্পহার, মৌঃ মোঃ আব্দুর রহমান মোজাদ্দেদী, মোয়াজ্জেম- দরবার শরীফ এনায়েতপুর, ১২তম সংস্করণ, বাং ১৪০৮, পৃঃ ৩৭ ॥

৪. গাঞ্জে আঁছিরার বা মা'রেফাত তত্ত্ব, খাজাবাবা এনায়েতপুরী (রঃ)-এর অনুমোদন ক্রমে মোঃ মকিম উদ্দীন প্রণীত, প্রকাশক পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) ১০ম সংস্করণ, ১৪০৯ সাল, পৃঃ ৯৮ ॥

শরীফ কাজা করিলে পরবর্তী এক বছরের জন্য বহু দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। যাবতীয় আয়-উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়।"[১]

৭. এনায়েতপূরী সাহেব বলেছেন ঃ এই তরিকায় মৌখিক যেকের বা উচ্চস্বরে যেকের করার নিয়ম নাই।[২]

এই বক্তব্য অবশ্যই কুরআন হাদীছ বিরোধী। কারণ কুরআন হাদীছে যে যিক্‌র করার কথা এসেছে, তার মধ্যে অবশ্যই মৌখিক যিক্‌র অন্তর্ভুক্ত।

আটরশী

(আটরশীর পীর ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস)

"আটরশীর পীর" বলতে ফরিদপুর শহরের নিকটস্থ আটরশি বিশ্বজাকের মঞ্জিল -এর প্রতিষ্ঠাতা শাহসুফী হাশমত উল্লাহকে বোঝানো হয়েছে। তিনি এনায়েতপুরের পীর শাহসুফী মুহাম্মদ ইউনুস আলী এনায়েতপুরীর মুরীদ ও খলীফা। জনাব হাশমত উল্লাহ সাহেব জামালপুর জেলার অন্তর্গত শেরপুর থানার পাকুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শাহ আলীম উদ্দীন। জনাব হাশমত উল্লাহ সাহেবের বয়স যখন পাঁচ/ছয় বৎসর, তখন নোয়াখালীর মাওলানা শরাফত আলী সাহেবের নিকট আরবী, ফার্সীর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এতটুকুই তার নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়ার ইতিহাস পাওয়া যায়। দশ বৎসর বয়সের সময় তার পিতা তাকে এনায়েতপুরীর পীর শাহ সুফী ইউনুস আলীর খেদমতে অর্পন করেন। ত্রিশ বৎসর যাবত তিনি এনায়েতপুরী সাহেবের কাছে থাকেন। অতপর এনায়েতপুরী সাহেবের নির্দেশে ফরীদপুরে এসে "জাকের ক্যাম্প" নামে একটি ক্যাম্প স্থাপন করেন। পরবর্তিকালে এটারই নাম দেয়া হয় "বিশ্ব জাকের মঞ্জিল"।[৩]

আটরশীর পীর জনাব হাশমত উল্লাহ সাহেব কর্তৃক লিখিত একখানা বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। সেটি হল "বিশ্বজাকের মঞ্জিলের পরিচালনা পদ্ধতি"। এ ছাড়া বিশ্ব জাকের মঞ্জিল কর্তৃক "শাহ সুফী হযরত ফরিদপুরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত" নামে তার বয়ান ও নসিহত সমূহের সংকলন বের করা হয়েছে বাইশ খণ্ডে। এই খণ্ডসমুহের আলোচনার সিংহভাগই মা'রেফাত সংক্রান্ত মাকাম, লতীফা, ছায়ের, উরূয ইত্যাদি তাসাওউফের নানান পরিভাষা সংক্রান্ত বিষয় এবং অনেকটা অবোধগম্য আলোচনায় ভরা। যে সব বিষয় সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে স্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। যেগুলি কোন কোন বুযুর্গের কাশ্‌ফ এবং অনেকের কল্পনার সমষ্টি, যা অন্য কারও জন্য দলীল নয়। তদুপরি এসব বক্তব্যকে সমর্থিত করার জন্য তিনি কুরআন-হাদীছ থেকে যে সব দলীলের অবতারণা করেছেন, তার মধ্যে বহু সংখ্যক মওযূ' বা জাল হাদীছ বিদ্যমান। আবার রয়েছে

১. সাহসূফী হযরত ফদিরপূরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত" প্রকাশকঃ পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপূর, খণ্ড ২১, পৃঃ ৪৯, সংস্করণ ৩য়, ৫ই জুন-২০০১ ॥

২. "ওজিফা ও উপদেশ", সম্পাদক ঃ পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দীন - সাজ্জাদনসীন এনায়েতপুর, পৃঃ ৩৬ ॥

৩. তথ্যসূত্র ঃ বিশ্বজাকের মঞ্জিলের পরিচালনা পদ্ধতি, শাহ সুফী ফরিদপুরী, ও সংক্ষিপ্ত ওজিফা, মাহ্‌ফুযুল হক, প্রকাশনায় বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ২০ তম সংস্করণ ॥

বাতিনী সুফীদের ন্যায় অগ্রহণযোগ্য তাবীল বা অপব্যাখ্যা। তার এসব নসিহতের বইতে বিদ্যমান জাল হাদীছের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল, যেগুলি হাদীছ নয় বরং প্রচলিত কথা বা কোন ব্যক্তি বা কোন সূফীর কথা; অথচ তিনি সেগুলোকে অবলিলায় হাদীছ বলে চালিয়ে দিয়েছেন। কুরআন হাদীছ সম্পর্কে জ্ঞান-স্বল্পতাই এর অন্যতম কারণ।

(১) موتوا قبل ان تموتوا - قال ابن حجر : انه ليس بثابت ، وقال القارى : من كلام الصوفية - (كذا فى المقاصد الحسنة وكشف الخفاء ومزيل الالباس -)

(২) من عرف نفسه فقد عرف ربه - قال النووى : انه ليس بثابت ، وقيل هو قول يحيى بن معاذ الرازى ، وقال ابن تيمية : موضوع - (كذا فى المقاصد الحسنة وكشف الخفاء ومزيل الالباس -)

(৩) كنت كنزا لا اعرف فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا . الحديث - قال ابن تيمية : انه ليس من كلام النبى ﷺ ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وكذا قال ابن حجر والزركشى - (كذا فى اللآلى المصنوعة للسيوطى والمقاصد الحسنة للسخاوى وكشف الخفاء ومزيل الالباس للعجلونى -)

(٤) قلوب المؤمنين عرش الله - قال الصغانى موضوع - (كشف الخفاء ومزيل الالباس للعجلونى -)

(٥) لولاك لما خلقت الافلاك - قال الصغانى موضوع - (ايضا)

এ ধরনের বহু জাল হাদীছ তার বক্তব্যের সর্বত্র বিদ্যমান।

তার এসব বই এবং বিশ্ব জাকের মঞ্জিল থেকে প্রকাশিত অন্যান্য কয়েকটি বই থেকে তার ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস সম্বন্ধে যা জানা যায় তা নিম্নরূপঃ

১. পীর সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা ঃ

পীর সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা তাদের একটি প্রধান বিভ্রান্তি। যেমন ঃ

(এক) ভাল-মন্দ পীরের হাতে।

আট রশির পীর সাহেব বলেছেনঃ "এনায়েতপুরী (কুঃ) ছাহেব তিরোধানের পূর্বে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন, "বাবা, তোর ভাল ও মন্দ -উভয়টাই আমার হাতে রইল। তোর কোন চিন্তা নেই।"[১]

১. "সাহসূফী হযরত ফদিরপূরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত" খণ্ড নং ৩, পৃঃ ১১১ প্রকাশকঃ পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর, ৩য় মুদ্রণ ১লা মে- ১৯৯৯ ॥

খণ্ডন ঃ

এনায়েতপূরী সাহেবের আকীদাও অনুরূপ ছিল। পূর্বে এনায়েতপূরী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এটা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা পরিপন্থী। এটা কুরআন ও সহীহ্ হাদীছে পরিষ্কার ভাবে যা বলা হয়েছে, তার বিরোধী। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে ঃ

قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا -

(সূরাঃ ৪-নিসাঃ ৭৮)

হাদীছে বলা হয়েছে ঃ

والخير والشر كله بيديك -

অতএব সকলের ভাল-মন্দ আল্লাহ্‌র হাতে কোন মানুষের হাতে নয়।

উল্লেখ্য ঃ এ শ্রেণীর লোকেরা পীরকে খোদার স্তরে পৌঁছে দিয়ে পীরের মধ্যে খোদায়ী গুণ আরোপ করেছে। তাই ভাল-মন্দ সম্পাদন করার খোদায়ী গুণ পীরের মধ্যে থাকাকে সাব্যস্ত করেছে। আর পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি -যারা আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য না করার মত পোষণ করেন, বা মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রবেশ করার মত পোষণ করেন, বা পীর মাশায়েখকে খোদার স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন, তারা এ বিষয়ে সাধারণত وحدة الوجود বা "সর্বেশ্বরবাদ"-দর্শনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এটা করে থাকেন। এ সম্পর্কে অত্র অধ্যায়ের শেষভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৫২৫।

(দুই) পীর পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবে ঃ

আটরশির পীর সাহেব বলেন ঃ "দুনিয়াতে থাকাবস্থায় তোমরা খোদা প্রাপ্তির পাথে যে যতটুকুই অগ্রসর হওনা কেন, তোমাদের ছায়ের-ছুলূক যদি জীবৎকালে সম্পন্ন নাও হয়, তবুও ভয় নাই। মৃত্যুর পরে কবরের মধ্যে দুই পূণ্যাত্মা (অর্থাৎ, রাসূলে পাক (সাঃ) এবং আপন পীর) তোমাকে প্রশিক্ষণ দিবেন। মা'রেফাতের তালিম দিবেন; ফলে হাশরের মাঠে সকলেই আল্লাহ্‌র অলী হইয়া উঠিবেন। এই করণেই বলা হয় -এই তরিকায় যিনি দাখিল হন, তিনি আর বঞ্চিত হন না।"[১]

পীর-মাশায়েখগণ মুরীদদের পাপের বোঝা বহন করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন এমন হবে না। এ ধারণাটি খৃষ্টানদের "প্রায়শ্চিত্যের আকীদা" (عقيدة كفاره)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ আকীদা কুফ্‌রী আকীদা। খৃষ্টানগণ মনে করে হযরত ঈসা (আঃ) নিজের প্রাণ দিয়ে তার অনুসারীদের মুক্তির ব্যবস্থা করে গেছেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

ولا تزر وازرة وزر اخرى -

অর্থাৎ, কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না। (সূরাঃ ৬-আন্‌আমঃ ১৬৫) কাজেই পীর ধরলে মুক্তি হবে এমন ধারণা চরম গোমরাহী মূলক আকীদা। তবে হ্যাঁ হক্কানী পীর মাশায়েখের হেদায়েত মেনে চললে তার ফায়দা অবশ্যই রয়েছে সেটা স্বতন্ত্র কথা।

১. "সাহসূফী হযরত ফদিরপূরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত" খণ্ড নং ৪, পৃঃ ৯৩ প্রকাশকঃ পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর, ৪র্থ মুদ্রণ, ৮ই এপ্রিল ১৯৯৮ ইং পৃঃ ৯৩ ॥

পীর তা'লীম দিয়ে বা কোনভাবে মুরীদের নাজাতের ব্যবস্থা করতে পারবে- এ ধারণা ভ্রান্ত। কেউ নিজে আমল করে নিজের নাজাতের ব্যবস্থা না করলে কোন পীর তাকে নাজাত দিতে পারবে না। স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) তার গোত্রের লোক বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব সহ নিজ কন্যা ফাতেমাকে পর্যন্ত আহবান করে বলেছেনঃ তোমরা নিজেদের নাজাতের ব্যবস্থা নিজেরা কর, আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারব না। ইরশাদ করেছেনঃ

يا بنى هاشم ! انقذوا انفسكم من النار فانى لا اغنى عنكم من الله شيئا - يا بنى عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار فانى لا اغنى عنكم من الله شيئا - يا فاطمة ! انقذى نفسك من النار فانى لا اغنى عنك من الله شيئا ..... - (مسلم)

অর্থাৎ, হে বনী হাশেম ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। হে বনূ আব্দিল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। হে ফাতেমা ! তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। ..... ।

(তিন) পীর দুনিয়াতে সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন ঃ

আটরশির পীর সাহেব বলেন ঃ মুর্শিদে কামেল তদীয় মুরীদ পৃথিবীর যে স্থানেই থাকুক না কেন সেই স্থানেই তাহাকে কুওতে এলাহিয়ার হেফাযতে রাখিতে পারেন। মুর্শিদে কামেলকে আল্লাহ এইরূপ ক্ষমতা দান করেন। শুধু মুরীদকেই নয় মুরীদের আত্মীয় স্বজন, মাল সামানা, বাড়ী-ঘর যাহা কিছুই খেয়াল করুক, তাহার সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার কুওতের কেল্লায় বন্দী করিয়া দেন।[১]

এ ধারণা স্পষ্টতঃ কুরআন বিরোধী ধারণা। আল্লাহ পাক কারও কোন বিপদের ফয়সালা করলে কেউ তাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو . الاية -

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তোমার কোন অকল্যাণ ঘটান, তাহলে তা হটানোর কেউ নেই। (সূরাঃ ১০-ইউনুসঃ ১০৭)

পীর তার মুরীদ এবং মুরীদের আত্মীয়-স্বজনকে সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করতে পারলে আটরশি সাহেবের মুরীদ ও তাদের আত্মীয়-স্বজন কেন পথে-ঘাটে দুর্ঘটনার শিকার হন? কেন তারা আততায়ীর হাতে নিহত হন? কেন তাদের বাড়ি-ঘরে চুরি ডাকাতি হয় ?

১. "সাহসূফী হযরত ফদিরপূরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত" প্রকাশকঃ পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর, খণ্ড ৬, পৃঃ ৩৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৭ই জুলাই-১৯৯৭ ইং ॥

২. পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অবশ্যকতা নেইঃ

আটরশির পীর সাহেব বলেনঃ "হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানগণ নিজ নিজ ধর্মের আলোকেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে পারে এবং তাহলেই কেবল বিশ্বে শান্তি আসতে পারে। (আটরশির কাফেলা সংকলনে মাহফুযুল হক, আটরশির দরবার থেকে প্রকাশিত, পৃঃ ৮৯, সংস্করণ-১৯৮৪-)[১]

খন্ডন ঃ

ان الدين عند الله الاسلام -

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ১৯)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخسرين -

অর্থাৎ , কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করলে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এমন ব্যক্তি পরকালে চির হতভাগাদের দলে থাকবে। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ৮৫)

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

لوكان موسى حيا لما وسعه الا اتباعى - (مشكوة عن احمد و البيهقى)

অর্থাৎ, হযরত মূসা নবীও যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ না করে তাঁরও কোন উপায় থাকত না।

৩. চার মাযহাব ও ইমামগণ সম্বন্ধে কটুক্তিঃ

আটরশির দরবার হতে প্রকাশিত বহু গ্রন্থের প্রণেতা এবং আটরশির প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক লেখক মাহফুযুল হক সাহেব লিখেছেন, "ইসলামী আইন ব্যবস্থার বর্তমান অব্যবস্থা ও অবক্ষয়ের জন্য আইনের বিধানসমূহ বা রীতিসমূহ দায়ী নহে; বরং এই অবক্ষয়ের মূল কারণ আইন প্রণেতাগণের (ইমামগণের) অনমনীয় নীতি। এই অনমনীয় নীতি অবলম্বনের দ্বারাই ইসলামী আইন প্রণেতাগণ কালক্রমে ইসলামী আইনের মৌলিক কাঠামোর মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া আইনকে একটি অনমনীয় ও বাস্তবতার সহিত সমঞ্জস্যহীন শাস্ত্রে পরিণত করেন।[২]

এখানে সব মাযহাবের ইমামগণকে মনগড়া ব্যাখাদানকারী ও সমস্ত মাযহাবের ফেকাহশাস্ত্রকে অবাস্তব শাস্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এভাবে সমস্ত মাযহাবের সমস্ত মুসলমানকে শাস্ত্রহীন তথা ধর্মহীন আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা খুব কম বাতিলপন্থীই বলেছে।

১. তাসাওউফ, তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, পৃঃ ১৪৭ প্রকাশকাল-২০০০ খৃঃ ১৪২১ হিঃ ॥

২."ইসলামের রূপরেখা" লেখক, মাহফুযুল হক, দ্বিতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ঃ ১৯৮২, প্রকাশনায় ঃ ইসলামী গবেষণা ও সংস্কৃতি পরিষদ, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, পৃষ্ঠা নং ২৪ ॥

৪. ওরস সম্বন্ধে তাদের বাড়াবাড়ি ঃ

ওরস সম্পর্কে তাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রয়েছে। আটরশির পীর সাহেব এনায়েতপুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ ওরস শরীফ কাজা করিলে পরবর্তী এক বছরের জন্য বহু দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। যাবতীয় আয়-উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়।"[১]

বি ঃ দ্র ঃ ওরস অবৈধ হওয়া সম্বন্ধে "ওরস প্রসঙ্গ" শিরোনামে দলীল প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃ ঃ নং ৫৮৬।

চন্দ্রপুরী

(চন্দ্রপাড়ার পীর আবুল ফযল-এর চিন্তাধারা)

চন্দ্রপাড়া ফরীদপুর জেলা শহর থেকে অদূরে একটি গ্রাম। এখানকার অধিবাসী মৌঃ সায়্যিদ আবুল ফযল সুলতান আহমদ (মৃত ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ) চন্দ্রপাড়া পীর নামে খ্যাত। তিনি শাহ সূফী ইউনুস আলী এনায়েতপুরীর শিষ্য। তিনি দেওয়ানবাগী পীর মাহবূব-এ খোদার পীর ও শ্বশুর।

চন্দ্রপাড়ার পীর আবুল ফযল সুলতান আহমদ-এর ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যে রয়েছে ঃ

১. কোন লোক বড় বুযুর্গ হলে তার আর ইবাদত লাগে না। স্বয়ং আবুল ফযল কর্তৃক লিখিত "হাক্কুল ইয়াক্বীন" পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠায় আছেঃ

"কোন লোক যখন মাকামে ছুদূর, নশোর, শামসী, নূরী, কুরবে মাকিনের মোকাম অতিক্রম করিয়া নফ্সীর[২] মোকামে গিয়ে পৌঁছে, তখন তাঁহার কোন ইবাদত থাকে না। জয্বার অবস্থায়ও কোন লোক যখন ফানার শেষ দরজায় গিয়ে পৌঁছে, তখনও তাহার কোন ইবাদত থাকে না। এমনকি তখন ইবাদত করিলে কুফ্রী হইবে। তাসাওউফের বহু কিতাবে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে।"[৩]

খণ্ডনঃ

* সুরেশ্বরী পীরের আকীদাও অনুরূপ ছিল। পূর্বে "সুরেশ্বরী" পীর-এর আকীদা-বিশ্বাস আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ এ আকীদার খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। তবে সুরেশ্বরী পীর এত আগে বেড়ে বলেননি যে, কামেল লোকদের জন্য ইবাদত করা কুফ্রী। যেমনটি চন্দ্রপাড়ার পীর বলেছেন।

১. সাহসূফী হযরত ফদিরপূরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত" প্রকাশকঃ পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপূর, খণ্ড ২১, পৃঃ ৪৯, সংস্করণ ৩য়, ৫ই জুন-২০০১ ॥

২. দেওয়ানবাগী মাহবূবে খোদা "আল্লাহ কোন পথে" বইয়ে (২য় সংস্করণ) লিখেছেনঃ কলবে ৭টি স্তরের মধ্যে নফসীর মর্যাদা সবার উর্দ্ধে। (পৃঃ ৯০) এ থেকে বোঝা গেল চন্দ্রপাড়ার পীরের মতবাদ হল বড় বুযুর্গ হলে তার কোন ইবাদত থাকে না। এমনকি তার জন্য তখন ইবাদত করা কুফরী ॥

৩. তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, ২৪৬ পৃঃ বরাত- হাক্কুল ইয়াকীন (অনুভবলব্ধ জ্ঞান) দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৭৮, পৃঃ ২৯ ॥

* চন্দ্রপাড়া পীরের মতবাদ অনুসারে বলতে হবে সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল (সাঃ) বুযুর্গির উচ্চস্তরে উন্নিত হননি নতুবা তাঁরা কেন ইবাদত করতেন? যদি তারা মেনে নেন এবং অন্ততঃ রাসূল (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই বলতে বাধ্য হবেন যে, রাসূল (সাঃ) বু-যুর্গির উচ্চস্তরে উন্নিত হয়েছিলেন, তাহলে নাউযুবিল্লাহ বলতে হবে তিনি এই স্তরে উন্নিত হওয়া সত্ত্বেও ইবাদত করে কুফ্রীতে লিপ্ত হয়েছিলেন। এমন আকীদার কুফ্রী হওয়ার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই।

২. চন্দ্রপাড়ার পীরের দ্বিতীয় ভ্রান্ত মতবাদ হল জিব্রাঈল এবং আল্লাহ এক ও অভিন্ন। চন্দ্রপাড়া পীরের জামাতা দেওয়ানবাগী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "সুফী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ" থেকে প্রকাশিত মাসিক "আত্মার বাণী" (৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) পত্রিকায় আছে ঃ সুলতানিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকার ইমাম চন্দ্রপুরী ফরমানঃ জিব্রাঈল বলতে অন্য কেহ নন স্বয়ং হাকীকতে আল্লাহ।[১]

খন্ডন ঃ

জিব্রাঈল (আঃ) একজন ফেরেশতা। ফেরেশতা আল্লাহ্র মাখলূক ও আল্লাহ্র দাস। অতএব হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ্র মাখলূক ও তাঁর দাস। খালেক আর মাখলূক এক নয়।

ফেরেশতাগণ যে আল্লাহ্র সৃষ্টি তার প্রমাণ হল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

ام خلقنا الملئكة اناثا وهم شاهدون -

অর্থঃ অথবা আমি কি ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম আর তারা প্রত্যক্ষ করেছিল ? (সূরাঃ ৩৭-সাফ্ফাতঃ ১৫০)

আর ফেরেশতাগণ যে আল্লাহর দাস অর্থাৎ, তাঁর দাসত্ব করাই ফেরেশতাদের কাজ, তা প্রমাণিত হয় নিম্নোক্ত আয়াত থেকে ঃ

وجعلوا الملئكة الذين هم عباد الرحمن اناثا -

অর্থাৎ, তারা দয়াময় আল্লাহ্র বান্দা ফেরেশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে। (সূরাঃ ৪৩- যুখরুফঃ ১৯)

৩. আল্লাহ্র ফেরেশতারা আল্লাহ্র নাফরমানী করেঃ

দেওয়ানবাগ হতে প্রকাশিত আত্মারবাণী ৫ম বর্ষ ৬ষ্ট সংখ্যার ২৫ নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে ১৪/১১/৮২ ইং এশার সময় জনৈক মুরিদ জিজ্ঞাসা করিল "বাবাজান ইবলিছের গলায় পায়গম্বরী হার হইল কেন ?" এর জবাবে চন্দ্রপাড়ার পীর মৌঃ সুলতান আহমাদ বলিলেন, "ইবলিছের অধীনে অসংখ্য ফেরেশতা কাজ করতেছে। চন্দ্রপুরী বলেন, ইবলিছ তার অধীনে যে ফেরেশতা আছে তাদের বলতেছে, এই ফেরেশতা তুই এই কর। বিভিন্ন নাম আছে তো, তুমি এইডা বানাও, তুমি ঐডা বানাও। এরে চোর বানাও। ওরে চোট্টা বান-াও। ওরে সাধু বানাও। সে হুকুম করতেছে তারা (ফেরেশতারা) বানাইতেছে। (২৬ পৃঃ)[২]

১.বাতিল পীরের পরিচয়, মুফতী মুহাম্মাদ শাসছুল হক , পৃঃ ২২ ॥

২.প্রাগুক্ত. পৃঃ ২৩ ॥

একথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, চন্দ্রপুরীর মতে আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে।

খণ্ডন ঃ

আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা সর্বদা আল্লাহ্‌র হুকুমের তাবেদারীতে লিপ্ত। তাঁর ইবাদতে লিপ্ত। তাঁরা কখনও আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে না, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন ঃ

لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون -

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তারা তাই করেন। (সূরা ঃ ৬৬-তাহ্‌রীম ঃ ৬)

৪. চন্দ্রপাড়ার পীর পুনর্জন্মবাদের প্রবক্তা। মাসিক আত্মার বাণী ৫ম বর্ষ ৬ষ্ট সংখ্যা ২৬ পৃষ্ঠায়[১] লেখা হয়েছে ঃ চন্দ্রপুরী ফরমাইলেন, "পূনর্জন্ম সম্বন্ধে কুরআনেই আছে-

كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون-

অর্থাৎ, কিভাবে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কুফ্‌রী কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন, অনন্তর তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ২৮)

চন্দ্রপুরীর মতে এখানে ثم يحييكم -এর অর্থ পৃথিবীতে পুনরায় জন্মলাভ করা।

খণ্ডন ঃ

জমহুরের মতে এখানে ثم يحييكم -এর অর্থ হাশরে পুনরায় জীবিত অবস্থায় উত্থিত হওয়া। আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করা কুফ্‌রী।[২] পুনর্জন্মবাদ সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ১১৫।

চন্দ্রপুরীর تكفير/تضليل প্রসঙ্গ ঃ

* শরঈ উযর বা কারণ ব্যতীত ইবাদত ফরয না হওয়ার আকীদা-বিশ্বাস একটি কুফ্‌রী আকীদা। আর তিনি ইবাদত করাকেই কুফ্‌রী বলেছেন ! তদুপরি একটি ফরয কাজকে কুফরী ঘোষণা দানও একটি কুফ্‌রী। শরহে আকাইদ গ্রন্থে আছে ঃ

ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغا الى حيث يسقط عنه الامر والنهى .... وهذا كفر وضلال -

অর্থাৎ, বান্দা যতক্ষণ সুস্থ মস্তিষ্ক বালেগ থাকে ততক্ষণ যত বড় আবেদ হোক না কেন তার উপর হতে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ রহিত হয় না। রহিত হওয়ার আকিদা কুফ্‌র ও পথভ্রষ্টতা।

১. বাতিল পীরের পরিচয়, মুফতী মুহাম্মাদ শাসছুল হক , পৃঃ ২২ ॥ ২. كشاف اصطلاحات الفنون ॥

* তারা আল্লাহ্‌র মাখলূক ফেরেশতাকে আল্লাহ্‌র সাথে অভিন্নতার মত পোষণ করে মাখলূককে খালেক সাব্যস্ত করেছে। আর খোদার কোন মাখলূককে খোদা সাব্যস্ত করা কুফ্‌রী। তাছাড়া জিব্রাঈল (আঃ) সম্পর্কিত ধারণা জরূরিয়াতে দ্বীন (ضروريات دين)-এর[১] অন্তর্ভুক্ত। হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্দহ্‌লবী বলেনঃ এ ধরনের ক্ষেত্রে কোন ভিন্নতর ব্যাখ্যা প্রদান (تاويل) এটাকে অস্বীকার করার নামান্তর। আর এ ধরনের বিষয়কে অস্বীকার করা কুফ্‌রী।[২]

দেওয়ানবাগী

(দেওয়ানবাগী পীর ও তার চিন্তাধারা)

তার নাম মাহবূবে খোদা। ২৭ শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আশুগঞ্জ থানাধীন বাহাদুরপুর গ্রামে তার জন্ম। তার পিতা সৈয়দ আবদুর রশীদ সরকার। প্রাথমিক স্কুল শিক্ষার পর তিনি তালশহর করিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীতে রিলিজিয়াস টিচার পদে চাকুরী করেন। ফরিদপুরস্থ চন্দ্রপাড়া দরবারের প্রতিষ্ঠাতা মৃত আবুল ফযল সুলতান আহ্‌মদ (চন্দ্রপাড়ার পীর) ছিলেন তার পীর এবং শ্বশুর। মাহবূবে খোদা নিজে এবং তার ভক্তবৃন্দ তাকে "সূফী সম্রাট" হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

তিনি ঢাকার অদূরে দেওয়ানবাগ নামক স্থানে একটি এবং ১৪৭ আরামবাগ ঢাকা-১০০০ তে 'বাবে রহমত' নামে আরেকটি দরবার স্থাপন করেছেন। তিনি সূফী ফাউণ্ডেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। যা উপরোক্ত আরামবাগের ঠিকানায় অবস্থিত। উক্ত ফাউণ্ডেশন থেকে তার তত্তাবধানে এবং নির্দেশে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ঃ

১. সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী অবদান আল্লাহ কোন্ পথে ?
২. সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার
৩. স্রষ্টার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সূফী সম্রাট ঃ আল্লাহ্‌কে সত্যিই কি দেখা যায় না ?
৪. বিশ্ব নবীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সূফী সম্রাট ঃ রাসূল (সঃ) কি সত্যিই গরীব ছিলেন ?
৫. মুক্তি কোন্ পথে ?
৬. শান্তি কোন্ পথে ?
৭. ওয়াজিফা
৮. মানতের নির্দেশিকা
৯. এজিদের চক্রান্তে মোহাম্মাদী ইসলাম

১. এটি একটি পরিভাষা, এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ১৯৪ পৃষ্ঠা ॥
২. عقائد الاسلام ॥

১০. সুলতানিয়া খাবনামা প্রভৃতি। এ ছাড়া উক্ত ফাউণ্ডেশন কর্তৃক 'মাসিক আত্মার বাণী' ও 'সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এসব গ্রন্থ ও পত্রিকার বর্ণনা থেকে দেওয়ানবাগী সাহেবের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে যা জানা যায়, তা হল ঃ

দেওয়ানবাগী সাহেবের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা ঃ

১. মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা জরূরী নয়। যেমন 'আল্লাহ কোন পথে' গ্রন্থে লেখা হয়েছে ঃ যে কোন ধর্মের লোক তার নিজস্ব অবস্থায় থেকে আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পন করে তাঁর বিধানমত নিজেকে পরিচালিত করতে পারে। তাহলে নামধারী কোন মুসলমানের চেয়েও সে উত্তম। মোটকথা ইসলাম বা মুসলিম কোন ব্যক্তির নাম নয়, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দিষ্ট বিধান এবং বিধান পালনকারীর নাম। যে কোন অবস্থায় থেকে এই বিধান পালন করতে পারলেই তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা যায়। আর যে কোন কুলে থেকেই এই চরিত্র অর্জন করতে পারলে তার মুক্তি হওয়া সম্ভব। (অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ জরূরী নয়।)[১]

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ দেওয়ানবাগী বলেন ঃ আমার এখানে এক ব্যক্তি আসে। সে ভিন ধর্মের অনুসারী। তার ধর্মে থেকেই ওজীফা আমলের নিয়ম তাকে বলে দিলাম। কিছু দিন পর লোকটা এসে আমাকে জানালো- হুজুর একরাত্রে স্বপ্নে আমার রাসূল (সঃ)-এর রওযা শরীফে যাওয়ার খোশ নসীব হয়। সেখানে গিয়ে উনার কদম মোবারকে সালাম দিয়ে জানালাম যে, শাহ দেওয়ানবাগী হুজুর কেবলার দরবার শরীফ থেকে এসেছি। নবীজি শায়িত ছিলেন। তিনি দয়া করে উঠে বসলেন। নবীজি তাঁর হাত মোবারক বাড়িয়ে আমার সাথে মোসাফা করলেন। মোসাফা করার পর থেকে আমার সারা শরীরে জিকির অনুভব করতে পারি। ..... এখন আমার অবস্থা এই যে, যখন যা কিছু করতে চাই তখন আমার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ চলে আসে-তুমি এভাবে চল।[২]

খন্ডন ঃ

ان الدين عند الله الاسلام -

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ১৯)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخسرين -

অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করলে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এমন ব্যক্তি পরকালে চির হতভাগাদের দলে থাকবে। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ৮৫)

১. সূত্র ঃ 'আল্লাহ কোন পথে ? ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, পৃঃ ১১৩-১১৪ ও ১২৫-১২৬ ॥
২. 'মানতের নির্দেশিকা' পৃঃ ৩১, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন, ২০০১ ॥

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

لوكان موسى حيا لما وسعه الا اتباعى - (مشكوة عن احمد والبيهقى)

অর্থাৎ, হযরত মূসা নবীও যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ না করে তাঁরও কোন উপায় থাকত না।

২. তিনি জান্নাত, জাহান্নাম, হাশর, মীযান, পুলসিরাত, কিরামান কাতেবীন, মুনকার নাকীর, ফেরেশতা, হুর, তাকদীর, আমলনামা ইত্যাদি ঈমান-আকীদা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়কে অস্বীকার করেছেন। অর্থাৎ, এগুলোর তিনি এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা এগুলো অস্বীকার করার নামান্তর। 'আল্লাহ কোন্ পথে?' গ্রন্থে সে ব্যাখ্যাগুলো বিদ্যমান। উক্ত গ্রন্থে প্রথমে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ সব বিষয়ে যে আকীদা-বিশ্বাস রাখেন সেগুলোকে প্রচলিত ধারণা[১] বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তারপর আল্লাহপ্রাপ্ত সাধকগণের বরাত দিয়ে সেগুলোর এমন অর্থ বলা হয়েছে যা এগুলোকে অস্বীকার করার নামান্তর। যেমন ঃ বলা হয়েছে প্রচলিত ধারণা মতে 'হুর' বলতে বেহেশতবাসীর জন্য নির্ধারিত সুন্দরী রমণীকে বুঝানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছেঃ আল্লাহপ্রাপ্ত সাধকগণ বলেন 'হুর' বলতে মানুষের জীবাত্মা বা নফ্‌সকে বুঝায়। এভাবে ঈমান আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হল। যেমন ঃ

* **জান্নাত** সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "প্রভূর সাথে পুনরায় মিলনে আত্মার যে প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ হয় উহাই শ্রেষ্ঠ সুখ। এ মহামিলনের নামই প্রকৃত জান্নাত।"[২] এখানে জান্নাতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং জান্নাত বলতে আত্মিক সুখকে বোঝানো হয়েছে।

* জান্নাতের **হুর** সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ হুর বলতে মানুষের জীবাত্মা বা নফ্‌সকে বুঝায়।[৩]

* **জাহান্নাম** সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ " আত্মার চিরস্থায়ী যন্ত্রনাদায়ক অবস্থাকেই জাহান্নাম বলে।"[৪] এখানে জাহান্নামের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং আত্মার যন্ত্রনাকে জাহান্নাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

* **হাশর** বা পুনরুত্থান সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ " সূফী সাধকগণের দৃষ্টিতে মানুষের হাশর পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হয়ে থাকে। মানুষকে তার কর্মের প্রতিফল সঙ্গে সঙ্গেই প্রদান করা হয়। অর্থাৎ, কর্ম সম্পাদনের সাথে সাথে পরিণতি হিসেবে মানুষের উন্নতি বা অবনতি লাভ হয়।"[৫] এখানে মৃত্যুর পর স্বশরীরে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা হয়েছে।

উক্ত গ্রন্থে অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় মৃত্যুর পর স্বশরীরে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে বলা হয়েছে ঃ " প্রকৃত পক্ষে (মৃত্যুর পর) মৃত ব্যক্তির দেহের কোন ক্রিয়া থাকে না, তার আত্মার উপরেই সব কিছু হয়ে থাকে। আর এ আত্মাকে পরিত্যক্ত দেহে আর কখনো প্রবেশ করানো হয় না।[৬]

১. প্রচলিত ধারণা তাদের মতে প্রকৃত ধারণা নয়, অর্থাৎ, এটা ভুল -এ কথা 'আল্লাহ কোন্ পথে ?' গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে ॥ ২. 'আল্লাহ্ কোন্ পথে ? ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, পৃঃ ৪০॥ ৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১২ ॥ ৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪ ॥ ৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪ ॥ ৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯ ॥

* **পুলসিরাত** সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ " পুলসিরাত পার হওয়া বলতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর কায়েম থাকা এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করাকে বুঝায়।"[১]

* **মীযান** সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ " মিযান বলতে মানুষের ষড়রিপুমুক্ত পরিশুদ্ধ বিবেককে বুঝায়।[২]

* **মুনকার-নাকীর** সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ মুনকার ও নাকীর বলতে কোন ব্যক্তির ভাল ও মন্দ কর্ম বিবরণীকে বুঝায়।[৩]

* **কিরামান কাতেবীন** সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ পরমাত্মায় বিদ্যমান সূক্ষ্ম শক্তি যা ফেরেশতার ন্যায় ক্রিয়াশীল উহাই আলাদা আলাদা ভাবে পাপ এবং পূণ্যের বিবরণী লিপিবদ্ধ করে অর্থাৎ, তা পরমাত্মার স্মৃতিফলকে সংরক্ষিত হয়।[৪]

* **আমলনামা** সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ আমলনামা বলতে মানুষের সৎ কর্মের দ্বারা আত্মার উন্নতি এবং অপকর্মের দ্বারা আত্মার অবনতিকে বুঝায়।[৫]

* **ফেরেশতা** সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ ফেরেশতা আলমে আমর বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগতের বস্তু, যা ষড়রিপুমুক্ত পুতঃপবিত্র আত্মাবিশেষ। মানুষের মাঝে ২টি আত্মা রয়েছে। একটি জীবাত্মা এবং অপরটি পরমাত্মা। পরমাত্মার ২টি অংশ। যথা-মানবাত্মা ও ফেরেশতার আত্মা। এই ফেরেশতার আত্মাই মানুষের দেহের ভিতরে ফেরেশতার কাজ করে থাকে।[৬]

* দেওয়ানবাগীর বিশ্বাস হল **আল্লাহ ও জিব্রাঈল এক ও অভিন্ন**। "আত্মার বাণী" (৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) পত্রিকায় আছে[৭] ঃ সুলতানিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকার ইমাম চন্দ্রপুরী ফরমানঃ জিব্রাঈল বলতে অন্য কেহ নন স্বয়ং হাকীকতে আল্লাহ। উল্লেখ্য - এ পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি হলেন মাহবূবে খোদা দেওয়ানবাগী স্বয়ং নিজে।

* **তাক্‌দীর** সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ তাক্‌দীর বলতে মানুষের কর্মফলকে বুঝায়। অর্থাৎ, মানুষের কর্মের দ্বারা অর্জিত উন্নতি অবনতির সংরক্ষিত হিসাব-নিকাশকে বুঝায়। সৃষ্টির আদি হতে অদ্যাবধি এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের আত্মা বিভিন্ন বাহনে আরোহন পূর্বক কর্মের যে স্মরণীয় স্মৃতিশক্তি আত্মার মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে উহাকেই মূলতঃ তাকদীর বলে।[৮]

এভাবে ঈমান-আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে এমন ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে যা উক্ত বিষয়গুলোকে অস্বীকার করার নামান্তর। অথচ এ বিষয়গুলো জরূরিয়াতে দ্বীন[৯] -এর অন্তর্ভুক্ত। আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট এর যে প্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন অর্থ এবং ব্যাখ্যা, তার উপর সকলের ইজ্‌মা বা ঐক্যমত রয়েছে। আর এ ধরনের জরূরিয়াতে দ্বীনকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। আল্লামা সুবকী (রহঃ) তার جمع الجوامع গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬০ ॥২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭ ॥ ৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯ ॥ ৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৮ ॥ ৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৮ ॥ ৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৩ ॥ ৭. বাতিল পীরের পরিচয়, মুফতী মুহাম্মাদ শাসছুল হক , পৃঃ ২২॥ ৮. 'আল্লাহ্ কোন্ পথে ? ৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩০ ॥ ৯. এটা একটি পরিভাষা, এর অর্থ হল তা এমন বিষয় যা সকলের কাছে সুবিদিত, আম খাস নির্বিশেষে সকলেই সে সম্বন্ধে অবগত ॥

جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر مطلقا -

অর্থাৎ, জরূরিয়াতে দ্বীন -যার উপর ইজমা সংঘটিত আছে- তার অস্বীকারকারী এক বাক্যে কাফের।

তবে এ ধরনের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, প্রথমতঃ যদি তারা কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই বেধড়ক কুরআন হাদীছের ভাষ্যকে অস্বীকার পূর্বক মনগড়া মতামত ব্যক্ত করে। কিংবা শরঈ হুকুমের মাঝে যে ব্যাখ্যা মূলক মতামত (تاويل) তারা দেয়, তা (تاويل)-এর নিয়ম নীতি অনুসরণ করে দেয় না, তাহলে তারা যে ব্যাখ্যা (تاويل)-এর আলোকে নিজেদের ধ্যান-ধারণা পোষণ করেছে তা শরী'আতের নীতি মাফিক না হওয়াতে তারা কুফ্‌রীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

হযরত মাওলানা ইদ্রীছ কান্দেহ্‌লভী লিখেছেন ঃ কোন জরূরিয়াতে দ্বীনের যদি এমন ব্যাখ্যা দেয়া হয় যা তার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থের বিপরীত, তাহলে এটা সে বিষয়কে অস্বীকার করারই নামান্তর।[১]

উপরোক্ত ঈমান-আকীদা সংক্রান্ত বিষয়াদির বাইরে আমলগত বিভিন্ন বিষয়েও তিনি মারাত্মক বিভ্রান্তিকর ও গোমরাহীমূলক ধ্যান-ধারণা পোষণ করেন। যেমন ঃ

১. দেওয়ানবাগী পুনর্জন্মবাদের প্রবক্তা। পূর্বে চন্দ্রপাড়া পীরের আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি পুনর্জন্মবাদের প্রবক্তা ছিলেন। চন্দ্রপাড়ার পীর পুনর্জন্মবাদের প্রবক্তা। মাসিক আত্মার বাণী ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ২৬ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে ঃ চন্দ্রপুরী ফরমাইলেন পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কুরআনেই আছে-

كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون-

অর্থাৎ, কিভাবে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কুফ্‌রী কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন, অনন্তর তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে। (সূরাঃ২-বাকারাঃ ২৮)

চন্দ্রপুরীর মতে এখানে ثم يحييكم -এর অর্থ পৃথিবীতে পুনরায় জন্মলাভ করা। উল্লেখ্য দেওয়ানবাগী উক্ত পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলির সভাপতি এবং চন্দ্রপাড়ার পীর তার পীর ও শশুর। সুতরাং বুঝা যায় দেওয়ানবাগীর আকীদাও অনুরূপ। 'আল্লাহ কোন পথে' গ্রন্থেও পুনর্জন্মবাদের স্বপক্ষে বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য ঃ জমহুরের মতে এখানে ثم يحييكم -এর অর্থ হাশরে পুনরায় জীবিত অবস্থায় উত্থিত হওয়া। আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করা কুফ্‌রী।[২]

২. كشاف اصطلاحات الفنون ॥
১. عقائد الاسلام ॥

২. তিনি নিজে হজ্জ করেননি। এ বিষয়ে তার আল্লাহ্ কোন্ পথে? গ্রন্থে লেখা হয়েছে ঃ তার জনৈক ভক্ত আহমদ উল্লাহ দেওয়ানবাগী সাহেব কেন হজ্জ করেননি- এটা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে যান। স্বপ্নে দেখেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নির্মিত মক্কার কা'বা ঘর এবং স্বয়ং রাসূল (সাঃ) বাবে রহমতে হাজির হয়েছেন। রাসূল (সাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ "তুমি যে ধারণা করতেছ যে, শাহ দেওয়ানবাগী হজ্জ করেননি, আসলে এটা ভুল। আমি স্বয়ং আল্লাহ্র নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর সাথে আছি এবং সর্বক্ষণ থাকি। আর ক্বা'বা ঘরও তাঁর সন্মুখে উপস্থিত আছে। আমার মুহাম্মাদী ইসলাম শাহ দেওয়ানবাগী প্রচার করতেছেন। তাঁর হজ্জ করার কোন প্রয়োজন নেই" ।[১]

এখানে মক্কাস্থিত বাইতুল্লাহ শরীফ গিয়ে হজ্জ পালন করার ফরযিয়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর হজ্জ হল ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের একটি। এটাকে অস্বীকার করা সন্দেহাতীতভাবে কুফ্রী।

এসব কুফ্রী আকীদা-বিশ্বাস ছাড়াও তিনি কুরআন-হাদীছের বহু বক্তব্যকে চরম ভাবে বিকৃত করেছেন। যেমন কুরআনে বর্ণিত হযরত আদম ও হাওয়া কর্তৃক নিষিদ্ধ ফল খাওয়া সম্বন্ধে তার বক্তব্য হল ঃ এই ফল দ্বারা যদি গন্দম ফল ধরা হয়, তাহলে অর্থ হবে গমের আকৃতির ন্যায় নারীদের গোপন অংগ এবং আঞ্জির ফল ধরা হলে তার অর্থ হবে সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা নারীর বক্ষযূগল। অতএব আদম হাওয়ার নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ অর্থ তাদের যৌন মিলন।[২]

জমহুরে উম্মতের নিকট গৃহীত পরিস্কার ব্যাখ্যার বিপরীত এরূপ ব্যাখ্যা প্রদানকারীকে বলা হয় যিন্দীক ও মুলহিদ।

উপরোল্লেখিত বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন আকাইদগত বিষয় ও বিভিন্ন মাসায়েলের ক্ষেত্রে তিনি জমহুরের মতামতের বিপরীত এবং অদ্ভুত ধরনের কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমনঃ

১. আল্লাহ ও রাসূলকে স্বচক্ষে না দেখে কালিমা পড়ে সাক্ষ্য দেয়ার ও বিশ্বাস করার কোন অর্থ হয় না।

২. কুরআন, কিতাব, হাদীছ, তাফসীর পড়ে আল্লাহ্কে পাওয়া যায় না। একমাত্র মুরশিদের সাহায্য নিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা করেই আল্লাহ্কে পাওয়া সম্ভব, এমনকি দুনিয়াতেই স্বচক্ষে দেখা যায়।

৩. আল্লাহ্র সাথে যোগাযোগ সবই ক্বালবেই (অন্তরে) হয়ে থাকে। অন্যভাবে হাজার ইবাদত করেও আল্লাহ্কে পাওয়া যায় না।

৪. সাধনার দ্বারা আল্লাহ্কে নিজের ভিতরেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব, বাইরে কোথাও নয়। কঠিন সাধনার মাধ্যমে আমিত্বকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী

১. আল্লাহ কোন্ পথে? দ্বিতীয় সংস্করণ, মে/১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩। উল্লেখ্য অত্র বইয়ের তৃতীয় সংস্করণে নিরবে এ বিষয়টির উল্লেখ পরিত্যাগ করা হয়েছে ॥

২. 'আল্লাহ্ কোন্ পথে ? ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, পৃঃ ৯৮ ॥

সাধকের সাথে আল্লাহ্ এমন ভাবে মিশে যান, যেমন চিনি দুধের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। তখন ঐ বান্দাকে আল্লাহ থেকে আলাদা করা মুশকিল।

৫. এরূপ ধ্যান করবেন, আদমের জীরেকদম (পায়ের নীচে) ক্বালব। এই কালবে আল্লাহ ও রাসূল থাকেন।

৬. কোরআনে আল্লাহ্ আমাদেরকে এই ধারণা দিচ্ছেন যে, তিনি আমাদের ভিতরে এবং অতি নিকটে অবস্থান করেন কিন্তু আমরা এতই মূর্খ যে, তাঁর অবস্থান সাত আসমানের উপর বলে মনে করে থাকি।

৭. গত ১৯৯৮ সালে বিশ্ব আশেকে রাসূল সম্মেলনে আল্লাহ ও রাসূল স্বয়ং দেওয়ানবাগে এসেছিলেন। আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত সমস্ত আশেকদের তালিকা তৈরী করতে। ঐ তালিকাভুক্ত সবাই বেহেশতে চলে যাবে।[১]

৮. সূর্যোদয় পর্যন্ত সেহরী খাওয়ার সময়। সুবহে সাদেক অর্থ-প্রভাত কাল। হুজুরেরা ঘুমানোর জন্য তাড়াতাড়ি আযান দিয়ে দেয়। আপনি কিন্তু খাবার বন্ধ করবেন না। আযান দিয়েছে নামাযের জন্য। খাবার বন্ধের জন্য আযান দেয়া হয় না।[২]

৯. দেওয়ানবাগী ও তার অনুসারীগণ প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানের উপর অত্যন্ত জোর প্রদান করে থাকেন। তাদের শ্লোগান হল " ঘরে ঘরে মীলাদ দাও রাসূলের শাফাআত নাও"।

এ ধরনের যিন্দীক ও মুলহিদ সূলভ এবং কুফ্রী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও দেওয়ানবাগী সাহেবের দাবী হল ঃ

১. তিনি আসল ইসলামের প্রচারক। তিনি তার প্রচারিত উপরোক্ত ধ্যান-ধারণা সম্বলিত মতবাদের নাম দিয়েছেন মোহাম্মাদী ইসলাম।[৩] তার বক্তব্য হল - তার মতবাদের বাইরে সারা বিশ্বে যে ইসলাম চালু রয়েছে এটা আসল ইসলাম নয়, এজিদী ইসলাম. এজিদী চক্রান্তের ফসল।

২. আল্লাহ্ই তাকে গোটা বিশ্বে খাঁটি মোহাম্মাদী ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে নূরে মোহাম্মাদীর ধারক ও বাহক রূপে পাঠিয়েছেন। তার সাপ্তাহিক পত্রিকায় লেখা হয়েছে ঃ আল্লাহ্, রাসূল (সাঃ) সহ সমগ্র নবী রাসূল, ফেরেশতা এবং দেওয়ানবাগী ও তার মোর্শেদ চন্দ্রপাড়ার মৃত আবুল ফজলের উপস্থিতিতে সমস্ত ওলী আউলিয়াগণ এক বিশাল ময়দানে সমবেত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে দেওয়ানবাগীকে মোহাম্মদী ইসলাম-এর প্রচারক নির্বাচিত করেন। অতঃপর সবাইকে নিয়ে আল্লাহ এক বিশাল মিছিল বের করেন। আল্লাহ, রাসূল দেওয়ানবাগী ও তার পীর-এই ৪ জনের হাতে মোহাম্মদী ইসলামের পতাকা। আল্লাহ্, দেওয়ানবাগী ও তার পীর-এই ৩ জন সামনের সারিতে। সমস্ত নবী রাসূলসহ বাকীরা পেছনে। মিছিলে আল্লাহ্ নিজেই শ্লোগান দিচ্ছিলেন- মোহাম্মাদী ইসলামের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো।[৪]

১. সূত্র ঃ মাসিক আত্মার বাণী, সংখ্যা-নভেম্বর-৯৯, পৃঃ-১০ ॥ ২. সূত্র ঃ মাসিক আত্মার বাণী; সংখ্যা-নভেম্বর-৯৯; পৃঃ ৯ ॥ ৩. তার প্রায় প্রত্যেকটা বইয়ের প্রচ্ছদে মোহাম্মাদী ইসলাম লেখা আছে এবং এই ইসলামের বিশেষ পতাকা দেখানো হয়েছে ॥ ৪. সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ পত্রিকা, সংখ্যা-১২/৩/৯৯ শুক্রবার ॥

৪. তিনি বর্তমান যামানার মোজাদ্দেদ, মহান সংস্কারক, শ্রেষ্ঠতম ওলী-আল্লাহ।[১]

তার সম্পর্কে উপরোক্ত দাবী ও তার বুযুর্গী প্রমাণে তার ও তার ভক্তদের বিভিন্ন স্বপ্নের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ তিনি খাবে দেখেছেন যে, ঢাকা ও ফরিদপুরের মধ্যখানে একটি বাগানে নবীজির প্রাণহীন দেহ খালি গায়ে পড়ে আছে। অতঃপর দেওয়ানবাগীর হাতের স্পর্শে নবীজির মৃতদেহে প্রাণ ফিরে এসেছে, সুন্দর পোষাক এসেছে, চেহারায় নূর এসেছে, নবীজি তাকে বলেছেন- হে ধর্মের পুনর্জীবনদানকারী! সবশেষে নবীজি দেওয়ান-বাগীর সাথে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছেন।[২]

আরও স্বপ্ন বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) স্বপ্নযোগে তাকে "ইসলাম ধর্মের পুনর্জীবনদানকারী" খেতাবে ভূষিত করেছেন।[৩]

এভাবে তার সূফী ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলির বিভিন্ন স্থানে তার নিজের এবং তার ভক্তবৃন্দের বিভিন্ন স্বপ্ন বর্ণিত হয়েছে যা দ্বারা তার বুযুর্গী প্রমাণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অথচ স্বপ্ন কোন দলীল নয়। কাযী ইয়ায বলেন ঃ স্বপ্নের দ্বারা কোন নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয় না। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা' রয়েছে। আল্লামা নববী বলেনঃ তদ্রূপ স্বপ্নের দ্বারা কোন হুকুমের পরিবর্তন ঘটানো যায় না। এ ব্যাপারে ইত্তেফাক বা সর্বসম্মত মত রয়েছে। যদিও হাদীছে বলা হয়েছে ঃ

من رانى فى المنام فقد راى الحق -

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) বলেন যে ব্যক্তি আমাকে দেখল সে সত্য দেখল।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ)কে স্বপ্নে দেখা মিথ্যা হতে পারে না। কেননা শয়তান রাসূল (সাঃ)-এর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তবে স্বপ্নে সে যা শুনেছে তা সঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছে এবং তা সঠিক ভাবে মনে রাখতে পেরেছে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই স্বপ্ন কোন দলীল হতে পারে না। এ ব্যাপারে আল্লামা নববী তার দীর্ঘ ইবারতে যা বলেছেন, সংক্ষিপ্ত ভাবে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল ঃ

قال القاضى عياض : ..... لا يقطع بامر المنام ولا انه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تثبت وهذا باجماع العلماء هذا كلام القاضى وكذا قاله غيره من اصحابنا وغيرهم فنقلوا الاتفاق على انه لا يغير به بسبب ما يراه النائم ما تقرر فى الشرع -

এ সম্পর্কে অত্র খণ্ডের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২০৫-২০৭।

১. আল্লাহ কোন পথে ? গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা, ১৩৭ পৃষ্ঠা, 'রাসূল সত্যিই কি গরীব ছিলেন ?' পৃষ্ঠা নং- ১২ (ভূমিকা) ॥

২.তথ্যসূত্র ঃ 'রাসূল সত্যিই কি গরীব ছিলেন ?' পৃষ্ঠা নং- ১২ (ভূমিকা), চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০১ ॥

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১ ॥

কিছু লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে যায়েদ (রাঃ) কর্তৃক স্বপ্নে আযানের শব্দগুলো শুনেছিলেন এবং রাসূল (সাঃ) সে অনুযায়ী আযান প্রবর্তন করেছিলেন-এ দ্বারা স্বপ্ন দলীল বলে প্রমাণ পেশ করে থাকেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা সেখানে স্বপ্নটি সঠিক বলে রাসূল (সাঃ) স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

ان هذه لرؤيا حق - (ترمذى جـ١)

অর্থাৎ, এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন।

রাসূল (সাঃ) এরূপ স্বীকৃতি না দিলে শুধু ঐ সাহাবীর স্বপ্নের ভিত্তিতে আযান প্রচলিত হত না। আর রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর কারও স্বপ্ন সত্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়ার যেহেতু কেউ থাকেনি, তাই এখন কারও স্বপ্নকে দলীল হিসেবে দাঁড় করানো যাবে না। এখানে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে - হযরত ওমর (রাঃ) এর ২০ দিন পূর্বে আযানের এরূপ শব্দ স্বপ্নে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি সে স্বপ্নের ভিত্তিতে সেভাবে আযান দেয়া শুরু করেননি।

স্বপ্ন দ্বারা কোন কিছুর দলীল দাঁড় করানো যায় না। বুযুর্গী স্বপ্ন দ্বারা প্রমাণিত হয়না; বুযুর্গী প্রমাণিত হয় সহীহ ঈমান-আকীদা ও সহীহ আমল দ্বারা। অতএব যতই স্বপ্ন বর্ণনা করা হোক দেওয়ানবাগীর ন্যায় যিন্দীক, মুলহিদ ও কুফ্রী আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি (এসব আকীদা পরিত্যাগ করা ব্যতীত) কস্মিনকালেও বুযুর্গ হতে পারে না।

রাজারবাগী

(রাজারবাগী পীর দিল্লুর রহমান ও তার চিন্তাধারা)

রাজারবাগী পীরের নাম দিল্লুর রহমান। ৫ নং আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা-১২১৭ মুহম্মাদীয়া জামিয়া শরীফ ও সুন্নতী জামে মসজিদ তার দরবার। তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানাধীন প্রভাকরদী গ্রামের তাঁতী ও সূতা ব্যবসায়ী মরহুম জনাব মোখলেছুর রহমান মিঞার ৩য় পুত্র। তিনি নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া করা কোন আলেম নন, একজন কলেজ শিক্ষিত ব্যক্তি। তবে তিনি দাবী করেন যে, তাকে ইল্মে লাদুন্নী দান করা হয়েছে এবং তিনি "বাহ্রুল উলূম" বা জ্ঞানের সমুদ্র। তার দাবী হল তিনি সাধারণ পীর নন বরং গাউছুল আজম এবং আমীরুল মু'মিনীন ফিত্ তাসাওউফ অর্থাৎ, তাসাওউফ শাস্ত্রের সর্বোচ্চ নেতা। তার মুরীদগণের বর্ণনা মতে বড়পীর আব্দুল কাদের জীলানীর চেয়েও তার মাকাম অনেক উর্ধ্বে।[১] তিনি কোন পীর থেকে খেলাফত লাভ করেননি। তবে তিনি বলেন স্বয়ং আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) তাকে খেলাফত দান করেছেন।

১. মাসিক আল-বাইয়্যিনাত, ৭৩ তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৪৬ -এ লেখা হয়েছেঃ উল্লেখ্য রাজারবাগ শরীফের হযরত পীর সাহেব ক্বিবলা মুদ্দাজিল্লুহুল আলী-এর নামের পূর্বে যেসব লক্বব রয়েছে, উনি তারও উর্ধ্বে। এমনকি কথিত গাউছুল আযম লক্বেরও উর্ধ্বে ॥

তিনি নিজের বুযুর্গী প্রমাণ করার জন্য ৩ ধরনের পন্থা গ্রহণ করেছেন।

১. নিজের নামের আগে পিছে প্রায় ৫২ টি উচ্চ অর্থ সম্পন্ন খেতাব সংযুক্ত করেছেন। আজ পর্যন্ত উম্মতের কেউ এমন খেতাবের বিশাল বহর নিজের নামের সাথে যোগ করেননি।[১] তিনি বলেন এর অনেকগুলো খেতাব তাকে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ, কতকগুলি দিয়েছেন হযরত রাসূল (সাঃ) ও বাকীগুলি দিয়েছেন তরীকতের ইমাম বা পীর আউলিয়াগণ।[২] তার খেতাবের মধ্যে রয়েছে- মুফতিয়ুল আজম, বাহ্‌রুল উলূম ওয়াল হিকাম, হাফিজুল হাদীছ, হাকিমুল হাদীছ, হুজ্জাতুল ইসলাম ফিল আলামীন, তাজুল মুফাস্‌সিরীন, রঈসুল মুহাদ্দিছীন, আমীরুল মু'মিনীন ফী উলূমিল ফিক্‌হে ওয়াত তাসাওউফ, মাখ্‌যানুল মা'রেফাত, ইমামুস সিদ্দীকীন, গাউছুল আজম, কুত্‌বুল আলম, সাইয়্যিদুল আউলিয়া, আফজালুল আউলিয়া, সুলতানুল আরিফীন, শাইখুশ শুয়ূখ ওয়াল মাশায়েখ, মুজাদ্দিদ ফিদ্‌দীন, সাইয়্যিদুল মুজ্‌তাহিদীন, কাইউমুয্ যামান, হাবীবুল্লাহ প্রভৃতি।[৩]

খণ্ডন ঃ

(এক) তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক, রাসূল (সাঃ) কর্তৃক ও আউলিয়াগণ কর্তৃক এসব খেতাব লাভ করেছেন বলে দাবী করেন, অথচ স্বপ্ন শরীআতে হুজ্জাত বা দলীল নয়। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বপ্ন দলীল হওয়ার ব্যাপারে কিছু লোক যে প্রমাণ পেশ করে থাকে পূর্বের পরিচ্ছেদে তার খণ্ডনও পেশ করা হয়েছে।

(দুই) তদুপরি তার ব্যবহৃত এসব খেতাবের মধ্যে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা বহির্ভূত অনেক দাবীও এসে গেছে। যেমন ঃ "ইমামুস সিদ্দীকীন" বা সিদ্দীকগণের ইমাম। এই সিদ্দীকীনদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)ও, যার মর্যাদা উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উর্ধ্বে। এ ব্যাপারে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের

১. মাসিক আল-বাইয়্যিনাত ও আঞ্জুমানে আল-বাইয়্যিনাত এর পক্ষ থেকে এর জবাবে একাধিক প্রচার পত্র ছাপা হয়েছে। যার মধ্যে বলা হয়েছেঃ "মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের লকব ছিল প্রায় ৬১ টি। এমনি ভাবে ইমাম আবূ হানীফার ৪৮টি, বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীর ৫১টি, ইমাম বোখারীর ২৮টি ইত্যাদি। কিন্তু রাজারবাগী সাহেব সম্ভবতঃ ইচ্ছাকৃতভাবেই এ বিষয়টি চেপে গেছেন যে, এসব লকব তাদের নিজেদের দেয়া নয়। বিভিন্ন জন তাদের প্রশংসায় যেসব শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন, তা গণনা করলে হয়তবা এরকম সংখ্যা দেখানো যাবে, কিন্তু তারা নিজেরা কখনও আত্মপ্রচারের জন্য এসব খেতাব চয়ন করে করে নিজেদের নামের সাথে জুড়ে দেননি। তদুপরি তারা রাজারবাগী সাহেবের ন্যায় নামের আগে পিছে এরকম খেতাবের বহর জুড়ে দেয়াকে সুন্নাত মনে করেননি। বরং পূর্বসূরীদের অনেকে এটা অপছন্দ করতেন, তার বহু প্রমাণ রয়েছে। অতএব এসব জারিজুরি করে জনগণকে ধোকা দেয়া ঠিক হবে না ॥

২. তথ্যসূত্র ঃ দিল্লুর রহমান সাহেবের বয়ানের ক্যাসেট। এ ক্যাসেট আমার (লেখকের) কাছে সংরক্ষিত আছে ॥

৩. তথ্যসূত্র ঃ তাদের প্রচারিত বিভিন্ন মাহ্‌ফীলের হ্যান্ডবিল ও আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা ॥

মধ্যে কারও কোন বিরোধ নেই। অথচ তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাবে দাবী করলেন তিনি "ইমামুস সিদ্দীকীন" বা সিদ্দীকগণের ইমাম। আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে সাহাবী নন এমন কোন ব্যক্তি কখনও সাহাবীর মর্যাদায় উপনীত হতে পারেন না।[১] কিন্তু দিল্লু সাহেব এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। যেমন তার আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকায় লেখা হয়েছেঃ হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) বলেছেন ঃ "আমি উরূয করতে করতে সিদ্দীকে আকবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর মাকাম অতিক্রম করলাম।" (নাউযুবিল্লাহ!) এরপর পত্রিকাটিতে মন্তব্য করা হয়েছে যে, দৃশ্যতঃ এখানেও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর চেয়ে তার মর্যাদা বেশী প্রকাশ পায়।[২]

মন্তব্য ঃ হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) এমন কথা বলেছিলেন কি না তা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়। বস্তুতঃ এ সব বুযুর্গদের সম্পর্কে অতি ভক্তদের দ্বারা এমন অনেক কিছু রটানো হয়েছে যা সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না, তবে এ ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করার দ্বারা রাজারবাগী সাহেবের আকীদা যে এরূপ তা অবশ্যই প্রমাণিত হয়েছে।

(তিন) তার খেতাবের মধ্যে জঘন্য বেয়াদবী সূচক খেতাবও রয়েছে। যেমন তিনি "হাবীবুল্লাহ" খেতাব ব্যবহার করেছেন। অথচ হাবীবুল্লাহ বলতে একমাত্র রাসূল (সাঃ) কেই সকলে বুঝে থাকেন। এখন নিজের জন্য এই খেতাব ব্যবহারকে হয় জঘন্য বেয়াদবী বলতে হবে নতুবা বলতে হবে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সমান মাকাম বা মর্যাদার দাবী করছেন, যা হবে কুফ্‌রীর পর্যায়ভুক্ত। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা।

(চার) তার খেতাবসমূহের মধ্যে কুফ্‌রী জ্ঞাপক খেতাবও রয়েছে। যেমন "কাইউমুয্ যামান" খেতাবটি। কাইউম শব্দটি আল্লাহ তা'আলার একটি ছিফাতী নাম, যার অর্থ জগতের ধারক ও রক্ষক। অতএব কাইউমুয্ যামান অর্থ হবে যামানার ধারক ও রক্ষক। এ কথাটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, অন্য কারও ব্যাপারে নয়। কোন মাখ্‌লূক কাইউম হতে পারে না বরং আব্দুল কাইউম বা কাইউমের গোলাম হতে পারে। কোন মানুষের হাতে (নাউযুবিল্লাহ) জগত পরিচালনার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকতে পারে না। সুতরাং কোন মানুষের ব্যাপারে এ উপাধি ব্যবহার নিঃসন্দেহে কুফ্‌রী জ্ঞাপক।[৩]

১. "সাহাবীদের সম্বন্ধে আকীদা" শিরোনামে প্রথম খণ্ডে এ সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য ॥

২.আল-বাইয়্যিনাত, ৭৩ তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ ইং, ৪৫ পৃঃ ॥

৩. আঞ্জুমানে আল-বাইয়্যিনাত এর পক্ষ থেকে এর জবাবে প্রচারিত একটি পত্রে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী, তার ছেলে হযরত ইমাম মাছুম, তার ছেলে হুজ্জাতুল্লাহ নক্‌শবন্দ, তার ছেলে আবুল উলা প্রমুখকে "কাইউম" লকব দিয়েছিলেন। এখানে "কাইউমুয যামান" কথাটার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অর্থ করতে হবে। ইত্যাদি। এখানেও রাজারবাগী সাহেব প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা এই খেতাব ব্যবহার করে থাকলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রূপক অর্থেই ব্যবহার করে থাকবেন। কিন্তু রাজারবাগী সাহেব ও তার অনুসারীগণতো প্রকৃত অর্থেই ব্যবহার করছেন। তার প্রমাণ হল তার পকিকায় গাওসুল আযম বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ গাওসুল আযম, সাইয়্যিদুল আওলিয়া, মুহিউদ্দীন, বড়পীর হযরত আব্দুল- (পরবর্তী পৃষ্ঠা টীকা দ্রষ্টব্যঃ)

এ ছাড়া তার উপাধিসমূহ যে অতিরঞ্জনে ভরা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

২. দিল্লুর রহমান সাহেব নিজের বুযুর্গী প্রমাণ করার জন্য দ্বিতীয় যে পন্থা গ্রহণ করেছেন তা হল - তিনি তার নিজের মর্যাদার ব্যাপারে এবং তার মাসিক পত্রিকা "আল-বাইয়্যিনাত" -এর মর্যাদা ও গুরুত্বের ব্যাপারে নিজের ও বিভিন্ন জনের স্বপ্ন বর্ণনা করে থাকেন। যেমন নিজের ব্যাপারে তিনি বলেন ঃ

(১) তিনি স্বপ্নে দেখলেন একটি কাঁচের ঘর, যাতে কোন দরজা জানালা কিছুই ছিল না। সেই ঘরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ৪ জন ওলীকে বসানোর জন্য ৪ কোণে ৪ খানা আসন রাখা হল। সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ আউলিয়া ঐ ঘরের চারপাশে ঘুরাঘুরি করছিলেন। সবাই বলাবলি করছিলেন এই ৪টি আসনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন ওলীকে বসানো হবে। সকলে ভাবছেন কাকে বসানো হয়। এ অবস্থায় হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ), খাজা মুঈ-নুদ্দীন চিশতী (রহঃ) ও হযরত মুজাদ্দেদে আল্‌ফে সানী (রহঃ) একে একে ৩ টি আসনে বসে পড়লেন। এবার লক্ষ লক্ষ আউলিয়ার মধ্যে বলাবলি হচ্ছিল যে, চতুর্থ আসনটিতে চার তরীকার চারজন ইমামের অবশিষ্ট মহামানব হযরত শায়েখ বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দী (রহঃ) এসে বসবেন। কিন্তু দেখা গেল একজন ফেরেশতা এসে আমাকে (দিল্লু সাহেবকে) টেনে নিয়ে ঐ আসনে বসিয়ে দিলেন। এ চারজন ছাড়া আর কাউকেই ভিতরে ঢুকতে দেয়া হয়নি।[১]

(২) তিনি বলেন তার এক মুরীদ ভাই তাকে বলেছেন তিনি রাসূল (সাঃ)কে স্বপ্নে দেখেছেন। তিনি নবীজি (সাঃ)কে চার তালিওয়ালা টুপি[২] পরিহিত দেখে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, হুজুর টুপি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলছে, কোন্‌টা আপনার খাস সুন্নাত? উত্তরে নবী (সাঃ) বলেছেনঃ টুপি, সুন্নাত, মাসলা-মাসায়েল যা কিছু জানতে হয় রাজারবাগের দিল্লুর কাছ থেকে জেনে নিও।[৩]

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার বাকি টীকা) কাদের জিলানী (রহঃ) বলেছেন, "কোন চাঁদ উদিত হয় না, কোন সূর্য অস্ত যায় না আমার অনুমতি ব্যতীত।" (নাউযুবিল্লাহ!) অতঃপর একটু সামনে গিয়ে রাজারবাগী সাহেবও এরূপ ক্ষমতা রাখেন সেদিকে ইংগিত করে পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছে ঃ "উল্লেখ্য, এ ধরনের আখাসসুল খাছ মর্যাদা-মর্তবার ওলী আল্লাহ্‌র ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সমাসীন ইমামুল আইম্মা, কুতবুল আলম, মুজাদ্দিদে যামান, আওলাদে রাসূল, ঢাকা রাজারবাগ শরীফের হযরত পীর সাহেব ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী।" (আল-বাইয়্যিনাত, ৭১ সংখ্যা, জুলাই, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৩৯) এভাবে বোঝানো হয়েছে যে, রাজার বাগী সাহেব সত্যিকার অর্থেই কাইউমুয যামান। তার হাতেও (নাউযুবিল্লাহ) জগত পরিচালনার ক্ষমতা ন্যস্ত ॥

১. তথ্যসূত্র ঃ প্রাগুক্ত ক্যাসেট ॥

২. দিল্লুর রহমান সাহেবের মতে চারতালিওয়ালা টুপি নবীজির খাস সুন্নাত ॥

৩. প্রাগুক্ত ক্যাসেট ॥

খণ্ডন ঃ

এখানেও তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে টুপি সম্পর্কে তার ধারণা ও তার বুযুর্গির স্বপক্ষে দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে স্বপ্ন কোন দলীল নয়। একমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ)-এর স্বপ্নই দলীল, অন্য কারও স্বপ্ন দলীল নয়। তবে কুরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের অনুকূলে কোন স্বপ্ন হলে সেটাকে সহযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এ ব্যাপারে পূর্বে "দেওয়ানবাগী" শিরোনামের অধীনে কিছু এবং অত্র খণ্ডের শুরুতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) স্বপ্নে স্বয়ং নবীজি (সাঃ) নাকি তাকে বলেছেন তিনি আওলাদে রাসূল। এরপর থেকে তিনি নিজেকে আওলাদে রাসূল পরিচয় দিয়ে থাকেন।

খণ্ডন ঃ

স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নিজেকে আওলাদে রাসূল বলে পরিচয় দেয়া যায় না। কেননা স্বপ্ন দলীল নয়। কেউ রাসূল (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখলে সেটা সত্য, কেননা শয়তান রাসূল (সাঃ)-এর রূপ ধরতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নে রাসূল (সাঃ) কে যা বলতে শুনেছে, সেটা সঠিক মনে রাখতে পেরেছে, তার নিশ্চয়তা নেই। হতে পারে তার মনের মধ্যে শয়তান কোন কথার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দিয়েছে। এ কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেছেনঃ শরী'আতে প্রমাণ নেই-এমন কোন ব্যাপারে যদি কারও মনে হয় যে, স্বপ্নে রাসূল (সাঃ) এটাই বলেছিলেন, তা হলে সেই সপ্ন অনুযায়ী সে তা করতে পারবে না। স্বপ্ন যে দলীল নয়, এ সম্পর্কে অত্র খণ্ডের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২০৫-২০৭।

তার মাসিক পত্রিকা "আল-বাইয়্যিনাত"-এর মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রমাণ করার ব্যাপারেও তিনি বিভিন্ন স্বপ্ন বর্ণনা করে থাকেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

(১) তিনি স্বপ্নে দেখেছেন ফুরফুরার হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীক (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা রুহুল আমীন (রহঃ) এক মাহফিলে ওয়াজ করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ দেখ আমি আগে মাসিক বাইয়্যিনাত পড়তাম না। আমাকে সর্বপ্রথম এটা পড়তে বললেন হাদীছের বিখ্যাত ইমাম আল্লামা দাইলামী (রহঃ)। তারপর বললেন খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রহঃ)। অতঃপর আমি এক বন্ধুসহ গেলাম মদীনায় প্রিয় নবীজি (সাঃ)-এর যিয়ারতে, নবীজিও আমাকে বললেন বাইয়্যিনাত পড়তে। এরপর থেকে আমি বাইয়্যিনাত পড়ে থাকি। তিনি আরও বললেন দেখ যারা বাইয়্যিনাত-এর বিরোধিতা করবে, তারা হালাক, ধ্বংস হয়ে যাবে, তারা ঈমান হারা হয়ে মারা যাবে।

মাসিক আল-বাইয়্যিনাত সম্পর্কে তিনি এত বাড়াবাড়ি করেছেন যে, আল-বাইয়্যিনাত, জুলাই ১৯৯৯ সংখ্যার ১৪৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে ঃ আল্লামা রূমী (রহঃ)-এর মছনবী শরীফকে যেমন ফার্সী ভাষায় 'কোরআন শরীফ' বলা হয়, তদ্রূপ আল-বাইয়্যিনাতও যেন "বাংলা ভাষার কোরআন শরীফ"।

খণ্ডন ঃ

(১) মৃত্যুর পর আম্বিয়ায়ে কেরাম কবরে নামায পড়েন বলে হাদীছে প্রমাণ রয়েছে। এ ছাড়া কবরে কোন ব্যক্তি পত্র-পত্রিকাতো দূরের কথা কুরআন কিতাব পাঠ করে এমন কোন প্রমাণও কুরআন হাদীছের কোথাও নেই।

(২) একদিকে তিনি আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকাকে কুরআন বলে আখ্যায়িত করছেন, আবার আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকার বিরোধিতা করলে ঈমান হারা হয়ে যাওয়ার ধারণা প্রদান করছেন। এর অর্থ হল তিনি এই পত্রিকাকে প্রকৃত অর্থেই কুরআনের সমতুল্য আখ্যায়িত করতে চান। তাই এর বিরোধিতাকে ঈমান হারা হওয়ার কারণ বলে আখ্যায়িত করছেন। কেননা কুরআনকে অস্বীকার করলে ঈমান হারা হবে বৈ কি ? মনে রাখা ভাল কুরআন নয় এমন কিছুকে যদি প্রকৃত অর্থেই কুরআনের সমতুল্য আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা হবে কুফ্‌রী কথা। তিনি যদি এই পত্রিকাকে প্রকৃত অর্থেই কুরআনের সমতুল্য আখ্যায়িত করতে না চান তাহলে কারও লেখা একটা পত্রিকার বিরোধিতা করলে ঈমান হারা হওয়ার প্রশ্নই অবান্তর। মছনবী-এর উদাহরণ টানা হল একটা প্রতারণা মাত্র। নতুবা কেউ কখনও মছনবী শরীফকে প্রকৃত পক্ষেই কুরআন আখ্যায়িত করেননি এবং মছনবী শরীফের বিরোধিতা করলে ঈমান হারা হতে হবে এমন কথাও কেউ বলেননি।

(৩) রূপক অর্থেও আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকাকে কুরআন আখ্যায়িত করা কুরআনের সাথে জঘন্য ধরনের উপহাস। কেননা এই আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকার বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে আলোচনায় না যেয়েও শুধু তার মধ্যে দিল্লু সাহেব ও তার চিন্তাধারার প্রতিপক্ষকে যেসব অকথ্য গালিগালাজ লেখা হয়, তার সাথে কুরআনের ভাষা ও বর্ণনাকে তুলনা করলে নিঃসন্দেহে কুরআনের সাথে উপহাস করা হবে। এমন একটি পত্রিকাকে কুরআন আখ্যায়িত করা কুরআনের অবমাননার শামিল।

আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকায় উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে এমন সব গালিগালাজ লেখা হয় যা কোন ভদ্রতা ও শালীনতার আওতায় পড়ে না। উক্ত পত্রিকায় শাইখুল হাদীস আজিজুল হক সাহেব, মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব, চরমোনাইয়ের পীর সাহেব, হাটহাজারী মাদ্রাসার মোহ্‌তামেম সাহেব প্রমুখ দেশ বরেণ্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় নায়েবে রাসূলগণকে যেসব কুৎসিত গালি দেয়া হয়েছে, তার কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ উম্মতে মোহাম্মাদী হতে খারিজ, মাওসেতুং ও গান্ধীর ভাবশিষ্য, শয়তানের পোষ্যপুত্র, মুশরিক, মুনাফেক, ধোকাবাজ, ভন্ড, জাহেল, গোমরাহ, কাজ্জাব, কমীনা, জেনাখোর, নফ্‌সের পূজারী, মালউন, ইত্যাদি।[১]

খণ্ডন ঃ

(১) গালিগালাজ করা ফাসেকী ও হারাম। হাদীছে বলা হয়েছে ঃ

سباب المسلم فسوق -

১. তথ্যসূত্র ঃ- মাসিক আল বাইয়্যিনাত ঃ সংখ্যা- ৬৪, ডিসেম্বর ১৯৯৮; পৃষ্ঠা ৪০-৪২ ও ৪৪, সংখ্যা- ৭০ জুন ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৪৫ এবং রাজারবাগীর বয়ানের ক্যাসেট ॥

অর্থাৎ, মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী।

(২) কাউকে মুনাফিক আখ্যায়িত করা সম্ভব নয়। কেননা রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর ওহীর দরজা বন্দ হয়ে যাওয়ার পর কার্ অন্তরে মুনাফিকী আছে তা জানার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আর আমলী মুনাফিকীর ভিত্তিতে কাউকে মুনাফিক আখ্যায়িত করা জায়েয নয়।

(৩) কুরআনে কারীম আমাদেরকে বিরোধী প্রতিপক্ষের সমালোচনার ক্ষেত্রেও শালীনতার শিক্ষা দিয়েছে। অশালীন ভাষায় প্রতিপক্ষের সমালোচনা করা কুরআনের আদর্শ বিরোধী। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم -

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদেরকে তারা আহবান করে, তোমরা তাদেরকে গালি দিও না। তাহলে তারাও অজ্ঞানতাবশতঃ সীমালংঘন করে আল্লাহ্‌কে গালি দিবে। (সূরাঃ ৬-আনআমঃ ১০৮)

৩. দিল্লুর রহমান সাহেব নিজের বুযুর্গী প্রমাণ করার জন্য তৃতীয় যে পন্থা গ্রহণ করেছেন তা হল ঃ তিনি বিভিন্ন বুযুর্গ সম্পর্কে অতি উচ্চ মাত্রায় বাড়াবাড়ি করে কিছু প্রশংসা করেছেন তারপর বলেছেন জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। অর্থাৎ, এভাবে বলে তিনি নিজের দিকে ইশারা করেছেন যে, আমার মধ্যেও এসব বুযুর্গী রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

(১) "কেউ যদি মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ)-এর লিখিত মাকতুবাত শরীফ পড়ে, (পড়াকালীন সময়ে) যদিও সে নবী নয়, তবুও নবীদের দফতরে তার নাম থাকে।" অতপর (দিল্লু সাহেব ও তার পত্রিকা বাইয়্যিনাত-এর অনুরূপ মর্যাদার প্রতি ইংগিত দিয়ে) বলা হয়েছে ঃ আকলমন্দের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।[১]

(২) রাজারবাগী সাহেব নিজেকে "গাওছুল আযম" দাবী করেছেন। আর তার পত্রিকায় গাওছুল আযম বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ গাওছুল আযম, সাইয়্যিদুল আওলিয়া, মুহিউদ্দীন, বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) বলেছেন, "কোন চাঁদ উদিত হয় না, কোন সূর্য অস্ত যায় না আমার অনুমতি ব্যতীত।" (নাউযুবিল্লাহ!) অতঃপর একটু সামনে গিয়ে রাজারবাগী সাহেবও এরূপ ক্ষমতা রাখেন সেদিকে ইংগিত করে পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছে ঃ "উল্লেখ্য, এ ধরনের আখাসসুল খাছ মর্যাদা-মর্তবার ওলী আল্লাহ্‌র ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সমাসীন ইমামুল আইম্মা, কুতবুল আলম, মুজাদ্দিদে যামান, আওলাদে রাসূল, ঢাকা রাজারবাগ শরীফের হযরত পীর সাহেব ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী।"[২]

খণ্ডন ঃ

চাঁদ, সূর্য অস্ত যাওয়া, উদিত হওয়ার মত প্রাকৃতিক পরিচালনা (تصرفات عالم) কোন মানুষের অনুমতি বা ইচ্ছায় সংঘটিত হয় বলে কেউ বিশ্বাস করলে সে নিশ্চিত কাফের হয়ে

১. বাইয়্যিনাত, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ট সংখ্যা, জুন-১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৬ ॥

২. আল-বাইয়্যিনাত, ৭১ সংখ্যা, জুলাই, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৩৯ ॥

যায়। বিশেষতঃ সূর্যের ব্যাপারে স্পষ্টতঃ হাদীছে এসেছে যে, সূর্য আল্লাহ্‌র আরশের নীচে সেজদায় পড়ে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করে অনুমতি লাভ হলে সে উদিত হয়। বোখারী শরীফে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি নিম্নরূপ ঃ

عن ابى ذر قال قال النبى ﷺ لابى ذر حين غربت الشمس اتدرى اين تذهب ؟ قلت الله ورسوله اعلم قال فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعى من حيث جئت فتطلع من مغربها فذالک قوله تعالى : والشمس تجرى لمستقر لها ذلک تقدير العزيز العليم -

হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) উপরোক্ত কথা বলেছিলেন কি-না তা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়। আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি যে, বস্তুতঃ বুযুর্গদের সম্পর্কে অতি ভক্তদের দ্বারা এমন অনেক কিছু রটানো হয়েছে যা সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না,[১] তবে এ ঘটনাকে এ ভাবে বর্ণনা করা দ্বারা রাজারবাগীরা যে এরূপ আকীদা বিশ্বাস রাখেন তা নিশ্চিতই প্রমাণিত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে কুফ্‌রী আকীদা। কিছু গালী শী'আদের ধারণা ছিল আল্লাহ তা'আলা জগত পরিচালনার দায়িত্ব হযরত আলী (রাঃ)-এর উপর ন্যাস্ত করেছেন। এভাবে তারা হযরত আলী (রাঃ)কে দ্বিতীয় খালেক (সৃষ্টিকর্তা) বানিয়ে রেখেছিল।[২] এ ধরনের গালী শী'আদেরকে উম্মত কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন।

উল্লেখ্য ঃ রাজারবাগীর পীর মুজতাহিদ হিসেবে জমহুরে উম্মতের খেলাফ অনেক মাসায়েলও উদ্ভাবন করেছেন। যেমন

১. চার কল্লী টুপি পরিধান করা নবীজির খাস সুন্নাত।

২. মুসলমানদের উপর চরম ধরনের বিপদাপদ আসলে ফজরের নামাযে কুনূতে নাযিলা পাঠ করা জায়েয নয়, এরূপ কুনূতে নাযিলা পাঠ করা হলে নামায ফাসেদ হয়ে যায়।

৩. নামের শুরুতে বহু খেতাব ব্যবহার করা সুন্নাত।

৪. ১২ রবিউল আউয়াল মুসলমানদের জন্য বড় ঈদ।

ইত্যাদি।

১. হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) সম্পর্কে তার একটি জীবনী গ্রন্থে এমন ঘটনাও বর্ণিত আছে যে, একবার এক বৃদ্ধার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু ঘটায় বৃদ্ধা কাঁদছিলেন। অবশেষে বৃদ্ধার অনুরোধে আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) আযরাঈলকে সন্ধান করে বের করেন এবং বৃদ্ধার পুত্রের রূহকে ছেড়ে দিতে বলেন। আযরাঈল সেটা অস্বীকার করায় আব্দুল কাদের জীলানী আযরাঈলের হাত থেকে থলেটি ছিনিয়ে নিয়ে উপুড় করে দেন। ঐ থলের মধ্যে ঐ দিনের কব্য করা সব রূহ ছিল। ফলে ঐ দিনে যারা মৃত্যু বরণ করেছিল তারা সকলে জিন্দা হয়ে যায়। নাউযুবিল্লাহ! এ ঘটনা বিশ্বাস করলে কারও ঈমান থাকবে না ॥ ২. الفرق بين الفرق. عبد القاهر البغدادى ॥

মাইজভাণ্ডারী

(মাইজভাণ্ডারী পীর ও তার অনুসারীদের মতবাদ)

"মাইজভাণ্ডারী পীর" বলতে চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডার দরবার-এর প্রতিষ্ঠাতা শাহ ছূফী মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী-কে বোঝানো হয়েছে। তার পিতার নাম মৌলভী সৈয়দ মতিউল্লাহ। তার মাতার নাম খায়রুন্নেছা। তিনি ১২৪৪ হিজরী মোতাবেক ১২৩৩ বাংলা, ১৮২৬ ইংরেজী ১লা মাঘ রোজ বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। চার বৎসর বয়স পার হওয়ার পর তাকে গ্রাম্য মক্তবে আরবী ও বাংলা শিক্ষা দেয়া হয়। ১২৬০ হিজরীতে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ৮ বৎসর লেখাপড়া করার পর ১২৬৮ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। তারপর এক বৎসর যশোর জেলার বিচার বিভাগে কাজীপদে দায়িত্ব পালন করেন। তার পীর হযরত ছূফী সৈয়দ মোহাম্মাদ ছালেহ লাহোরী। মাইজভাণ্ডারী পীর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হিজরী ১৩২৩ সনে বাংলা ১৩১৩ সালে ১০ই মাঘ মোতাবেক ২৭ জিলক্বদ সোমবার ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের পর তার পৌত্র মাওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন তার স্থলাভিষিক্ত হন।[১]

মাইজভাণ্ডারী পীর ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস ঃ

মাইজভাণ্ডার গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ- থেকে বেশ কিছু বই-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে মাইজভাণ্ডারী পীরের পৌত্র মাওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ হল "বেলায়তে মোতলাকা", "মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার", "মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া" এবং মাইজভাণ্ডারী পীরের জীবনী গ্রন্থ "মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত"। আরও রয়েছে শাহজাদা সৈয়দ মুনিরুল হক, মোনতাজেম গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ কর্তৃক প্রকাশিত মাইজভাণ্ডারী গানের সংকলন- "রত্ন ভাণ্ডার" এবং "আয়েনায়ে বারী ও ফয়জিয়াতে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" প্রভৃতি। এ সব পুস্তক-পুস্তিকার আলোকে মাইজভাণ্ডারী পীর ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস সম্বন্ধে যা জানা যায় তা হল।

১. ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ।

এই "ধর্মনিরপেক্ষতা" কথাটা প্রচলিত রাজনৈতিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। বরং এ মতবাদ অনুসারে যে কোন ধর্মের লোককেই তার স্বধর্মে রেখে তাকে মুরীদ বানানো হয় এবং এটাকেই তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়। মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আবশ্যকতা আছে বলে মনে করা হয় না। বরং মনে করা হয় - হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যে কোন ধর্মের লোক নিজ নিজ ধর্মে থেকে সাধনা করে মুক্তি পেতে পারে।

১. তথ্যসূত্র ঃ গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, সংকলন সংগ্রাহক ঃ মাওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (মাইজভাণ্ডারী), পঞ্চদশ প্রকাশ জুলাই- ২০০২ ॥

"মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত" গ্রন্থে "হযরতের ধর্ম নিরপেক্ষতা ঃ বৌদ্ধ ধননজয়কে স্বধর্মে রাখিয়া শিক্ষা" শিরোনামে লেখা হয়েছে ঃ একদিন সকালে নাস্তার সময় নিশ্চিন্তাপুর নিবাসী বৌদ্ধ ধননজয় নামক এক ব্যক্তি আসিয়া হযরতের নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য বারবার অনুরোধ করতে লাগিলেন। .... হযরত তাহাকে বলিলেন, "মিঞা! তুমি তোমার ধর্মে থাক। আমি তোমাকে মুসলমান করিলাম।" ইহার পরও তিনি বসিয়া রহিলেন। হযরতের খাদেম মৌলভী আহমদ ছফা কাঞ্চননগরী সাহেব তাহাকে পিছন হইতে ইশারা করিয়া ডাকিয়া নিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহাকে হাকিকতে মুসলমান করা হইয়াছে। এ গ্রন্থেই আর এক পৃষ্ঠা পরে জনৈক হিন্দু মুন্সেফ অভয়চরণকে স্বধর্মে রেখে দীক্ষা ও উপদেশ দানের কথা বর্ণিত হয়েছে।[১]

তারা এই ধর্মনিরপেক্ষতার আর এক নাম দিয়েছে "তাওহীদে আদ্ইয়ান" তথা সর্বধর্মের ঐক্য। তাদের বক্তব্য হল যেকোন ধর্ম গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকলে ধর্ম বিরোধ মিটে যায় এবং জনগণকে ধর্ম ঘৃণা থেকে বিমুখ করে তোলা যায়। এভাবে সব ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। মাইজভাণ্ডারী সিলসিলার দ্বিতীয় পীর শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (মৃত ১৯৮২ ইং) কর্তৃক রচিত "বেলায়তে মোতলাকা" নামক গ্রন্থে 'বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগ বিকাশ" শিরোনামের অধীনে "পরিবর্তিত বেলায়তে মোতলাকা যুগ" উপশিরোনামে লেখা হয়েছে ঃ

"সময়ের ব্যবধান ও ইসলামী হুকুমতের অবসানের ফলে ইসলামী ধর্মজগতে নানা এখ্তেলাফ বা মতানৈক্য দেখা দেয়। তখন পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বাতেনী শাসন পদ্ধতির প্রথানুযায়ী সমুচিত হেদায়েত ও উপযুক্ত শক্তিশালী ত্বরীকতের প্রভাবে জগৎবাসীকে অন্ধকার হইতে সহজতম ভাবে উদ্ধার মানসে বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মাদীকে "বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদী" রূপে পরিবর্তিত করেন।.... ইহা বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদকে নীতিগত ভাবে একই দৃষ্টিতে দেখে। কারণ ইহা মনে করে যে, বিভিন্ন মতবাদের "মত ও পথ" বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেকের গন্তব্যস্থল এক।"[২] তারপর এই কথিত তৌহীদে আদ্ইয়ান বা ধর্ম ঐক্যের প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করা হয়েছে ঃ

ان الذين امنوا والذين هادوا والنصرى والصبئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون -

অর্থাৎ, যারা মু'মিন, যারা ইয়াহুদী, এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন- (এদের মধ্যে) যারাই আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ৬২)

১. মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, সংকলন সংগ্রাহক ঃ মাওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (মাইজভাণ্ডারী), পঞ্চদশ প্রকাশ ঃ জুলাই- ২০০২, পৃষ্ঠা ঃ ১৫১-১৫২ ॥ ২.বেলায়তে মোতলাকা, আলহাজ্জ শাহ সুফী সৈয়দ মুনিরুল হক মোনতাজেম দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রকাশিত, ৮ম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০১, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭ ॥

অথচ এ আয়াতে যে কোন ধর্মের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ঈমান আনলে এবং নেক কাজ করলে তারা পরকালে মুক্তি পাবে। আর একথা স্পষ্ট যে, ইসলাম ধর্ম আগমনের পর রাসূল (সাঃ)কে আখেরী নবী না মানলে তার ঈমান পূর্ণ হবে না। আর রাসূল (সাঃ)কে আখেরী নবী মানলে অন্যান্য সব ধর্মের বিধানকে রহিত মানতে হয়। তাহলে অন্য কোন ধর্মে থেকে মুক্তির অবকাশ রইল কোথায়?

উক্ত গ্রন্থে আরও লেখা হয়েছে, " মানবের রুচী অনুযায়ী ধর্ম মত গ্রহণের এখতেয়ার বা অধিকার প্রত্যেকের আছে। ইহার নাম ধর্ম স্বাধীনতা। এই বিষয়ে তৌহীদে আদ্য়্যান প্রবন্ধে আলোচনা আছে। ইহা বেলায়তে মোতলাকার যুগোপযোগী ব্যবস্থা যাহা জনগণকে ধর্ম ঘৃণা বিমুখ করে।"[১]

খন্ডন ঃ

আল্লাহ্র নিকট একমাত্র ইসলাম ধর্মই গ্রহণযোগ্য। অতএব ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

ان الدين عند الله الاسلام -

অর্থাৎ, আল্লাহ্র কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ১৯)
অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخسرين -

অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করলে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এমন ব্যক্তি পরকালে চির হতভাগাদের দলে থাকবে। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ৮৫)

মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ঃ

والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى احد من هذه الامة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى ارسلت به الا كان من اصحاب النار -

অর্থাৎ, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, এই উম্মতের ইয়াহুদী, নাসরানী যে কেউ আমার কথা শুনবে অতঃপর আমাকে যা সহ প্রেরণ করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেছেন ঃ

وانما ذكر اليهود والنصرى تنبيها على من سواهما . لأن اليهود والنصارى لهم كتاب . فاذا كان هذا شانهم مع ان لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب لهم اولى - (ج-١/ صفحه/٨٦)

১.বেলায়তে মোতলাকা, আলহাজ্জ শাহ সুফী সৈয়দ মুনিরুল হক মোনতাজেম দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রকাশিত, ৮ম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০১, পৃষ্ঠা ১২৯ ॥

অর্থাৎ, এখানে ইয়াহুদ, নাসারাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অন্যদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে। কেননা, ইয়াহুদ নাসারাদের নিকট আসমানী কিতাব রয়েছে, এতদসত্ত্বেও তাদের যখন এই অবস্থা (যে, তাদের মুক্তিও শেষ নবীকে মান্য করার উপর নির্ভরশীল) তখন অন্য যাদের নিকট আসমানী কিতাব নেই তাদের অবস্থাতো অবশ্যই এমন হবে।

অন্য এক হাদীছে এসেছে রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعى - (مشكوة عن احمد والبيهقى)

অর্থাৎ, হযরত মূসা নবীও যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ না করে তাঁরও কোন উপায় থাকত না।

২. বিশেষ স্তরে শরী'আতের বিধান শিথিল হওয়ার মতবাদ।

উক্ত "বেলায়তে মোতলাকা" গ্রন্থে লেখা হয়েছে ঃ

" শরীয়ত নাছূত বা দৃশ্যমান জগতের অবস্থার সহিত সম্পর্কযুক্ত। এবং এই স্তরের লোকদের জন্য অবতীর্ণ।" অতপর নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে ইংগিত করে লেখা হয়েছে যে, "যদি কেহ বেকারার বা অস্থির বা বাধ্য হয় তাহার জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য নহে।" যাহা অবস্থাভেদে ব্যবস্থার পরিপোষক বুঝা যায় এবং ইহা খোদার অনুগ্রহ ও ক্ষমার পর্যায়ভুক্ত।[১] আয়াতটি এই ঃ

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا - فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم -

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেআমতকে সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম। (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ৩)

উক্ত গ্রন্থে "বিধান শিথিল অবস্থা" উপশিরোনামে আরও লেখা হয়েছে ঃ

" ইসলামী শরীয়তী আইন-কানূন মোয়ামেলাত শিথিল যুগে ইহা হুকুমতের হুকুমের সংঙ্গে যুক্ত হইতে বাধ্য। এবাদাতে মোতনাফিয়া আচরণে ছুফীয়ায়ে কেরামগণ গোঁড়া সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এবং উসকানিদাতা মতলববাজ "আলেম" নামধারী লোকদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিতে না পারিয়া বহুদিন পূর্ব হইতে মোশাহেদা, মোরাকেবা ইত্যাদি ভিন্ন পন্থাও অবলম্বন করিয়াছিলেন। যেহেতু ত্বরীকত পন্থা শরীয়ত পন্থার পরবর্তী বিধায় লাওয়ামা বা অনুতাপকারী স্তর হইতে আরম্ভ হয়। তাই উপরোক্ত বহির্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের দৃষ্টির ভঙ্গির সঙ্গে ইহার তফাত দেখা যায়। এই কারণে জিক্‌রে জবানীকে নাছূতী এবং জিক্‌রে কল্‌বীকে মলকূতী বলা হয়।

১ বেলায়তে মোতলাকা, আলহাজ্জ শাহ সুফী সৈয়দ মুনিরুল হক মোনতাজেম দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রকাশিত, ৮ম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০১, পৃষ্ঠা ১৬ ॥

তারপর "ছূফী ধ্যান-ধারণা" উপশিরোনামে লেখা হয়েছে ঃ -

"ছূফীয়ায়ে কেরামগণ আত্মশুদ্ধকামী দ্বিতীয় স্তরের "লাওয়ামা" বা অনুতাপকারী চিন্তাশীল জনগণ হন বিধায় তাহারা ত্বরীকত পন্থী। তাহারা এখতেলাফ পরিহার করেন; অলীয়ে কামেলের জ্ঞান জ্যোতিঃ অনুসরণ করেন। বিধান ধর্মের উপর নৈতিক ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং এবাদত বা উপাসনার উপর "এতায়াত" বা আনুগত্যকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন, যাহা উপাসনার উদ্দেশ্য।"[১]

এসব কথার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বিশেষ কামেল স্তরের ব্যক্তিবর্গের জন্য নামায, রোযা ইত্যাদি বিধান শিথিল হয়ে যায়। বস্তুতঃ এ কারণেই অনেক ভাণ্ডারীকে বাতিনী নামাযের নামে নামায থেকে বিরত থাকতে দেখা যায়।

তাদের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে তাদের আরও একটি মতবাদ আছে বলে প্রমাণিত হয়। তা হল ঃ

৩. শরী'আত ও তরীকত ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার মতবাদ।

এই মতবাদের ভিত্তিতেই মনে করা হয় যে, শরী'আত সাধারণ স্তরের মানুষের জন্য। কামেল স্তরের মানুষের জন্য শরী'আতের বিধি-বিধান পালনের বাধ্যবাধকতা থাকে না। শরী'আতে অনেক কিছু জরূরী যা ত্বরীকতে জরূরী নয়। উল্লেখ্য সুরেশ্বরী পীর ও তার অনুসারীদের আকীদাও অনুরূপ ছিল যে, শরী'আত ও তরীকত ভিন্ন ভিন্ন এবং কামেল ও বুযুর্গ হওয়ার পর তাদের আর ইবাদতের প্রয়োজন থাকে না। পূর্বে সুরেশ্বরীদের মতবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে দলীল-প্রমাণ সহ খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। এবং এসব বাতিল পন্থীরা কামেল ও বুযুর্গ হয়ে গেলে ইবাদত লাগে না- এ মর্মে যে আয়াত দ্বারা দলীল প্রদান করে থাকে, সে সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা ও খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৪৬৩-৪৬৬।

৪. পীরের মধ্যে খোদায়িত্ব আরোপ করার মতবাদ।

তারা তাদের বিভিন্ন বইতে এমন সব কথা লিখেছেন যাতে বোঝা যায় তাদের ধারণা মতে পীরের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ, তাদের পীর আল্লাহ্‌র প্রকাশ বা আল্লাহ্‌র অবতার। এমনকি স্বয়ং খোদা। যেমন তারা বলেছে ঃ

গাউছ বেশ ধৈরে ভবে খেলিতেছে নিরঞ্জনে।
তানে ভাবে যেবা ভিন, পাবে না সে প্রভূ চিন।[২]

এ কবিতায় মাইজভাণ্ডারীকে খোদার প্রকাশ হওয়ার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। তারা আরও বলেছেন ঃ

১. বেলায়তে মোতলাকা, আলহাজ্জ শাহ সুফী সৈয়দ মুনিরুল হক মোনতাজেম দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রকাশিত, ৮ম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০১, পৃষ্ঠা ১১৮ ॥

২. রত্নভাণ্ডার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা -২১, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭ ॥

আগে কি জানিতাম আমি তুমি হে জগৎ স্বামী
তোমা কৃপা গুণে সব জীবের জীবন।
জানতেম কি অরুণ শশী দেবমান স্বর্গবাসী।
তব গুণে গুণী তব নূরের সৃজন
ছাপে ছিলে মানব ছলে হাদী প্রেমে পর পৈলে
গাউছ বেশ ধরি কোথা পালাবে এখন।[১]

এ কবিতায় মাইজভাণ্ডারীকে খোদার প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে তার খোদা হওয়ার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ ধারণা কুফ্‌রী। দেখুন পৃঃ ৪৯।

আরও বলা হয়েছে ঃ

সে আজলী সে আবদী সে এবতেদা, সে এন্তেহা।
সে আওয়ালে সে আখেরে সে জাহেরে সে বাতেনে।[২]

আরও বলা হয়েছে ঃ

আউয়াল আখের তুমি জাহের বাতেন তুমি।
তুমি হে নূরের ছটা সারা ভূবন মোহন ॥
ওহে কর্ত্তা জগরক্ষা ভিক্ষুকের দেও ভিক্ষা
কর হাদীর প্রাণ রক্ষা প্রিয়া গাউছ ধন ॥[৩]

এ সব কবিতায় খোদার জন্য যে সব সিফাত প্রযোজ্য সে সব মাইজভাণ্ডারীর জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। এভাবে তাকে খোদার স্তরে পৌঁছে দেয়া হয়েছে, যা চরম গোমরাহী। আরও বলা হয়েছে ঃ

আহ্‌মদে বেমিম তুজহে কাহতা হোঁ ওয়াল্লাহ।
মিমকি পর্দ্দা কো মের ভিতু উঠা দাও॥[৪]

এ কবিতায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ হলেন আহাদ। আর মাইজভাণ্ডারী হলেন আহমদ। এই আহাদ ও আহমদের মধ্যে পার্থক্য কেবল একটা মীম হরফের। নতুবা আল্লাহ ও মাইজভাণ্ডারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৫. হায়াত-মওতের ব্যাপারে পীরের নিয়ন্ত্রণ ঃ

মাইজভাণ্ডারীগণ মনে করেন তাদের পীরের মধ্যে মানুষের হায়াত-মওতের ব্যাপারেও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে। জীবনী ও কারামত গ্রন্থে " হযরতের বেলায়তী ক্ষমতায় আজরাঈল হইতে রক্ষা ও মৃত্যু সময় পরিবর্তন" শিরোনামে মাইজভাণ্ডারী সাহেবের জনৈক ভক্ত মৌলভী আবদুল গনি সাহেব সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, তিনি একবার অসুস্থ হওয়ার পর একদিন হঠাৎ বেহুশ হয়ে পড়লে দেখতে পান যে, আজরাইল কদাকার ভীষণ আকৃতিতে একখানা অসি নিয়ে তার বুকের উপর বসে তার গলায় চালাতে উদ্যত। এমনি

১. রত্নভাণ্ডার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -১১, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭ ॥ ২. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১, ॥ ৩. রত্নভাণ্ডার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -১১, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭ ॥ ৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -২, ॥

সময় গাউসুল আজম (মাইজভাণ্ডারী সাহেব) সেখানে হাজির হলেন। তিনি তার অসি ছিনিয়ে নিলেন এবং তাকে বললেন ঃ

"তুমি এখনই ফিরিয়া যাও। আমি তাহাকে এক সপ্তাহের সময় দিলাম। তাহার সাথে আমার দরকারী কাজ আছে। তখন আজরাইল হযরতকে কিছু বলিতে চাহিলে, তিনি অতিশয় নারাজ ও জালাল হইয়া বলিয়া উঠিলেনঃ এখনই যাও। তোমার খোদাকে আমার কথা বলিও। আমি সময় দিয়াছি।" তখন আজরাইল চলিয়া গেল। তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিলেন।[১]

পীর সম্বন্ধে এমন আকীদা হায়াত মওত সম্পর্কিত আকীদার পরিপন্থী। তদুপরি কোন মানুষ আল্লাহ ও ফেরেশতার উপর এমন মাতবরী দেখাতে পারে তা বিশ্বাস করা ঈমান বিরোধী।

উল্লেখ্য ঃ এ শ্রেণীর লোকেরা পীরকে খোদার স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। তার পীরের মধ্যে খোদায়ী গুণ আরোপ করেছে। পীর খোদার প্রকাশ, পীরের মধ্যে প্রাণ রক্ষা করার ক্ষমতা, হায়াত-মওত পীরের হাতে থাকা ইত্যাদি খোদায়ী গুণ থাকাকে সাব্যস্ত করেছে। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি -যারা আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য না করার মত পোষণ করেন, বা মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রবেশ করার মত পোষণ করেন, বা পীর মাশায়েখকে খোদার স্তরে পৌঁছে দেয়, পীরকে খোদার প্রকাশ বলে, বা পীরের মধ্যে খোদায়ী গুণ আরোপ করে, তারা এ বিষয়ে সাধারণতঃ وحدة الوجود বা "সর্বেশ্বরবাদ"-দর্শনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এটা করে থাকেন। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৫২৫।

৬. পীর কর্তৃক পরকালে মুক্তি পাওয়ার মতবাদ।

মাইজভাণ্ডারীদের মতবাদ হল পীর মৃত্যুকালে কষ্ট থেকে মুক্তি দিবেন, কবরে আরামের ব্যবস্থা করবেন, হাশরে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবেন। আমলে ত্রুটি থাকলে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করবেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

দাসগণের প্রাণ হরিতে -ভয় নাহি দূত সমনে।
ফুল দেখাই প্রাণ হরিবে - নিজ হাতে গাউছ ধন।
মনকির নকিরের ডর-কবরে নাহিক মোর।
আদবের চাবুক মেরে হাঁকাইবেন গাউছ ধন।
কবর কোশাদা হবে- পুষ্পসয্যা বিছাইবে।
সামনে বসি হাল্‌কা বন্দি- করাইবেন গাউছ ধনে
হীন দাস হাদী কয়- হাশরেতে নাহি ভয়।
পিছে পিছে দাসগণ ফিরাইবেন গাউছ ধন।[২]

১. মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, সংকলন সংগ্রাহক ঃ মাওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (মাইজভাণ্ডারী), পঞ্চদশ প্রকাশ ঃ জুলাই- ২০০২, পৃষ্ঠা ঃ ১২৯ ॥

২. রত্নভাণ্ডার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা -১৭, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭ ॥

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

গাউছজি, মাওলাজি ডাকছি তোমারে
নাছুতী সঙ্কটে উদ্ধারিত মোরে
দিন দুনিয়ার ছোওয়াব গুনা...
মিজানের পাল্লাখানা, পোলছেরাতের ভাবাগোনা
রেহাই দেও মোরে।[১]

উল্লেখ্য ঃ আটরশী পীরের মতবাদও অনুরূপ ছিল। তাদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।[২]

৭. পীর কর্তৃক কামনা-বাসনা পূরণ হওয়ার মতবাদ।

এ প্রসঙ্গে তাদের নিম্নোক্ত কবিতাটি তুলে ধরা যায়ঃ

ভাণ্ডারীকে যে পাইল- খোদা রসূল সে চিনিল।
গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী পূর্ণ করেন বাসনা।[৩]

উল্লেখ্য এনায়েতপূরী ও আটরশী পীরের মতবাদও অনুরূপ ছিল। তাদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।[৪]

৮. গান-বাদ্য জায়েয হওয়ার মতবাদ।

তারা লিখেছেন ঃ "যাহারা ছেমায় আসক্ত, ছেমা বা গান বাদ্য জনিত জিকির বা জিকরী মাহফিল করিতে চাহেন তাহাদের জন্য বাদ্যযন্ত্র সহকারে জিকির বা জিকরী মাহফিল করিবার অনুমতি ও অনুমোদন আছে।[৫]

উল্লেখ্য ঃ গান-বাদ্য ও সামা অবৈধ হওয়া প্রসঙ্গে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। দেখুন পৃঃ নং ৫৫২-৫৬১।

রেজবী বা রেজাখানী

"রেজবী" বা "রেজাখানী" বলতে বোঝানো হয়েছে আহমদ রেজাখান বেরেলভীর মতবাদ অনুসারীদেরকে। তাদেরকে "বেরেলভী"ও বলা হয়। আহমদ রেজা খান ১০ই শাওয়াল, ১২৭২ হিজরী মোতাবেক ১৪ই জুন, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রসিদ্ধ শহর বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মগত নাম মুহাম্মাদ ওরফে আহমদ রেজা। তিনি নিজের নাম রাখেন আব্দুল মুস্তফা। তার ভক্তবৃন্দরা তাকে "আ'লা হযরত" নামে স্মরণ করে থাকেন। তার পিতার নাম ছিল নাকী আলী। দাদার নাম রেজা আলী।

---

১. রত্নভাণ্ডার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -২৭, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭ ॥
২. দেখুন ৪৭৭-৪৭৮ পৃষ্ঠা ॥
৩. রত্নভাণ্ডার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা -৩৩, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭ ॥
৪. দেখুন ৪৭৩-৪৭৪ ও ৪৭৬-৪৭৮ পৃষ্ঠা ॥
৫. "মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া" মাইজভাণ্ডারীর দ্বিতীয় পীর - শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন কর্তৃক সম্পাদিত, ১১শ সংস্করণ, জুন ২০০২, পৃষ্ঠা ৪ ॥

আহমদ রেজা খান সাহেব তার পিতা ও দাদার অনুসরণে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভাই মির্জা গোলাম কাদের বেগ-এর নিকট। তারপর পিতার নিকট থেকে অধিকাংশ বিদ্যা অর্জন করেন। পারিবারিক ভাবে স্বচ্ছল থাকায় লেখাপড়া থেকে ফারেগ হয়েই তিনি লেখনী অঙ্গনে পদচারণা শুরু করেন।[১]

আহমদ রেজাখান সাহেব অত্যন্ত পরমত অসহিষ্ণু মেজাযের মানুষ ছিলেন। তার কলম ছিল অত্যন্ত বে পরোয়া এবং গালী প্রদানে পারঙ্গম। সারা জীবন তিনি নদুয়া এবং দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে লেগে ছিলেন। তাদেরকে কাফের বলে ফতওয়া দেয়াই ছিল তার জীবনের প্রধান কাজ। এই ফতওয়াবাজীর কারণেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৩১১ হিজরী থেকে লাগাতর প্রায় দশ বছর তিনি নদুয়ার উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে ফতওয়াবাজীতে লিপ্ত থাকেন। মক্কা মদীনার উলামায়ে কেরাম থেকেও তিনি তাদের তাক্‌ফীরের ফতওয়া সংগ্রহ করেন এবং فتاوى الحرمين برجف ندوة المين নামে হাজার হাজার সংখ্যায় সেটা প্রচার করতে থাকেন। এ ছাড়াও এ মর্মে অসংখ্য পুস্তিকা ও প্রচার পত্র অবিরাম বৃষ্টির মত ছড়াতে থাকেন। তার এই বিরামহীন অহেতুক ফতওয়াবাজ-ীর বিরুদ্ধে নদুয়ার উলামায়ে কেরাম চুপ থাকা এবং তার কোন উত্তর দিতে প্রবৃত্ত না হওয়াই সংগত মনে করেন।

ইতিমধ্যে দ্বীন ও মিল্লাতের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে দারুল উলূম দেওবন্দ মাকবূলিয়্যাত অর্জন করে এবং স্বল্পকালের মধ্যেই দারুল উলূম দেওবন্দ হিন্দুস্তানের দ্বীনী মারকাজ ও দ্বীনের কেল্লা হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করে। তখন আহমদ রেজাখান সাহেবের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয়। ১৩২০ হিজরীতে তিনি المعتمد المستند নামে একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন, যার মধ্যে প্রথমবার জামা'আতে দেওবন্দের আকাবির হযরত মাওলানা কাসেম নানতুবী ও হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহীকে কাফের বলে ফতওয়া দেয়া হয়। তিনি লেখেনঃ "এরা এমন কাফের যে, তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে যে সন্দেহ করবে সেও নিশ্চিত কাফের ও জাহান্নামী।"

তার এই পুস্তকখানা আরবীতে রচিত হওয়ার কারণে হিন্দুস্তানের সাধারণ জনগণের মধ্যে বিষয়টি তেমন জানাজানি ও প্রচার না হওয়ায় অবশেষে তিনি ১৩২৩ হিজরীর শেষ দিকে মক্কা মদীনায় সফর করেন এবং দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন উর্দূ কিতাবের ইবারতকে গড়বড় করে বা কাঁট-ছাঁট করে তার ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে তারা কাফের হয়ে গিয়েছেন এই মর্মে একটা জাল ফতওয়া দাঁড় করে হারামাইনের উলামায়ে কেরামের সামনে পেশ করেন যে, দেওবন্দের উলামায়ে কেরাম খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করেন, রাসূল (সাঃ)-এর অবমাননা ও সমালোচনা করেন। অতএব তাদের তাক্‌ফীর করা প্রয়োজন। হারামাইনের উলামায়ে কেরাম উর্দূ পড়তে পারতেন না। উলামায়ে দেওবন্দের রচিত উর্দূ কিতাবাদি সম্বন্ধে তারা বেখবর ছিলেন। তারা আহমদ রেজাখানের উপস্থাপনায়

---

১. তথ্যসূত্র ঃ رد رضاخانیت. مولانا مفتی محمد امین صاحب پالنپوری. استاد حدیث وفقہ دار العلوم دیوبند ـ ॥

বিশ্বাস স্থাপন করে সেই ফতওয়ায় স্বাক্ষর করে দেন। আহমদ রেজাখান এই ফতওয়া حسام الحرمين (হুছামুল হারামাইন) নামে উর্দূ ভাষায় দেশব্যাপী প্রচার করেন। এই ফতওয়ায় দেওবন্দের প্রসিদ্ধ চার জন আলেমের (হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী, হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপূরী ও হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী)-এর নাম উল্লেখ পূর্বক বিভিন্ন উদ্ধৃতি সহকারে যা বলা হয়, তার সারকথা হল তারা এমন কাফের ও মুরতাদ যে, তাদের কাফের ও জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে যে সন্দেহ করবে সেও কাফের ও জাহান্নামী।[১]

এটা ১৩২৫ হিজরীর ঘটনা। এতদিন যাবত যারা আহমদ রেজাখানের ফতওয়াবাজীতে কর্ণপাত করছিলেন না, তারাও এখন হারামাইনের উলামায়ে কেরামের স্বাক্ষর দেখে বিচলিত হয়ে গেলেন এবং আরও অনেকে এই ফিতনায় জড়িয়ে পড়লেন। তখন উপরোক্ত চার জনের মধ্যে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ও হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপূরী জীবিত ছিলেন। তারা দুজন তখনই নিজ নিজ সাফাই পেশ করেন এবং পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেন যে, حسام الحرمين গ্রন্থে আমাদের দিকে যে আকীদা ও বিষয়বস্তু সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অপবাদ ও মিথ্যা। এরূপ আকীদা পোষণকারীদেরকে আমরাও ইসলাম থেকে বহির্ভূত মনে করি। তাদের বক্তব্য তখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)-এর বক্তব্য بسط البنان নামে স্বতন্ত্রভাবেও প্রকাশিত হয়। কিন্তু আহমদ রেজাখান ও তার অনুসারীদের প্রচারণা প্রপাগাণ্ডা চলতেই থাকে।

এদিকে আহমদ রেজাখান কর্তৃক হারামাইনের উলামায়ে কেরাম থেকে উক্ত ফতওয়ায় স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক হিন্দুস্তান প্রত্যাবর্তনের পর উক্ত ফতওয়ায় স্বাক্ষর প্রদানকারী হারামাইনের কতিপয় আলেম এ মর্মে অবগত হন যে, আহমদ রেজাখান নামক উক্ত হিন্দুস্তানী মৌলভী প্রতিপক্ষের আকীদা-বিশ্বাস বর্ণনার ব্যাপারে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। বস্তুত তাদের আকীদা-বিশ্বাস এরূপ নয়। তখন তারা আহমদ রেজাখান কর্তৃক বর্ণিত বিষয়াবলী ছাড়াও মৌখিকভাবে তাদের নিকট উলামায়ে দেওবন্দ সম্বন্ধে আরও যেসব আকীদাগত অমূলক বিভ্রান্তির কথা পৌঁছেছিল এরকম ২৬ টি বিষয় উল্লেখ পূর্বক উলামায়ে দেওবন্দের নিকট সেসব ব্যাপারে তাদের কি আকীদা তা জানার জন্য প্রেরণ করেন। হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপূরী তার বিস্তারিত জওয়াব লিখে হারামাইনের উলামায়ে কেরামের নিকট প্রেরণ করেন। তারা সে উত্তরগুলো দেখে এতমিনান প্রকাশ করেন এবং স্পষ্টতঃ লেখেন যে, আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাসও অনুরূপ। এর মধ্যে কোনটিই আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাস্‌লাক বিরোধী নয়। এ সব প্রশ্ন ও জওয়াব হিন্দুস্তান এবং হারামাইনের উলামায়ে কেরামের সত্যায়নসহ উর্দূ ভাষায় কিতাব আকারে المُهنَّد على المُفَنَّد المعروف بالتصديقات لدفع التلبيسات নামে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। তার উর্দূ অংশ عقائد علماء ديوبند নামে

[১] حسام الحرمين على منحر الكفر والمين. قادرى كتاب گھر بريلى شريف سال طباعت ۱۲ ربيع الاول ۱۴۱۸ھ ص/ ۳۲-۱۲.

স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হয়। যার ফলে তখনকার মত এই ফিতনা অনেকটা নির্বাপিত হয়। পরবর্তিতে হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ও হযরত মাওলানা মুর্তজা হাছান চান্দপূরী حسام الحرمين গ্রন্থের বিস্তারিত জওয়াব লেখেন এবং এক এক করে প্রমাণ করে দেখান যে, এ গ্রন্থে আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের দিকে যে সব আকীদা সম্পৃক্ত করে দেখানো হয়েছে, তা সম্পূর্ণ জালিয়াত ও মিথ্যা। হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) লিখিত সে গ্রন্থ খানার নাম الشهاب الثاقب আর মুর্তজা হাছান চান্দপূরী লিখিত গ্রন্থের নাম السحاب المدرار। তারা এ গ্রন্থদ্বয়ে প্রমাণ করে দেখান যে, আহমদ রেজাখান কিভাবে আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের বিভিন্ন ইবারত কাঁট-ছাঁট করে তার ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে কুফ্‌রীর ফতওয়া দাঁড় করেছেন এবং মানুষকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আহমদ রেজাখান ও তার অনুসারীদের প্রচারণা প্রপাগাণ্ডা তারপরেও অব্যাহত থাকে এবং এখনও রয়েছে।

আহমদ রেজাখান সাহেব উলামায়ে দেওবন্দের বিভিন্ন উর্দূ কিতাবের ইবারতকে কিভাবে গড়বড় করে বা কাঁট-ছাঁট করে তার ভিত্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে কুফ্‌রীর জাল ফতওয়া দাঁড় করেছিলেন তা জানার জন্য উপরোক্ত কিতাবসমূহ (المُهنَّد على المُفَنَّد, بسط البنان, السحاب المدرار, الشهاب الثاقب, عقائد علماء ديوبند প্রভৃতি) পাঠ করলেই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হবে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হল।

১. হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহীর فتاوى رشيديه-এর বরাত দিয়ে বলা হয় যে, তিনি তাতে বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলতে পারেন।" অথচ রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (রহঃ)-এর ইবারত নিম্নরূপ ঃ

بیشک اللہ تعالی اس سے منزہ ہے کہ کذب کے ساتھ متصف ہو اسکے کلام میں ہر گز کذب کا شائبہ بھی نہیں جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے : ومن اصدق من اللہ قیلا ۔اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے ؟ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے نکالے کہ اللہ تعالی جھوٹ بولتا ہے وہ کافر و قطعی ملعون ہے۔اور کتاب و سنت و اجماع امت کا مخالف ہے۔ہاں اہل ایمان کا یہ عقیدہ ضرور ہے حق تعالی نے قرآن میں فرعون وہامان وابو لہب کے متعلق جو یہ فرمایا ہے کہ وہ دوزخی ہین تو یہ حکم قطعی ہے اس کے خلاف کبھی نہ کریگا لیکن اللہ ان کو جنت میں داخل کرنے پر ضرور قادر ہے عاجز نہیں ہاں البتہ اپنے اختیار سے ایسا کریگا نہیں الخ ۔

এখানে গঙ্গোহী (রহঃ) আল্লাহ্‌র কুদরত বর্ণনা করতে গিয়ে لیکن اللہ ان کو جنت میں داخل کرنے پر ضرور قادر ہے عاجز نہیں -এই বাক্য ব্যবহার করেছেন, এ থেকেই আহমদ রেজা খান সাহেব এই কথা বের করেছেন যে, গঙ্গোহীর মতে আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন।

২. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি حفظ الايمان গ্রন্থে বলেছেন ঃ "রাসূল (সাঃ)-এর গায়েবের যেমন জ্ঞান রয়েছে তেমন জ্ঞান

একটা শিশু, পাগল এমনকি জানোয়ারেও রয়েছে। এভাবে তিনি রাসূল (সাঃ)এর অবমাননা করেছেন। আর রাসূল (সাঃ)-এর অবমাননা করা কুফ্‌রী।" অথচ থানবী (রহঃ) রাসূল (সাঃ) কে "আলেমুল গায়েব" বা "গায়েবের জ্ঞানের অধিকারী" বলা ঠিক নয় এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে নিম্নোক্ত ইবারত ব্যবহার করেছেন ঃ

آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضورؐ کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی رہے تو چاہئے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے الخ۔(بسط البنان صفحہ / ۱۵)

৩. হযরত খলীল আহমদ আম্বিটবী সাহারানপূরী রচিত براہین قاطعہ গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে (حسام صفحہ / ۲۷) যে, তাতে আছে ঃ "নবী করীম (সাঃ)-এর এল্‌মের চেয়ে তার (রশীদ আহমদ গঙ্গোহী/সাহারানপূরীর) পীর ইবলীছের এল্‌ম বেশী।" অথচ এটা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। উক্ত গ্রন্থে দীর্ঘ ইবারতে যা বলা হয়েছে عقائد علماء دیوبند গ্রন্থের বর্ণনা মতে তার সারকথা এরূপ ঃ

کسی جزئی حادثہ کا حضرت کا اس لئے معلوم نہ ہونا کہ آپ نے اس کی جانب توجہ نہیں فرمائی آپ کے اعلم ہونے میں کسی قسم کا نقصان پیدا نہیں کر سکتا جبکہ ثابت ہو چکا کہ آپ ان شریف علوم میں جو آپ کے منصب اعلی کے مناسب ہیں ساری مخلوق سے بڑھے ہوئے ہیں جیسا کہ شیطان کو بہتیرے حقیر حادثوں کی شدت التفات کے سبب اطلاع ملجانے سے اس مردود میں کوئی شرافت اور علمی کمال حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ انپر افضل و کمال کا مدار نہیں ہے. الخ۔

৪. হযরত কাসেম নানুতবী (রহঃ) সম্পর্কে تحذیرالناس গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি তাতে খতমে নবূওয়াতের অস্বীকার করে বলেছেন যে, নবী (সাঃ)-এর পরও আরও নবী হতে পারে। এ কথাটিও কাসেম নানুতবী (রহঃ)-এর কথার বিকৃতি।[১] আমি تحذیرالناس গ্রন্থ আগাগোড়া পাঠ করে কোথাও এমন কথা দেখিনি। হয়ত কাসেম নানুতবী (রহঃ)-এর সুদীর্ঘ বক্তব্যকে কাঁটছাঁট ও বিকৃত করেই এমনটি করা হয়েছে।

আহমদ রেজাখান সাহেব কেন এরূপ অহেতুক ও বিভ্রান্তিমূলক ফতওয়াবাজী করে উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মিশন গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রকৃত রহস্য আল্লাহ তা'আলাই অবগত আছেন। তবে এর পিছনে ইংরেজদের মিশন সফল করার কোন যোগসূত্র ছিল বলে অনেকের ধারণা। তার কারণ কয়েকটি। যথা ঃ

১. দেখুন تحذیرالناس ও عقائد علماء دیوبند গ্রন্থ ॥

১. আহমদ রেজাখান সাহেবের শিক্ষক ছিলেন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভাই মির্জা গোলাম কাদের বেগ। আর এই মির্জা পরিবারটি যে ইংরেজদের ক্রিড়নক ও তল্পিবাহক ছিল তা সর্বজন বিদিত।[১] এভাবে এই পরিবারের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ইংরেজ পরিকল্পনার সাথে আহমদ রেজাখান সাহেবের যোগসূত্র গড়ে উঠতে পারে।

২. ইংরেজগণ ভারতবর্ষ দখল করার পর এক সময় শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) ভারতকে দারুল হর্‌ব ঘোষণা দেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহবান জানান। এ ঘোষণার সাথে সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম একাত্মতা পোষণ করেন এবং একে একে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বহু জিহাদ পরিচালিত হয়। সর্বশেষ ১৮৫৭ সালে হিন্দু মুসলিম সম্মিলিত ভাবে দেশ স্বাধীন করার জন্য সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। সে সংগ্রামও ব্যর্থ হয়। ভারতবর্ষের উপর ইংরেজ আধিপত্য পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতকিছু সত্ত্বেও আহমদ রেজাখান সাহেব তার اعلام الاعلام بان هندوستان دار الاسلام নামক গ্রন্থ লিখে তাতে ভারতবর্ষকে দারুল ইসলাম বলে ফতওয়া প্রকাশ করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লেখেন ঃ "আমাদের ইমাম আজম (আবূ হানীফা) বরং তিন ইমামের মাযহাব অনুযায়ী হিন্দুস্তান দারুল হর্‌ব নয় বরং দারুল ইসলাম।"

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল একদিকে তিনি ইংরেজদের চরম বিরোধী উলামায়ে কেরামকে অযথা কাফের আখ্যায়িত করে মুসলমানদেরকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছেন, অপর দিকে বৃটিশ সরকার যখন একে একে ইসলাম ও মুসলমানদের সব নিশানা নিশ্চিহ্ন করে চলেছে সেই মুহূর্তে তিনি ভারতবর্ষকে দারুল ইসলাম আখ্যায়িত করে ইংরেজদের আনুকুল্য প্রদান করেছেন। এটাকে ইংরেজদের ইশারা ঘটিত মনে করা হলে তা অস্বাভাবিক আখ্যায়িত হওয়ার কথা নয়।

৩. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন হিন্দুস্তানে খেলাফত আন্দোলন চলতে থাকে এবং ভারতবর্ষের শতকরা ৯০ জন আলেম তাদের মাসলাকগত মতবিরোধকে পিছনে ফেলে ইসলামের পবিত্র ভূমী রক্ষা ও ইসলামী খেলাফতের হেফাযতের জন্য এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা পোষণ করে একই প্লাটফরমে একত্রিত হন, তখনও আহমদ রেজাখান সাহেব খেলাফত আন্দোলনে শরীক সমস্ত উলামায়ে কেরামকে গান্ধি ফিরকা(فرقہ گاندھویہ) নামে আখ্যায়িত করেন এবং তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে লেখনী ও প্রচারণা যুদ্ধ শুরু করেন।

১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ১৯২১ সালে আহমদ রেজাখান সাহেব ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তার ইন্তেকালের পরও তার মিশন চলতে থাকে। মৌলভী নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, মৌলভী আমজাদ আলী আজমগড়ী, মৌলভী হাশমত আলী পীলীভীতী ও মুফতী মুহাম্মাদ ইয়ার খান প্রমুখ তার মিশনকে অব্যাহত গতিতে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন।

১. দেখুন "কাদিয়ানী মতবাদ" ২৯৭ পৃষ্ঠা ॥

এই রেজভী বা বেরেলী মিশনের কাজ প্রধানতঃ দু'টি।

১. আম্বিয়া ও আওলিয়াদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা।

২. রসম ও বিদআত সমূহকে জয়ীফ এমনকি মওজূ' হাদীছের আশ্রয় নিয়ে সেগুলোকে জায়েয বরং মুস্তাহ্ছান (উত্তম) প্রতিপন্ন করা। সেই সাথে সাথে রসম ও বিদআত বিরোধী প্রতিপক্ষীয় উলামায়ে কেরামকে কথায় কথায় কাফের বলে ফতওয়া দেয়ার ঐতিহ্যবাহী আমলটিতো রয়েছেই। তারা কথায় কথায় তাক্ফীর করায় এত বেশী তৎপর যে, তাদেরকে "তাক্ফীর পার্টি" বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আমাদের দেশে রেজভী নামে যে গ্রুপটি দেখা যায়, তারাও উক্ত আহমদ রেজাখানের অনুসারী। তারাও কথায় কথায় উম্মতের হক্কানী উলামায়ে কেরামকে তাক্ফীর করার রেজাখানী ঐতিহ্যকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে চর্চা করে যাচ্ছেন। তারাও حسام الحرمين গ্রন্থের সেই সব ভিত্তিহীন কথাগুলি এখনও আওড়ে যাচ্ছেন এবং তার ভিত্তিতে উলামায়ে দেওবন্দ ও তাদের অনুসারীদেরসহ বিদআত কুসংস্কার বিরোধী হক্কানী উলামায়ে কেরামকে অত্যন্ত লাগামহীনভাবে তাক্ফীর করে চলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ মাওলানা আকবার আলী রেজভী কর্তৃক প্রকাশিত একটি বই থেকে সামান্য কিছু অংশ তুলে ধরা হল।

"১২০০ হিজরী সনে নজ্দ দেশে এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইব্নে আবদুল ওয়াহ্হাব নামে দেশে দেশে কালিমা ও নামাযের তাবলীগ চালাইয়া মুসলমানদিগকে ফাঁকি দিয়া দলভুক্ত করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং সাহাবায়ে কেরামের আকায়েদের বিপরীত আকীদা শিক্ষা দিয়া একটি বেঈমান শয়তানের দল গঠন করিয়াছে। সেই দলের নাম হইল 'ওহাবী' দল। এবং ওহাবী ধর্মের একটি কেতাব লিখিয়াছেন। যাহার নাম হইল "কিতাবুত তাওহীদ"। সেই কেতাব অনুযায়ী সমস্ত "উম্মতে মোহাম্মাদীকে" মুশরেক বানাইয়াছে। ..... এবং "কিতাবুত্ তৌহিদ" নামক কিতাবখানা দিল্লীতে পাঠাইয়াছে। এই কেতাব মৌলভী ইসমাইল দেহ্লভী দেখিয়া ওহাবী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এবং 'কিতাবুত্ তৌহিদ' অনুযায়ী উর্দু ভাষায় একখানা কেতাব লিখিয়াছে। সেই কেতাবের নাম 'তাকবিয়াতুল' ঈমান। মৌলভী ইসমাইলের দ্বারা হিন্দুস্তানে ওহাবী ধর্ম প্রচার হইয়াছে। অবশেষে ওহাবী ধর্মের কেন্দ্র' দেওবন্দ মাদ্রাসা কায়েম হইয়াছে। তারপর হিন্দুস্তানে এবং পাকিস্তানে দেওবন্দের শাখা প্রশাখা শত শত ওহাবী মাদ্রাসা কায়েম হইয়াছে। দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়িয়া মৌলভী ইলিয়াস নামে একজন বাহির হইয়াছে। তারপর "তাবলীগ জামাত" নাম দিয়া মুহাম্মাদ ইব্নে আব্দুল ওহাব নজদীর মত ওহাবী দল গঠন করিয়াছে এবং কলেমা ও নামায শিক্ষার বাহানা করিয়া হাজার হাজার সুন্নী মুসলমানকে মিথ্যা শুনাইয়া দলভুক্ত করিয়া ওহাবী বানইয়াছে। এবং আজ পর্যন্ত প্রায় ৫০ বৎসরের মধ্যে হাজার হাজার সুন্নী মুসলমান তাবলীগ জামাতের দলভুক্ত হইয়া "ওহাবী" জাহান্নামী হইয়াছে। সামান্য শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকদিগকে প্রলোভন দিয়া মিথ্যা মিথ্যা

ছওয়াবের কথা শুনাইয়া দলভুক্ত করিতেছে। আমীর বানাইতেছে এবং এই লক্ষ লক্ষ টাকার খরচ তাহাদিগকে সৌদী গভর্ণর অর্থাৎ, ওহাবী গভর্ণর গোপনে দিয়াছে। বর্তমানে "তাবলীগ জামাতের" প্রধান কেন্দ্র নজ্দ দেশে আছে এবং দ্বিতীয় কেন্দ্র দেওবন্দ মাদ্রাসা। তৃতীয় কেন্দ্র হইল নয়াদিল্লী মৌলভী ইলিয়াসের বাড়ীতে। ইহাই হইল তাহাদের মূল হাকীকত ইতিহাস। তাহাদের হুকুম সম্বন্ধে কিতাব "হেদায়াতে মাক্কীয়া জওয়াব কেতাবুত তৌহিদ" এবং ফতুয়া হুচ্ছামূল হারামাইনের মধ্যে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের চারি মুজহাবের সমস্ত আলেমগণ এবং ফতুয়া আল কাওকাবাতুস সাহাবীয়ায় ইমামে আহ্লূস সুন্নাত মোজাদ্দেদে জামান হযরত আল্লামা আহাম্মাদ রেজা খান সাহেব বেরলভী এবং কেতাব "আচ্ছারে মূল হিন্দিয়ার" মধ্যে হিন্দুস্তানের এবং পাকিস্তানের হাজার হাজার সুন্নী আলেমগণ একমত হইয়া ফতুয়া দিয়াছেন যে, ওহাবী দল বিশেষ করিয়া ওহাবী দলের নেতাগণ যথা ঃ- মুহাম্মদ ইব্নে আব্দুল ওয়াহাব নজদী, মৌলভী ইসমাইল দেহলভী, মৌলভী কাসেম নানুতোবী বানিয়ে মাদ্রাসা দেওবন্দ, মৌলভী রশীদ আহ্মদ গঙ্গুহী, মৌলভী খলিল আহম্মদ আমবটী এবং মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সমস্ত কাফের মুরতাদ্ এবং হিন্দুস্তানের ওহাবীগণের নেতা মৌলভী ইসমাইল দেহলভী যার উপর ৭০ কুফূরী ফতুয়া আছে। আল-কাওকাবাতুশ শাহাবিয়া নামক কিতাবে প্রমাণ আছে। তার সম্বন্ধে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের আলেমগণ ফতুয়া দিয়াছেন যে তাকবীয়াতুল ঈমানের আকীদা অনুযায়ী কাফের ও দাজ্জাল এবং ইসমাইলের সমস্ত সমর্থনকারী দাজ্জালের লস্কর। দেখুন কিতাব আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত।

মূল কথা হইল এই যে, "ওহাবী সম্প্রদায় ও তাবলীগি জামাতের মধ্যে সামিল হওয়া, তাহাদিগকে সাহায্য করা, তাদের পিছনে নামায পড়া, তাদের জানাযার নামায পড়া, তাদের সঙ্গে বিবাহ-শাদী করা, তাহাদেরকে সালাম দেওয়া, তাহাদিগকে সম্মান করা, তাহাদের সহিত মোছাফা করা, তাহাদিগকে মসজিদে স্থান দেওয়া, তাদের মাদ্রাসায় সাহায্য করা, তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করা, তাদের সঙ্গে সমাজ কায়েম করা সমস্ত হারাম ও শক্ত গোনাহ বরং কুফুরী। কোরান শরীফ, হাদীছ শরীফ এবং ফেকা ও আকায়েদের কেতাবাদীর দ্বারা প্রমাণিত আছে। তাদের আকীদা সম্বন্ধে "ফতুয়ায়ে আল কাওকাবাতুশ শাহাবিয়া" এবং সাইফুল জব্বার ও কেতাব আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত দেখুন।

বিঃ দ্রঃ যাহারা সুন্নী মুসলমান তাবলীগ জামাতের আকীদাগুলি না জানিয়া মিথ্যা কথার উপর বিশ্বাস করিয়া দলভুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের জন্য তাবলীগ জামাত ত্যাগ করিয়া তওবা করা ফরয।"[১]

---

১. বর্তমান প্রচলিত তাবলীগের ইতিহাস, প্রকাশক- মাওলানা আকবর আলী রেজভী ছুন্নী আল-কাদ্রী, ঠাকুরাকোণা, মোমেনশাহী ॥

এরপর তিনি হুছামুল হারামাইনের সেই সব অভিযোগ তুলে ধরেছেন যে, ওহাবী ও তাবলীগী ওহাবীদের আকীদাগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহ মিথ্যা বলিয়াছেন। (ফতুয়া রশীদ আহমদ গঙ্গোহী)

২. নবী (দঃ) এর এলেম হইতে শয়তানের এলেম বেশী। (বারাহিনে কাতেয়া)

ইত্যাদি।

অথচ এসব অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তা বহু কিতাবে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যার কিছুটা বিবরণ ইতিপূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে। তিনি এর চেয়ে আরও ভিত্তিহীন বক্তব্যও তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি تحذير الناس গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলেছেন যে, তাতে আছে কাসেম নানুতবী বলেছেন "খাতামুন্নাবিয়্যানের" অর্থ শেষ নবী নয় বরং আফজল নবী। এই কারণে যদি হুজুরের পরে অন্য কোন নবী আসে তবুও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম খাতামুন্নাবিয়্যানে থাকিবেন। "খাতেমুন্নাবিয়্যান" অর্থ শেষ নবী-এই অর্থ করা মূর্খ লোকের কাজ।"

আকবর আলী রেজভী সাহেব কর্তৃক تحذير الناس গ্রন্থের উপরোক্ত বরাত দেখে বিষয়টি যাচাই করার জন্য আমি আবার আগাগোড়া উক্ত গ্রন্থ খুঁটে খুঁটে দেখলাম। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করেও কোথাও এমন কথা দেখতে পেলাম না। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত করুন।

বে শরা পীর-ফকীর

"বে শরা পীর-ফকীর" বলতে বোঝানো হচ্ছে যারা নিজেদেরকে পীর ফকীর বলে দাবী করে অথচ শরী'আত মেনে চলে না। যেমন নামায পড়ে না, গান-বাদ্য করে, মদ গাঁজা খায়, শরীআতের পর্দা মেনে চলে না, নারী পুরুষ অবাধে পর্দাহীনভাবে একত্রে জিক্‌রের আসর বসিয়ে ঢলাঢলি করে। এদের অনেকে জটা রাখে, অনেকে উলঙ্গ থাকে, অনেকে রঙ-বেরংয়ের তালি লাগানো কিম্ভূত কিমাকার কাপড়-চোপড় পরিধান করে নিজেদের বুযুর্গী প্রকাশের প্রয়াস পায়। ইত্যাদি। এরা নিজেদেরকে মা'রেফাতপন্থী বলে দাবী করে। তাদের দাবী হল শরী'আত ও মা'রেফাত ভিন্ন ভিন্ন। শরী'আত হল জাহিরী বি-ধি-বিধান আর মা'রেফাত হল বাতিনী বিধি-বিধান। জাহিরী শরী'আতে যা নাজায়েয মা'রেফাতের পন্থায় তা জায়েয। অনেকে এ ধরনের পীর-ফকীরকে "ন্যাড়ার ফকীর" বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

এ জাতীয় পীর-ফকীরদের শরীআত পরিপন্থী আকীদা-বিশ্বাস প্রচুর। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ ও সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত খণ্ডন পেশ করা হল।

বে শরা পীর-ফকীরদের মতবাদ ঃ

১. শরী'আত ও মা'রেফাত ভিন্ন ভিন্ন। শরী'আত হল যাহিরী বিধি-বিধান আর মা'রেফাত হল বাতিনী বিধি-বিধান। যাহিরী শরী'আতে যা নাজায়েয মা'রেফাতের পন্থায় তা জায়েয। তারা বলে আমরা যাহিরী শরী'আতের উপর নয় বরং বাতিনী শরী'আতের উপর আমল করি।

খণ্ডন ঃ

তারা যাহেরী শরীআত ও বাতেনি শরী'আত বলে দুইটা শরী'আত দাঁড় করেছেন। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, এর কোন দলীল কুরআন-হাদীছে নেই। তদুপরি শরী'আত থেকে তরীকতকে পৃথক করে নিলে শরী'আত তথা শরী'আতের বিধি-বিধানকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয়, যা শরী'আতকে রহিত সাব্যস্ত করার ন্যায়। এ ধরনের বিকৃতি সাধনকারী লোকদেরকে বলা হয় মুল্‌হিদ বা যিন্দীক।

নিম্নে সহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যাকার ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী (রহঃ)-এর একটি যুক্তিপূর্ণ বিশদ আলোচনার সারাংশ সামান্য বাখ্যাসহ তুলে ধরা হল। তিনি বলেন ঃ

"যিন্দীকদের একটি গ্রুপ এমন তাসাওউফের কথা বলে, যার ফলে শরী'আতের বিধানাবলীকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়। তারা বলে ঃ 'শরী'আতের এসব বিধি-বিধান নির্বোধ ও সাধারণ লোকদের জন্যে। আউলিয়ায়ে কেরাম ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ শরী-আতের এসব বিধানাবলীর মুখাপেক্ষী নন। (বরং তারা এ সব কিছুর উর্ধ্বে) কারণ তাঁদের অন্তঃকরণ স্বচ্ছ ও নির্মল। তাই তাদের অন্তরে যা কিছুর উদ্রেক হয়, তাই তাঁদের থেকে কাম্য' -এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কুফ্‌রী কথা। এ ধরনের কথাবার্তা যারা বলে, তাদেরকে কতল করে দিতে হবে। তওবাও তলব করা হবে না। কেননা, এ মতবাদের মধ্যে শরী'আতের একটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য আকীদার অস্বীকৃতি পাওয়া যায়। সে আকীদাটি হল, 'আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অবগতির কোন উপায় নেই।' আর শরী'আতের কোন সুস্পষ্ট ও অকাট্য আকীদার অস্বীকৃতি পরিষ্কার কুফর।"[১]

২. এজন্য তারা বাতিনী নামাযের প্রবক্তা। তাদের অনেকে বলে আমরা বাতিনী নামায পড়ি।

খণ্ডন ঃ

পূর্বে আলোচনা করা হল যে, এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কুফ্‌রী কথা। যারা এ ধরনের আকীদা রাখে বা এ ধরনের কথাবার্তা যারা বলে, তারা যিন্দীক ও কাফের। বাতিনী নামায নামায নয় বরং বলা যায় সেটা নামাযের কল্পনা। শরীআতে নামায আদায় করতে বলা হয়েছে নামাযের কল্পনা করতে বলা হয়নি। রাসূল (সাঃ) স্বশরীরে নামায আদায় করে নামায কিভাবে আদায় করতে হবে তা দেখিয়ে গেছেন। সূতরাং ক্বলব দ্বারা নামায নয় বরং স্বশরীরেই নামায আদায় করতে হবে।

৩. তারা বলে ক্বলব ঠিক থাকলে সব ঠিক। ক্বলব ঠিক থাকলে যাহিরী ইবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন পড়ে না। অর্থাৎ, ইয়াক্বীন অর্জন হয়ে যাওয়ার পর আর ইবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন থাকে না।

খণ্ডন ঃ

এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে কিছু খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। সুরেশ্বরী, আটরশী ও মাইজভাণ্ডারীদের অনুরূপ আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে। সুরেশ্বরী, আটরশী ও মাইজভাণ্ডারীদের

১. تفسير قرطبي. جـ/١١. صفحـ/٢٩-٢٨، فتح الباري جـ/١، صفحـ/٢٦٧

আকীদা-বিশ্বাস পর্যালোচনার প্রাক্কালে এতদসম্পর্কিত বিস্তারিত খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৪৬৩-৪৬৯।

৪. তারা বলে কুরআনের ত্রিশ পারা যাহির আর দশ পারা বাতিন। এই বাতিনী দশ পারা বাতিনী পীর-ফকীরদের সিনায় সিনায় চলে আসছে। তাদের কেউ কেউ এমনও বলেন যে, মে'রাজে রাসূল (সাঃ) ৯০ হাজার কালাম লাভ করেছিলেন। উলামায়ে কেরাম কেবল ৩০ হাজার কালাম জানেন। অবশিষ্ট ৬০ হাজার কালাম এসব সূফী ফকীরদের নিকটই রয়েছে। যা তারা সিনা পরম্পরায় লাভ করেছেন।

খণ্ডন ঃ

সিনায় সিনায় চলে আসা এসব বিদ্যা তারা কিভাবে লাভ করলেন? কে কাকে কখন কিভাবে শিক্ষা দিল? তার সনদ কি? সনদ ছাড়া দ্বীনের কোন কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এর সনদ তারা কোন দিন দিতে সক্ষম হবে না। সনদ ছাড়া দ্বীনের কথা গ্রহণযোগ্য হলে যে যা ইচ্ছা তা দ্বীনের নামে চালিয়ে দিতে পারবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মুবারক তাই বলেছেন ঃ

الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ـ (مقدمة مسلم)

অর্থাৎ, সনদ দ্বীনের অংশ। সনদ না থাকলে যার যেমন ইচ্ছা তেমন বলে যেত।

এ ধরনের চিন্তাধারা শী'আদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইব্নে সাবা শী'আদের মধ্যে এই ধারণা ছড়িয়ে ছিল যে, নবী করীম (সাঃ) আহ্লে বাইতকে বিশেষতঃ হযরত আলী (রাঃ)কে কিছু বিশেষ গোপন তথ্য শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা সাধারণ্যে ফাঁস করা হয়নি। তারপর সে মনগড়া একটা তথ্য ব্যক্ত করে সেটাকে সেই গোপন তথ্যের নামে চালিয়ে দিয়ে উম্মতের একটা বিরাট গোষ্টিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

রাসূল (সাঃ) দ্বীনের কোন কথা গোপন রাখেননি। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তিনি যা প্রাপ্ত হয়েছেন, তা সবই উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কুরআন ও হাদীছ দ্বারা এ বিষয়-টি প্রমাণিত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يايها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته ـ

অর্থাৎ, হে রাসূল ! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা তোমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, তা পৌঁছে দাও। অন্যথায় তোমার রেছালাতের দায়িত্ব পৌঁছালে না।

বিদায় হজ্জের ভাষণে লক্ষাধিক সাহাবীর সন্মুখে তিনি তিনবার বলেছিলেন ঃ

الا هل بلغت ؟ الا هل بلغت ؟ الا هل بلغت ؟

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি ? তিনবার তিনি এভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। সমবেত সাহাবীগণ উত্তর দিয়েছিলেন ঃ হ্যাঁ। তারপর তিনি আল্লাহ্কে এ মর্মে স্বাক্ষী রেখে বলেছিলেন ঃ

اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাক।

৫. তারা গায়রে মাহ্রাম নারী-পুরুষের পর্দাহীনভাবে যিকির ও ঢলাঢলিকে বৈধ বলে কার্যতঃ গায়রে মাহ্রাম নারী-পুরুষের মধ্যে পর্দা ফরয - এই বিধানকে অস্বীকার করে।

খণ্ডন ঃ

গায়রে মাহ্রাম নারী-পুরুষের মধ্যকার পর্দার বিধান ফরয। এটা نصوص قطعيه দ্বারা প্রমাণিত। এরূপ বিষয়কে অস্বীকার করা কুফ্রী। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن . الاية ـ (সূরাঃ ২৪-নূরঃ ৩১)

৬. তাদের মতে যে কোন পুরুষ যে কোন নারীকে ভোগ করতে পারে।

এ জাতীয় ফকীরদের অনেকে অবাধ যৌন মিলনকে সিদ্ধি লাভের সহায়ক মনে করে।[১] তারা মনে করে পঞ্চ রসই শক্তির আধার। পঞ্চ রস হল ঃ মল, মূত্র, বীর্য, ঋতুর রক্ত ও শ্লেষ্মা। তারা নিজ স্ত্রীর বা পরস্ত্রীর মিলনে যে রস নিঃসৃত হয়, তা সেবনকে 'রতি সেবন' বলে। কেউ কেউ 'লাল সাধন' কেউ কেউ 'গুটি সাধন'ও বলে। তারা একে অপরের স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনে অসন্তোষ প্রকাশ করে না। এই অসন্তোষ প্রকাশ না করা তাদের মতে আত্মশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। তারা বলে নারীগণ হল বহতা নদীর মত। নদীর মধ্যে যে কোন ময়লা আবর্জনা পড়লে যেমন নদী নাপাক হয় না, তদ্রূপ নারীর যোনীতে পর পুরুষের বীর্য পড়লে তা নাপাক হয় না। তারা আরও বলে নারীগণ গঙ্গা স্বরূপ। আর তাদের মিলন প্রত্যাশী পুরুষগণ হল স্নানার্থী তীর্থ যাত্রী স্বরূপ। আর গঙ্গা স্নানে তথা যৌন মিলনে কারও কোন আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না।

তারা বলে দলে দলে একত্রে স্ত্রী পুরুষ মিলে নাচ গান করলে কামরিপু দমন হয়। যেমন একে অপরের স্ত্রীকে ব্যবহার করলে হিংসা রিপু দমন হয়। তারা অবাধ যৌনাচারিতায় যে বীর্যপাত হয় তা ময়দার সাথে মিশিয়ে রুটি বানিয়ে ভক্ষণ করে। এটাকে তারা নাম দিয়েছে "প্রেমভাজা"। (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা)

খণ্ডন ঃ

এ সব কথার মাধ্যমে তারা যেনাকে বৈধ করেছে। যেনা কুরআন হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য অনুসারে হারাম। আর যেনা হারাম হওয়ার বিষয়টি একটি বদীহী বা সর্বজন বিদিত বিষয়। এরূপ বিষয়কে অস্বীকার করা কুফ্রী। অতীতে মুরজিয়া নামক একটি গোমরাহ ফিরকার অনুরূপ আকীদা ছিল। তারা বলত ঃ নারীগণ বাগানের ফুলের ন্যায়। যে ইচ্ছা সে ভোগ করতে পারে- বিবাহ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই।[২] এ আকীদা উম্মতের সর্বসম্মত মতে কুফ্রী।

৭. তাদের মতে গান-বাদ্য করা বৈধ।

খণ্ডন ঃ

গান-বাদ্য হারাম। কোন হারামকে হালাল মনে করা কুফ্রী। গান-বাদ্য হারাম এ সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৫৫২-৫৬১।

১. এটাকে শয়তানিয়্যাত সিদ্ধি বলা হলেই যথার্থ হবে ॥ ২. كما في مقدمة عقيدة الطحاوى ॥

৮. তাদের মতে মদ গাঁজা খাওয়া বৈধ।

তারা শুধু মদ গাঁজা নয়, হায়েয, নেফাস, বীর্য, মল, মুত্র ইত্যাদিও ভক্ষণ করে। তারা বলে এগুলো ভক্ষণ দ্বারা রিপু দমন হয়।

খণ্ডন ঃ

মদ গাঁজা সম্পূর্ণ হারাম। এটা শয়তানী কর্ম। এটা نصوص قطعيه দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه -

অর্থাৎ, মদ, জুয়া, বেদী ও তীর (নিক্ষেপের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ) এগুলো শয়তানের কাজ। অতএব তা থেকে বিরত থাক। (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ৯০)

এমনি ভাবে হায়েয, নেফাসের রক্ত, বীর্য, মল, মুত্রও হারাম। কুরআন হাদীছের বহু ভাষ্য দ্বারা এগুলি হারাম হওয়া প্রমাণিত। আর কোন হারামকে হালাল মনে করা কুফ্‌রী।

৯. তারা পীর ফকীরদের মধ্যে আল্লাহ্‌র হুলূলের আকীদা রাখে অর্থাৎ, তারা মনে করে পীর-ফকীরদের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রকাশ ঘটে। তারা শিক্ষা দেয়, "যেহী মুরশিদ সেহি খোদা"। এভাবে তারা পীর-মুরীদির অন্তরালে শির্‌কের শিক্ষা প্রদান করে। তারা পীর ফকীরদের মধ্যে আল্লাহ্‌র হুলূলের আকীদা রাখে-এ প্রসঙ্গে তাদের বহু গান বা কবিতার কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন লাল মামূদ গেয়েছে ঃ

আল্লাহ নবী দুই অবতার
এক নূরেতে দুই মিশকাত কর
এ নূরে সাধিলে নিরঞ্জনকে
অমনি তাকে যাবে ধরা ।

আরও উল্লেখ করা যায়ঃ

মন পাগলরে গুরু ভজনা
গুরু বিনে মুক্তি পাবিনা
গুরু নামে আছে শুধা,
যিনি গুরু তিনিই খোদা,
মন পাগলরে গুরু ভজনা।

খণ্ডন ঃ

পূর্বে সুরেশ্বরী পীরের আকীদা-বিশ্বাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে যে, হুলূলের আকীদা শিরক। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল আল্লাহ্‌র সত্তা কারও সত্তার মধ্যে মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হয় না বা প্রবেশ (حلول) হয় না এবং তাঁর সত্তার মধ্যেও কেউ মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হয় না। খৃষ্টানদের ধারণায় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে প্রবেশ حلول করেছিলেন অর্থাৎ, অবতারিত হয়েছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাস মতে ঈশ্বর মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষ পাথর সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ (حلول) করেন অর্থাৎ, অবতারিত হন। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারীদেরকে হুলুলিয়া (حلوليه) বলা হয়। এরূপ বিশ্বাস কুফ্‌রী। মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী বলেন ঃ যেসব মূর্খ লোকেরা বলে, আল্লাহ্‌র খাস

ওলীগণ আল্লাহ্‌র সত্তার মধ্যে এমনভাবে লীন হয়ে যান, যেমন বরফ পানির মধ্যে এবং বিন্দু দরিয়ার মধ্যে লীন হয়ে যায়, (ফলে তার এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে আর পার্থক্য করা যায় না।) এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং স্পষ্ট কুফ্‌র।[১]

১০. তারা পীর-ফকীরদেরকে খোদার স্তরে নয় বরং খোদার চেয়ে উপরে তুলে নিয়ে যায়। তাদের মুখ থেকে বের হয় ঃ

খোদার ধন রাসূলকে দিয়া
খোদা গেছেন খালি হইয়া
রাসূলের ধন খাজাকে দিয়া
রাসূল গেছেন খালি হইয়া
..... ইত্যাদি।

খণ্ডন ঃ

এরূপ আকীদা বিশ্বাস যে কুফ্‌রী তার বিশদ বিবরণ প্রদান নিষ্প্রয়োজনীয়।

এ ছাড়াও এসব বে-শরা পীর-ফকীররা পীর বা পীরের কবরকে সাজদা করে, তারা মহিলা মুরিদদের থেকে খেদমত নেয়, মেয়েলোক নিয়ে জিকির করে, ঢলাঢলি করে। ইত্যাদি বহু শরী'আত বিরুদ্ধ আকীদা ও আমলের অনুসারী তারা।

বাউল সম্প্রদায়

"বাউল" শব্দের উৎপত্তি ঃ

"বাউল" শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ বলেছেন বাউল শব্দটি আরবী "আউয়াল" শব্দ থেকে উদ্ভূত এবং তা থেকে বাউল। কেউ কেউ বলেন বাউল্যা হতে বাউলা ও বাউলা হতে বাউল আর "আউলিয়া" হতে আউল্যা, আউল্যা হতে আউলা ও আউলা হতে আউল। আউল এবং বাউল শব্দদ্বয় সমার্থবোধক। কেউ কেউ বলেন ফারসী "বা" প্রত্যয় অর্থের সাথে গ্রাম্য "উল" (যার অর্থ সন্ধান) যোগ হয়ে বাউল হয়েছে। এখন বাউল শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি সন্ধানের সাথে বা মনের মানুষের সন্ধানে বর্তমান। যেমন মুসলিম সাধকগণ নিজেদেরকে তালিবুল মাওলা বলেন তেমনি বাউলগণ নিজেদেরকে বাউল বা তালিবুল মাওলা বলেন। কেউ কেউ বলেন সংস্কৃত "বাতুল" (অর্থ উন্মাদ) শব্দের প্রাকৃত রূপ "বাউর" ও হিন্দী শব্দ "বাউরা" (অর্থ পাগলা) হতে বাউল শব্দের উৎপত্তি। তাদের ব্যাখ্যা মতে বাউলগণ পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ও আপন ভাবে মশগুল ও উন্মাদ প্রকৃতির হয়ে থাকে বিধায় তাদেরকে বাউল বলা হয়।

বাউলদের নাম ঃ

বাংলাদেশে ও পশ্চিম বঙ্গে লালন ও তার অনুসারী ফকীরদেরকে বাউল, বে-শরা ফকীর, নেড়ার ফকীর ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। কদাচিৎ বাউল নামেও তারা পরিচিত।

---

১. عقائد الاسلام عبدالحق حقانى ॥

বাউলদের শ্রেণী ভাগ ঃ

মোটামুটি ভাবে বাউলদের দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হয়।

১. হিন্দু জাতির বাউল তথা বৈষ্ণব, বৈষ্ণব-বাউল, বাউল-মোহান্ত, বৈষ্ণব-রসিক প্রভৃতি।

২. মুসলমান জাতির বাউল তথা পীর, কুতুব, সাঁই, ফকীর প্রভৃতি।

বাউল মতের প্রবর্তক ও এই মতের উদ্ভবকাল ঃ

বাউল মতের উদ্ভব কাল ও এ মতের প্রবর্তক কে এ সম্পর্কেও পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। বাউল গবেষক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেনঃ মুসলমান নেড়া বা বে-শরা ফকীরই বাউল ধর্ম সাধনার আদি প্রবর্তক। কেউ কেউ বলেন বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের আদি গুরু চৈতন্যদেব।[১] বাউল গবেষক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এই শ্রেণীর সকল সাধকই বাউল। কেউ কেউ বলেন বাউল মতের আদি প্রবর্তক বলে খ্যাত ব্যক্তির নাম হল আউল চাঁদ। বাউল গবেষকদের অনেকের মতে মুসলমান মাধব বিবি ও আউল চাঁদই এ মতের প্রবর্তক। মোটামুটি ভাবে ১৭ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকেই বাউল মতের উন্মেষ।

বাউলদের কতিপয় দর্শন ও রীতি-নীতি ঃ

বিস্তারিত অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাউলগণ নির্দিষ্টভাবে হিন্দু বা মুসলিম কোন সম্প্রদায়েরই আচার-আচরণ বা দর্শনের অনুসারী নয়।[২] বরং বাউলদের

---

১. চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮০ ও মৃত্যু ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে। তিনিই বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক। গৌড়ীয় বাউল সম্প্রদায় তাকেই আদি বাউল বলেন ॥

২. কোন কোন বাউল গবেষক বাউলদেরকে মুসলমান আখ্যায়িত না করলে নাখোশ হন, এমনকি বাউলদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত লালন শাহকে বে-শরা ফকীর বললেও তারা নাখোশ হন। তাদের যুক্তি হল লালন শাহ তার গানে বহু স্থানে আল্লাহ, রাসূল, নামায, আখেরাত ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব তাকে বে-শরা আখ্যায়িত করা অযৌক্তিক। কিন্তু এ সব গবেষকগণ সম্ভবতঃ জানেন না যে, শুধু আল্লাহ, রাসূল ইত্যাদি মুখে বললেই বা স্বীকার করলেই সে শরী'আতপন্থী হয়ে যায় না, যদিনা তার আকীদা-বিশ্বাস শরী'আতের বিচারে যথার্থ ও সহীহ বলে বিবেচিত হয়। তিনি আল্লাহ, রাসূল ও দ্বীন ধর্মকে ইসলাম বর্ণিত ব্যাখ্যায় ও ইসলাম পন্থীদের মত করে বিশ্বাস করেননি বরং নিজস্য ব্যাখ্যা অনুসারে বিশ্বাস করেছেন, যা ঈমানের সংজ্ঞায় যথার্থ বলে বিবেচিত হতে পারে না। তদুপরি বাউলদের শরী'আত পরিপন্থী দর্শনসমূহ বিচার করলেও বাউলদেরকে বে-শরা আখ্যায়িত করা বৈ গত্যন্তর থাকে না। শরী'আতের আলোকে বাউলদের দর্শনকে বিচার করলে কোন ক্রমেই তাদেরকে শরীআত অনুসারী বলে স্বীকৃতি দেয়ার অবকাশ থাকে না। উল্লেখ্যঃ লালন শাহও চারচন্দ্র সাধনার প্রবক্তা ছিলেন। এমনকি তিনি গৌর, হরি, রাম, নারায়ণ প্রমুখকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার হিসেবে বিবেচনা করতেন, যা সন্দেহাতীতভাবে একটি কুফ্‌রী আকীদা। এ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৪৯। এমন হারাম ভক্ষণকারী ও কুফ্‌রী আকীদা পোষণকারীকে বে-শরা বললে যদি কেউ অসন্তুষ্ট হন, তাহলে সে অসন্তুষ্টি দূর করার দায় দায়িত্ব একমাত্র তারই থেকে যায় ॥

অনেকগুলি নিজস্য বিশেষ দর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি দর্শন ও ইসলামের দৃষ্টিতে সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হল।

১. চার চন্দ্র ভেদতত্ত্ব ঃ

"চারচন্দ্র" বলতে বোঝায় শুক্র, রজঃ, বিষ্ঠা ও মুত্র। বাউলদের মতে সিদ্ধি অর্জন করার জন্য এই চারচন্দ্র সাধনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাউলদের দাবী হল চারচন্দ্র সাধনায় কামজয় হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা যোগে বাউলগণ প্রকৃতি আশ্রয়ী হয়ে সাধনা করতে গিয়ে তারা পানক্রিয়া অনুষ্ঠান করে এ সব পান করে থাকে।

এই চারচন্দ্র-ভেদ সাধনার জন্য বাউলরা হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছে অত্যন্ত নিন্দিত; যদিও বাউল সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে তা খুবই প্রশংসনীয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মল, মুত্র, মনী বা বীর্য ও ঋতু স্রাব - এসব ভক্ষণ করা হারাম। অতএব হারামকে যারা হালাল মনে করে তাদের ঈমান থাকে না। আর হারাম উপায়ে কৃত কোন সাধনা ইসলামে স্বীকৃত ও কাম্য নয়।

উল্লেখ্য - বাউলগণ শুক্র বা বীজকে ঈশ্বর আখ্যায়িত করে থাকেন। তাই সিদ্ধি অর্জনের জন্য শুক্র বা বীজ ভক্ষণ তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হওয়ারই কথা। বাউল গবেষক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালন শাহ তথা বাউল সম্প্রদায়ের ধর্মমত সম্পর্কে বলেন, "বাউলগণ পুরুষদের বীজরূপী সত্তাকে ঈশ্বর বলেন। বাউলদের মতে এই বীজ সত্তা বা ঈশ্বর রস ভোক্তা, লীলাময় ও কাম ক্রীড়াশীল।"

বীজকে ঈশ্বর আখ্যায়িত করার কারণে অনেকে বাউলদেরকে বীজেশ্বরবাদী বলে অভিহিত করে থাকেন। এই বাউলদের অনেকে বলে থাকেন "বীজমে আল্লাহ"।

উল্লেখ্য - বীজকে ঈশ্বর আখ্যায়িত করে বাউলগণ আল্লাহ্‌র পরিচয়কে বিকৃত করেছেন। এরূপ ব্যাখ্যা ও পরিচয়ে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা অবিশ্বাস করারই নামান্তর। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বাউল দর্শন একটি ইসলাম বিবর্জিত ও ঈমান পরিপন্থী দর্শন।

২. মনের মানুষ তত্ত্ব ঃ

বাউলগণ আল্লাহ, অচিন পাখী, মনের মানুষ, আলেক সাঁই ইত্যাদিকে সমার্থবোধক মনে করে থাকেন। আত্মসন্ধানের মাধ্যমে তাদের এই কথিত "মনের মানুষ" তথা খোদাকে সন্ধানই তাদের প্রধান লক্ষ্য। তাদের কথিত "মনের মানুষ"-এর কি অর্থ তা নিয়ে বাউল গবেষকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল অন্তরস্থিত নূর, যে নূর দ্বারা মুহাম্মাদকে তৈরি করা হয়েছিল অর্থাৎ, এর দ্বারা নূরে মোহাম্মাদীকে বোঝানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী মনের মানুষকে সন্ধান করা আল্লাহ্‌কে সন্ধান করার নামান্তর নয়। কেউ কেউ বলেন "মনের মানুষ" দ্বারা আল্লাহকে বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ মানুষের অন্তরে সমাহিত হয়ে থাকেন। যাহোক এভাবে বাউলগণ আল্লাহ্‌র পরিচয়কে অস্পষ্ট করে তুলেছেন। ইসলামী আকীদা মতে নূরে মুহাম্মাদী আর আল্লাহ সমার্থবোধক নয়। তাছাড়া আল্লাহ কোন মনের মানুষ নন। তিনি সমস্ত উত্তম গুণাবলীর আধার এক সত্তা। তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিরাজমান। তিনি কোন মানুষের অন্তরে অবস্থান গ্রহণ করেন না। তিনি স্থান ও কালের উর্ধ্বে। অতএব বাউল কথিত মনের মানুষকে সন্ধান করা আদৌ আল্লাহ্‌কে সন্ধান করার সমান্তরাল নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাউলগণের ধারণায় আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যিনি আল্লাহ তিনিই রাসুল। তাই তাদের কথিত মনের মানুষের ব্যাখ্যা আল্লাহ ও রাসূল উভয়ই হতে পারে তাতে কোন বৈপরিত্য নেই।

৩. আল্লাহ ও রাসূল এক হওয়ার তত্ত্ব ঃ

কেবল মাত্র বলা হল বাউলগণের ধারণায় আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যিনি আল্লাহ তিনিই রাসুল। এ প্রসঙ্গে বাউলশ্রেষ্ঠ লালন বলেনঃ

আছে আল্লাহ আছে রাসূল
এতে কোন ভুল নাই,
আল্লাহ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা,
এই এক 'সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করে সার,
যে নিরঞ্জন সেই নূর নবী নামটি ধরে,
কে পারে সে মকরউল্লার মকর বুঝিতে,
আহাদে আহামদ নাম হয় জগতে,
আত্মতত্ত্বে ফাজিল যে জনা,
জানতে পায় নিগুঢ় কারখানা,
হল রছূল রূপে প্রকাশ রব্বানা।

উল্লেখ্য আহাদ ও আহমদের মধ্যে শুধু একটি মীম হরফের পার্থক্য এছাড়া আহাদ তথা আল্লাহ ও আহমদ তথা নবীর মধ্যে আর কোন পার্থক্য নেই- এরূপ দর্শন মাইজ-ভাণ্ডারীগণও পোষণ করে থাকেন। এনায়েতপূরীদের মতবাদ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এ মতবাদটির কুফ্‌রী মতবাদ হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৪৭১।

৪. মুরশিদ তত্ত্ব ঃ

বাউলদের একটি প্রসিদ্ধ তত্ত্ব হল মুরশিদ তত্ত্ব। একে পীরতত্ত্ব বা গুরুতত্ত্বও বলা হয়। তারা আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে যেমন পার্থক্য করেনা, তদ্রূপ আল্লাহ ও মুর্শিদের মধ্যেও কোন পার্থক্য করে না। এ প্রসঙ্গে তাদের প্রসিদ্ধ উক্তিটি উল্লেখ্য ঃ "যেহি মুরশিদ সেহি খোদা"। লালন (মুর্শিদকে লক্ষ্য করে) বলেন ঃ

আপনি খোদা আপনি নবী
আপনি সেই আদম ছবি
অনন্ত রূপ ধরে ধারণ
কে বোঝে তার নিরাকারণ
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন
মুর্শিদ রূপ ভজন পথে।

তিনি আরও বলেন ঃ

মোরশেদ বিনে কি মন ধন আর আছে রে এ জগতে
মোরশেদের চরণ সুধা
পান করলে হবে ক্ষুধা
করনা আর দেলে দ্বিধা
যেহি মোরশেদ সেহি খোদা।

উল্লেখ্য ঃ পীরকে খোদা আখ্যায়িতকারী ফকীরগণ ফানা ফিল্লাহ্‌র অজুহাত দেখিয়ে পীর ও খোদার মধ্যে পার্থক্য না থাকার কথা বলে থাকেন। তারা মানসূর হাল্লাজ প্রমুখ মজযূবের জযবার হালাতে উক্ত কিছু বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে মতলব উদ্ধারের চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু প্রথমতঃ কথা হল ফানা ফিল্লাহ্‌র অর্থ সবকিছু আল্লাহ হয়ে যাওয়া নয় বরং সবকিছু আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যাওয়া। সবকিছু আল্লাহ হয়ে যাওয়া এবং সবকিছু আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যাওয়া- এ দুটোর মধ্যে বহু ব্যবধান। দ্বিতীয়তঃ কোন মাজযূবের জযবার হালাতের কোন কথা দলীল নয়। দলীল হল কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল।

৫. সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের দর্শন ঃ

"বাংলার বাউল দর্শন" গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ বাউল ধর্মের লক্ষ্য হল সর্বধর্মের সার সমন্বয় সাধন। সর্ব ধর্মের মূল লক্ষ্য আত্মার মুক্তি। আত্মার মুক্তি বা মোক্ষলাভের মূল বাণীসমূহ ও মতাদর্শের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে বাউল মতবাদ।

এই সর্বধর্ম সমন্বয় দর্শনের কারণেই বাউলগণ একদিকে খোদা রাসূলে বিশ্বাসের কথাও বলেন আবার রাম, নারায়ণ প্রমুখকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার হিসেবেও স্বীকার করেন। একই কারণে স্পষ্টতঃ মুসলমানদের পরিভাষায় আল্লাহ ও রাসূলের পরিচয় প্রদান ও আল্লাহকে সন্ধানের সোজা ইসলামী তরীকা থেকে বিচ্যুত হয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। এই একই কারণে বাউল রচিত সঙ্গিত বা গানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মতবাদই প্রাধান্য পেতে থাকে।[১] "বাংলার বাউল দর্শন" গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ হিন্দু বাউল যেমন সূফী ভাবধারাকে মেনে নেয়, তেমনি হিন্দু, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব মতবাদকেও মুসলমান জাতির বাউল তথা ফকীর, দরবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায় এড়িয়ে থাকেনি।

আল্লাহ্‌র নিকট ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخسرين -

অর্থাৎ, ইসলাম ব্যতীত যে অন্য ধর্ম সন্ধান করবে, আদৌ তার থেকে তা কবূল করা হবে না। এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ৮৫)

অতএব সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা একটি কুফ্‌রী মতবাদ। আকবারের দ্বীনে ইলাহী এবং এনায়েতপূরী ও মাউজভান্ডারী প্রমুখের মতবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬. ওহী ভিত্তিক কোন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার ঃ

বাউলরা ঐশী শাস্ত্র বা জিব্রাঈল মারফত কোন নবীর উপর প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রভিত্তিক কোন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা মানে না। কারণ এ সবের ভিত্তি হল চেতনা। বাউলরা সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও দল চেতনা স্বীকার করেনা। তারা দেশ জাত-বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে কেবল

১.বাংলার বাউল দর্শন, মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রকাশনায় বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর- ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১৯১-১৯২ ॥

মানুষকে জানতে, মানতে ও শ্রদ্ধা জানাতে চায়। মানুষের ভিতর মনের মানুষকে খুঁজে পেতে চায়।[১]

বাউলগণ তাদের কথিত সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা থেকেই ওহী ভিত্তিক ধর্মকে অস্বীকার করেছেন। এরূপ আকীদা-বিশ্বাস সন্দেহাতীত ভাবেই কুফ্‌রী।

৭. সংসার ত্যাগ ঃ

বাউলগণ সংসার বিরাগী হয়ে থাকেন। নিষ্ক্রিয়তা, জীবন-বিমুখতা, ও আত্মসন্ধানের মাধ্যমে তাদের কথিত "মনের মানুষ"-কে সন্ধানই তাদের প্রধান লক্ষ্য। ইসলাম এরূপ বৈরাগ্যকে সমর্থন করেনা। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ان الرهبانية لم تكتب علينا . (رواه احمد وابن حبان)

অর্থাৎ, আমাদেরকে সন্ন্যাসবাদের বিধান দেয়া হয়নি।

অতএব ইসলামে কোন সন্যাসবাদ নেই। বরং ইবাদতও করতে হবে, সেই সাথে সাথে ঘর সংসার এবং সমাজের সাথে সম্পর্ক সামঞ্জস্যও রাখতে হবে। আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য মেহনত-সাধনাও করতে হবে, আবার বিবি বাচ্চার খোঁজ-খবরও রাখতে হবে, তাদের ব্যাপারে ইসলাম যে দায়িত্ব অর্পন করেছে তাও পালন করতে হবে।

৮. সঙ্গীত সাধনা ঃ

সঙ্গীত বাউলদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। বাউলদের গানগুলো "মারফতী" বা "মুর্শিদা" গান নামে অভিহিত হয়। উত্তর বঙ্গে 'বাউল গান" সাধারণতঃ "দেহ তত্ত্বের গান" নামে এবং পশ্চিম বঙ্গে 'বাউল গান' নামে পরিচিত। এ সব গানের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব[২] প্রভৃতি সব ধর্মের মতবাদই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কারণ তারা নির্দিষ্ট কোন ধর্মের অনুসারী নয় বরং তারা সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রবক্তা।

বাউলদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত ব্যক্তি লালন (ফকীর) শাহ তার লালন গীতের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ বাউল কবিদের মধ্যে ছিলেন উত্তর বঙ্গের গঙ্গারাম, জগাকৈবর্ত পদ্মলোচন, শিখা ভূইমালী, কাঙ্গালী ও সিরাজসাঁই, সিলেটের মুনীরুদ্দীন ফকীর ও কুষ্টিয়া কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ)। রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাউলের রীতি অনুসরণ করে বহু গান লিখেছেন।

উল্লেখ্য উপরোক্ত দর্শনসমূহ ছাড়াও বাউলদের 'প্রেমতত্ত্ব', 'রূপ-স্বরূপ তত্ত্ব' আত্মিক-বিবর্তনবাদ' প্রভৃতি দর্শন রয়েছে।[৩]

১.বাংলার বাউল দর্শন, মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রকাশনায় বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর- ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১৯৫ ॥ ২. বৈষ্ণব ঃ হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর উপাসকগণ বৈষ্ণব নামে পরিচিত। ৭ম শতাব্দিতে রামানুজ দাক্ষিণাত্যে হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথা ও কঠোরতা থেতে মুক্ত এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেন। ১৪শ শতাব্দিতে রামানন্দ এর রূপায়ন করেন। ১৬শ শতাব্দিতে চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে এই ধর্মের বিস্তৃতি ঘটান ॥ ৩. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য বাংলার বাউল দর্শন, লেখক ঃ মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রকাশনায় বাংলা একাডেমী ॥

সর্বেশ্বরবাদ/সর্বখোদাবাদ

(وحدة الوجود/Pantheism)

"সর্বেশ্বরবাদ"[১] বা "সর্বখোদাবাদ" বলতে বোঝায় 'সবকিছুই খোদা'-এই মতবাদ।[২] ইংরেজীতে একে বলা হয় Pantheism (প্যান্‌থিইজ্‌ম Pan=all [সব] theo=God [ঈশ্বর]) আর আরবীতে বলা হয় وحدة الوجود (ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ)। কিংবা বলা যায় এটি এমন এক মতবাদ যাতে সমগ্র মহাবিশ্বই খোদা-এই মত পোষণ করা হয়। এ মতানুসারে স্রষ্টার বাইরে সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকাকে অস্বীকার করা হয় এবং বলা হয় তিনিই (আল্লাহ্‌ই) সবকিছু। এ মতবাদে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে ঐক্য প্রকাশ করা হয় এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির অস্তিত্বে অভেদত্ব প্রকাশ করা হয় বিধায় একে বলা হয় وحدة الوجود। আরবী একথাটির অর্থ হল অস্তিত্বের ঐক্য। সূফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় "তাওহীদ", "আইনিয়্যত" এবং "মাজহারিয়্যত" ইত্যাদিও এই মাসআলারই বিভিন্ন শিরোনাম।

মুসলিম মনীষীদের মধ্যে সর্বপ্রথম শায়খে আকবার ইব্‌নুল আরাবী এই মতবাদটি উদ্ভাবন করেন এবং তার অনুসারীগণ এটির প্রচার প্রসার ঘটান।[৩] ইব্‌নুল আরাবী এই মতবাদটি ব্যক্ত করতে যেয়ে বলেন ঃ وجود المخلوقات عين وجود الخالق অর্থাৎ, সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব হুবহু আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব। এখানে তিনি عينيت বা হুবহুতা বলে এই وحدة الوجود তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টির অস্তিত্বের ঐক্য ও অভেদতত্বকেই বুঝিয়েছেন। ফারসী কবি ফরীদুদ্দীন আত্তার, সাদরুদ্দীন, নাবলূসী প্রমুখ তাদের লিখনীতে ইব্‌নুল আরাবীর এই وحدة الوجود মতবাদটি তুলে ধরেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন। নাবলূসী এর ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ আল্লাহ্‌ই একমাত্র অস্তিত্ববান সত্তা, এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তিনি সার্বিক-সমগ্র (كلي), অন্যের দ্বারা তিনি অস্তিত্ববান (قائم بالغير) নন বরং তিনি স্বকীয় সত্তায় অস্তিত্ববান (قائم بالذات)। নাবলূসী এই وحدة الوجود-এর আলোকে প্রদত্ত কালিমার ব্যাখ্যাকেই বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন। তবে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের উলামায়ে কেরাম তার অভিমতকে মেনে নেননি।

এই পরিভাষার পাশাপাশি হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফে ছানী (রহঃ) আর একটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। সেটি হল وحدة الشهود (ওয়াহ্‌দাতুশ শুহূদ)। এর অর্থ হল সমস্ত অস্তিত্ববান জিনিসের মধ্যে শুহুদ তথা দৃষ্টিপাত শুধু একটি সত্তার প্রতি।

---

১. "সর্বেশ্বরবাদ" শব্দটি সম্ভবতঃ হিন্দুদের মধ্যে যারা অদ্বৈতবাদ-এর সমান্তরাল হিসেবে সর্বেশ্বরবাদকে ব্যবহার করেন, তাদের সৃষ্টি। নতুবা মুসলমান ইশ্বর শব্দকে খোদা ও আল্লাহ শব্দের সমান্তরালে ব্যবহার করেন না। তারা وحدة الوجود - এর প্রতি পরিভাষা হিসেবে "সর্বখোদাবাদ" শব্দ ব্যবহার করতে পারেন ॥

২. ইংরেজীতে বলা হয় ঃ the doctrine that the whole universe is god ॥

৩. অমুসলিমদের মধ্যে এথেন্সের দার্শনিক জেনো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্টোয়িক দর্শনে সর্বদেবত্ববাদ তথা Pantheism ছিল বলে জানা যায়। দ্রঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত "গ্রিক দর্শন প্রজ্ঞা ও প্রসার" মে ঃ ১৯৯৪ সংস্করণ, পৃঃ ১৫৩ ॥

এই وحدة الوجود (ওয়াহ্দাতুল উজূদ) কথাটার সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম বলেছেন ঃ এর দ্বারা প্রকৃত ও শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং এটা হল এক ধরণের রূপক কথা। রূপকভাবে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের পূর্ণাঙ্গতার বিপরীতে অন্যান্য সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বকে নেতিবাচ্যতার পর্যায়ে ধরে নেয়া হয়েছে। احسن الفتاوى গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ কেননা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গ এবং তাঁর বিপরীতে অন্যান্য সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব এতই অপূর্ণ যে, তা প্রায় নেতিবাচ্যতার পর্যায়ভুক্ত। সাধারণ বাগধারায় পূর্ণাঙ্গের বিপরীতে অপূর্ণাঙ্গকে অস্তিত্বহীন বলা হয়। যেমন ঃ কোন বড় জবরদস্ত আল্লামার বিপরীতে সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিকে অথবা কোন প্রসিদ্ধ বীর পাহলোয়ানের বিপরীতে সাধারণ ব্যক্তিকে বলা হয়- 'এতো তার সামনে কিছুই নয়'। অথচ ঐ সাধারণ ব্যক্তিটি অস্তিত্বহীন তা নয় বরং তার স্বতন্ত্র সত্তা ও গুণাবলী বিদ্যমান। কিন্তু পূর্ণাঙ্গের বিপরীতে তাকে 'নাস্তি' সাব্যস্ত করা হয়। কিংবা যেমন কোন সম্রাটের দরবারে কেউ আবেদন পেশ করলে সম্রাট তাকে কোন ছোট অধীনস্ত শাসকদের শরণাপন্ন হতে পরামর্শ দেন। আর লোকটি প্রতি উত্তরে বলে, হুজুর! আপনিই সবকিছু। তখন এর অর্থ এই হয় না যে, সমস্ত অধীনস্ত শাসক সম্রাটের সাথে একাকার এবং অন্যান্য শাসকদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নেই, বরং "আপনিই সবকিছু" কথাটার উদ্দেশ্য হল- আপনার সামনে সমস্ত অধীনস্থ শাসক নাস্তির পর্যায়ে। অনুরূপভাবে (রূপক অর্থে) সুফিয়ায়ে কিরাম আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্বের সামনে সমস্ত মাখলূকের অস্তিত্বকে 'নেই' সাব্যস্ত করেন। হযরত শেখ সাদী (রহঃ) দু'টি উদাহরণের মধ্যে এর খুব সুন্দর বিবরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

১ নং উদাহরণ ঃ তুমি দেখে থাকবে মাঠে-ময়দানে রাতের বেলায় চেরাগের ন্যায় জোনাকী পোকা জ্বলে। একজন জিজ্ঞেস করল, হে রাতকে আলোকোজ্জ্বলকারী জোনাকী পোকা! কি ব্যাপার ? তোমাকে দিনের বেলায় দেখা যায় না কেন ? জোনাকী উত্তর দিল - আমি তো দিবারাত্র মাঠে-ময়দানেই থাকি। মাঠ-ময়দান ছাড়া কোথাও থাকি না, তবে সূর্যের সামনে আমি প্রকাশিত হতে পারি না।' (অর্থাৎ, সূর্যের সামনে আমি যেন অস্তিত্বহীন, তাই আমাকে দেখা যায় না।)।

২ নং উদাহরণ ঃ বৈশাখে এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি সমুদ্রের অভ্যন্তরে পড়ে সমুদ্রের বিশালতা দেখে লজ্জিত হয়ে যায়। বৃষ্টির ফোটাটি তখন বলে, "যেখানে সমুদ্র, সেখানে আমি এক ফোঁটা বৃষ্টি আর কি ? বাস্তবে যদি এর অস্তিত্ব থাকে, তবে আমি তো অস্তিত্বহীন।

এরূপ রূপক অর্থেই যত কিছু অস্তিত্ববান, আল্লাহ্র অস্তিত্বের সামনে তাকে 'অস্তিত্বহীন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এটারই পরিভাষা হল এই وحدة الوجود (ওয়াহ্দাতুল উজূদ)।

অনুরূপ عينيت (আইনিয়্যত) শব্দটিও সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় রূপকভাবে মুখাপেক্ষিতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে সমস্ত মাখলূক হুবহু স্রষ্টা। অর্থাৎ, তাঁর মুখাপেক্ষী। তবে সুফিয়ায়ে কেরাম "আইনিয়্যত" শব্দটি ব্যবহারের জন্য এই শর্তারোপ করেছেন যে, এই মুখাপেক্ষিতার জ্ঞান (মা'রেফত)ও যেন থাকে। সেমতে শুধুমাত্র আরিফ

ব্যক্তির পক্ষেই এ শব্দটি ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছেন। কোন কোন সময় এ শব্দটি ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত আরেকটি শর্তও সংযুক্ত করেছেন যে, এই শব্দটি ব্যবহারকারী ব্যক্তির মা'রফাতে এ পরিমাণ বিভোরতা থাকতে হবে যে, সমস্ত মাখলূক এমনকি তার নিজের সত্তার দিকেও তার দৃষ্টি থাকবে না। এ অর্থেই আরিফ রূমী (রহঃ) বলেছেন ঃ

آں یکے را روئے اوشد سوئے دوست ÷ ویں یکے را روئے اوخود روئے دوست

অর্থাৎ, ঐ এক জনের চেহারা হল প্রেমাস্পদমুখী, আর এই একজনের চেহারাই হল স্বয়ং প্রেমাস্পদের চেহারা।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) তাঁর فيصلة وحدة الوجود والشهود গ্রন্থে বলেনঃ "ওয়াহ্দাতুল উজূদ" ও"ওয়াহ্দাতুশ শুহূদ" পরিভাষা দুটি দুই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

(এক) কখনও কখনও এ পরিভাষা দুটি আল্লাহ্র পথে সায়েরকারী তথা সালেকের দুটি মাকাম বা অবস্থা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বলা হয় এই সালেকের মাকাম হল ওয়াহ্দাতুল উজূদ এবং ঐ সালেকের মাকাম হল ওয়াহ্দাতুশ শুহূদ। এখানে 'ওয়াহ্দাতুল উজূদ' বলে বোঝানো হয় হাকীকত বা তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধানে এমন মহা নিমগ্নতাকে, যা ভাল-মন্দ নির্ণয়ের ভিত্তি রূপ শরী'আত ও বিবেক বিবৃত পার্থক্য জ্ঞানকে রহিত করে দেয়। কোন কোন সালেক এই স্তরে নিপতিত হয়ে থাকেন, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন। আর যদি সালেকের সমন্বয় ও পার্থক্য জ্ঞান বহাল থাকে তাহলে সে জানতে পারে সমস্ত কিছু কোন এক দৃষ্টিভংগিতে এক হলেও অন্য বহু প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন, তাহলে সালেকের এই স্তরকে বলা হয় 'ওয়াহদাতুশ শুহূদ'। এই দ্বিতীয় মাকামটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও নির্ঝঞ্ঝাট।

(দুই) কখনও কখনও এ পরিভাষা দুটি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞান অর্জন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই জ্ঞান অর্জন করতে যেয়ে অনিত্ব (قديم) ও নিত্ব (حادث)-এর মাঝে সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রশ্নে কেউ কেউ মনে করেছেন জগতের সবকিছুই আপতন বা অপ্রধান বিষয় (عَرَض/accident), যা আপনা আপনি স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় না বরং একটি সত্তায় কেন্দ্রিভূত হয়। যেমন মোম দিয়ে যদি মানুষ, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদির আকৃতি বানানো হয়, তাহলে মোমের অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোনটার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এবং ঐ আকৃতিগুলি প্রকৃত মানুষ, ঘোড়া, গাধাও নয়। তবে মোমের অস্তিত্ব ঐ সব আকৃতি ছাড়াও বিদ্যমান। আবার বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞান অর্জন করতে যেয়ে কেউ কেউ মনে করেছেন গোটা জগত হল আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী (اسماء وصفات)-এর প্রতিবিম্ব, যা ঐ নাম ও গুণাবলীর বিপরীত নাস্তির আয়নায় প্রতিবিম্বিত। যেমন ক্ষমতার বিপরীত হল অক্ষমতা। এ ক্ষেত্রে অক্ষমতার আয়নায় ক্ষমতার আলো প্রতিবিম্বিত হয়। আল্লাহ্র সমস্ত গুণাবলীর বিষয়টিই এমন। অস্তিত্বের বিষয়টিও অনুরূপ।[১] যাহোক প্রথমোক্ত শ্রেণীর মতবাদ হল 'ওয়াহদাতুল উজূদ' আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মতবাদটি হল 'ওয়াহদাতুশ শুহূদ'।

১. অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব হল নাস্তির পর্যায়ভুক্ত। সেই নাস্তির আয়নায় আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ফলে দৃষ্টিপাত কালে একই অস্তিত্বের প্রতিই দৃষ্টিপাত হয়ে থাকে ॥

এই হল وحدة الوجود (ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ)-এর মুহাক্কিক উলামা ও মাশায়েখে কেরাম কৃত সঠিক ব্যাখ্যা। এর বিপরীত কিছু কিছু অজ্ঞ সূফী ও তাদের অনুসারীগণ وحدة الوجود (ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ) কথাটিকে প্রকৃত ও আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করে কোন কোন পীর সাহেবকে খোদার স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন এবং পীর ও সূফীকে খোদায়ী গুণে গুণান্বিত বলে ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছেন। যেমন মাইজভাণ্ডারী, এনায়েতপূরী ও আটরশি প্রমুখ পীরদের আকীদা-বিশ্বাস বর্ণনা প্রসঙ্গে কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে।

জাহেল সূফী ও তথাকথিত দার্শনিকদের ফিতনা থেকে উম্মতকে হেফাযত করার জন্য আহলে ইরশাদ তথা মাশায়েখে কেরাম وحدة الوجود (ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ)-এর পরিভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে وحدة الشهود পরিভাষা ব্যবহার করাকে নিরাপদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে ফিতনার আশংকা নেই। কারণ, এতে অন্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়নি। বরং এর অর্থ হল সমস্ত অস্তিত্ববান জিনিসের মধ্যে শুহুদ তথা দুষ্টিপাত শুধু একটি সত্তার প্রতি নিবদ্ধ থাকবে।

কোন কোন ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিম দর্শন শাস্ত্রবিদ وحدة الوجود (ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ)-এর মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম কৃত সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এরূপ মন্তব্যও করেছেন যে, একেশ্বরবাদ নয় বরং সর্বেশ্বরবাদ (তথা ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ)ই হল ইসলামের সূফী দর্শন।[১] এ ধরনের লোকেরা সর্বেশ্বরবাদকে ইসলামের একত্ববাদের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করেন না। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদ কোনক্রমেই একত্ববাদ নয়। কারণ ঃ

১. একত্ববাদে স্রষ্টার অস্তিত্বকে সৃষ্টির অস্তিত্ব থেকে আলাদা করে দেখা হয়। পক্ষান্তরে সর্বেশ্বরবাদে অন্য সবকিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। অথচ মানুষ ইত্যাদি অনেক কিছুরই অস্তিত্ব পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা প্রমাণিত।

২. একত্ববাদে স্রষ্টাকে সৃষ্টির অস্তিত্ব থেকে আলাদা করে দেখা হয়। পক্ষান্তরে সর্বেশ্বরবাদে খোদা ছাড়া অন্য কিছুই নেই। কিন্তু স্রষ্টা আর সৃষ্টি কখনও এক হতে পারে না। অন্যথায় সৃষ্টিকে স্রষ্টা বলতে হয়। মানুষকেও খোদা বলতে হয়। তাহলে আমি আপনি কি? আমি আপনি কি খোদা ? আমরাতো অসহায়, আল্লাহ্‌তো আমাদের মত অসহায় হতে পারেন না।

৩. একত্ববাদে স্রষ্টার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। পক্ষান্তরে সর্বেশ্বরবাদে অন্য সবকিছুর স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় এবং মহাবিশ্বের সবকিছুকে খোদার সঙ্গে লীন করে দেয়া হয়। ফলে খোদা হয়ে যান নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। আর নৈর্ব্যক্তিক সত্তার স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছা, প্রজ্ঞা, প্রেম ইত্যাদি কিছুই থাকে না। অথচ ইসলাম ইচ্ছা, প্রজ্ঞা ইত্যাদি সবকিছুর ক্ষেত্রে খোদার একচ্ছত্রতা প্রমাণিত করেছে।

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রফেসর ডঃ আমিনুল ইসলাম কর্তৃক রচিত "মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি" নামক গ্রন্থে এমন ধারণা পেশ করা হয়েছে ॥

অতএব সর্বেশ্বরবাদ কোনক্রমেই ইসলামের মতবাদ হতে পারে না। সুফিয়ায়ে কেরাম যারা وحدة الوجود (ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ) পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তারা সেই শুদ্ধ ও রূপক অর্থেই তা করেছেন, যার ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে প্রদান করেছি।

কেউ কেউ وحدة الوجود, সর্বেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদকে সমান্তরাল মনে করেছেন। "প্যানথিইজম"-এর অনুবাদ সর্বেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদ দেখে এরূপ ভ্রান্তি হয়ে থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন হিন্দু মনে করে 'বিশ্বই ব্রহ্ম'। এ রকমের মতবাদকে বলা হয় "অদ্বৈতবাদ"। যদিও হিন্দু ধর্মে 'ব্রহ্ম'ই যে আসল প্রভু কিনা তা স্পষ্ট নয়। 'বিষ্ণু', 'মহেশ্বর' দেবতাও ব্রহ্ম'-র প্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব وحدة الوجود ও অদ্বৈতবাদ এক কথা নয়।

এন, জি, ও

'এনজিও' (N, G, O) কথাটি একটি দীর্ঘ কথার শব্দ সংক্ষেপ। পুরো কথাটি হল Non government Organization অর্থাৎ, বেসরকারী সংস্থা। সংক্ষেপে N, G, O (এন, জি, ও) বলা হয়।

শাব্দিক অর্থ হিসেবে সব ধরনের বেসরকারী সংস্থাগুলোকেই এন, জি, ও বলা যায়। কিন্তু সাংবিধানিক অর্থে এনজিও বলা হয়- মুনাফার উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু সেবার উদ্দেশ্যে গঠিত বেসরকারী সংস্থাকে। অর্থাৎ, যে সংস্থাগুলো বেসরকারীভাবে অর্থ সংগ্রহ করতঃ তা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্ব-কর্মসংস্থান, শিশু ও মাতৃসেবা দান, সমাজ উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেবা প্রদান ও ঋণ বিতরণ ইত্যাদি সেবামূলক কাজে ব্যয় করে।

এ সকল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই মূলতঃ বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য দেশের মত দেশী-বিদেশী এনজিওগুলোকে এদেশে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছে। কিন্তু অনুমোদন লাভের পর এনজিওগুলো প্রতিশ্রুতি মোতাবেক শুধু সেবামূলক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তারা (বিশেষভাবে খৃস্টান এন, জি, ও গুলো) সেবার নামে এদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের কৃষ্টি কালচার, রীতিনীতি ও ধর্মীয় অনুভূতিতে চরমভাবে আঘাত হানছে। গ্রাম বাংলার পারিবারিক ও সমাজ ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে বিনষ্ট করছে, শুধু এতটুকুই নয়, এমনকি জাতীয় অর্থনীতি এবং রাজনীতিতেও হস্তক্ষেপ শুরু করেছে।

বিভিন্ন তথ্য সূত্রে পাওয়া যায় বর্তমানে রেজিস্ট্রীকৃত অরেজিস্ট্রীকৃত দেশী বিদেশী ইসলামী ও অনৈসলামিক সব মিলে ত্রিশ হাজার এন, জি, ও বাংলাদেশে কার্যরত রয়েছে। তবে এর মধ্যে ২২/১১/০৩ ইং সন পর্যন্ত রেজিষ্ট্রীকৃত বিদেশী এন, জি, ও-র সংখ্যা ১৮০ টি আর দেশী এন, জি, ও-র সংখ্যা ১৬৪৩টি। সর্বমোট ১৮২৩টি।

নিম্নে উল্লেখযোগ্য কতিপয় দেশী বিদেশী এনজিও এর তালিকা প্রদান করা হল ঃ

বিদেশী	দেশী
(১) কেয়ার (CARE)	(১) ব্রাক (BRAC)
(২) আর, ডি, আর এস (RDRS)	(২) প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র।
(৩) এম, সি, সি (MCC)	(৩) কারিতাস।

(৪) এডরা (ADRA)
(৫) কনসার্ন (CONCERN)
(৬) ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ।
(৭) সেভ দি চিলড্রেন ফান্ড (ইউ কে)
(৮) সেভ দি চিলড্রেন ফান্ড (ইউ, এস, এ)
(৯) ডিয়া কোনিয়া
(১০) অক্সফাম (OXFAM)
(১১) এ্যাকশন এইড
(১২) সুইডিশ ফ্রি মিশন
(১৩) আইডিয়াস ইন্টারন্যাশনাল
(১৪) সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ
(১৫) ইউ, এস, সি সি, বি
(১৬) ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন
(১৭) অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি
(১৮) ই, ডি এস
(১৯) টি, ডি, এইচ (T, D, H) সুইজারল্যান্ড
(২০) রাড্ডা বারনেন।

(৪) সি, সি, ডি, বি।
(৫) নিজেরা করি।
(৬) গন স্বাস্থ্য কেন্দ্র
(৭) হীড বাংলাদেশ
(৮) কুমিল্লা প্রশিকা
(৯) আশা
(১০) ডি এইচ এস এস
(১১) বি, এ, ভি এস
(১২) এডাব
(১৩) ইউসেফ
(১৪) সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর
(১৫) বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি
(১৬) ওয়াই, এস, সি এ
(১৭) বাঁচতে শেখা
(১৮) উন্নয়ন সহযোগী টীম
(১৯) সি, ডি, এস

এছাড়া উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ইসলামী সেবা সংস্থাও রয়েছে। তবে এখানে পাশ্চাত্য ভাবধারার বিদেশী এনজিও এবং পাশ্চাত্যের মদদ পুষ্ট দেশীয় এনজিও যেগুলি সেবার ছদ্মাবরণে অর্থনৈতিক শোষণ, ধর্মান্তরীত করণ এবং সমাজ বিনষ্ট করণের মত নেতিবাচক কাজেও লিপ্ত শুধু সে সকল এনজিওগুলো সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হচ্ছে।

এনজিওদের আগমনের পেক্ষাপটঃ

১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু দীর্ঘদিন যুদ্ধের ফলে গোটাদেশ একটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। নূন্যতম মানবিক চাহিদা সামগ্রি তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার চরম সংকট দেখা দেয়। অভাব-অনটনে চতুর্দিকে হাহাকার পড়ে যায়। দেশের এহেন সংকটপূর্ণ মুহুর্তে মানুষের দরিদ্রতা ও দুরাবস্থার অজুহাতে ধূর্ত ও ফন্দিবাজ এনজিওগুলো গায়ে সেবার আকর্ষণীয় লেবেল এঁটে বাংলার বুকে আগমন করে।

এমনিভাবে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময়, ১৯৮৮ সালে সর্বনাশা বন্যার সময়, ১৯৯১ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণি ঝড়ের সময়, ১৯৯৮ সালের দীর্ঘস্থায়ী সর্বগ্রাসী বন্যার সময় তথা দেশের চরম দুর্যোগপূর্ণ মুহুর্তগুলোতে এনজিওদের সরব আগমন ঘটেছে। কিন্তু আগমনের কিছু দিন যেতে না যেতেই তাদের আসল স্বরূপ জাতির উলামা ও সচেতন

মহলের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তখন থেকেই উলামায়ে কেরাম এবং সচেতন মহল দেশের সরকার ও জাতিকে এনজিওদের অপতৎপরতার ব্যাপারে অবগত করে আসছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে কার্যরত ত্রিশ হাজার এনজিও প্রায় সবগুলো খৃষ্টান বিশ্ব ও খৃষ্টান মিশনারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ হিসেবে বলতে গেলে খৃষ্টান মিশনারীগণ ১৫১৭ সালে প্রাকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলা ভূমি সুজলা সুফলা শষ্য শ্যামলা এ বাংলার বুকে সর্ব প্রথম আগমন করে। এর একশত তেত্রিশ বছর পর তারা তাদের স্বজাতি খৃষ্টান বণিকদেরকে এদেশে নিয়ে আসে। এর পর তারা দুদলে মিলে বাংলার হিন্দু, মুসলমানের মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের শোষণ ও লুণ্ঠন চালায়। ১৭৫৭ সালে এসে আমাদের সার্বভৌম সত্ত্বাকে পদদলিত করে। দীর্ঘদিন দাসত্যের শৃংখলে আবদ্ধ থাকার পর একটি বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্টি ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬১ ও ১৯৭০ সালে সেই খৃষ্টান মিশনারীগণ বাংলার হিন্দু মুসলমানকে খৃষ্টান বানানোর দূরভিসন্ধি নিয়ে এনজিওদের হাতে হাত কাধে কাধ মিলিয়ে আবার এদেশে আগমন করে। তাই সার্বিক দিক বিবেচনায় দেখা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে এনজিওদের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। শ্লোগান শুধু ভিন্ন, কিন্তু অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

নিম্নে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎপরতার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল।

সামাজিক ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎপরতা ঃ

দীর্ঘদিন ইসলামী অনুশাসনে চলে আসা আমাদের গ্রাম বাংলার পারিবারিক এবং দাম্পত্য জীবন এনজিওদের দূরভিসন্ধি তথা খৃষ্টান বানানোর ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। তাই এনজিওগণ আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা এবং দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। লক্ষ লক্ষ পুরুষ বেকার ও কর্মহীন থাকা সত্ত্বেও নারী জাতিকে সাবলম্বী করার ভাওতা দিয়ে আমাদের কোমল মতি নারীদেরকে কর্ম সংস্থানের জন্য স্বামী ঘরের আরাম থেকে বের করে মাঠে গঞ্জে বাজারে হাড় ভাঙ্গা খাটুনির কাজে লাগাচ্ছে। তাও আবার অল্প মজুরীর কর্মে। আবার অনেক এনজিও সংস্থা আমাদের অবলা রমণীদেরকে শ্বেত চামড়ার এনজিও কর্মকর্তাদের সেবা ও মনতুষ্টির মত হীন কাজে ব্যবহার করছে। এভাবে এনজিওগুলো মহিলাদেরকে স্বামী থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। অনেক এলাকাতে আবার এনজিওদের প্ররোচনায় প্ররোচীত হয়ে স্ত্রীগণ স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অফিসে গিয়ে এনজিও কর্মকর্তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও ফস্টি নষ্টি করে। এতে স্বামী স্ত্রীর মাঝে অন্তঃকলহ সৃষ্টি হয়। উপরন্তু এনজিও সংস্থাগুলো মহিলাদেরকে 'কিসের বর কিসের ঘর' 'ঘরের ভিতর থাকব না স্বামীর কথা মানব না', 'আমার মন আমার দেহ, যাকে খুশি তাকে দেব'-এরূপ বিভিন্ন উদ্ধত ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলা উদ্দীপক শ্লোগান শিক্ষা দিয়ে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করছে এবং অবাধ যৌনাচারিতার দিকে নারী সমাজকে অগ্রসর করছে। তারা 'স্বামী স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে প্রহার করছে' এ ধরনের উদ্ভট চিত্র সম্বলিত পোষ্টার, ফেস্টুন দেখিয়ে

এবং নারী নির্যাতনের কল্প-কাহিনী শুনিয়ে মহিলাদেরকে স্বামীর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছে। এর অনিবার্য পরিণাম স্বরূপ বিবাহ বিচ্ছেদের মাধ্যমে অসংখ্য সুখের সংসার ভেঙ্গে ছার খার হয়ে যাচ্ছে। এভাবে আমাদের সামাজিক ভারসাম্যতা মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হচ্ছে। এদিকে এনজিওগণ তালাক প্রাপ্তা মহিলাদেরকে 'ফ্রি লিগেল এইড' দিয়ে থাকেন। যার ফলে তারা স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে ভয় পাচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে এ সকল নারীরা খৃষ্টানদের খপ্পরে পড়ে খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। অনেকে নিজেদেরকে পশ্চিমা জীবন ধারায় পরিচালিত করছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎপরতা ঃ

এনজিও সংস্থাগুলো অর্থনৈতিক সাহায্যের নামে অর্থনৈতিক শোষণ চালাচ্ছে। তারা ২০% থেকে ৬০% কোন কোন সংস্থা ২২৬% ও ২০০% এরূপ উচ্চ সুদের হারে অর্থ লগ্নীকরে। এ সুদ তারা দৈনিক ও সাপ্তাহিক উশুল পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করে। আর এই সর্বনাশা ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে অনেক পরিবার ভিটে-বাড়ী ছাড়া হয়েছে। অনেকে এনজিওদের অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে রাগে ক্ষোভে বিষ পানে আত্মহত্যা করেছে। এনজিওদের চাপে নিরুপায় হয়ে কোলের সন্তান বিক্রি করে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে-এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। এভাবে আমাদের সমাজ জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। তাই বিভিন্ন সমীক্ষার রিপোর্ট অনুসারে দারিদ্র বিমোচনের পরিবর্তে এনজিওগুলোর কারণে উল্টো দরিদ্রতা আরো সমাজকে চরমভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎপরতাঃ

এনজিওগুলো সাহায্য-সহযোগিতার নামে অনুমোদন লাভ করে থাকে। কোন রূপ রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা গঠনতান্ত্রিকভাবে তাদের জন্য বিধিবদ্ধ নয়। কিন্তু বিদেশী খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত এনজিওগুলো শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে এনজিওগুলো রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী প্রার্থীকে বে-আইনিভাবে প্রচুর অর্থ প্রদান করে এবং ভোট প্রদানের জন্য টার্গেট গ্রুপকে নির্দেশ দেয়। বলা বাহুল্য- এভাবে যথেষ্ট সংখ্যক এনজিও সমর্থক প্রার্থী বিভিন্ন সময় শীর্ষ স্থানীয় তিনটি দলের টিকিটে সংসদ সদস্য হয়েছেন। এছাড়াও বিদেশী এনজিওগুলো তৃণমূল পর্যায়ে শতকরা ৪৪ ভাগ গ্রামে তাদের সংগঠন কায়েম করেছে। উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তারা প্রকাশ্যে অংশ গ্রহণ করছে। তারা ৪০০ প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। তার মাঝে ১০ জন চেয়ারম্যান নির্বাচিতও হয়েছেন। এছাড়াও এনজিও নিয়ন্ত্রিত ভূমিহীন সমিতির অনেক মহিলা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর নির্বাচিত হয়েছেন। এনজিওগুলো শুধু নির্বাচন কালেই সক্রিয় থাকে এমন নয়, বরং প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ইস্যুতেই তারা কোন না কোনভাবে নগ্ন হস্তক্ষেপ করে থাকে। যা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য চরম হুমকী স্বরূপ।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎপরতা ঃ

এনজিওগুলো অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ধর্মীয় ক্ষেত্রেও মারাত্মকভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। মুসলমানদেরকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্যে তারা হরেক রকমের অপকৌশল অবলম্বন করছে। শিক্ষা প্রদানের নামে এনজিও পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে- তারা কোমলমতি শিশুদের মগজ ধোলাই করছে। 'ইসলাম', ও 'আল্লাহ্' সম্পর্কে বিভ্রান্তির বীজ তাদের মনে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এভাবে আমাদের আগামী প্রজন্মকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিচ্ছে। এমনিভাবে এনজিও সংস্থাগুলো শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জোরেসোরে সারা বাংলায় ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে ন্যাক্কার জনক প্রপাগান্ডা ও তথ্য সন্ত্রাস চালাচ্ছে। তারা গ্রাম বাংলার সরল প্রাণ মুসলমান ভাইদের কাছে বলছে 'মুসলমান মানেই দরিদ্র আর খৃষ্টান মানেই ধনবান'। তারা মানুষকে ধর্ম বিমুখ ও ধর্মহীন করার জন্য নানা কৌশলে শুক্রবারের নামায সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায না পড়ার জন্য উপদেশ প্রদান করে। তারা পর্দা ব্যবস্থার ঘোর বিরোধিতা করে, পর্দা অগ্রগতির অন্তরায় বলে মেয়েদের শিক্ষা দেয়। (দৈনিক ইনকিলাব)

তারা আরো বলে "মুহাম্মাদের চাইতে ঈসা বড়।" "মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শাফাআত করার অধিকার নেই।" 'ইসলামের ইতিহাস হত্যা ও ধ্বংসের কাহিনী' ইত্যাদি।

এছাড়াও খৃষ্টান মিশনারী নেটওয়ার্ক ইসলামের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের বিকৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত বই-পত্র দেশের আনাচে-কানাচে বিনামূল্যে বিতরণ করছে। এসব পুস্তকের মুল বক্তব্য হল- "ইসলামের নবী শান্তির দূত নন বরং তিনি একজন যোদ্ধা। ইসলাম মানবতার মুক্তি দিতে পারে না। পরকালেরও কোন গ্যারান্টি দিতে পারে না। পক্ষান্তরে খৃষ্টধর্ম দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বিধান করে।" এভাবে স্বরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে ও বিভ্রান্ত করে খৃষ্টান বানানোর সকল অপকৌশল অবলম্বন করছে। তাই অনেক স্বরলপ্রাণ নিষ্ঠাবান মুসলমানও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছেন।[1]

ধর্মীয় ক্ষেত্রে এনজিওদের অনাসৃষ্টির একটি উদাহরণ হল তারা "জজ মেজিস্ট্রেট থাকে ঘরে মোল্লা এখন বিচার করে"- এ ধরণের কটুক্তিমূলক চরম আপত্তিকর শ্লোগান সম্বলিত পোষ্টার, প্লাকার্ড ব্যানার দিয়ে মহিলাদেরকে আলেম সমাজের বিরুদ্ধে মাঠে নামিয়েছে। এভাবে এনজিওগুলো সমাজকে মারাত্মক সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেয়ার মত চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। বাস্তব হল এনজিওদের কার্যক্রম গোটা দেশব্যাপী। "এক সমীক্ষায় দেখা যায় ২.৫৫ গ্রামে একটি করে এন, জি, ও।" তাই তাদের দুস্কৃতি ও অপতৎ-পরতার পরিধিও অত্যন্ত ব্যাপক। যা এ অল্প পরিসরে লিখে শেষ করা সম্ভব নয়।[2]

* * * * *

১. উল্লেখ্য খৃষ্টান এনজিও মিশনারীদের বিশ বছরের প্রচেষ্টায় ১৯৯২ সন পর্যন্ত [illegible]ান জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে পঞ্চাশ লাখে উন্নীত হয়েছে। তাদের টার্গেট ছিল ২০০০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা এক কোটিতে উন্নীত করা, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ জনক ॥ ২. তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ এনজিও উপনিবেশবাদের দুর্ভেদ্য জালেঃ লেখক মুহাম্মাদ নূরুযযামান ও এনজিওদের ষড়যন্ত্রের কবলে বাংলাদেশ ঃ লেখক মুহাম্মদ এনামুল হক জালালাবাদী ॥

চতুর্থ অধ্যায়

(আধ্যাত্মিক মতবাদ ও বিদ'আত সংক্রান্ত বিষয়ক)

অত্র অধ্যায়ে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বা আধ্যাত্মিকতার নামে যে সব বিদআত প্রচলিত রয়েছে, সেগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে। এজন্য প্রথমে বিদ'আত সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যে বিদ'আত সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ পেশ করা হল।

বিদ'আত প্রসঙ্গ

বিদ'আতের আভিধানিক অর্থঃ

বিদ'আত (البدعة) শব্দটি (ب د ع) ধাতুমূল থেকে গঠিত। এর মূল [مادة] অর্থ কোন পূর্ব নমূনা বিহীন সৃষ্টি করা। যেমন بدع الشئ [باب فتح] অর্থাৎ, অনুপমভাবে সৃষ্টি করেছে। এ থেকেই আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুছনার একটি নাম البديع । আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে উল্লেখিত البديع শব্দটিও উক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ بديع السموت والارض অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে কোনরূপ পূর্ব নমূনা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। এই শব্দটি যখন كرم يكرم থেকে ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ দাঁড়ায় উপমাহীন, অভিনব এবং এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি-

قل ماكنت بدعا من الرسل -

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তদীয় বান্দাদের প্রতি আমিই সর্ব প্রথম রিসালাত নিয়ে আগমন করেছি তাতো নয়। বরং আমার পূর্বে আরও অনেক রসূল এসেছেন। (সূরাঃ ৪৬ - আহকাফ ঃ ৯)

তাছাড়া যার কোন নমূনা বা তুলনা হয় না- এমন কোন অতি সুন্দর জিনিসকেও امر بديع বলা হয়। যার অর্থ অভিনব, অনুপম। আর ابتدع فلان بدعة এর অর্থ হল সে এমন পথের সূচনা করেছে, যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। تبدع শব্দের অর্থ অনুপম হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানী আবুল ফাত্‌হ নাসির ইব্‌নে আব্দুস সালাম আল-মাতরাযী 'المغرب' গ্রন্থে লিখেছেনঃ الخلفة শব্দটি যেমন الاختلاف থেকে উদগত ইস্‌ম, الرفعة যেমন الارتفاع থেকে উদগত ইস্‌ম, অনুরূপভাবে البدعة শব্দটিও ابتدع الامر থেকে উদগত ইস্‌ম। যার অর্থ অভিনব।

এ হল বিদআতের আভিধানিক অর্থ। যার সারকথা হল নতুন সৃষ্টি, অভিনব আবিস্কার। আলেমগণ এরই আলোকে বিদ'আতের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ

* ঈমাম নববী (রহঃ) বলেছেনঃ

البدعة كل شئ عمل على غير مثال سابق -

অর্থাৎ, কোন পূর্ব নমূনা বা উপমার অনুসরণ ব্যতীত কৃত যে কোন বিষয়কেই বিদআত বলা হয়।

* ইমাম শাতিবী (রহঃ) বলেছেনঃ

واصل مادة "بدع" للاختراع على غير مثال سابق . اهـ -

অর্থাৎ, بدع ধাতুটির মূল ব্যবহার অভিনব আবিস্কারের অর্থে।

* হাফিয ইব্‌নে হাজার আসকলানী (রহঃ) বলেছেনঃ

البدعة اصلها ما احدث على غير مثال سابق -

অর্থাৎ, কোন পূর্ব নমূনা বা উপমার অনুসরণ ব্যতীত সৃষ্ট বিষয়কেই বিদ'আত বলা হয়।[১]

সারকথা- বিদ'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ হল কোন পূর্ব নমূনা বা উপমার অনুসরণ ব্যতীত সৃষ্টি করা। চাই সেটা ইবাদত জাতীয় হোক, আচার-আচরণ হোক কিংবা নির্বাহের স্বার্থে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি হোক- সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ ঃ

বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের ভাষ্য বিভিন্ন হলেও সকল বক্তব্যের মূল মর্ম এক ও অভিন্ন। যেমন ঃ

১. 'উম্‌দাতুল কারী' গ্রন্থে আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেছেনঃ

البدعة فى الاصل احداث امر لم يكن فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم .

অর্থাৎ, মূলতঃ রাসূল (সাঃ)-এর যামানায় ছিল না-এমন কোন কিছু সৃষ্টি করাকেই বিদ'আত বলে। আল্লামা নববীও অনুরূপ অর্থ বলেছেন।

---

১. ইমাম শাতিবী (রহঃ) কৃত আল ই'তিসাম, আল-মুনজিদ, মিরকাত, ফাত্‌হুল বারী ও আল-মিনহাজুল ওয়াযিহ্‌ প্রভৃতি গ্রন্থ অনুসরণে ॥

২. হাফিয ইব্নে হাজার আসকলানী (রহঃ) 'ফাতহুল বারী'তে বলেছেনঃ

البدعة اصلها ما احدث ولبس له اصل فى الشرع - وما كان له اصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة -

অর্থাৎ, বিদ'আতের মূল কথা হল শরী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই-এমন কিছু আবিস্কার করা। কিন্তু শরী'আতে যার ভিত্তি আছে এমন কোন বিষয় বিদ'আত নয়।

৩. ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (রহঃ) 'المفردات فى غريب القرآن' গ্রন্থে লিখেছেনঃ

البدعة فى المذهب ايراد قول لم يستن قائلها او فاعلها فيه بصاحب الشريعة واماثلها واصولها المتقنة -

অর্থাৎ, মাযহাব বা ধর্মের ক্ষেত্রে বিদ'আত হল, সাহেবে শরী'আত (নবী [সাঃ]) বা শরী'আতের প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার অনুসরণ ব্যতীত কোন কথা আবিস্কার কিংবা যুক্ত করা।

৪. আল্লামা মাজ্দুদ্দীন 'القاموس المحيط' গ্রন্থে লিখেছেনঃ

البدعة الحدث فى الدين بعد الاكمال او ما سيحدث بعد النبى صلى الله عليه وسلم من الاهواء والاعمال -

অর্থাৎ, বিদআত হল দ্বীন পূর্ণতা লাভের পর তাতে নতুন কিছু আবিস্কার করা কিংবা রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর যা আবিস্কৃত হবে।

৫. আল্লামা শাতিবী (রহঃ) الاعتصام (আল-ই'তিসাম) গ্রন্থে লিখেছেনঃ

البدعة طريقة فى الدين تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه -

অর্থাৎ, বিদ'আত হল দ্বীনের মধ্যে এমন এক পন্থা যা ব্যহ্যতঃ শরী'আতের মতই, যা অবলম্বন করা হয় আল্লাহ তা'আলার দাসত্বের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে।

৬. হাফেয ইব্নে রজব হাম্বলী (রহঃ) 'جامع العلوم والحكم' (জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম) গ্রন্থে লিখেছেনঃ

والمراد بالبدعة ما احدث مما لا اصل له فى الشريعة يدل عليه ، واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وان كان بدعة لغة -

অর্থাৎ, শরী'আতে ভিত্তি নেই এমন কোন বিষয় আবিস্কার করাকেই বিদ'আত বলে। কিন্তু শরী'আতে ভিত্তি আছে এমন কোন বিষয়কে ইসলামের পরিভাষায় বিদ'আত বলা যাবে না- সেটা আভিধানিক ভাষায় বিদ'আত বিবেচিত হলেও।

৭. تاج العروس (তাজুল উরূস) গ্রন্থে আল্লামা মুরতাযা আয-যাবীদী (রহঃ) লিখেছেনঃ

(البدعة) ما خالف اصول الشريعة ولم يوافق السنة -

অর্থাৎ, শরী'আতের নীতিমালা বিরোধী এবং সুন্নাত পরিপন্থী যা তাই বিদ'আত।

৮. আল্লামা ইব্নে কাছীর (রহঃ) তদীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেনঃ

كل محدث قولا او فعلا لم يتقدم فيه متقدم فان العرب تسميه مبتدعا -

অর্থাৎ, প্রত্যেক এমন কাজ বা কথা যা ইতিপূর্বে কোন ব্যক্তি করেনি আরবরা তাকেই 'বিদ'আত' বলে।

৯. আল্লামা আল-বারকালী (البركلى) (রহঃ) 'الطريقة المحمدية' (আত-তরীকাতুল মুহাম্মাদিয়্যাহ) গ্রন্থে লিখেছেনঃ

وهى زيادة فى الدين او النقصان منه الحادثان بعد الصحابة بغير اذن الشارع به لا قولا ولا فعلا ولا صريحا ولا اشارة . اه -

অর্থাৎ, বিদআত হল ইসলামের মধ্যে কম বা বেশী করা- যা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর যুগের পর শারে' (شارع [আঃ])-এর পক্ষ থেকে কথা, কাজ, স্পষ্ট বক্তব্য কিংবা ইংগিত-মূলক কোন প্রমাণের অনুমোদন ছাড়াই আবিস্কৃত ও সংযোজিত হয়েছে।

নাবলূসী (রহঃ) এই সংজ্ঞায় বারকালী (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত بعد الصحابه (তথা সাহাবায়ে কেরামের যুগের পর) কথাটির পর "তাবিঈন ও তাবে তাবিঈন-এর যুগের পর" কথাটিকে বৃদ্ধি করেছেন।

১০. আল্লামা শাব্বীর আহমদ উছমানী (রহঃ) লিখেছেন ঃ

البدعة ما لا اصل لها فى الكتاب والسنة والقرون المشهود لها بالخير ويرتكبونها قصدا للثواب وعلى ظن انها من الامور الدينية -

অর্থাৎ, বিদ'আত বলা হয় কুরআন সুন্নাহ ও কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত যুগে (القرون المشهودة لها بالخير) যার কোন ভিত্তি ও প্রমাণ নেই- এমন কোন বিষয় যাকে মানুষ ছওয়াবের আশায় পালন করে এবং মনে করে যে, এটা দ্বীনী বিষয়। মাওলানা সরফরায আহমদ খান সফদর (রহঃ)ও 'المنهاج الواضح' (আল-মিনহাজুল ওয়াযিহ) গ্রন্থে অনুরূপই বলেছেন।

এতক্ষণ বিদআতের পারিভাষিক অর্থ বা শরয়ী পরিচয় সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের ভাষ্যাবলীর কয়েকটি উদ্বৃত করা হল। যার সারমর্ম হল- শরী'আতের পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয় ঃ

كل ما احدث فى الدين من الاقوال او الافعال بعد عهد النبى ﷺ والصحابة والتابعين وتابعيهم ولم يكن لها ثبوت فى القرآن والسنة ولا فى القرون المشهود لها بالخير لا قولا ولا فعلا ولا صراحة ولا اشارة ، ويرتكبونها قصدا للثواب وعلى ظن انها من الامور الدينية -

অর্থাৎ, প্রত্যেক এমন কথা বা কাজ, যা রাসূল (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের যুগের পর ইসলামের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, সংযোজিত হয়েছে- অথচ কুরআন, সুন্নাহ্ কিংবা খায়রুল কুরূন (কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত অতীত কাল)-এর কোথাও

কথা, কাজ, স্পষ্ট বা ইংগিতমূলক কোন প্রকার দলীলাদিতেই তার প্রমাণ নেই। মানুষ ছওয়াবের বাসনায় এর উপর আমল করে, আবার ভাবে এটা একটা দ্বীনী বিষয়।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বিদ'আতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে عموم خصوص مطلق -এর নিসবত। পারিভাষিক বিদ'আত খাস আর আভিধানিক বিদআত আম।

বিদআতের পারিভাষিক সংজ্ঞার উৎস ঃ

"امانى الحاجة" গ্রন্থের সংকলক লিখেছেনঃ বিদ'আত-এর শরয়ী সংজ্ঞার ভিত্তি হল রাসূল (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছটি-

من أحدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد -

অর্থাৎ, যে আমাদের এই দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভব ঘটাবে - যা তার অংশ নয়- সেটা প্রত্যাখ্যাত।

এ হাদীছে ব্যবহৃত "امر" শব্দ দ্বারা 'দ্বীন'কে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং একমাত্র দ্বীনের ক্ষেত্রে 'নব-আবিস্কৃত বিষয়' ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে এই "বিদ'আত" শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। সুতরাং যে কোন নব আবিস্কৃত উদ্ভাবিত বিষয়কেই বিদ'আত বলা যাবে না। এর দ্বারা বিদ'আতের আওতা থেকে খানা-পিনা, বাহন -উপকরণসহ বৈধ নানাবিধ বিষয়ে আধুনিক রূপসমূহ আলাদা হয়ে গেছে। এমনিভাবে বিদ'আতের আওতা থেকে আলাদা হয়ে গেছে সেসব রুসম রেওয়াজও, যেগুলো মানুষ ছওয়াবের নিয়তে করে না। যদিও আভিধানিক অর্থে এগুলোকেও বিদ'আত বলা যায়। কেননা এগুলো যারা করে তারা দ্বীন মনে করেনা কিংবা ছওয়াবের আশায় করে না। সুতরাং এগুলো দ্বীনের মধ্যে আবিস্কার বা সংযোজন নয়।

অনুরূপভাবে রাসূল (সাঃ)-এর ইরশাদ "ما ليس منه" দ্বারাও একথাই প্রমাণিত হয় যে, যেসব বিষয় সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ'র স্পষ্ট কিংবা ইংগিতমূলক কোন ভিত্তি রয়েছে সেগুলোকে বিদআত বলা যাবে না। এর দ্বারা বিদআতের আওতা থেকে احكام منصوصة ও احكام مستنبطة من النصوص আলাদা হয়ে গেছে। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের তা'আমুলও আলাদা হয়ে গেছে। কারণ, শরী'আতে এর ভিত্তি আছে। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين -

অর্থাৎ, তোমরা আমার তরীকা ও খোলাফায়ে রাশেদীন -যারা হেদায়েত প্রাপ্ত-এর তরীকাকে দৃঢ়ভাবে আকঁড়ে থাক।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেনঃ

اوصيكم باصحابى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم -

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে আমার সাহাবীদের ব্যাপারে ওসীয়ত করছি, তারপর যারা তাঁদের সাথে যুক্ত, তারপর যারা তাঁদের সাথে যুক্ত- তাদের ব্যাপারেও।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেনঃ

خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم -

অর্থাৎ, সবযুগের মধ্যে উত্তম যুগ আমার যুগ, তারপর যারা তাঁদের সাথে যুক্ত, তারপর যারা তাঁদের সাথে যুক্ত- তাদের যুগ।

এই তিন হাদীছের ভাষ্য স্পষ্টভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের আমল আচরণ লেন-দেন দ্বীনের অংশ। সুতরাং সেগুলোর উপর "বিদ'আত" কথাটা প্রযোজ্য হবে না।[১]

'বিদ'আত'-এর সংজ্ঞার فوائد قيود ঃ

বিদ'আত-এর সংজ্ঞায় ব্যবহৃত احداث فى الدين - অর্থাৎ, "দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করা"-এর কথা বলা হয়েছে। তাই কেউ যদি পার্থিব লক্ষ্যে কোন কিছু আবিস্কার করে, যেমন- নানা রকমের পোষাক, খাবার, দ্বীনী যোগাযোগ উপকরণ, যন্ত্রপাতি, নব নব সমরাস্ত্র ইত্যাদি-এর কোনটিই দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি ও সংযুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এগুলি হল দুনিয়া ও পার্থিব বিষয়ে নতুন সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তাই এগুলোকে 'বিদ'আত' অর্থাৎ, শরী'আতের পরিভাষায় বিদ'আত বলা যাবে না। এই সংজ্ঞা অনুসারে বর্তমান কালের দ্বীনী মাদ্‌রাসা ও মকতবসমূহে যে ইল্‌মে নাহু, ইল্‌মে সর্‌ফ, ইল্‌মে আদব, ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয় এগুলো রচনা ও সংকলন এবং শিক্ষাদান ও এরূপ দ্বীনী মাদ্‌রাসা ও মকতব তৈরি করা ইত্যাদি বিদআতের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে যায়। কারণ, এগুলো যদিও নব সৃষ্টি, কিন্তু দ্বীনের জন্যে (للدين), দ্বীনের মধ্যে (فى الدين) নয়। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, এগুলো এমন বিষয় যার উপর শরী'আতের আদেশ-নিষেধ (المامور به) পালন করাও নির্ভরশীল।[২]

কেউ কেউ বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন- এসব বিষয়গুলো সরাসরি দ্বীনী বিষয় না হলেও تبعا তথা পরোক্ষভাবে দ্বীনী বিষয়। অনুরূপভাবে পরোক্ষভাবে দ্বীনী বিষয় বলে বিবেচিত মানতেক দর্শন যার দ্বারা গোমরাহ মতবাদের মোকাবিলা করা হয়, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি যার দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা হয়। তাছাড়া আত্মশুদ্ধির বিভিন্ন পন্থা, আওরাদ-আযকার যেগুলো সুফিয়ায়ে কেরাম প্রবর্তিত করেছেন- এর কোনটিই

---

১. ॥ فتح الملهم بتغيير وزيادة

২. مامور به বলতে উদ্দেশ্য হল শরী'আতের পক্ষ থেকে আদিষ্ট বিষয় সেটা ওয়াজিবও হতে পারে, মুস্তাহাবও হতে পারে। যেমন, দ্বীনের হেফাযত, দ্বীনী উলূম হাসিল করা, দ্বীনী উলূমে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করা, তার প্রচার করা, দ্বীনের সাহায্য করা, দীনের প্রতিরক্ষা করা- ইত্যাদি যা এই আধুনিক কালে এসে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অথচ পূর্বসূরী মনীষীদের জন্যে বিশেষ অবস্থার কারণে এগুলো অপরিহার্য ছিল না। আর সে কারণ ও অবস্থা তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর উসূল তথা মূলনীতি হল, যেটা ব্যতীত ওয়াজিব পূর্ণ হয় না সেটাও ওয়াজিব। مامور به যার উপর নির্ভরশীল সেটাও مامور به - حكما সেটাও দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। বিদ'আত নয় ॥

বিদ'আত নয়। বরং দ্বীনী বিষয়। তবে প্রত্যক্ষভাবে নয়-পরোক্ষভাবে। আর আমাদের পূর্বসূরী মনীষীগণের কালে যেহেতু এগুলোর প্রয়োজন দেখা দেয়নি তাই তারা এগুলোর দ্বারস্থ হননি। বরং এগুলোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে পরবর্তীকালে।

বিদ'আতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

بعد عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم. الخ

অর্থাৎ, "যা আবিস্কৃত হয়েছে সাহাবা, তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের যামানার পর।" সুতরাং এর দ্বারা বিদ'আতের আওতা থেকে ঐসব বিষয় বের হয়ে গেছে, যেগুলো তাদের কালেই অস্তিত্ব লাভ করেছে- যে কাল সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) কল্যাণের সাক্ষ্য দিয়েছেন-এবং সেসব বিষয় সেকালে অস্তিত্ব লাভ করার পর সমকালীন সকলেই তা কবূলও করে নিয়েছেন। যেমন- কুরআনে কারীমের সংকলন, মদ্যপায়ীর জন্যে ৮০ দোররা 'হদ' নির্ধারণ, খোলাফায়ে রাশেদার ফয়সালার ভিত্তিতে কারিগরের উপর ভর্তুকি চাপানো এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর যুগেই জামা'আতের সাথে পূর্ণ গুরুত্বসহ তারাবীহ নামায আদায় করার বিধান ইত্যাদি। আর তাবে তাবিঈনের যুগে হাদীছ সংকলণ হওয়ায় সেটাও বিদ'আতের সংজ্ঞা থেকে আলাদা হয়ে গেছে। কেননা, বিদ'আতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

ولم يكن لها ثبوت فى القرون المسشهود لها بالخير -

অর্থাৎ, বিদআত কেবল এমন বিষয়কেই বলা যাবে খায়রুল কুরূনে (কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত তিন কালের কোন কালেই) যার অস্তিত্ব ছিল না।

বিদ'আতের সংজ্ঞায় আরও বলা হয়েছে-

ولم يكن لها ثبوت من القرآن والسنة -

অর্থাৎ, "কুরআন সুন্নায় যার কোন প্রমাণ নেই।" এর দ্বারা কুরআন ও সান্নাহর নুসূস থেকে উদ্ভাবিত বিধানাবলী (الاحكام المستنبطة /আহকামে মুস্তামবাতা) বিদ'আতের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে গেছে। কারণ কুরআন-সুন্নায় আহ্কামে মুস্তাম্বাতার ভিত্তি আছে।

সংজ্ঞায় আরও বলা হয়েছে-

ويرتكبونها قصدا للثواث وعلى ظن انها من الامور الدينية -

অর্থাৎ, "বিদ'আতের অনুসারীরা যে বিদ'আতটাকে ছওয়াবের আশায় এবং দ্বীনী বিষয় মনে করেই করে থাকে।" এর দ্বারা বিদ'আত থেকে ঐসব বিষয় বেরিয়ে গেছে, যেগুলো মানুষ অভ্যাসবশতঃ করে এবং সেটাকে আদৌ দ্বীনী বিষয় মনে করে না। তাছাড়া প্রচলিত রেওয়াজ ও প্রথাবলী- যেমন বিয়ে ইত্যাদি উৎসবে পালিত বিভিন্ন রকমের রেওয়াজ-এগুলো যদিও পাপের বিষয়, তবে শরী'আতের পরিভাষায় বিদ'আত নয়। কারণ মানুষ এসব উৎসব শুধু প্রথা হিসাবে, চক্ষু লজ্জার খাতিরে, লোক দেখানোর মানসে, সুনামের নেশায় করে থাকে। ছওয়াবের উদ্দেশ্যে কেউ এগুলো করে না। অনুরূপভাবে এগুলোকে দ্বীনী বিষয়ও মনে করে না। এটা হল বিদ'আত ও রুসূমের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য।

বিদ'আতের প্রকারঃ হাসনাহ্ ও সায়্যিআহ্ প্রসঙ্গ ঃ

জমহুর মুহাককিকীনের মত হল- বিদ'আতে হাসানাহ্ (উত্তম বিদ'আত) ও বিদ'আতে সায়্যিআহ্ (মন্দ বিদ'আত) বলতে কোন ভাগ নেই। তবে কোন কোন ব্যাখ্যাকারের ভাষ্য থেকে বিদ'আত হাসানাহ ও সায়্যিআহ্ হিসাবে বিভক্ত হওয়াটা প্রতিভাত হয়। তাই যদি এই বিভক্তিটা আভিধানিক অর্থ হিসাবে হয় তাহলে সেটা ঠিক আছে। কারণ, আভিধানিকভাবে সকল অভিনব-নতুন আবিস্কৃত বিষয়কেই বিদ'আত বলা যায়। চাই সেটা ভাল হোক বা মন্দ হোক। আর যদি এই বিভক্তিটা পারিভাষিক অর্থে হয় তাহলে যথার্থ হবে না। কারণ, শরী'আতের পরিভাষায় বিদ'আত বলে প্রমাণিত সবটাই গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার শামিল। এর মধ্যে এমন কোন অংশ বা বিষয় নেই যেটাকে حسنة বা উত্তম বলা যাবে। তবে কোন কোন شارح ও ব্যাখ্যাকারের কাছে মূল বিষয়টি ঘুলিয়ে গেছে। তাই তারা পারিভাষিক বিদ'আতকেই হাসানাহ ও সায়্যিআহ হিসাবে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন- শায়েখ আযযুদ্দীন ইব্নে আবদুস সালাম ও যারকানী প্রমুখ।

বিদ'আত দুই প্রকার-এই বক্তব্য পন্থীদের দলীল ঃ

যারা বিদআতকে হাসানাহ্ ও সায়্যিআহ্ -এই দুইভাগে বিভক্ত করেছেন তাদের প্রমাণ হল ঃ

১. জামা'আতের সাথে পূর্ণ গুরুত্বসহ তারাবীহ আদায় করা সম্পর্কে হযরত উমর (রাঃ) বলেছেনঃ نعمت البدعة هذه (কত উত্তম বিদ'আত এটা।) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন বিদআত প্রশংসার্হ্য ও উত্তম (حسنة) বলে বিবেচিত।

এর উত্তর হল-এখানে হযরত ওমর (রাঃ) বিদ'আত শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করেছেন, পারিভাষিক অর্থে নয়। কারণ, তরাবীহ্কে শরীআতের পরিভাষায় বিদ'আত বলা যায় না! কেননা, রাসূল (সাঃ)-এর যুগেই তরাবীহ্ নামায মাশরু' (مشروع) বা শরী'আত নির্দেশিত ছিল, তবে তার জামা'আতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হত না। পরবর্তীকালে রাসূল (সাঃ)-এর শিক্ষার আলোকেই সেটা করা হয়েছে। জামা'আতসহ এই বাহ্যিক রূপটির যেহেতু নতুনভাবে প্রচলন ঘটেছে, সে অর্থেই (অর্থাৎ, আভিধানিক অর্থেই) হযরত ওমর (রাঃ) তাকে উত্তম বিদ'আত আখ্যা দিয়ে বলেছেনঃ

نعمة البدعة هذه -

অর্থাৎ, কত উত্তম বিদ'আত এটি।

২. বিদ'আত দুই প্রকার-এই বক্তব্য পন্থীদের আরেকটি দলীল হল হাদীছ শরীফে আছেঃ

من سن سنة حسنة كان له اجرها واجرمن عمل بها ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص ذالك من اوزارهم شيئا -

এর উত্তর হল-এ হাদীসে ব্যবহৃত سن শব্দের অর্থ সুন্নাতে নববী অনুযায়ী যে ব্যক্তি আমল করল। এর অর্থ اخترع বা নতুন সৃষ্টি করা নয়- যেমনটি তারা ধারণা করেছে।

৩. বিদ'আত দুই প্রকার-এই বক্তব্য পন্থীদের আরেকটি দলীল হল তিরমিযী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীছ ঃ

من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضى الله ورسوله كان عليه مثل اثم من عمل . الخ -

এ হাদীছের আলোকে তারা মনে করেছেন এক বাক্যে সব বিদ'আত মূলতঃ গোনাহের ও নিন্দনীয় নয়। বরং সেটা যদি পথ ভ্রষ্টতা (ضلاله) ও গোমরাহীর কারণ হয় তবেই সেটা গোনাহের বিষয় এবং তা নিন্দনীয়। এতে বুঝা যায় কিছু বিদ'আত এমনও আছে যা ضلاله বা গোমরাহীর কারণ নয়। জবাব হল- ضلاله শব্দটি হাদীছ শরীফে قيد اتفاقى হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে قيد احترازى হিসাবে নয়। যেমনটি কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত স্থানে হয়েছে ঃ

لاتأكلوا الربو اضعافا مضاعفة -

অর্থাৎ, তোমরা বহুগুণে বৃদ্ধি করে সূদ ভক্ষণ কর না। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ১৩০)

বিদ'আতের কোন ভাগ নেই-এর প্রমাণ ঃ

১. বিদ'আতের নিন্দাবাদে বর্ণিত সবগুলো ভাষ্য (نص)ই 'আম' বা ব্যাপক অর্থবোধক। যা সকল প্রকার বিদ'আতের-ই নিন্দা জ্ঞাপন করে। যেমন ইব্নে মাজায় বর্ণিত হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদীছ ঃ

وشرالأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة -

অর্থাৎ, সববিষয়ের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হল নতুনসৃষ্ট বিষয়। আর সব নতুনসৃষ্ট বিষয় হল বিদ'আত।

হযরত ইব্নে মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীছে আছেঃ

فان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة -

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সর্ববিষয়ের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হল নতুনসৃষ্ট বিষয়। আর সব নতুনসৃষ্ট বিষয় হল বিদ'আত। আর সব বিদ'আত হল গোমরাহী।

২. সকল বিদ'আতই মন্দ ও নিন্দনীয়-এ ব্যাপারে সাহাবা, তাবিঈন ও তাঁদের পরবর্তী সালাফে সালিহীনের ইজ্মা রয়েছে। এতে কোন রূপ বিভক্তি ও তাখসীস নেই। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সকল বিদ'আত-ই মন্দ (سيئة) সকল বিদ'আত-ই নিন্দাযোগ্য।

যারা বিদ'আতকে নানাভাগে ভাগ করেন তাদের দৃষ্টিতে বিদ'আতের প্রকার সমূহ ঃ

উল্লেখ্য যে, যাঁরা বিদ'আতকে হাসানাহ ও সায়্যিআহ্'-এই দুই ভাগ করেছেন তারা বিদ'আতকে কেবল দুই প্রকারের মধ্যেই সীমিত রাখেননি। বরং তাঁরা শরী'আতের পাঁচ

প্রকার হুকুমের ভিত্তিতে বিদ'আতকেও পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার কোনটি ওয়াজিব, কোনটি মুস্তাহাব, কোনটি মুবাহ কোনটি মাকরূহ।

আয-যুজাজাহ্ গ্রন্থে আছে, ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আবদুল আযীয ইব্নে আবদুস সালাম কিতাবুল কাওয়া'ইদ (كتاب القواعد)-এর শেষে উল্লেখ করেছেনঃ বিদআত মোট পাঁচ প্রকার। যথা ঃ

১. ওয়াজিব। যেমন ইল্মে নাহু শিক্ষা করা- যার দ্বারা আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের কালাম বুঝা যায়। কেননা, শরী'আতের সংরক্ষণ হল ওয়াজিব। আর সেটা শরী'আত বুঝা ব্যতীত সম্ভব নয়। এসব ওয়াজিব যার উপর নির্ভরশীল, সেটাও ওয়াজিব হয়ে থাকবে। অনুরূপভাবে কিতাব ও সুন্নাহ-র গরীব শব্দাবলী মুখস্থ করা, ফিক্হের উসূল সংকলন করা, জার্হ্ ও তা'দীলের আলোচনায় (صحيح سقيم) শুদ্ধ-অশুদ্ধের পার্থক্য নির্ণয় করা ইত্যাদিও ফরয।

২. হারাম। যথা কাদরিয়া, জাবরিয়া, মুরজিয়া, মুজাস্সিমা ইত্যাদি ফিরকা। আর এগুলোর প্রতিরোধ করা হল ওয়াজিব বিদ'আত। কারণ, এ জাতীয় বিদ'আত থেকে শরী'আতকে হেফাযত করা ফরযে কিফায়াহ্।

৩. মানদূব। যেমন- নানা রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেক এমন নেক কাজ যা ইসলামের প্রথম যুগে ছিল না। যেমন তারাবীহ।[১] অনুরূপভাবে সুফিয়ায়ে কেরামের জটিল ও তাত্ত্বিক বিষয়াবলীর আলোচনা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মাসাইলের ক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বৈঠক ও মাহ্ফিলের আয়োজন করা।

৪. মাকরূহ। মসজিদে সাজ-সজ্জা করা, কুরআন শরীফে নকশা করণ ইত্যাদি।[২]

৫. মুবাহ্। যথা আসর ও ফজর নামাযের পর মুসাফাহা করা।[৩] খানা-পিনার স্বাদে বৈচিত্র আনয়ন, পোষাক ও নিবাসে প্রশস্ততা ও জামার আস্তীন বড় ও প্রশস্ত করা। অবশ্য মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেছেনঃ এর কোন কোনটির মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন।[৪]

বিদ'আতের নিন্দনীয় হওয়ার কারণসমূহ ঃ

১. বিদ'আত সৃষ্টির অর্থই হল রাসূল (সাঃ)-এর দিকে জাহালাত বা মূর্খতার নিসবত করা। যেন এই কথার-ই দাবী করা যে, হযরত (সাঃ) এই আবিস্কৃত পদ্ধতিটি জানতেন না। অথচ এটা একটা দ্বীনী বিষয় (বিদ'আতীদের ধারণা মতে।)!

---

১. অর্থাৎ, জামা'আতসহ। (مرقاة شرح مشكوة) ॥ ২. এটা শাফিঈ মাযহাবের মত। হানাফীদের মতে এটা বৈধ-মুবাহ্। প্রাগুক্ত ॥ ৩. এটা শাফিঈদের মত। হানাফীদের মতে মাকরূহ। প্রাগুক্ত ॥ ৪. ইমাম শাতিবী (রহঃ) 'আল-ই'তিসাম' গ্রন্থে আযযুদ্দীন (রহঃ)-এর বক্তব্য সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আযযুদ্দীন (রহঃ) যেসব বিধি-বিধানের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি তার কোন কোনটির জবাবও দিয়েছেন। বিস্তারিত জানতে হলে 'الاعتصام' দেখুন ॥

২. অথবা তিনি জানতেন। তবে মানুষের কাছে সেটা পৌঁছাননি। এর অর্থ হল রাসূল (সাঃ) খেয়ানত করেছেন। বিদ'আতী ব্যক্তি যেন একথাই বলতে চান যে, (নাউযু-বিল্লাহ) রাসূল (সাঃ) খেয়ানত করেছেন, তিনি তাঁর রিসালাতকে যথাযথভাবে পৌঁছে দেননি।

৩. বিদ'আত আবিস্কারের অর্থ হল এ কথার দাবী করা যে, দ্বীন এখনো পরিপূর্ণ হয়নি। অথচ আল্লাহ তা'আলা দ্বীনকে মুকাম্মাল করে দিয়েছেন। এ মর্মে ইরশাদ করেছেনঃ

اليوم اكملت لكم دينكم . الاية -

অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ৩)

৪. বিদ'আতী পরোক্ষভাবে নিজেকে শরী'আত প্রবর্তক (شارع)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার-ই দাবী করে।

৫. বিদ'আত সৃষ্টি করার অর্থ সুন্নাতকে মিটিয়ে দেয়া। হাদীছ শরীফে আছে ঃ

ما احدث قوم بدعة الارفع مثلها من السنة فتمسک بسنة خير من احداث بدعة (رواه احمد - مشكاه)

অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায় কোন বিদ'আত আবিষ্কার করলে অনুরূপ সুন্নাত উঠে যায়। অতএব কোন বিদ'আত আবিষ্কার করার চেয়ে সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকাই উত্তম।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে ঃ

ما ابتدع قوم بدعة فى دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القيامة - (رواه الدارمى عن حسان موقوفا - مشكاة)

অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায় তাদের ধর্মে কোন বিদআত আবিষ্কার করলে আল্লাহ অনুরূপ সুন্নাত তুলে নেন। অনন্তর কিয়ামত পর্যন্ত আর সে সুন্নাতকে প্রত্যানীত করেন না।

৬. বিদ'আত আবিস্কার করার অর্থই দ্বীনকে বিকৃত করা। নিম্নোক্ত হাদীছ শরীফে এ বিষয়টির দিকে ইংগিত পাওয়া যায় ঃ

يقول يوم القيامة لاناس احدثوا ويعرضون على النبى صلى الله اليه وسلم عند الحوض - فيقول لهم : سحقا سحقا لمن غير بعدى -

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন হাওযে কাউছারের নিকট কিছু বিদআতী লোককে নবী (সাঃ)-এর সন্মুখে পেশ করা হলে নবী (সাঃ) তাদেরকে বলবেন ঃ যারা আমার পর বিকৃতি সাধন করেছে তাদেরকে হাকিয়ে দেয়া হোক, তাদেরকে হাকিয়ে দেয়া হোক।

৭. বিদ'আতী বিদ'আতের পাপ থেকে তওবা করার সুযোগ লাভ করে না। কারণ, সে পাপটাকেই দ্বীন মনে করছে। তাই সে এ কারণে লজ্জিত হয় না। আর তওবার জন্যে লজ্জিত হওয়াও একটি শর্ত।

যেসব কারণে বিদ'আতের উদ্ভব ঘটে ঃ

১. বিদ'আত সৃষ্টির প্রথম কারণ হল মূর্খতা। এর ব্যাখ্যা হল, বিদ'আতের মধ্যে কিছু বাহ্যিক চানক্য আছে। যা দেখে মানুষ সহজেই ধোকায় পড়ে যায় এবং তার উপর আমল করতে শুরু করে। ফলে কার্যত তারা ব্যর্থ হয়। তাই পার্থিব জগতে তাদের সাধনা বৃথা যায়। অথচ তারা ভাবে যে, তারা কত উত্তম কাজ-ই না করছে।

২. দ্বিতীয় কারণ হল শয়তানের প্রবঞ্চনা ও ধোকা। শয়তান বিদ'আতকে তাদের সামনে সুশোভিত করে পেশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل -

অর্থাৎ, শয়তান তাদের সামনে তাদের আমলসমূহকে সুশোভিত করে তুলেছে, অতঃপর তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। (সূরাঃ ৪৭-মুহাম্মাদঃ ২৫)

আরও ইরশাদ হয়েছেঃ

ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم -

অর্থাৎ, যারা নিজেদের নিকট হেদায়েত সুস্পষ্ট হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। (সূরাঃ ৪৭-মুহাম্মাদঃ ২৫)

৩. বিদ'আত উদ্ভাবনের আরেকটি কারণ হল- অমুসলমানদের অনুসরণ। বিশেষতঃ এ কারণেই আমাদের এই উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে নানা রকম রুসুম ও বিদ'আতের উদ্ভব ঘটেছে। এগুলোর সিংহভাগের উদ্ভব ঘটেছে হিন্দুদের অনুসরণে।

৪. বিদ'আত সৃষ্টির আরেকটি কারণ হল আধুনিকতা প্রীতি ও পদমর্যাদার লোভ। এটা একটা ব্যাপক ব্যাধি। এ থেকে কথা, কর্ম ও চিন্তায় নতুনত্ব ও আধুনিকতা সৃষ্টির চেতনা জাগ্রত হয়। ফলে তারা নতুন নতুন কথা ও কাজের অবতারণা করে। এরূপ লোকদের সম্পর্কে হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا ابائكم، فاياكم واياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم - (ماخوذ از اختلاف امت اور صراط مستقيم)

অর্থাৎ, শেষ যমানায় প্রতারক মিথ্যুকদের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের নিকট এমন সব হাদীছ উপস্থিত করবে, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ শোননি। অতএব সাবধান তারা যেন তোমাদেরকে গোমরাহ করতে না পারে, তোমাদেরকে ফিতনায় ফেলতে না পারে।

বিদ'আত চেনার মৌলিক নীতিমালা ঃ

১. শরী'আত যেখানে কোন একটা বিষয়ের বিশেষ একটি সময় নির্ধারিত করে দিয়েছে, সেখানে আমরা যদি তার জন্যে ভিন্ন একটি সময় নির্ধারণ করি, তাহলেই সেটা

বিদ'আত হয়ে যাবে। এর উপমা হল-নামাযের পর মুসাহাফা করা। কারণ, শরী'আত সালাম-মুসাফাহাকে নির্ধারণ করেছে সাক্ষাৎ ও বিদায়ের সময়। এখন কোন কোন স্থানে যে নামাযের পর মুসাফাহার রেওয়াজ তৈরী হয়েছে এটা বিদ'আত- ভিন্ন সময়ের সাথে নির্ধারিত করার কারণে।

আল্লামা ইব্নে আবিদীন শামীতে (রাদ্দুল মুহ্তারে) লিখেছেনঃ আমাদের আলিমগণ ও অন্যান্য আলেমগণ নামাযের পর রেওয়াজী মুসাফাহাকে সময়ের তাখ্সীসের কারণে বিদ'আত বলেছেন। যদিও মুসাফাহা করা সুন্নাত। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেনঃ এ কারণেই আমাদের কোন কোন আলেম স্পষ্ট করে বলেছেনঃ এটা মাকরূহ, এটা নিন্দনীয় বিদ'আত। শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহঃ) আশ্'আতুল লুম'আত-য়ে বলেছেনঃ মানুষের মধ্যে নামাযের পর কিংবা জুমুআর পর মুসাফাহার যে রেওয়াজ রয়েছে এর কোন ভিত্তি নেই। বিশেষ সময়ের সাথে খাস করার কারণে এটা বিদ'আত।' এর উপমা হল কবরের উপর আযান দেয়া, নামাযের প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ শরীফ পড়া ইত্যাদি।

২. শরী'আত যে বিষয়টিকে মুতলাক (শর্ত-বন্ধনহীন) রেখেছে, নিজেদের পক্ষ থেকে قيود (শর্ত-বন্ধন) যোগ করে সেটাকে مقيد (শর্ত-বন্ধনযুক্ত) করা। এর উপমা হল- কবর যিয়ারতের জন্যে কোন দিবস নির্ধারণ করা। হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছে দেহ্লভী (রহঃ)কে কবর যিয়ারতের জন্যে দিন-তারিখ নির্ধারণ ও বিশেষ দিবসে পালিত ওরসে গমন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি এর উত্তরে বলেছিলেনঃ কবর যিয়ারত তো জায়েয। কিন্তু তার জন্যে দিবস ও তারিখ নির্ধারণ করাটা বিদ'আত। সালাফে সালেহীনের মধ্যে এ জাতীয় দিন নির্ধারণ করার কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং এটা এমন একটা বিদআত যার মূল জায়েয, শুধু সময় নির্ধারণ করার কারণে সেটা বিদ'আতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। যেমন তূরান দেশে আসর নামাযের পর মুসাফাহা করার রেওয়াজ প্রচলিত আছে।[১]

এই নীতির আলোকে উলামায়ে কেরাম বলেছেনঃ মৃত্যু দিবস পালন, বিশেষ দিবসে ঈসালে ছওয়াবের অনুষ্ঠান যথা মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে, চল্লিশতম দিবসে- এসবই বিদআত। কারণ এসব ক্ষেত্রেই বিশেষ দিবসের সাথে দু'আর আমলকে খাস করা হয়। নিয়ম হল- শরী'আত যে আমলকে যেভাবে করতে বলেছে, সেটা ঠিক সেভাবেই আমল করতে হয়। এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন হারাম ও বিদ'আত, এ কারণে সির্রী নামাযে জিহ্রী কেরাত ও তার বিপরীত করাটা হারাম ও বিদ'আত।

৪. অনুরূপভাবে যেসব ইবাদতকে শরীআত ইনফিরাদী বা আলাদা আলাদাভাবে করাকে বিধিবদ্ধ ও নির্ধারিত করেছে, সেগুলো জামা'আতের সাথে আদায় করা বিদ'আত। এ কারণেই ফকীহগণ বলেছেনঃ জামা'আতের সাথে নফল নামায পড়া মাকরূহ এবং বিদ'আত।

১. فتاوى عزيزيه جـ١ ॥

আল্লামা শামী (রহঃ) রদ্দুল মুহ্তারে (২য় খণ্ড) বলেছেনঃ এ কারণেই ফকীহগণ জামা'আতবদ্ধ হয়ে صلوة الرغائب পড়তে নিষেধ করেছেন-যা কিনা লৌকিক কিছু আবেদের সৃষ্টি। কারণ নির্দিষ্ট ঐ রাতগুলোতে কথিত পদ্ধতিতে এসব নামায পড়ার বিধান শরী'আতে বর্ণিত নেই- যদিও নামায একটি পরিপূর্ণ উত্তম আমল।[১]

তাসাওউফ বা সুফিবাদ সম্পর্কে ইফরাত/তাফরীত

নামায, রোযা, প্রভৃতি শরী'আতের জাহিরী বিধানের উপর আমল করা যেমন জরূরী, তদ্রূপ এখ্লাস, তাক্ওয়া, সবর, শোক্র প্রভৃতি কলবের গুণাবলী অর্জন এবং রিয়া, তাকাব্বুর প্রভৃতি অন্তরের ব্যাধি দূর করা তথা শরী'আতের বাতিনী বিধানাবলীর উপর আমল করাও ওয়াজিব। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم -

অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিবেন কিতাব ও হিক্মত এবং তাদের তায্কিয়া (تزكيه) তথা আত্মশুদ্ধি করবেন। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১২৯)

অন্যান্য আরও বিভিন্ন আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قد افلح من زكها وقد خاب من دسها -

অর্থাৎ, সফলকাম হবে, যে নিজের তায্কিয়া (تزكيه) তথা আত্মশুদ্ধি করবে। (সুরাঃ ৯১-শাম্সঃ ৯)

وقال تعالى : قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى . الاية -

অর্থাৎ, সে-ই সেই সফলকাম হবে, যে নিজের তায্কিয়া (تزكيه) তথা আত্মশুদ্ধি করবে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করবে ও নামায আদায় করবে। (সূরাঃ ৮৭-আ'লাঃ ১৪)

এই বাতিনী বিধানাবলীর উপর আমল করাকে বলা হয় তায্কিয়ায়ে নফ্স (تزكيه نفس) বা আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধির এই সাধনাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক সাধনা। আর এই শাস্ত্রকে বলা হয় তাসাওউফ বা সূফীবাদ। তবে উলামায়ে কেরাম তাসাওউফ শব্দটিই ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা সূফীবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন না।

কুরআন-হাদীছে তাসাওউফ শব্দটি উল্লেখিত হয়নি।[২] তবে ইহ্সান (احسان) শব্দটি প্রসিদ্ধ হাদীছে জিব্রীলে এসেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

১. বিদ'আত চেনার এই ষষ্ট মূলনীতি কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে اختلاف امت اور صراط مستقيم থেকে গ্রহণ করা হয়েছে ॥

২. কেউ কেউ বলেন তাসাওউফ (تصوف) শব্দটির অর্থ সূফ বা রেশমী পোষাক পরিধান করা। এর থেকেই এসেছে সূফী শব্দটি। প্রাচীন যুগে সূফী দরবেশগণ রেশমী পোষাক (মোটাসোটা পোষাক) পরিধান করতেন বিধায় ইসলামী পরিভাষায় এই শাস্ত্রের নাম তাসাওউফ হয়ে থাকবে। তবে সূফীসুলভ জীবন-যাপন ও এই বিশেষ ধরনের বস্ত্র পরিধানের পারস্পরিক সম্বন্ধ এতই অগভীর ও অপ্রয়োজনীয় যে, তার দ্বারা ইসলামের সকল তাসাওউফ পন্থী সূফী-দরবেশদের জন্য ব্যাপকভাবে তাসাওউফ বা সূফী শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না ॥

ما الاحسان ؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراك فانه يراك - (بخارى ومسلم)

অর্থাৎ, "ইহ্সান" কি? তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি আল্লাহ্কে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে না দেখ, তিনিতো তোমাকে দেখছেন।

আহ্লে হক কুরআনের আয়াতে বর্ণিত তায্কিয়া (تزكيه) এবং উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত ইহ্সান (احسان)-এর ব্যাখ্যার আলোকে তাসাওউফকে জরূরী মনে করেন। তাসাওউফ -এর মামূলাত এই ইহ্সান-এর মাকাম অর্জনের উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়। অতএব এটাও কুরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বলতে হবে। বস্তুত ইহ্সান (احسان) হল ফযীলতের স্তর। আর তাসাওউফ এই ফযীলতের স্তর অর্জন করার ওসীলা বা মাধ্যম। অতএব ইহ্সানের ন্যায় তাসাওউফ অর্জন করাও কাম্য।

আহ্লে হক তাসাওউফের ব্যাপারে বাড়াবাড়িও করেন না, ছাড়াছাড়িও করেন না। যারা মনে করেন পীর না ধরলে মুক্তি নেই তারা বাড়াবাড়িতে আছেন। পীর ধরা ফরয /ওয়াজিব নয়, পীরের হাতে বাই'আত হওয়া ফরয /ওয়াজিব নয়, এটাকে সুন্নাত বলা হয়। রাসূল (সাঃ)-এর হাতে অনেক সাহাবী বাই'আত করেছেন এই মর্মে যে, আমরা শির্ক করব না, যিনা করব না, চুরি করব না, কোন পাপ কাজ করব না, ভাল কাজ করব ইত্যাদি। এটাকে বাই'আতে সুলূক বলা যায়। কোন কোন সাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর হাতে এরূপ বাই'আত হয়েছেন আবার অনেকে হননি। বাই'আত হওয়া ফরয/ওয়াজিব হলে সব সাহাবীই বাই'আত হতেন।

কেউ যদি মনে করেন পীর ধরলে পীর-মাশায়েখগণ মুরীদদের পাপের বোঝা বহন করে বা কবরে হাশরে মুরীদদেরকে তা'লীম ও তাল্কীন দিয়ে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, এটা কুরআন হাদীছ বিরোধী কথা। কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

ولا تزر وازرة وزر اخرى -

অর্থাৎ, কেউ কারও কোন পাপের বোঝা বহন করবে না। (সূরাঃ ৬-আন্আমঃ ১৬৪)

কেউ নিজে আমল করে নিজের নাজাতের ব্যবস্থা না করলে কোন পীর তাকে নাজাত দিতে পারবে না। রাসূল (সাঃ) থেকে বড়তো আর কোন পীর হতে পারে না। স্বয়ং রাসূল (সাঃ) তাঁর গোত্র বনূ হাশেম, বনূ মুত্তালিব এবং নিজ কন্যা ফাতেমাকে ডেকে নিজেদের নাজাতের ব্যবস্থা নিজেদেরকে করতে বলেছেন। ইরশাদ করেছেন ঃ

يا بنى هاشم ! انقذوا انفسكم من النار فانى لا اغنى عنكم من الله شيئا- يا بنى عبد المطلب ! انقذوا انفسكم من النار فانى لا اغنى عنكم من الله شيئا- يا فاطمة ! انقذى نفسك من النار فانى لا اغنى عنك من الله شيئا . الحديث - (مسلم)

অর্থাৎ, হে বনী হাশেম ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহ্র আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। হে বনূ আব্দিল

মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহ্র আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। হে ফাতেমা ! তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহ্র আযাব থেকে তোমাকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। .....।

আবার যারা মনে করেন পীর-মাশায়েখদের কাছে যাওয়ারই কোন দরকার নেই, অর্থাৎ, যারা তাসাওউফকে ইসলামের বহির্ভূত সাব্যস্ত করেন, তারা ছাড়াছাড়িতে রয়েছেন। আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যথার্থ তাসাওউফকে কখনও ইসলামের বহির্ভূত সাব্যস্ত করেননি।

যারা প্রচলিত তাসাওউফকে অস্বীকার করেন, তারা প্রধানত ঃ চারটি সন্দেহের ভিত্তিতে তা করে থাকেন।

১. তারা মনে করেন প্রচলিত তাসাওউফের যিক্র, শোগল, মোরাকাবা ইত্যাদি বিদআত, কেননা, এটা ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন, কুরআন-হাদীছে যার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এর জওয়াব হল-একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই দেখা যায় এটা বিদ'আতের সংজ্ঞায় পড়ে না। কেননা বিদ'আত বলা হয় ইবাদত এবং ছওয়াব মনে করে ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা। পক্ষান্তরে প্রচলিত তাসাওউফের যিক্র, শোগল, মোরাকাবা ইত্যাদিকে ইবাদত এবং ছওয়াব মনে করে করা হয় না। বরং এগুলো করা হয় মাধ্যম ও ওসীলা হিসেবে। মূল উদ্দেশ্য হল তায্কিয়া বা আত্মিকগুণাবলী অর্জন করা, যে সম্পর্কে কুরআন-হাদীছের বহুস্থানে তাগীদ এসেছে। এ যিক্র শোগলগুলো সেই আত্মিক গুণাবলী অর্জনের ওসীলা বা মাধ্যম হয়ে থাকে। যেমন প্রচলিত মাদ্রাসা ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠান রাসূল (সাঃ)-এর যুগে ছিল না। কিন্তু দ্বীনী ইল্ম শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজনে পরবর্তীতে এগুলোকে ওসীলা বা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে মূল উদ্দেশ্য হল দ্বীনী ইল্ম শিক্ষা দেয়া, যার গুরুত্ব কুরআন-হাদীছে এসেছে। তাসাওউফের যিক্র শোগলগুলোও অনুরূপ।

২. যারা প্রচলিত তাসাওউফকে অস্বীকার করেন, তাদের দ্বিতীয় সন্দেহ হল তায্কিয়া বা আত্মিকগুণাবলী অর্জন করার জন্য এসব মাধ্যম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকলে রাসূল (সাঃ)-এর যুগে কেন এরূপ করা হয়নি?

এর জওয়াব হল রাসূল (সাঃ)-এর সোহবত এতখানি কার্যকরী ছিল যে, শুধু তাঁর সোহবতেই মানুষের মধ্যে খাওফ, খাশিয়্যাত, আল্লাহ্র মহব্বত, ফিক্রে আখিরাত, এখ্লাস ইত্যাদি আত্মিক গুণাবলী অর্জিত হয়ে যেত। এ সবের জন্য অন্য আর কোন মেহনত-মোজাহাদার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকত না। যেমন শুধু রাসূল (সাঃ)-এর সোহবতই তা'লীমের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাওয়ায় স্বতন্ত্র কোন মাদ্রাসা বা দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তখন দেখা দেয়নি। রাসূল (সাঃ)-এর সোহবত প্রাপ্ত সাহাবীদের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। পরবর্তীতে পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও মানুষের মন-মানসিকতার অবনতি ঘটায় শুধু সোলাহাদের সোহবতই এর জন্য যথেষ্ট না হওয়ায় এসব আত্মিক

গুণাবলী অর্জন করার জন্য স্বতন্ত্র মেহনত-মোজাহাদার প্রয়োজনে বুযুর্গানে দ্বীন এসব তরীকাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং হাজার হাজার বুযুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতায় এগুলির কার্যকারিতা সুপ্রমাণিত হয়েছে।

৩. যারা প্রচলিত তাসাওউফকে অস্বীকার করেন, তাদের তৃতীয় সন্দেহ হল- যদি প্রচলিত তাসাওউফের যিক্‌র, শোগল, মোরাকাবা ইত্যাদি মাধ্যমগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকত, তাহলে রাসূল (সাঃ) এগুলি সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়ে যেতেন। কিন্তু রাসূল (সাঃ) এসব ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা দিয়ে যাননি।

এর জওয়াব হল- যিক্‌র, শোগল, মোরাকাবা ইত্যাদি মাধ্যমগুলো যুগকাল ও ব্যক্তির মেজায এবং স্বভাব অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে, পীর মুরশিদগণ তাদের সব ধরনের মুরীদকে একই ব্যবস্থাপত্র দেন না বরং সালেকের মেজায এবং স্বভাব অনুসারে তার জন্য ব্যবস্থাপত্র নির্ধারণ করে থাকেন। এসব ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে এরূপ ব্যাপকতার অবকাশ রাখার জন্যই রাসূল (সাঃ) এর তরীকা খাস করে দিয়ে যাননি।

৪. যারা প্রচলিত তাসাওউফকে অস্বীকার করেন, তাদের চতুর্থ সন্দেহ হল- তাসাওউফের প্রচলিত যিক্‌র, শোগল, মোরাকাবা ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ার কারণে মানুষ কর্মতৎপরতা থেকে বিচ্যুত ও বিমুখ হয়ে পড়ে।

এই সন্দেহ নিরসনের জন্য তাসাওউফ শাস্ত্রের ইমাম - শাহ ওয়ালীউল্লাহ, মোজাদ্দিদে আল্‌ফে ছানী, সাইয়্যেদ আহ্‌মদ বেরেলভী প্রমুখ মনীষীদের জীবনী দেখা যেতে পারে। তাঁরা একদিকে তাসাওউফের যিক্‌র শোগল ও পীর-মুরীদীর কাজেও তৎপর ছিলেন আবার তাঁরা এক এক ব্যক্তি জীবনে এমন কাজ করে গেছেন যা এখন কোন বিরাট সংস্থা সংগঠনও করে দেখাতে পারছে না।

ইল্‌হাম, কাশ্‌ফ্‌ ও কারামত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

এ সম্পর্কে ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন ১৫৩-১৫৬ পৃষ্ঠা।

ওলী, আবদাল, গাউছ, কুতুব ইত্যাদি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

এ সম্পর্কে ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন ১৫৬-১৫৭ পৃষ্ঠা।

মাযার, কবর যিয়ারাত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

এ সম্পর্কে ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন ১৫৭ পৃষ্ঠা।

গান-বাদ্য প্রসঙ্গ

গানের সংজ্ঞাঃ

গানের আরবী শব্দ হল- غناء - غناء শব্দটি আভিধানিকভাবে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা ঃ

(১) বড় আওয়াজ বা আরবী লাহান, যে লাহানে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং আরবী কবিতা পাঠ করা হয়।

(২) গান "গান"-এর আভিধানিক অর্থ হল সঙ্গীত/কণ্ঠ সঙ্গীত। আর পরিভাষায় গান বলা হয় এমন সঙ্গিতকে যা অন্তরে কামোদ্দীপনা জাগ্রত করে ও যৌন সুড়সুড়িমূলক

আবেদন সৃষ্টি করে। এ কারণেই গানকে যিনার মন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লামা তাহের পাটনী বলেন এ কারণেই বলা হয় ঃ

الغناء رقية الزنا - (مجمع بحار الانوار جـ/٤)

অর্থাৎ, গান হল যেনার মন্ত্র।

তবে সাধারণত ঃ গান বাদ্যযন্ত্র সহকারে হয়ে থাকে বিধায় বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত সূর সঙ্গীতকে গান বলা হয়। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وسماع آوازے را گویند کہ بے آلات (مزامیر ومعازف) باشد - وغناء مع آلات ست - (بوادر النوادر از درالمعارف)

অর্থাৎ, সামা' বলা হয় বাদ্যযন্ত্র ও বাঁশি বিহীন সূর সঙ্গীতকে, আর গান বলা হয় বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত সূর সঙ্গীতকে।

কবিতা পাঠের শরঈ বিধান ঃ

খুশির অনুষ্ঠানে তিন শর্তে غناء তথা সূর করে কবিতা পাঠ সর্ব সম্মতিক্রমে জায়েয। শর্তত্রয় হল ঃ

(১) কবিতা পাঠের সাথে دف ব্যতীত অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত না হতে হবে।

(২) কবিতার কথা ও বিষয়বস্তু অশালীন ও অশ্লিল্ না হতে হবে।

(৩) কবিতাটি সঙ্গিতের সূরধারা (وزن موسیقی) মোতাবেক না হতে হবে।

এ ছাড়া কবিতা আবৃত্তিকারী বেগানা নারী না হওয়ারও শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

গান ও বাদ্যের শরঈ বিধানঃ

শরী'আতে গান-বাদ্য হারাম। গান হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামাদের কোন মতবিরোধ নেই। দুররুল মা'আরিফ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

اختلاف نیست یکے از علماء بحرمت غنا نیست - (بوادر النوادر از درالمعارف)

অর্থাৎ, (পারিভাষিক) গান হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামাদের মাঝে কোন মতানৈক্য নেই। অবশ্য বাদ্যের ব্যাপারে সামান্য ব্যাখ্যা রয়েছে। বাদ্য তিন প্রকার-

(১) ঐ সমস্ত বাদ্য যেগুলোকে ঘোষণা ইত্যাদির জন্য বানানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা আনন্দ-ফুর্তি, ক্রিড়া-কৌতুক উদ্দেশ্য নয়। যেমনঃ دف - ঘন্টা, نقاره/ডঙ্কা। এ সবের ব্যবহার জায়েয।

(২) ঐ সকল বাদ্যযন্ত্র যেগুলো আনন্দ-ফুর্তি, আমোদ-প্রমোদ ও ক্রিড়া-কৌতুকের উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে এবং সেগুলো ফাসেক ফুজ্জারদের شعار বা প্রকীক। যেমনঃ সেতারা, হারমোনিয়াম, গিটার, সারিন্দা, একতারা, দোতারা ইত্যাদি। এগুলোর ব্যবহার সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম।

(৩) ঐ সকল বাদ্যযন্ত্র, যেগুলো আমোদ-প্রমোদ ও ক্রিড়া-কৌতুকের জন্য বানানো হয়েছে। তবে সেগুলো ফাসেক ফুজ্জারদের প্রতীক নয়। যেমনঃ বড় ঢোল। এগুলোর ব্যাপারে

ইমাম গাযালী (রহঃ) এবং কতক সূফীয়ায়ে কেরাম বিভিন্ন শর্ত স্বাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছেন। শর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) শুনানে ওয়ালা শ্মশ্রুবিহীন বালক না হতে হবে। অথবা গায়র মাহরাম নারী না হতে হবে।

(খ) পঠিত কবিতার বিষয়বস্তু শরী'আত পরিপন্থী না হতে হবে।

(গ) এর দ্বারা শুধু অন্তরে রেখাপাত করা উদ্দেশ্য হবে- এ ছাড়া আমোদ-প্রমোদ ও ক্রিড়া কৌতুকের উদ্দেশ্যে না হতে হবে।

কিন্তু সমস্ত ফুকাহা (ফেকাহ বিশারদ)দের নিকট আমোদ-প্রমোদ ও ক্রিড়া-কৌতুকের উদ্দেশ্যে নির্মিত সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হারাম ও নিষিদ্ধ।

গান-বাদ্য হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল

কুরআন থেকে দলীল ঃ

১. কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بعير علم-

অর্থাৎ, "আর কতক লোক এমন রয়েছে যারা অজ্ঞতা বশতঃ মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট বা ভ্রান্ত করার জন্য গান-বাদ্যকে ক্রয়/অবলম্বন করে।" (সূরাঃ ৩১-লুকমানঃ ৬)

এ আয়াতে 'لهو الحديث' দ্বারা উদ্দেশ্য হল- 'গান-বাদ্য'। এ সম্পর্কে ইব্‌নে আবি শাইবা, ইব্‌নে আবিদ্দুনিয়া, ইব্‌নে জারীর, ইবনুল মুনযির এবং হাকিম ও বায়হাকী সহীহ সনদে আবুস সাহ্‌বা থেকে বর্ণনা করেন ঃ

قال سألت عبد الله بن مسعودؓ من قوله تعالى- "ومن الناس من يشترى لهو الحيديث" قال والله الغناء- (تفسير روح المعانى جـ١١ صـ ٦٧)

অর্থাৎ, আবুস সাহ্‌বা বলেনঃ আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ)কে কুরআনের এ আয়াত 'ومن الناس من يشترى لهو الحديث' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি (আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ [রাঃ]) উত্তরে বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র কসম, গান-বাদ্যই হল لهو الحديث - ।

উক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)ও করেছেন। তিনি বলেছেনঃ 'لهو الحديث' হল- গান এবং গান জাতীয় ক্রিড়া-কৌতুক। (تفسير روح المعانى جـ١١ صـ ٦٧) অন্যান্য মুফাস্‌সিরীনে কেরামও উক্ত আয়াতের এ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হল যে, গান-বাদ্য হারাম।

২. আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের অন্য স্থানে ইরশাদ করেছেন ঃ

واستفزز من استطعت منهم بصوتك -.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'তুই তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস "তোর আওয়াজ" দ্বারা সত্যচ্যুত কর।' (সূরাঃ ১৭-বানী ইসরাঈলঃ ৬৪)

বিশিষ্ট তাফসীর কারক আল্লামা মুজাহিদ (রহঃ) "শয়তানের আওয়াজ"-এর ব্যাখ্যা করেছেন গান-বাদ্য ও অনর্থক ক্রিড়া-কৌতুক দ্বারা। (تفسير روح المعانى جـ٨ صـ ٦٧) সুতরাং যে গান-বাদ্য শয়তানের আওয়াজ তা কক্ষনো শরী'আতে বৈধ হতে পারে না।

৩. কুরআনে কারীমে অনেক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ-

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون -

অর্থাৎ, তোমরা কি এই বিষয়ে (কুরআনে কারীমে) আশ্চর্যবোধ করছ ? (অস্বীকার করছ?) এবং হাসছ (ঠাট্টা স্বরূপ) ক্রন্দন করছ না (নিজেদের সীমা লংঘনের কারণে)? আর তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ? (তথা গান-বাদ্য বাজিয়ে মানুষকে কুরআন থেকে বিমূখ করছ?) (সূরাঃ ৫৩-নাজ্‌মঃ ৫৯-৬১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ উবায়দা বলেন ঃ

السمود الغناء بلغة حمير - (تفسير روح المعانى جـ١٤ صـ ٦٧)

অর্থাৎ, হিময়ারীদের পরিভাষা অনুযায়ী السمود হল গান-বাদ্য। যেমন তারা বলে থাকে - غنى لنا - হে খুকি! গান শুনাওতো। অর্থাৎ, يا جارية اسمدى لنا

ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও سمود-এর অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন- هو الغناء باليمانية অর্থাৎ, ইয়ামানী ভাষায় এর অর্থ হল গান। (প্রাগুক্ত)

উপরোক্ত আয়াতে গান-বাদ্য বাজিয়ে মানুষকে কুরআন থেকে বিমূখ করার দরুন আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক কড়া ধমক প্রদত্ত হয়েছে, যা গান-বাদ্য নিষিদ্ধ হওয়াকেই বুঝায়।

সুতরাং পুর্বোল্লেখিত আয়াতত্রয় দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, গান-বাদ্য হারাম। সূফী সম্রাট শায়খ সোহরওয়ার্দী (রহঃ)ও স্বরচিত عوارف المعارف য়ে উপরোক্ত আয়াতত্রয় দ্বারা গানের নিষিদ্ধতার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন।

হাদীছ থেকে দলীল ঃ

গান-বাদ্যের নিষিদ্ধতা ও অসারতার উপর অসংখ্য হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদীছ নিম্নে প্রদান করা হল।

১. হযরত আবূ মালিক/আবূ আমের আশআরী (রাঃ)- مرفوعا বর্ণনা করেন ঃ

ليكونن من امتى اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف - (صحيح بخارى جـ٢ صـ ٨٣٧)

অর্থাৎ, আমার উম্মতের মাঝে এমন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ এবং গান-বাদ্যকে হালাল মনে করবে।

২. সুনানের মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل - (تفسير روح المعانى جـ١١ صـ ٦٧)

অর্থাৎ নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ গান-বাদ্য মানুষের অন্তরে নেফাক বা কপটতা উৎপন্ন করে, যেমনিভাবে পানি যমিনে শষ্যাদি উৎপন্ন করে।

৩. হযরত আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ما رفع احد صوته بغناء الا بعث الله تعالى اليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان باعقابها على صدره حتى يمسك -

(المصدر السابق)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ যখনই কেউ গান শুরু করে, তখনই আল্লাহ তা'আলা তার নিকট দুই শয়তান প্রেরণ করেন। শয়তানদ্বয় তার কাঁধের উপর আরোহন করে পা দ্বারা তার বক্ষে (আনন্দচ্ছলে) আঘাত করতে থাকে- যতক্ষণ না সে গান থেকে বিরত হয়।

৪. হযরত ইমরান ইব্নে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فى هذه الامة خسف ومسخ وقذف - فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ! ومتى ذلك ؟ قال اذا ظهرت القيان والمعازف وشرب الخمور - (ترمذى جـ٢ صـ ٥٤)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ এ উম্মতের মাঝে ভূমিধস, চেহারার বিকৃতি ও প্রস্তুর বর্ষণ হবে। তখন জনৈক সাহাবা প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রাসূল! কখন এমনটি হবে? উত্তরে নবী (সাঃ) বললেন যখন তাদের মাঝে গায়িকা, বাদ্যযন্ত্র এবং মদ্যপানের প্রবর্তন ঘটবে।

৫. হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

ان النبى صلى الله عليه وسلم - بعثت بهدم المزامير والطبل - (الجامع لاحكام القرآن صـ٥٣)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি যাবতীয় বাদ্য-যন্ত্র ও ঢোল নিষিদ্ধ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।

৬. হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعثت بكسر المزامير- (المصدر السابق)

অর্থাৎ,নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেনঃ আমি যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রকে ভেংগে ফেলার জন্য প্রেরিত হয়েছি।

৭. হযরত মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فادخل اصبعيه فى اذنيه ، ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاث مرات - ثم قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - (ابن ماجه صـ ١٣٧)

অর্থাৎ, আমি ইব্নে উমরের (রাঃ) সাথে ছিলাম। তিনি তবলার আওয়াজ পেয়ে, দু' কানে আঙ্গুল দিলেন। অতঃপর কিছুটা সরে দাঁড়ালেন। এরূপ তিনবার করার পর বললেন ঃ নবী করীম (সাঃ) এরূপ করেছেন।

গানবাদ্যের বৈধতার দাবিদার বিদআতীদের কতিপয় দলীল/প্রমাণ ও তার উত্তর

১ ম দলীলঃ

عن الربيع بنت معوذ قالت : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على غداة بنى بى فجلس على فراشى كمجلسك منى وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من ابائى يوم بدر الى ان قالت احداهن : وفينا نبى يعلم ما فى غد - فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسكتى عن هذه وقولى التى كنت تقولين قبلها -

(بخارى جـ٢ صـ ٧٧٣ وترمذى)

অর্থাৎ, রুবাইয়্যি' বিন্তে মুআওয়্যিজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন ঃ স্বামীর ঘরে আমার প্রবেশের দিবসে নবী করীম (সাঃ) আসলেন এবং আমার বিছানার উপর এমন ভাবে বসলেন যেমন তুমি আমার কাছে বসেছ। তখন আমাদের গোত্রের ছোট ছোট মেয়েরা দুফ বাজাচ্ছিল। আর বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী আমাদের পূর্ব পুরুষদের সৌর্য বীর্য সম্বলিত কাব্য পাঠ করছিল। এক পর্যায়ে তাদের একজন বলে উঠল- আমাদের মাঝে এমন একজন নবী রয়েছেন যিনি ভবিষ্যতের খবর জানেন। তখন নবী করীম (সাঃ) তাকে বললেন, "এমন কথা বলো না বরং পূর্বে যেকথা বলছিলে তা-ই বলতে থাকো"।

খণ্ডন ঃ

এ হাদীছে বিবাহের অনুষ্ঠানে- দুফ বা তাম্বুরা বাজিয়ে পূর্বসূরীদের শৌর্য বীর্য মূলক কবিতা আবৃতির কথা এসেছে। এটা প্রচলিত গান নয়। আর শরী'আতে খুশির অনুষ্ঠানে- দুফ বাজানোর অনুমতি রয়েছে। তবে শর্ত হল দুফের মাঝে ঝাঁঝ- না থাকতে হবে।

দুফের ব্যাপারে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেনঃ

المراد الدف الذى كان فى زمان المتقدمين واما ما عليه الجلاجل فينبغى ان يكون مكروها بالاتفاق -

অর্থাৎ, উপরোক্ত হাদীছে দুফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুতাকাদ্দিমীনের (পূর্ববর্তী যুগের) দুফ (যাতে ঝাঁঝ ছিল না)। আর যে দুফের মাঝে ঝাঁঝ রয়েছে তা ব্যবহার করা সর্ব সম্মতিক্রমে মাকরূহ বা অপছন্দনীয়।

সুতরাং কবিতা পাঠের শর্তত্রয় যথাযথ রেয়ায়েত করার পর শুধু আনন্দ খুশীর অনুষ্ঠানে ঝাঁঝ বিহীন দুফ বাজিয়ে কবিতা পাঠ করা জায়েয আছে বিধায় উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা বাদ্যযন্ত্র ও গানের বৈধতার উপর প্রমাণ পেশের কোন অবকাশ নেই।

২য় দলীল ঃ

গান-বাদ্যের বৈধতার স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীছটি দ্বারাও প্রমাণ পেশ করা হয়ে থাকে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ

قالت دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وعندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل ابو بكرؓ فانتهرنى وقال مزمار الشيطان عند النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دعهما - فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد - (صحيح بخارى جـ١ صـ ١٣٠ و صحيح مسلم)

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম (সাঃ) আমার নিকট আসলেন। তখন ছোট ছোট দুই বালিকা আমার নিকট বু'আছের যুদ্ধ সম্পর্কীয় কবিতা পাঠ করছিল। হুজুর (সাঃ) বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আর চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। এমন সময় আবূ বকর (রাঃ) আসলেন এবং (মেয়েদের এ কবিতা পাঠের দরুন) আমাকে ধমক দিয়ে বললেন নবী কারীম (সাঃ)-এর নিকট শয়তানের গান ? তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ এদেরকে ছেড়ে দিন। অতঃপর যখন তিনি অন্যমনা হলেন, তখন আমি মেয়েদেরকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করলাম। আর সেদিনটি ছিল ঈদের দিন।

بغناء بعاث শব্দ থেকেও পরিষ্কার বোঝা যায় এটা কোন প্রচলিত গান নয় বরং এটা ছিল 'বু'আছ'-যুদ্ধ সংক্রান্ত স্বপক্ষের কীর্তিগাথা ও প্রতিপক্ষের নিন্দা কাব্য।

খণ্ডন ঃ

এখানে খুশির দিবসে মেয়েদুটি বাদ্য-যন্ত্র বিহীন কিংবা দুফ (ঝাঁঝ বিহীন) বাজিয়ে কবিতা পাঠ করছিল, যা শরী'আতে বৈধ। (দ্রঃ পূর্বের হাদীছের জওয়াব) এছাড়া এ হাদীছে উক্ত বালিকাদ্বয় যে প্রচলিত গান করছিল না- তার প্রমাণ হল নিম্নোক্ত হাদীছ ঃ

عن عائشة قالت : دخل على ابو بكر وعندى جاريتان من جوار الانصار تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بعاث - قالت وليستا بمغنيتين. الخ -

উপরোল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এ হাদীছটিতে تغنيان শব্দদ্বয় উদ্ভূত সন্দেহটিকে দূর করে দিয়েছেন। এ হাদীছে তিনি পূর্বোল্লেখিত মেয়ে দুটির ব্যাপারে বলেছেন- 'وليستا بمغنيتين' অর্থাৎ, মেয়ে দুটি গায়িকা ছিল না অর্থাৎ, তারা গান করা জানত না, তাই তারা যা পাঠ করছিল তা গান ছিল না বরং তা ছিল কবিতা পাঠ- যাকে রূপকার্থে تغنيان (গাইছিল) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে হাদীছের যত স্থানে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে غنى -يغنى শব্দের ব্যবহার হয়েছে সে সকল স্থানে غناء-এর প্রথম অর্থ- 'কবিতা পাঠ করা' উদ্দেশ্য। কেননা নবী করীম (সাঃ) অসংখ্য হাদীছে গান নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম

গান ও গান বাদ্যকে চরম ভাবে ঘৃনা করতেন। তবে কখনো তাঁরা বাদ্যযন্ত্র বিহীন বৈধ কবিতা পাঠ করতেন এবং শুনতেন। আর সাহাবায়ে কেরামের এ কাজটিকেই সাহাবায়ে কেরাম গান করতেন ও শুনতেন বলে বাতিলপন্থীরা অপপ্রচার করে গান-বাদ্যের সপক্ষে দলীল দেয়ার হীন প্রয়াস চালিয়েছে।

৩য় দলীল ঃ

তারা নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারাও দলীল পেশ করে থাকে ঃ

عن عائشةؓ انها زفت امرأة الى رجل من الا نصار فقال النبى صلى الله عليه وسلم يا عائشة ! ماكان معكم لهو؟ فان الا نصارى يعجبهم اللهو- (بخارى جـ٣ صـ ٧٧٥)

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি এক দুলহানকে তার আনসারী স্বামীর ঘরে পাঠালেন। তখন নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ হে আয়েশা! তোমাদের কি বিনোদনমূলক কবিতা পাঠক ছিল না? আনসাররা প্রমোদ ও বিনোদনমূলক কবিতা ভালবাসে।

বাতিলপন্থীরা দাবী করে যে, এ হাদীছে ব্যবহৃত لهو শব্দটি ব্যাপক। সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র ও গান-এর অন্তর্ভুক্ত।

খণ্ডন ঃ

বাতিলপন্থীদের এ দাবীর উত্তর হল- এখানে لهو দ্বারা বাদ্যযন্ত্র বিহীন প্রমোদ ও বিনোদনমূলক কবিতা (গযল) পাঠ উদ্দেশ্য। যা বুঝা যায় 'ইব্নে মাজা'-এর ১৩৭ নং পৃষ্ঠার বর্ণনা থেকে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

أرسلتم معها من يغنى؟ قالت لا - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الانصار قوم غزل فلو بعثتم معها من يقول :

أتيناكم أتيناكم ÷ فحيانا وحياكم -

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা কি কনের সাথে ছোট ছোট মেয়ে প্রেরণ করেছ? কেননা আনসাররা গযলপ্রিয়, তাই এরা গিয়ে (গযল পাঠ করত এবং) বলত ঃ

أتيناكم أتيناكم ÷ فحيانا وحياكم -

অর্থাৎ, এসেছি আমরা এসেছি; তিনি দীর্ঘজীবী করেন আমাদেরকে এবং দীর্ঘজীবী করেন তোমাদেরকে।

আল্লামা ইব্নে হাজার আসকলানী (রহঃ)ও বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ-ফতহুল বারীতে উপরোক্ত হাদীছের এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

সুতরাং পুর্বোল্লেখিত হাদীছ দ্বারা শুধু বৈধ কবিতা পাঠের প্রমাণ পাওয়া যায়। অথবা বেশির থেকে বেশী দুফ বাজিয়ে কবিতা পাঠ করার প্রমাণ পেশ করা যায়, যা

শরী'আতে অনুমোদিত। কিন্তু উক্ত হাদীছ দ্বারা গান-বাদ্যের স্বপক্ষে দলীল পেশ করার কোন অবকাশ নেই।

বস্তুতঃ বাতিলপন্থীরা যে সকল হাদীছ, আছার ও আইম্মায়ে কেরামের উক্তি দ্বারা গান-বাদ্যের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেছেন, সেগুলোতে তারা হয়ত জলজ্যান্ত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে,, নয়তো অপব্যাখ্যা ও মন গড়া ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, কিংবা তারা ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়েছেন।

সামা' (سماع) প্রসঙ্গ

সামা'র পরিচয়ঃ

সামা' (سماع)-এর আভিধানিক অর্থ শ্রবণ করা, গান, ধর্ম সঙ্গীত। পরিভাষায় সামা' বলা হয় -

كل ما التذ به الاذن من صوت حسن- (قواعد الفقه)

ঐ শ্রুতি মধুর আওয়াজ, যদ্বারা কর্ণ পুলক অনুভব করে।

سماع-এর সংজ্ঞা এভাবেও দেয়া হয়েছে -

وسماع آوازے را گویند کہ بے آلات (مزامیر ومعازف) باشد - (بوادر النوادر از درالمعارف)

অর্থাৎ, সামা' বলা হয় বাদ্যযন্ত্র ও বাঁশি বিহীন সুর সঙ্গীতকে।

সামা'-র হুকুম ঃ

ইমাম গাযালী (রহঃ) বর্ণনা করেন, কাজী আবুত্তায়্যিব (রহঃ) সামা'র ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ), ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম শাফিঈ (রহঃ), ইমাম সুফিয়ান (রহঃ) থেকে এমন শব্দ বর্ণনা করেছেন যা থেকে বোঝা যায় এসব ইমামগণের নিকট সামা' হারাম।[১]

بوادر النوادر (বাওয়াদিরুন নাওয়াদির) নামক গ্রন্থে সামা' সম্পর্কে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)-এর ব্যাপক অর্থবোধক ছোট একটি উক্তি পেশ করা হয়েছে। তাহল-

کہ مبتدی را نقصان است ومنتہی را حاجت نیست

অর্থাৎ, সুলূকের লাইনে প্রাথমিক পর্যায়ের যারা, সামা' তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আর যারা এ লাইনে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে, তাদের জন্য নিঃপ্রয়োজনীয়।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

انه سئل عن السماع - فقال هو ضلال للمبتدى والمنتهى لا يحتاج اليه - (تفسير روح المعانى جـ/١١ صـ ٧٢)

অর্থাৎ, সুলূকের লাইনে প্রাথমিক পর্যায়ের যারা, সামা' তাদের জন্য অত্যন্ত গোমরাহী। আর যারা এ লাইনে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে, তাদের জন্য নিঃপ্রয়োজনীয়।

১. حق السماع صـ ٣ ॥

ইমাম গাযালী (রহঃ) احياء علوم الدين গ্রন্থে পাঁচটি শর্ত পুরণ করা এবং পাঁচটি অন্তরায় থেকে বেঁচে থাকার শর্তে সামা'কে মুবাহ বলেছেন।[১] যে পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হবে তা হল ঃ

১. সঙ্গী, স্থান ও কাল-এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখার অর্থ হল সামা' এমন স্থানে হতে হবে যাতে লোক চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে এবং হট্টগোল না হয়। আর কাল বা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার অর্থ হল এমন সময়ে সামা না করা যাতে শরঈ বা তবয়ী কোন কাজের ব্যাঘাত ঘটে।
২. এমন মুরীদের সম্মুখে সামা' শুনা যাবে না, যাদের জন্য সামা' ক্ষতিকর। এমন মুরীদ তিন প্রকার। (বিস্তারিত জানার জন্য দ্রঃ حق السماع)
৩. অত্যন্ত মনোযোগিতার সাথে কান লাগিয়ে শুনতে হবে। এদিক সেদিক দৃষ্টি দেয়াযাবে না এমনকি সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের দিকেও দৃষ্টি দেয়া যাবে না।
৪. দাঁড়িয়ে জোর আওয়াজে চিৎকার করতে পারবে না।
৫. যদি কোন সাদিকুলহাল ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সকলে তার অনুসরণ করবে।

আর যে পাঁচটি অন্তরায় থেকে বেঁচে থাকতে হবে তা হল ঃ

১. যে শোনাবে সে গায়রে মাহ্‌রাম মহিলা না হতে হবে এবং দাড়িবিহীন বালক না হতে হবে।
২. যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং মদ ইত্যাদি না হতে হবে।[২]
৩. সামা'র বিষয়বস্তু অশালীন, কামোদ্দীপক ও শির্‌ক মিশ্রিত হতে পারবে না।
৪. যৌবনের প্রাবল্য না থাকা। সুতরাং যার মাঝে যৌবনের তেজ এবং যৌন উত্তেজনার প্রাবল্য বিদ্যমান, তার জন্য সর্বাবস্থায় সামা' হারাম।
৫. সামা' শ্রবণকারী ব্যক্তি দ্বীনী জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মানুষ (عوام الناس) না হতে হবে।

শায়খ আবূ আব্দির রহমান সুলামী বলেন ঃ আমি আমার দাদাকে বলতে শুনেছি- সামা' শ্রবণকারী কলব বা অন্তরকে জিন্দা আর নফ্‌স তথা প্রবৃত্তিকে মৃত করে নিবে। এর বিপরীত ঘটলে সামা' শ্রবণ করা হারাম। আর কলব জিন্দা হয় কলবের গুণাবলী উজ্জীবিত করা দ্বারা এবং নফ্‌সের মৃত্যু হয় নফ্‌সের স্বভাবজাত চাহিদাগুলি দমন করা দ্বারা। কলবের

১. ভণ্ড পীর-ফকীরগণ ইমাম গাযালী (রহঃ) সামাকে জায়েয বলেছেন - এ কথাটি অত্যন্ত ফলাও করে প্রচার করে থাকেন, কিন্তু তিনি যেসব শর্ত বলেছেন, সেগুলোর উল্লেখ তারা করেন না। বস্তুত ঃ তিনি যে সব শর্তারোপ করেছেন, তার আলোকে ঐ সব ভণ্ড পীর-ফকীরদের আচরিত সামা'কে কোনক্রমেই বৈধ বলা যায় না ॥

২. আল্লামা তাহের পাটনীও অনুরূপ বলেছেন ঃ

وما احدثه المتصوفة من السماع بالات فلا خلاف فى تحريمه - (مجمع بحار الانوار جـ/٤. صـ/٧١)

অর্থাৎ, সূফীগণ বাদ্য-যন্ত্র সহকারে যে সামা'-র উদ্ভব ঘটিয়েছেন, তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই ॥

গুণাবলী হল ঃ ইল্‌ম, ইয়াকীন, শোক্‌র, যিক্‌র, খাশিয়্যাত বা খোদাভীতি, খোদাপ্রেম প্রভৃতি। আর নফসের স্বভাবজাত চাহিদা হল কাম, ক্রোধ, অহংকার, হিংসা, পরশ্রী-কাতরতা, সম্মানপ্রীতি প্রভৃতি।

বলা বাহুল্য- বর্তমান যমানার বে-শরা ফকীরদের মাঝে পূর্বোল্লেখিত ৫টি শর্তের একটিও পাওয়া যায় না। আবার সামা'র অন্তরায় ৫টি বিষয়ের সবগুলোই তাদের মাঝে পাওয়া যায়। তাই রদ্দুল মুহ্‌তারে (শামীতে) বলা হয়েছে ঃ

وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس اليه ومن قبلهم لم يفعل كذالك -

অর্থাৎ, আমাদের যামানার বে-শরা ফকীররা যা করে থাকে তা সম্পূর্ণ হারাম। তাদের অনুষ্ঠানে যাওয়ার ইচ্ছা করা এবং সেখানে বসা জায়েয নেই। আর (তারা পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন গান-বাদ্য করেছেন বলে যে বরাত দিয়ে থাকেন তা সঠিক নয়।) পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন কখনও তাদের মত গান-বাদ্য করেননি।

ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম হুলওয়ানী (রহঃ) কে স্বঘোষিত মা'রেফতী ফকীরদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এই উত্তরই প্রদান করেছেন।[১]

আল্লামা ইবনুস সালাহ তার ফতওয়ায় দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন ঃ

فاذن هذا السماع حرام باجماع اهل الحل والعقد من المسلمين - (تفسير روح المعانى جـ/١١. صـ/٦٩)

অর্থাৎ, মুসলমানদের সকল ইমামের সর্ব সম্মত মতে এই সামা' হারাম।

"ফতওয়ায়ে শামীতে 'সামা'র' শর্ত সমূহ বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে-

والحاصل انه لا رخصة فى السماع فى زماننا لان الجنيدؒ تاب عن السماع فى زمانه - (رد المحتار جـ/٥. صـ/٢٣٠)

অর্থাৎ, মোটকথা - আমাদের যামানায় সামা'র কোন অনুমতি নেই। যেহেতু হযরত জুনাইদ (রহঃ) তার যুগে সামা' থেকে তওবা করেছেন।

সারকথা- সামা' মুবাহ হওয়ার ক্ষেত্রেই মতানৈক্য রয়েছে। বহু মনীষী স্বমূলেই সামা'কে নাজায়েয বলেছেন। যারা সামা'কে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে মুবাহ বলেছেন, তারা এমন সব শর্তারোপ করেছেন যা এ যামানায় পালিত হচ্ছে না। সাম্প্রতিক কালের বাস্তব অবস্থা হল বে-শরা ফকীররা গান-বাদ্য ও নারী সমন্বিত নাচ-গানের আসরকে বুযুর্গানে দ্বীন কর্তৃক চর্চিত সামা' বলে চালিয়ে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং এই সামা'কে তারা ইবাদত ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায় বলে মনে করছে। এভাবে তারা একদিকে

১. ॥ عالمگیری جـ/٤ صـ ١١٠

বুযুর্গদের প্রতি মিথ্যা নেছবত প্রদান করে চলেছে, অপরদিকে তারা দ্বিগুণ পাপে জর্জরিত হচ্ছে। প্রথমতঃ হারাম করার কাজ করার পাপ, দ্বিতীয়তঃ সেই হারাম কাজকে ইবাদত মনে করার পাপ। সুতরাং বর্তমান যুগের প্রচলিত সামা' সর্বশ্রেণীর উলামায়ে কেরামের মতে সন্দেহাতীত ভাবেই হারাম এবং কবীরা গুনাহ্‌।

মীলাদ মাহফিল প্রসঙ্গ

মীলাদ বা মীলাদ-মাহ্‌ফিলের অর্থ ঃ

মীলাদ (ميلاد)-এর আভিধানিক অর্থ জন্ম, জন্মকাল ও জন্মতারিখ। পরিভাষায় মীলাদ বা মীলাদ-মাহ্‌ফিল বলতে বোঝায় রাসূল (সাঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা বা জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনার মজলিস। তবে আমাদের দেশের প্রচলিত মীলাদ মাহ্‌ফিল বলতে সাধারণতঃ বোঝায় ঐ সব অনুষ্ঠান, যেখানে মওজূ' রেওয়ায়েত সম্বলিত তাওয়ালূদ[১] পাঠ করা হয়, রাসূল (সাঃ)-এর প্রশংসা মূলক বিভিন্ন কসীদা পাঠ করা হয় ও সমস্বরে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয় এবং অনেক স্থানে দুরূদ পাঠ করার সময় রাসূল (সাঃ) মজলিসে হাজির-নাজির হয়ে যান -এই বিশ্বাসে কেয়ামও করা হয়। এসব করা হলে রাসূল (সাঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা হোক বা না হোক সেটাকে মীলাদ মাহফিল মনে করা হয়। আর এসব না হলে অর্থাৎ, তাওয়ালূদ পাঠ না হলে, সমস্বরে দুরূদ পাঠ না হলে সেটাকে মীলাদ মনে করা হয় না চাই সে মজলিসে রাসূল (সাঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে যতই আলোচনা করা হোক না কেন। তাই প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল আর সত্যিকার পারিভাষিক মীলাদ-মাহ্‌ফিল তথা নবী করীম (সাঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনার মাহফিল আমাদের সমাজে দুটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

মীলাদ-মাহ্‌ফিলের হুকুম ঃ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের দেশে প্রচলিত মীলাদ মাহফিল আর প্রকৃত মীলাদ-মাহ্‌ফিল তথা নবী করীম (সাঃ)-এর বরকতময় জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা দুটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেমতে প্রচলিত মীলাদ মাহফিল বিদ'আত আর প্রকৃত মীলাদ-মাহ্‌ফিল তথা রাসূল (সাঃ)-এর বরকতময় জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনার মাহফিল মুস্তাহাব।

এ ব্যাপারে ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যার কিতাবুল বিদ'আতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

مجلس مولود مجلس خیر وبرکت ہے در صورتیکہ ان قیودات مذکورہ سے خالی ہو فقط بلا قید وقت معین وبلا قیام وبغیر روایت موضوع مجلس خیر وبرکت ہے صورت موجودہ جو مروج ہے بالکل خلاف شرع ہے اور بدعت ضلالہ ہے۔ (فتاوی رشیدیہ)

১. "তাওয়ালুদ" বলতে বোঝায় الخ . ولما تم من حمله شهران على اشهر الاقوال المرضية পাঠ করা। এর আদ্যোপান্ত বক্তব্য সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় ॥

অর্থাৎ, নবী (সাঃ)-এর জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা সভা অত্যন্ত পূণ্য ও বরকতময় যখন সেটা সব ধরনের প্রচলিত শর্ত-বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। অর্থাৎ, সব ধরনের শর্ত-বন্ধন তথা সময় নির্দিষ্ট করণ, কেয়াম ও জাল রেওয়ায়েত বর্ণনা করণ ইত্যাদি ছাড়া শুধু নবী করীম (সাঃ)-এর জন্ম-বৃত্তান্তের আলোচনা কল্যাণ ও পূণ্যময়। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত মীলাদ সম্পূর্ণ শরী'আত বিরোধী এবং বিদ'আত ও গোমরাহী।

একটি সন্দেহ-নিরসন ঃ

যারা প্রচলিত মীলাদ-মাহ্ফিলের বিরোধিতা করেন, প্রচলিত মীলাদপন্থীদের পক্ষ থেকে তাদের ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি মহব্বত-ভালবাসা তথা নবী প্রেম কম থাকার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়ে থাকে। অতএব এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, নিঃসন্দেহে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা পোষণ করা-প্রকৃত ঈমানের দাবী। আর নবী করীম (সাঃ)-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রের সঠিক বিবরণ এবং নবী (সাঃ)-এর প্রতিটি কথা ও কাজকে বর্ণনা করা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের মহান উপায়। তাই জীবনের এমন কোন মুহূর্ত নেই যখন নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করা নিষেধ। কিন্তু প্রচলিত মীলাদ-মাহফিলের বৈধতার জন্য দুটো বিষয় দেখার রয়েছে ঃ

১. দেখতে হবে প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল নবী করীম (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম এবং খাইরুল কুরূনের কারও থেকে প্রমাণিত কি না? যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে মুসলমানদের এতে কুণ্ঠাবোধ করার কোন অবকাশ নেই। কেননা তারা যা কিছু করেছেন সেটাই দ্বীন। আর যদি প্রমাণিত না হয়, তাহলে তা দ্বীনী কাজ নয় বরং দ্বীন বহির্ভূত গর্হিত কাজ। কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির দীর্ঘ ২৩ বৎসর, খুলাফায়ে রাশেদীনের ও সাহাবায়ে কেরামের সুদীর্ঘ কাল অতঃপর তাবিঈন, তাবে তাবিঈনের সময়কাল সবমিলে ছিল প্রায় ৪০০ বৎসর। নবী প্রেম ছিল তাঁদের মাঝে চরম পর্যায়ের। নবীর প্রতি তাঁদের চাইতে বেশী ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন আর কেউ করতে পারবে না। এতদ্বসত্ত্বেও খাইরুল কুরূণের এ সুদীর্ঘ সময়টিতে-মীলাদ মাহফীল করার কোনই প্রমাণ নেই। এখন প্রশ্ন হল- তাঁদের মাঝে নবী প্রেম চূড়ান্ত পর্যায়ের থাকা সত্ত্বেও বিদ'আতীদের কথিত ও আচরিত বরকতময় অসীম পূণ্যের এ কাজটি তাঁরা কেন করেননি ? নিশ্চয়ই তাঁরা এটাকে পূণ্যের কাজ মনে করেননি। সুতরাং খাইরুল কুরূণে যেটা পূণ্যের কাজ ছিল না সেটা এতদিন পর এসে পূণ্যের কাজ হতে পারে না। নবী করীম (সাঃ) এবং খাইরুল কুরূণ-এর পূণ্যবান ব্যক্তিগণ যা বলেছেন এবং যা করেছেন তাই দ্বীন আর যা তাঁরা বর্জন করেছেন তা দ্বীন বহির্ভূত।

২. প্রচলিত মীলাদ-মাহ্ফিল না করাকে নবী প্রেম না থাকার সমান্তরাল আখ্যায়িত করা ভুল। নবী (সাঃ)কে ভালবাসা বা নবী-প্রেমের পদ্ধতি কি তাও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আর তা হল নবী (সাঃ)-এর সুন্নাতকে ভালবাসা, নবী (সাঃ)-এর সাহাবাকে ভালবাসা,

নবী (সাঃ)-এর দেশের মানুষকে ভালবাসা, নবী (সাঃ) যা ভালবেসেছেন তাই ভালবাসা ইত্যাদি। হাদীছে এগুলোকে ভালবাসাই রাসূলকে ভালবাসা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মীলাদ-মাহফিলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ

৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত কোন সাহাবী, তাবিঈন, তাবে-তাবিঈন, মুহাদ্দিছীন কিংবা কোন ফকীহ ও বুযুর্গ এই মীলাদের প্রচলন করেননি। বরং মুসেল শহরের অপচয়ী ও ধর্মীয় ব্যাপারে উদাসীন বাদশাহ্ মুজাফফরুদ্দীন কুক্রী ইব্নে আরবালের নির্দেশে সর্ব প্রথম ৬০৪ হিজরীতে এই মীলাদ-মাহ্ফিলের সূচনা হয়। এ ব্যাপারে মীলাদের স্বপক্ষে দলীলাদী সম্বলিত কিতাব রচনা করে বাদশাহকে সহযোগিতা করেন দুনিয়ালোভী দরবারী মৌলভী উমার ইব্নে দেহ্ইয়া আবুল খাত্তাব।

এই বাদশার চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ মিসরী মালেকী উল্লেখ করেনঃ

كان ملكا مسرفا يأمرعلماء زمانه ان يعملوا باستنباطهم واجتهادهم وان لا يتبعوا لمذهب غيرهم حتى مالت اليه جماعة من العلماء وطا ئفة من الفضلاء ويحتفل لمولد النبى صلى الله عليه وسلم فى الربيع الاول وهو اول من احدث من الملوك هذا العمل ـ (راوسنت از القول المعتمد فى عمل المولد)

অর্থাৎ, সে ছিল একজন অপচয়ী বাদশাহ। সে তার সময়কার উলামায়ে কেরামকে অন্যের মাযহাব অনুসরণ বর্জন করে নিজ নিজ ইজতিহাদ ও গবেষণা অনুসারে চলার নির্দেশ দিত। আর এতে দুনিয়া পূজারী উলামা ও ফুযালাদের একটি দল তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। সে রবিউল আওয়াল মাসে মীলাদ-মাহফিলের আয়োজন করত। বাদ্শাহদের মাঝে এ-ই সর্ব প্রথম ব্যক্তি যিনি এই বিদ'আতের (মীলাদ মাহফিলের) প্রচলন করেছেন।

এ অপচয়ী বাদশাহ প্রজাদের অন্তরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত রাখার জন্য এই বিদ'আত উৎসবের আয়োজন করত, আর তাতে জাতির বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ অকাতরে অপচয় করত। এ অপচয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লামা যাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ

كان ينفق كل سنة على مولد النبى صلى الله عليه وسلم نحو ثلاث مأة الف ـ (دول الاسلام جـ২/ صـ১০৩)

অর্থাৎ, সে প্রতি বৎসর মীলাদ-মাহফিলে প্রায় তিন লাখ (দেরহাম/দীনার) ব্যয় করত।

দুনিয়ালোভী, দরবারী মৌলভী উমর ইব্নে দেহ্ইয়া আবুল খাত্তাব যিনি মীলাদ মাহফিল ও জশনে জুলুসের স্বপক্ষে দলীল-প্রমাণ সম্বলিত কিতাব রচনা করে বাদশাহর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ কড়ি হাতিয়ে নিয়েছেন, তার ব্যাপারে হাফেজ ইব্নে হাজার আসকলানী (রহঃ) বর্ণনা করেনঃ

كثير الوقيعة فى الائمة وفى السلف من العلماء خبيث [illegible] احمق شديد الكبر قليل النظر فى امور الدين متهاونا ـ (لسان الميزان جـ٤/ صـ ٢٩٦)

অর্থাৎ, সে আইম্মায়ে দ্বীন এবং পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে অত্যন্ত আপত্তিকর ও গালিগালাজ মূলক কথাবার্তা বলত। সে দুষ্টভাষী, আহমক এবং অত্যন্ত অহংকারী ছিল। আর ধর্মীয় ব্যাপারে ছিল চরম উদাসীন।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকলানী আরো বর্ণনা করেনঃ

قال ابن النجار رايت الناس مجتمعين على كذبه وضعفه ـ (لسان الميزان جـ٤/ صـ٢٩٠)

অর্থাৎ, ইব্‌নে নাজ্জার (রহঃ) বলেন ঃ আমি মানুষদেরকে তার (উমার ইবনে দেহ্ইয়া-আবুল খাত্তাব-এর) মিথ্যা ও অবিশ্বাসযোগ্যতার উপর ঐক্যবদ্ধ বা একমত পেয়েছি।

সুতরাং উপরোক্ত বিবরণ থেকে বুঝা গেল মীলাদ মাহফিল প্রচলনকারীদের একজন হলেন প্রতারক, ধূর্তবাজ বাদশাহ, আরেকজন হলেন স্বার্থান্বেষী দুনিয়ালোভী মৌলভী। আর তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন ঐ সকল পীর, সূফী-যারা ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতায় পৌঁছেননি। এ তিন দলের সমন্বিত প্রয়াস ও অপ-প্রচারে সাধারণ জনগণ হয়েছেন বিভ্রান্ত।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) যথার্থই বলেছেন ঃ

وهل افسد الدين الا الملوك ÷ واحبار سوء ورهبانها

অর্থাৎ, রাজা বাদশাহ আর অসৎ পন্ডিত ও সাধুরাই ধর্মকে নষ্ট করে থাকে।

প্রচলিত মীলাদ-মাহ্‌ফিল সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের উক্তি ঃ

তাই সর্বযুগের হক পন্থীরা এবং সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম কঠোর ভাবে এর (মীলাদ মাহফিলের) বিরোধিতা করেছেন এবং বাতিল পন্থীদের সমস্ত ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইব্‌নে তাইমিয়া হাম্বলী (রহঃ) (তার ফাতাওয়ার ১ম খণ্ডের ৩১২ নং পৃষ্ঠায়), ইমাম নাসিরুদ্দিন শাফেঈ رشاد الاخيار গ্রন্থে, মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ) مکتوبات ৫ম খণ্ডের ২২ নং পৃষ্ঠায় এবং ইব্‌নে আমীরুল হাজ্ব মালেকী (রহঃ) সুস্পষ্ট রূপে বিশদ বিশ্লেষণের সাথে এর খণ্ডন করেছেন। আল্লামা ইবনে আমীরুল হাজ্ব মালেকী বর্ণনা করেছেন ঃ

ومن جملة ما احدثوا من البدع مع اعتقادهم ان ذلك من اكبر العبادات واظهار الشعائر ما يفعلونه فى الشهر الربيع الاول من المولد وقد احتوى ذلك على بدع ومحرمات الى ان قال وهذه المفاسد مترتبة على فعل المولد اذا عمل بالسماع فان خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا اليه الاخوان وسلم من كل ما تقدم

ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط لان ذلك زيادة فى الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف اولى (مدخل ابن الحاج مطبوعہ مصر جـ١/ صـ ٨٥)

আল্লামা আব্দুর রহমান মাগরীবী তার ফাতাওয়ায় উল্লেখ করেন ঃ

ان عمل المولد بدعة لم يقل به ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والائمة ـ (كذافى الشرعة الالهية)

অর্থাৎ, মীলাদকর্ম বিদ'আত। রাসূল (সাঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন ও ইমামগণ কেউ এ ব্যাপারে বলেননি এবং তা করেননি।

আল্লামা আহ্‌মদ ইব্‌নে মুহাম্মাদ মিসরী মালেকী (রহঃ) লেখেনঃ

قد اتفق علماء [illegible] المذاهب الاربعة بذم هذا العمل ـ (القول المعتمد)

অর্থাৎ, মাযহাব চতুষ্টয়ের উলামায়ে কেরাম এই কাজ (মীলাদ) নিন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ।

প্রচলিত মীলাদ-পন্থীদের দলীল-প্রমাণ ও তার খণ্ডন ঃ

পূর্বের বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, খাইরুল কুরূণে এই মীলাদ মাহফিলের সূচনা হয়নি। বরং ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পর এর সূচনা হয়েছে। সূচনাকারীদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে যে, তৎকালীন এক বদকার বাদশাহ এর পৃষ্টপোষকতা করেছেন। আর সম্রাটের গৃহীত এই নীতির ফলে সর্ব সাধারণের মাঝে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। এমনকি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গও এই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছেন।

এত কিছুর পর মীলাদের স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তি প্রমাণ না দিতে পেরে প্রসিদ্ধ বিদ'আতী মৌলভী আব্দুস সামাদ সাহেব ও আরো অনেকে নিজেদের আত্ম প্রশান্তি ও অনুসারীদের সান্ত্বনা প্রদানের জন্য তিহাত্তুরজন মনীষীর তালিকা পেশ করেছেন, যারা মীলাদ অনুষ্ঠানকে পছন্দ করতেন।[১]

কিন্তু এ তালিকায় সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছীনে কেরামের নাম নেই। যাদের নাম আছে তাদের অধিকাংশই সূফীয়ায়ে কেরাম। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ)-এর কথা (عمل صوفيه در حل وحرمت سند نيست-অর্থাৎ, হালাল-হারামের ব্যাপারে সূফীদের কথা সনদ নয়।) অনুযায়ী যাদের আমল গ্রহণযোগ্য নয়। আর যে কয়েকজন দার্শনিক আলেম রয়েছেন তারা ভ্রান্ত কিয়াসের শিকার হয়েছেন। আবার অনেকেই শুধু জন্ম বৃত্তান্তের আলোচনাকে استحباب বলেছেন, যেটাকে কেউ অস্বীকার করেন না। প্রচলিত মীলাদের কথা তারা বলেননি।

মুফতী আহমদ ইয়ারখান সাহেব মীলাদের স্বপক্ষে একটি দলীল পেশ করেছেন যে, হারামাইন শরীফাইনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পবিত্র মীলাদ-মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবং যে রাষ্ট্রেই যাবে সেখানেই মুসলমানদের মাঝে এ কাজটি পাবে। বুযুর্গানে দ্বীন এবং

---

১. انوار ساطعه صـ ٢٤٨-٢٥٠ ॥

উলামায়ে কেরাম এর বহু ফযীলত বর্ণনা করেছেন। তাই পবিত্র মীলাদ-মাহফিল মুস্তাহাব। (جاء الحق صـ ٢٢٤) তিনি আরো লিখেছেন- استحباب (মুস্তাহাব হওয়া)-এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মুসলমান কাজটিকে ভাল জানে।"[১]

খণ্ডন ঃ

এই দলীলের উত্তর হল - তখন এ হারামাইন শারীফাইনও ছিল, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তাবে-তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন তাঁরাও ছিলেন। তাঁরা কি মীলাদ মাহফিলের বরকত ও ফযীলত সম্পর্কে অবগত ছিলেন না ?

আর শরী'আতের ভাষ্যসমূহ (نصوص)-এর মাঝে হারামাইন শরীফাইনের অনেক ফযীলত ও মর্যাদার কথা এসেছে। তাই হারামাইন শরীফাইন তথা সেখানকার আমল শরী'আতের কোন দলীল নয়। সেখানে শরী'আত পরিপন্থী কাজের প্রচলনও হয়ে পড়তে পারে। শরী'আতের দলীল মাত্র চারটি তথা কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াস। তাই হারামাইন শরীফাইনে যদি কোন ভাল কাজ হয় তাহলে ভাল نور على نور-। অন্যথায় কক্ষনো তা দলীল হতে পারে না। হারামাইনেও মাঝে মধ্যে অন্যায়কর্ম সংঘটিত হয়েছে তার প্রমাণ রয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এক সময়কার হারামাইন শরীফাইনের অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলেছেনঃ-

فى الحرمين الشريفين شيوع الظلم وكثرة الجهل وقلة العلم وظهور المنكرات وفشوع البدع واكل الحرام والشبهات - (مرقات جـ٣/ صـ ٢٧١)

অর্থাৎ, হারামাইন শারীফাইনের মাঝে অন্যায় অত্যাচার ব্যাপকতা লাভ করেছে, অজ্ঞতা বেড়ে গেছে, ইল্‌ম কমে গেছে, অপ্রীতিকর কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে, বিদ'আত প্রসার লাভ করেছে, হারাম খাওয়া হচ্ছে. দ্বীনি শুবুহাত বেড়ে গেছে।

অতএব হারামাইন শরীফাইন দলীল হতে পারে না। আর মুফতী আহ্‌মদ ইয়ার খান সাহেব বলেছেন ঃ মুস্তাহাব হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মুসলমান সেটাকে ভাল জানে। অথচ মুস্তাহাব তো অনেক উঁচু জিনিস, বরং اباحت (মোবাহ হওয়াটা)ও শরী'আতের একটি হুকুম- যা নবী করীম (সাঃ) এর কথা বা কাজ ছাড়া ثابت (প্রমাণিত) হয় না।

এ ব্যাপারে আল্লামা শামী (রহঃ) লিখেছেনঃ

الندب حكم شرعى لا بد له من دليل - (رد المحتار)

অর্থাৎ, استحباب (মুস্তাহাব হওয়া) শরী'আতের একটি হুকুম। তাই তার জন্য দলীলের প্রয়োজন রয়েছে।

সারকথা উপরের এই সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল বিদ'আত এবং দ্বীন-বহির্ভূত বিষয়। তবে রাসূল (সাঃ)-এর বরকতময় জন্ম-বৃত্তান্ত এবং তাঁর আদর্শ আলোচনার মজলিস মোস্তাহাব ও উত্তম।

১. جاء الحق صـ ٢٢٧ ॥

মীলাদে কেয়াম করা প্রসংঙ্গ

কেয়াম কাকে বলে ঃ

"কেয়াম" (قيام) শব্দের আভিধানিক অর্থ দাঁড়ানো। আর মুআশারা তথা সমাজ-সামাজিকতার পরিভাষায় "কেয়াম" বলতে বোঝায় কারও আগমনে দাঁড়ানো। আর মীলাদ প্রসঙ্গে উল্লেখিত "কেয়াম" দ্বারা বোঝানো হয় বিশেষ ধরনের কসীদা পাঠ করার পর রাসূল (সাঃ) মজলিসে হাজির হয়ে গেছেন ধারণায় "ইয়া নবী ....." বলার সময় দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুরূদ শরীফ পাঠ করা।

সমাজ-সামাজিকতায় কেয়াম-এর হুকুম ঃ

কোন বুযুর্গ তথা সম্মানী ব্যক্তি যখন স্বশরীরে আগমন করেন, তখন কোন কোন মুহূর্তে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি ছাড়া ক্বেয়াম করা (আগন্তুক ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া) বৈধ। এ ব্যাপারে ইমাম নববী (রহঃ) 'قوموا الى سيدكم' (অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের নেতার কাছে গিয়ে দাঁড়াও।) হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এভাবে যে, হযরত সাআদ ইব্‌নে মু'আয (রাঃ) আঘাতপ্রাপ্ত ছিলেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে গাধার পিঠ থেকে নামানোর জন্য সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন। সেমতে তাঁরা তাঁকে গাধার পিঠ থেকে নামানোর জন্য মজলিস থেকে উঠেছিলেন। এটা কোন সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে দাঁড়ানো নয়। এ ব্যাপারে মুসনাদে আহমদের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

قوموا الى سيدكم فانزلوه من الحمار- (مسند احمد)

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের নেতার কাছে গিয়ে দাঁড়াও তাঁকে গাধার পিঠ থেকে নামাও। এজন্যই الى سيدكم "তোমাদের নেতার কাছে" কথাটা বলেছেন- 'لسيدكم' "নেতার জন্য" কথাটা বলেননি।

যাহোক উপরোক্ত হাদীছ অকাট্য অর্থবোধক না হওয়ায় এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের আমল কি ছিল এবং নবী করীম (সাঃ) কোন আমলটিকে পছন্দ করতেন, তা দেখা দরকার এবং সেটাই হবে আমাদের আমল। আর এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে জানা যায় হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা ঃ

لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك - (رواه الترمذى جـ٢/ صـ ١٠٠ وقال هذا حديث حسن صحيح ومشكوة جـ٢/ صـ ٤٠٣ ومسند احمد جـ٣/ صـ ١٥١ وادب المفرد صـ ١٣٨)

অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরামের কাছে নবী করীম (সাঃ)-এর জাত মোবারকের চাইতে বড় সম্মানের ও প্রিয় এ দুনিয়াতে আর কোন কিছুই ছিল না, এতদসত্ত্বেও তাঁরা নবী করীম (সাঃ) কে দেখলে ক্বেয়াম করতেন না। যেহেতু তারা জানতেন নবী করীম (সাঃ) এ কাজটিকে (কারো সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া/কেয়াম করাকে) অপছন্দ করেন।

মীলাদে কেয়াম-এর হুকুম ঃ

পূর্বে উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) নিজের জন্য কেয়াম করাকে অপছন্দ করতেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি চরম ভালবাসা ও মহব্বত পোষণ করা সত্ত্বেও নবী করীম (সাঃ) যখন স্বশরীরে উপস্থিত হতেন তখন তাঁকে দেখতে পেয়েও তাঁরা দাঁড়াতেন না। তাই মীলাদ-মাহ্ফিলে রাসূল (সাঃ)-এর নাম আসলে যদি মেনে নেয়া হয় যে, তিনি হাজির হয়ে যান তবুও কেয়াম করা যাবে না। কেননা নবী করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়ও তাঁর জন্য কেয়াম করা হত না এবং তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে কেয়াম করা তথা দাঁড়িয়ে যাওয়াকে পছন্দও করতেন না। তদুপরি মীলাদ মাহফিলে রাসূল (সাঃ)-এর নাম আসলে সেখানে রাসূল (সাঃ)-এর আগমন ঘটে এটা শরী'আতের কোন দলীল দ্বারাও প্রমাণিত নয়। বরং রাসূল (সাঃ)-এর উদ্দেশ্যে দুরূদ পাঠ করা হলে তিনি সেখানে হাজির হন না বরং নির্ধারিত ফেরেশ্তা রাসূল (সাঃ)-এর কাছে সে দুরূদ পৌঁছে দেন - এ কথা স্পষ্টতঃ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে ঃ

صلوا على فان صلا تكم تُبَلِّغُنِى حيث كنتم - (مشكاة عن النسائى)

অর্থাৎ, তোমরা আমার প্রতি দুরূদ পাঠ কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের সে দুরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হবে। অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছেঃ

ان لله ملئكة سياحين فى الارض يبلغونى من امتى السلام - (مشكاة عن النسائى والدارمى)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক দল ফেরেশ্তা নিযুক্ত আছেন, যারা সারা পৃথিবীতে পরিভ্রমন করেন। আমার উম্মতের পক্ষ থেকে দুরূদ সালাম যা পাঠ করা হয় তারা সেগুলো আমার কাছে পৌঁছে দেন।

কেয়াম সম্বন্ধে বিদ'আতীদের বক্তব্য ও তার খণ্ডন ঃ

বিদ'আতীদের বক্তব্য হল মীলাদ-মাহ্ফিলে রাসূল (সাঃ)-এর নাম আসলে তিনি মজলিসে হাজির হয়ে যান। তাই তাঁর সম্মানার্থে কেয়াম করতে হবে অর্থাৎ, দাঁড়িয়ে যেতে হবে। বিদ'আতীগণ এই কেয়াম করাকে জায়েয এবং মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য করেন। এমনকি তারা এটাকে ওয়াজিব ও ফরয বলেও আখ্যায়িত করেন। আর কেয়াম না করনে ওয়ালাদেরকে কাফের পর্যন্ত বলা হয়। বরাত একটু পূর্বেই উল্লেখ করছি।

খণ্ডন ঃ

পূর্বোল্লিখিত হাদীছে স্পষ্টতঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, তাঁর কাছে দুরূদ সালাম পৌঁছে দেয়া হয়, তিনি হাজির হন না। অথচ বিদ'আতীগণ বলছেন তার বিপরীত। হাদীছে বর্ণিত আকীদার বিপরীত কোন বিষয় কিভাবে মুস্তাহাব এমনকি ফরয হয়ে যায় তা বোধগম্য নয়। আর যারা হাদীছে বর্ণিত আকীদা মোতাবেক মীলাদের মজলিসে রাসূল

(সাঃ)-এর হাজির না হওয়ার আকীদা রাখেন, তারা কিভাবে কাফের হয়ে যান তা আরও অবোধগম্য বৈ কি ? যারা কুরআন-হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক আকীদা পোষণ করেন তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা, পক্ষান্তরে যারা কুরআন-হাদীছের বর্ণনার বিপরীত আকীদা পোষণ করেন তাদেরকে খাঁটি মুসলমান মনে করাটা কি কুফ্রী নয় ?

একটি অপকৌশল প্রসঙ্গ ঃ

মীলাদ-মাহ্ফিলে রাসূল (সাঃ)-এর হাজির হওয়ার বিষয় অস্বীকারকারী আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদেরকে কাফের আখ্যা দেয়ার অপরাধকে ঢাকা দেয়ার জন্য প্রসিদ্ধ বিদ'আতী আলেম মুফতী আহমদ ইয়ার খান সহেব বলেছেন যে, 'মুসলমান মীলাদের মাঝে কেয়াম করাকে ওয়াজিব মনে করে'-এ কথাটি মুসলমানদের উপর অপবাদ মাত্র। কেননা, কোন আলেমে দ্বীন একথা লেখেনওনি বলেনওনি যে, কেয়াম করা ওয়াজিব। বরং সর্ব সাধারণও এ ধারণাই পোষণ করে যে, কেয়াম, মীলাদ এগুলো পূণ্যের কাজ।

মুফতী সাহেবের এ দাবী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অবাস্তব সম্মত। কেননা মৌলভী আব্দুস সামী' নিজের দাবীর স্বপক্ষে মুহাম্মাদ ইব্নে ইয়াহ্ইয়া- মুফতীয়ে হানাবেলা থেকে বর্ণনা করেনঃ

يجب القيام عند ذكر ولادة صلى الله عليه وسلم- (انوار ساطعه صـ ٢٥٠)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ)-এর জন্ম-বৃত্তান্তের আলোচনার সময় কেয়াম করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে বিদ'আতীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ার কিতাব "মাজমুআ ফাতাওয়া" অর্থাৎ, غاية المرام -এর ৫৫-৫৬-৬৭-৭১ নং পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

حضور علیہ السلام ہر محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں، تعظیم کیواسطے کھڑاہونا فرض ہے ، قیام نہ کرنے والا کافر ہے -

অর্থাৎ, প্রত্যেক মীলাদ-মাহফিলে নবী করীম (সাঃ) উপস্থিত হন এবং তাঁর সম্মানে কেয়াম করা ফরয। কেয়াম না করনেওয়ালা কফের।

নবী করীম (সাঃ)-এর গায়েব জানা প্রসঙ্গ

গায়েব (غيب)-এর পরিচয় ঃ

"গায়েব"-এর আভিধানিক অর্থ হল কোন জিনিস গোপন থাকা।[১] যে জিনিস আমাদের থেকে গোপন রয়েছে তাকেও গায়েব (غيب) বলা হয়। আর শরী'আতের পরিভাষায় "গায়েব" বলা হয় প্রত্যেক ঐ জিনিসকে যা বান্দার থেকে গোপন থাকে।

১. غيب এবং مغيب উভয়টা (ض) غاب بغيب এর মাসদার। غاب الشئ عن فلان অর্থ হল গোপন হওয়া। আবার যে সকল বিষয় গোপন থাকে তাকেও গায়েব বলা হয়। এ অর্থে غيب -এর বহুবচন হল غيوب -। আর مغيب এর বহু বচন হলো- مغيبات -॥

ইবনে কাছীর, সুদ্দী মুফাসসিরীনে কেরামের উদ্ধৃতি দিয়ে ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ), ইব্‌নে মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ

اما الغيب : فماغيب عن العباد من امر الجنة وامر النار وما ذكر فى القران- (تفسير ابن كثير. صـ/ ١٤ جـ/١)

অর্থাৎ, "গায়েব" হল ঐ জিনিস, যা বান্দা থেকে গোপন রয়েছে। যেমন জান্নাত জাহান্নামের অবস্থা সমূহ এবং কুরআনে কারীমে বর্ণিত বিষয়াবলী।

আইম্মায়ে আহ্‌নাফের প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ 'مدارك'-এ বলা হয়েছে ঃ

والغيب : هو ما لم يقم عليه دليل ولا اطلع عليه مخلوق-

অর্থাৎ, ঐ জিনিসকে গায়েব বলা হয়, যার উপর কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই এবং কোন মাখলূক সে বিষয়ে অবগত নয়।

"গায়েব"-এর স্তরভেদ ঃ

গায়েব জানার মৌলিক স্তর প্রথমত ঃ ২টি। যথা ঃ

(১) ذاتی [সত্তাগত] (২) عطائی [অন্য প্রদত্ত]

عطائی আবার দুই প্রকার। যথা ঃ

(১) محیط [ব্যাপক] (২) غیر محیط [অব্যাপক]

محیط আবার দুই প্রকার। যথা ঃ

(১) محیط عام [সর্বব্যাপী] (২) محیط خاص [সীমিত ব্যাপী]

এই সর্বমোট চারটি স্তর। নিম্নে ছকাকারে তা দেয়া হল।

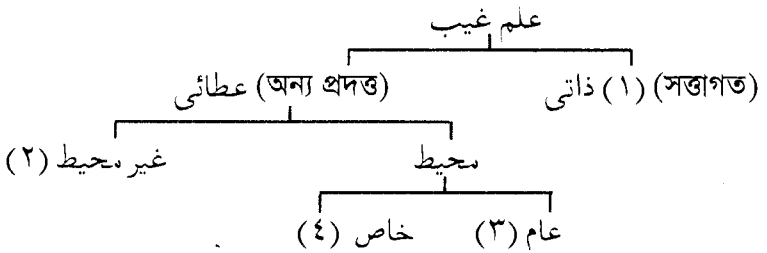

উপরোক্ত স্তর চতুষ্ঠয়ের মধ্য হতে তিনটির হুকুম প্রায় সর্বসম্মত। মতানৈক্য শুধু ১টি তথা ৩য়টির মাঝে। আর এ মতানৈক্যটাই ইল্‌মে গায়েব-এর ইখতিলাফ হিসাবে খ্যাত।

স্তর চতুষ্ঠয়ের হুকুম ঃ

১ম প্রকার ঃ

علم غائب ذاتی অর্থাৎ, যে গায়েব (مغیبات)-এর জ্ঞানটা সত্তাগত (ذاتی) অর্থাৎ, যার মাঝে অন্যের কোন হস্তক্ষেপ নেই। এ প্রকার ইল্‌মে গায়েবের ব্যাপারে সকলেই একমত, যে, এটা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য খাস (خاص)। কেউ যদি কোন রাসূলের জন্য কিংবা কোন

ওলির জন্যে সামান্যতম এরূপ সত্তাগত জ্ঞান (ذاتی علم) সাব্যস্ত করে, তাহলে সে সর্ব সম্মতিক্রমে মুশরিক ও কাফের হয়ে যাবে।[১]

২য় প্রকার ঃ

علم غائب عطائی محیط عام অর্থাৎ, যে গায়েবের জ্ঞানটা অন্য কোন সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত (عطائی) এবং সেটা আদি অন্তের সমস্ত বিষয়ের মৌলিক (کلی) জ্ঞান। এ প্রকার ইল্‌মে গায়েবের ব্যাপারে সকলের সর্বসম্মত বিশ্বাস হল এ প্রকারটিও আল্লাহ্‌র জন্য খাস (خاص)। সুতরাং যদি কেউ এ ধারণা পোষণ করে যে, রাসূল (সাঃ)ও সার্বিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত, আল্লাহ তা'আলার ইল্‌ম আর নবী করীম (সাঃ)-এর ইল্‌মের মাঝে শুধু ذاتی আর عطائی-এর পার্থক্য, তাহলে এই ধারণা পোষণকারীও মুশরিক ও কাফের হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

من اعتقد تسوية علم الله ورسوله يكفر اجماعا كما لا يخفى - (موضوعات كبير صـ ١١٩)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূল (সাঃ)-এর ইল্‌মের মাঝে সমতার বিশ্বাস রাখে, তাকে সর্ব সম্মতিক্রমে কাফের বলা হবে; যা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়।

৩য় প্রকার ঃ

علم غائب عطائی محیط خاص অর্থাৎ, যে গায়েবের জ্ঞানটা অন্য কোন সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত (عطائی) এবং সেটা আদি অন্তের অর্থাৎ, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে নিয়ে জান্নাত জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের সামগ্রিক (محیط) ও পুঙ্খানুপুঙ্খ (خاص) জ্ঞান। এ প্রকার ইল্‌মে গায়েবের হুকুমের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাস মতে এ প্রকারটিও আল্লাহ্‌র জন্য খাস (خاص)। কিন্তু রেজাখানী সহ বেদ'আতীদের আকীদা-বিশ্বাস হল নবী করীম (সাঃ)ও এই প্রকার ইল্‌মের অধিকারী।[২]

খান সাহেব বেরেলভী বলেন ঃ

حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام ما کان وما یکون الی یوم القیامۃ کا علم تھا اور ابتداء آفرینش عالم سے لیکر جنت و نار کے داخلہ تک کا کوئی ذرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے باہر نہیں۔ (انباء المصطفی صـ ٤ ملخصا)

---

১. সার সংক্ষেপ بریلوی فتنہ کا نیا روپ صفحہ / ۷۵-۷۴ مصنف عارف سنبھلی استاذ ندوۃ العلماء لکھنو بحوالہ خالص الاعتقاد مصنف احمد رضا خان صـ ۲۲ ॥

২. বিদআতীগণ নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য ইল্‌মে গায়েব প্রমাণিত করার এত প্রচেষ্টা কেন করেছেন, তার পশ্চাতে মীলাদে কেয়াম করার বিষয়টার স্বপক্ষে দলীল দাঁড় করানোর চিন্তা-চেতনা কাজ করছে। সেটি এভাবে যে, রাসূল (সাঃ)-এর নামে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হলে তিনি তা জানেন যেহেতু তিনি ইল্‌মে গায়েবের অধিকারী, তাই তিনি জানতে পেরে মজলিসে উপস্থিত হন। আর তাঁর উপস্থিতি হেতু কেয়াম করতে হবে ॥

অর্থাৎ, যা কিছু হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে - সেই সবকিছুর জ্ঞান নবী করীম (সাঃ)-এর ছিল। পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে জান্নাত জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত কোন ক্ষুদ্রস্য থেকে ক্ষুদ্রস্য বিষয়ও নবী (সাঃ)-এর জ্ঞান বহির্ভূত নয়।

৪র্থ প্রকার ঃ

علم غائب عطائی غیر محیط অর্থাৎ, যে গায়েবের জ্ঞানটা অন্য কোন সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত (عطائی) এবং সেটা বিশেষ বিশেষ জ্ঞান (غیر محیط/সামগ্রিক জ্ঞান নয়) এ প্রকার ইল্‌মে গায়েব গায়রুল্লাহ্‌র জন্য প্রমাণিত। কেননা আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরামকে ওহী ও ইল্‌হামের মাধ্যমে কিছু বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন। সেমতে ওহী এবং ইল্‌হামের মাধ্যমে যে সকল গায়েব-এর বিষয় সম্পর্কে তাঁরা অবগত হয়েছেন। তা ছাড়া দুনিয়ার সকল বিষয়ে পুঙ্খানোপুঙ্খ জ্ঞান তাঁদের নেই।

নবী করীম (সাঃ)-এর গায়েব জানা সম্পর্কে সারকথা ঃ

নবী করীম (সাঃ)-এর গায়েব জানা সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাস হল ঃ নবী করীম (সাঃ)কে তাঁর শান মত আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও সিফাত সম্পর্কে, অতীত ও ভবিষ্যতের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে বারজাখ, কবরের অবস্থা, হাশরের ময়দানের চিত্র, জান্নাত, জাহান্নামের পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে এমন জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে যা কোন নবী কিংবা কোন নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাকেও দেয়া হয়নি। যার আন্দাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই করতে পারেন। তবে সেটা আল্লাহ তা'আলার "সর্ব বিষয়ের সামগ্রিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান" (علم محیط)-এর সামনে কিছুই নয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে বিদআতী ও রেজাখানীদের আকীদা-বিশ্বাস হল যা কিছু হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে- সেই সবকিছুর জ্ঞান নবী করীম (সাঃ)-এর ছিল। পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে জান্নাত জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত কোন ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্রস্য বিষয়ও নবী (সাঃ)-এর জ্ঞান বহির্ভূত নয়।

আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দলীল ঃ

কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে "গায়েব-এর জ্ঞান" (علم الغیب) বিষয়কে আল্লাহর বিশেষ সিফাত বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সমস্ত মাখলূক থেকে এমনকি নবী করীম (সাঃ) থেকেও "গায়েব-এর জ্ঞান"কে নিবারিত (نفی)করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল।

(১) قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا الله وما یشعرون ایان یبعثون -

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি বলে দাও যত মাখলুক আসমান এবং যমিনে রয়েছে কেউ গায়েব জানে না। এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া। আর (এ কারণেই) তারা জানে না তারা কবে পূনরুত্থিত হবে। (সূরাঃ নাম্‌লঃ ৬৫)

(২) قل لا اقول لکم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک -

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি বলে দাও আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ তা'আলার (সমস্ত মাকদুরাতের) ভাণ্ডার রয়েছে। আর না একথা বলি যে, আমি গায়েব জানি। আর না আমি তোমাদের কে বলি আমি ফেরেশতা। (সূরা ঃ ৬-আন্‌আম ঃ ৫০)

(৩) قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء -

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন কর্তৃত্ব নেই। আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলেতো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। (সূরাঃ ৭-আ'রাফঃ ১৮৮)

(٤) وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو -

অর্থাৎ, তাঁরই নিকট রয়েছে গায়েবের কুঞ্জি, তিনি ব্যতীত কেউ তা জানেনা। (সূরাঃ ৬-আন্‌আমঃ ৫৯)

(٥) یسئلونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو - الی قوله - قل انما علمها عند الله ولکن اکثر الناس لا یعلمون -

অর্থাৎ, তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন ঘটবে ? তুমি বলে দাও এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাসময়ে তার প্রকাশ ঘটাবেন। ..... তুমি বলে দাও এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই আছে। (সূরাঃ ৭-আ'রাফঃ ১৮৭)

এসব আয়াত এবং বুখারী মুসলিমে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ-

ما المسئول عنها باعلم من السائل -

(অর্থাৎ, এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হয় সে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশী জানে না।) দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, কিয়ামতের সুনির্দিষ্ট সময় ও তৎসংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিষয়াদি নবী করীম (সাঃ) থেকেও গোপন রয়েছে। সুতরাং দুনিয়া সৃষ্টির শুরু থেকে জান্নাত জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান নবী করীম (সাঃ)-এর ছিল-এ ধারণা ঠিক নয়। নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সবকিছুর সামগ্রিক জ্ঞান (علم محیط) প্রমাণিত করা এবং নবী করীম (সাঃ)কে আলেমুল গায়েব বা গায়েব জান্তা মনে করা পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং হাদীছের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

বিদআতীদের দলীল ও তা খণ্ডনঃ

১ম দলীলঃ

جاء الحق নামক গ্রন্থে আহমদ ইয়ার খান সাহেব তাদের দাবীর স্বপক্ষে দলীল দিতে গিয়ে উল্লেখ করেনঃ

وما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء -

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার এই শান না যে, তিনি তোমাদের সর্বসাধারণকে গায়েবের ইলম/জ্ঞান দান করবেন। হ্যাঁ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণ থেকে যাকে চান তাকে মনোনীত করেন। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ১৭৯)

উক্ত আয়াতের অধীনে তাফসীরে বাইযাভী ও তাফসীরে খাজেনের ব্যাখ্যা উল্লেখ করতঃ খান সাহেব বলেনঃ এতে বুঝা যায় আল্লাহ তা'আলার খাস ইল্‌মে গায়েব আম্বিয়ায়ে কেরামের সামনে প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত হয়। কতক মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন তাফসীরে বাইযাভী ও তাফসীরে খাজেনে উল্লেখিত "কতক ইল্‌মে গায়েব" (بعض غيب) দ্বারা উদ্দেশ্য হল- আল্লাহ তা'আলার ইল্‌মের মোকাবেলায় কতক। আর দুনিয়ার শুরু থেকে জান্নাত জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সমস্ত জ্ঞান আল্লাহ্‌র ইল্‌মের মোকাবেলায় কতকই বটে।[১]

খণ্ডন ঃ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা ওহী এবং ইল্‌হামের মাধ্যমে আম্বিয়ায়ে কেরামকে গায়েবের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত করেন। কিন্তু এর দ্বারা কোন নবীকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান প্রদান করা প্রমাণিত হয় না। আর তাফসীরের কিতাবে উল্লেখিত 'بعض غيب'-এর যাহিরী বা সুস্পষ্ট ও পরিস্কার ব্যাখ্যা হল কতক جزئيات-এর জ্ঞান, আল্লাহ্‌র ইল্‌মের মোকাবেলায় بعض (কতক) নয়। বিনা কারণে যাহিরী অর্থ ত্যাগ করা তাফসীরের সহীহ নীতি নয়।

২য় দলীল ঃ

فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول-

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ে কাউকে অবগত করেন না- তবে রাসূলদের মাঝে যাদের পছন্দ করেন। (সূরাঃ ৭২-জিনঃ ২৬-২৭)

আহমদ ইয়ার খান সাহেব উক্ত আয়াতের অধীনে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থের ব্যাখ্যা (যদিও তা তাদের দাবীর বিপরীত) উল্লেখ করতঃ বলেন "এ থেকে বুঝা যায় আল্লাহ তা'আলার খাস ইল্‌মে গায়েব এমনকি কিয়ামতের ইল্‌মও নবী (সাঃ)কে দেয়া হয়েছে। সুতরাং নবী (সাঃ)-এর জ্ঞান থেকে বাকী রইল কি ?"[২]

খণ্ডন ঃ

এ আয়াতের পূর্বাংশে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

قل ان ادرى اقريب ما توعدون ام يجعل له ربى امدا-

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, আমি জানি না তোমাদের সাথে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অতি নিকটে না আমার প্রতিপালক তার জন্য দীর্ঘ সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। (প্রাগুক্ত)

এ আয়াতে 'ما توعدون' এর অর্থ (مصداق) 'আযাব' কিংবা 'কিয়ামত'। এতদুভয়ের যেটাই মুরাদ নেয়া হোক না কেন, সেটা ماكان وما يكون-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সর্বাবস্থায় ماكان وما يكون -এর কিছু বিষয় এমন রয়ে গেছে যার ইল্‌ম নবী করীম (সাঃ)-এর ছিল না।

১. جاء الحق صـ ٤٨ صـ ٤٩ ॥ ২. ٥٦ جاء الحق صـ ॥

৩য় দলীল ঃ

তারা নিম্নোক্ত হাদীছের মাধ্যমেও দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছেন। হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون فى مقامه ذالك الى قيام الساعة الا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه - (مشكوة.كتاب الفتن صـ ٤٦١)

অর্থাৎ, একদা নবী করীম (সাঃ) আমাদের মাঝে খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর খুতবার মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে এমন কোন বিষয় বলতে ছাড়েননি। যে স্মরণ রেখেছে সে স্মরণ রেখেছে, আর যে ভুলে গেছে সে ভুলে গেছে।

খণ্ডন ঃ

বিদ'আতীরা এরূপ বিভিন্ন হাদীছের মাধ্যমে দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে হাদীছগুলো তাদের মূলনীতি অনুসারেই দলীল হতে পারে না। মুলনীতি হল আহমদ ইয়ার খান সাহেব লিখেছেনঃ

جب علم غیب کا منکر اپنے دعوے پر دلیل قائم کرے تو چار باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے (۱) وہ آیت قطعی الدلالۃ ہو جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں، اور (۲) حدیث ہو تو متواتر ہو . الخ۔

(جاء الحق صـ ٤٠)

অর্থাৎ, ইল্‌মে গায়েব অস্বীকারকারী নিজের দাবীর স্বপক্ষে দলীল দিতে চাইলে তাকে ৪ টি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। যথা ঃ (১) সেটা এমন আয়াত হতে হবে যার অর্থ হবে দ্ব্যর্থহীন অর্থাৎ, তাতে একাধিক অর্থের অবকাশ থাকতে পারবে না। (২) দলীলটি হাদীছ হলে সেটা 'মুতাওয়াতির' (متواتر) হতে হবে। ... ইত্যাদি।

অথচ তাদের পেশকৃত হাদীছ একটিও 'মুতাওয়াতির' (متواتر) নয়। এতো গেল الزامى উত্তর। তাহ্‌কীক্বী উত্তর হল ঃ তাদের পেশকৃত হাদীছগুলোর কতকের মতলব হল নবী (সাঃ) কিয়ামত পর্যন্ত যত বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে তা এবং বিভিন্ন ফিতনা ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামকে খুতবায় যা শুনিয়েছেন, বিদ'আতীগণ এগুলোকেই হুজুর (সাঃ)-এর গায়েব জানার প্রমাণ দাঁড় করেছেন। অথচ এটা সব ধরনের বিষয়ে রাসূল (সাঃ)-এর বক্তব্য ছিল না। বিশেষ এক ধরনের বিষয়ে ছিল। আমাদের এ বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় আবূ দাউদ শরীফ-এর নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা- হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ

والله ما ادرى أنسى اصحابى ام تناسوا ؟ والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة الى ان تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلاث مأة فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابيه واسم قبيلته - (ابوداؤد شريف و مشكوة شريف ص ٤٦٣)

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি না আমার সাথীরা ভুলে গেছেন নাকি- ভুলের ভান করেছেন। আল্লাহ্‌র কসম নবী করীম (সাঃ) কিয়ামত পর্যন্ত কোন ফিতনা সৃষ্টি কারীর কথা বলতে ছাড়েননি। যাদের চেলা চামুন্ডার সংখ্যা হবে তিনশত বা ততোধিক। নবী করীম (সাঃ) আমাদের সামনে তার নাম, তার পিতার নাম, তার গোত্রের নাম পর্যন্ত বলেছেন।

সুতরাং বোঝা গেল- নবী করীম (সাঃ) খুতবায় যা বলেছেন সে সব ছিল ফিতনা ও কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত। দুনিয়ার সকল বিষয় নয়।

আর তাদের পেশকৃত কতক হাদীছের উদ্দেশ্য হল- নবী করীম (সাঃ)-এর সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে গায়েবের বিষয়াবলীর মধ্য থেকে শুধু শরীআতের বিধি-বিধান ও দ্বীনের বিষয়াবলী যা নবী করীম (সাঃ)-এর শানের সাথে সংগতিপূর্ণ। হাদীছের পূর্বাপর অবস্থা থেকে এমনটিই বুঝে আসে।

সুতরাং এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, علم ذاتی এবং علم محیط بالکل একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সাথে খাস। কোন রাসূল কিংবা গায়রে রাসূল তাতে শরীক নন এবং কোন نص -এর মাঝে মাখলূকের জন্য 'عالم الغيب'-এর ব্যবহার দেখা যায় না। তাইতো উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বলবে নবী করীম (সাঃ) গয়েব জানেন, সে যেন আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা অপবাদ দিল।[১]

নবী (সাঃ)-এর হাজির-নাজির হওয়া প্রসঙ্গ

হাজির ও নাজির (حاضر وناظر) শব্দ দুটো আরবী। হাজির অর্থ মওজুদ, বিদ্যমান বা উপস্থিত। আর নাজির অর্থ দ্রষ্টা। যখন এ শব্দ দু'টিকে মিলিয়ে ব্যবহার করা হয়, তখন অর্থ হয় ঐ সত্তা, যার অস্তিত্ব বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ নয় বরং তাঁর অস্তিত্ব একই সময়ে গোটা দুনিয়াকে আবেষ্টিত করে রাখে এবং দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবস্থা তার দৃষ্টির সামনে থাকে।

হাজির-নাজির সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ঃ

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে হাজির-নাজির কথাটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারেই প্রযোজ্য। হাজির-নাজির থাকা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই সিফাত। নবী করীম (সাঃ)-এর ব্যাপারে হাজির-নাজিরের আকীদা পোষণ করা শরীআতগত (شرعا) ও যুক্তিগত (عقلا) উভয় দিক থেকে ভ্রান্ত।

হাজির-নাজির সম্বন্ধে বিদ'আতীদের আকীদা ঃ

বিদ'আতীদের আকীদা হল রাসূল (সাঃ) হাজির-নাজির। তাদের এই বিশ্বাসের পশ্চাতে মীলাদে কেয়াম করার বিষয়টার স্বপক্ষে দলীল দাঁড় করানোর চিন্তা-চেতনা কাজ করছে। সেটি এভাবে যে, রাসূল (সাঃ)-এর নামে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হলে তিনি তা জানেন, যেহেতু তিনি হাজির-নাজির বা সর্বত্র উপস্থিত। তাই তাঁর উপস্থিতি হেতু কেয়াম করতে হবে।

১. صحيح بخارى - مشكواة شريف صـ ٥٠١ ॥

বিদ'আতীদের আকীদা মতে শুধু হুজুরে পাক (সাঃ)ই নন, বরং বুযুর্গানে দ্বীনও পৃথিবীর সব কিছুকে হাতের তালুর মত দেখতে পান। তারা দূরের ও কাছের আওয়াজ শুনতে পান। এবং মুহুর্তের মধ্যে গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করেন এবং হাজার হাজার মাইল দূরের হাজতমান্দ ব্যক্তির হাজত পূর্ণ করেন।

খণ্ডন ঃ

নবী (সাঃ) সর্বত্র হাজির-নাজির এটা দ্বারা যদি নবী (সাঃ)-এর সর্বত্র শারীরিক হাজির-নাজির থাকা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটা যুক্তিগত ভাবে (عقلا) অসম্ভব এবং সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। কারণ এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, নবী করীম (সাঃ) রওযা মুবারকে আরাম করছেন। এবং সমস্ত আশেকীনরা সেখানে গিয়ে হাজিরা দেন, যিয়ারাত করেন। আর নবী (সাঃ) সর্বত্র হাজির-নাজির এটা দ্বারা যদি তাঁর রূহানী হাজিরী উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ, এই বোঝানো হয়ে থাকে যে, দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র রূহের জন্য সর্বস্থানে বিচরণ করার অনুমতি রয়েছে, তাহলে বলা হবে - সর্বস্থানে বিচরণের অনুমতি থাকার দ্বারা বাস্তবেই সর্বস্থানে উপস্থিত থাকা জরূরী নয়। বরং তিনি যে সর্বত্র হাজির থাকেন না, তার প্রমাণ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে যে, তিনি সর্বদা রওযা মুবারকে আরাম করছেন। অতএব এখন যদি কেউ অন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে নবী (সাঃ)-এর উপস্থিতির কথা দাবী করে, তাহলে সেটা হবে একটা স্বতন্ত্র দাবী। এর স্বপক্ষে দলীল চাই। অথচ এর স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। সুতরাং দলীল বিহীন এমন আকীদা পোষণ করা নাজায়েয।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দলীল ঃ

১ম দলীল ঃ

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সাঃ) কে হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে অবগত করার পর ইরশাদ করেন ঃ

وماكنت بجانب الغربى اذ قضينا الى موسى الامر وماكنت من الشاهدين -

অর্থাৎ, তুমি (তূর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না, যখন আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে হুকুম প্রেরণ করি। আর তুমি তা প্রত্যক্ষ করনি। (সূরা ঃ ২৮-কাসাসঃ ৪৪)

সুতরাং বুঝা গেল- হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় মহাম্মদ (সাঃ) তূর পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে হাজিরও ছিলেন না নাজিরও ছিলেন না।

২য় দলীল ঃ

সূরা তওবায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وممن حولكم من الاعراب منفقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم -

অর্থাৎ, তোমার আশপাশের পল্লীবাসী ও মাদীনাবাসীর মাঝে এমন কিছু মুনাফিক রয়েছে যারা মুনাফেকিতায় সিদ্ধ। তুমি তাদেরকে জান না। আমি তাদেরকে জানি। (সূরা ঃ ৯-তাওবা ঃ ১০১)

বিদ'আতীদের দলীল ও তার খণ্ডন ঃ

১ম দলীল ঃ

আহমদ ইয়ার খান সাহেব তার দাবীর স্বপক্ষে দলীল দিতে গিয়ে লিখেন-

يايها النبي انا ارسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا -

অর্থাৎ, হে গায়েবের খবর প্রদানকারী! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে হাজির-নাজির, সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহ্র পথে তার নির্দেশে আহবানকারী এবং দীপ্তমান সূর্য্য রূপে প্রেরণ করেছি। (সূরাঃ ৩৩-আহ্যাবঃ ৪৫-৪৬)

شاهد এর অর্থ সাক্ষ্যও হতে পারে, আবার হাজির-নাজিরও হতে পারে। সাক্ষ্যকে শাহেদ (شاهد) বলার কারণ হল- সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকে। আর হুজুর (সাঃ)কে شاهد বলা হয় যেহেতু তিনি দুনিয়াতে عالم الغيب হিসাবে দেখে সাক্ষ্য দেন। অন্যথায় অন্যান্য নবীগণওতো সাক্ষ্যদানকারী। তাহলে তফাৎ থাকল কোথায়? অথবা নবী করীম (সাঃ) কিয়ামতের দিবসে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের পক্ষে চাক্ষুস সাক্ষ্য প্রদান করবেন। আর এ সাক্ষ্য দেখা ছাড়া দেয়া সম্ভব নয়। এটা হুজুর (সাঃ)-এর হাজির-নাজির হওয়ার প্রমাণ। এমনিভাবে নবী করীম (সাঃ)-এর সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়াও তাঁর হাজির-নাজির হওয়ার প্রমাণ। কেননা অন্যান্য নবীগণ একাজ করেছেন শুনে, আর হুজুর (সাঃ) একাজ করেছেন দেখে। এ জন্যইতো স্বশরীরে মে'রাজ একমাত্র হুজুর (সাঃ)-এরই হয়েছে। আবার সিরাজে মুনীরের অর্থ হল সূর্য্য। এটা পৃথিবীর সর্বস্থানে বিরাজমান, প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিদ্যমান। তদ্রূপ নবী করীম (সাঃ)ও সর্বস্থানে বিদ্যমান। সুতরাং এ আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্য থেকে নবী (সাঃ)-এর হাজির-নাজির হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে।[১]

খণ্ডন ঃ

খান সাহেব এ সত্যটুকুও অবলোকন/অনুধাবন করেননি যে, সূর্য্য সর্বস্থানে বিদ্যমান নয় বরং যেখানে দিন সেখানে সূর্য্য বিদ্যমান আর যেখানে রাত সেখানে সূর্য্য অবিদ্যমান। সুতরাং এই উপমার মাধ্যমে খান সাহেবের দাবী প্রমাণিত না হয়ে সুতরাং নবী করীম (সাঃ)-এর সর্বত্র হাজির-নাজির না হওয়াই প্রমাণিত হয়। নবীগণ শুধু গায়েব সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেন- এর দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর সবকিছু জানা ও দেখা প্রমাণিত হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলার ওহী ও ইল্‌মের মাধ্যমে যতটুকু জানেন তাঁরা ততটুকুই অবগত থাকেন।

আর আহমদ ইয়ার খান সাহেব 'شاهد'-এর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তা ঠিক নয়। বরং 'شاهد' শব্দটি شهد (س) يشهد থেকে ইস্‌মে ফায়েল (اسم فاعل)-এর সীগা। এর অর্থ হল নিশ্চিত ও সঠিক সংবাদ প্রচার করা। এর জন্য আলেমুল গায়েব হয়ে দেখে সাক্ষ্য দেয়া জরুরী নয়। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা কোনভাবেই নবী করীম (সাঃ)-এর হাজির-নাজির হওয়া প্রমাণ করা যায় না।

অনুরূপভাবে আহমদ ইয়ার খান সাহেব কুরআনে কারীমের যে আয়াত নবী করীম (সাঃ)-এর হাজির নাজিরের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন সেখানেই তিনি গলত ফাহ্মী বা ভুল বুঝার শিকার হয়েছেন।

১. جاء الحق صـ ١٣٢ ॥

২য় দলীল ঃ

বিদ'আতীগণ হুজুরে আকরাম (সাঃ)-এর হাজির-নাজির হওয়ার পক্ষে আরও কিছু হাদীছ উল্লেখ করেন, যার দ্বারা হুজুর (সাঃ)-এর হাজির-নাজির হওয়া আদৌ প্রমাণিত হয় না।

এ ব্যাপারে শেখ সা'দী (রহঃ) গুলিস্তায় সুন্দর বলেছেন ঃ

یکے پرسید ازاں گم کردہٗ فرزند ÷ کہ اے روشن گہر پیر خردمند

زمصرش بوئے پیراہن شمیدی ÷ چرا درچاہ کنعانش نہ دیدی

بگفت احوال ما برجہان ست ÷ دم پیدا و دیگر دم نہان ست

گہے بر طارم اعلی نشینم ÷ گہے برپشت پائے خود نہ بینم

অর্থাৎ, কেউ হযরত ইয়াকূব (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছেন ব্যাপার কি ? শত সহস্র মাইল দূর মিসর থেকে ইউসুফ (আঃ)-এর জামার ঘ্রাণ পান, অথচ কেনানের নিকটে এক কূঁয়ায় ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা যখন তাকে নিক্ষেপ করল আপনি তা দেখতে পেলেন না।

উত্তরে ইয়াকূব (আঃ) বলেছেনঃ আমাদের অবস্থা হল আকাশে চমকানো বিদ্যুতের ন্যায়। যা উদ্দীপ্ত হয়েই নিভে যায়। (অর্থাৎ, যখন আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীর ফয়জান হয় তখন আমরা দূর দুরান্তে দেখতে পাই। তবে এ অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না- অল্প সময় পর শেষ হয়ে যায়।) কখনো আমরা বহু উঁচু আসনে বসি, আবার কখনো আমায় নিজের পায়ের পিঠ পর্যন্ত দেখতে পাই না।

যে সমস্ত বিদ'আতীরা অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি বশতঃ শুধু নবী করীম (সাঃ)ই নন বরং বুযুর্গানে কেরামের সম্বন্ধেও হাজির-নাজির থাকার আকীদা পোষণ করেন। তাদের ব্যাপারে ফতওয়া হল ঃ

ফতওয়ায়ে বায্‌যাযিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

قال علما ؤنا من قال ارواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر - (بزازیہ برحاشیۂ عالمگیری جـ٦/ صـ ٣٢٦)

অর্থাৎ, আমাদের উলামায়ে কেরামগণ বলেনঃ যে সমস্ত ব্যক্তি এ কথা বলে যে, বুযুর্গানে দ্বীনের রূহ হাজির বা বিদ্যমান এবং সে সবকিছু জানে, এমন ব্যক্তিগণ কাফের।

নবী করীম (সাঃ)-এর নূর ও বাশার হওয়া প্রসঙ্গ

নূর (نور) শব্দের অর্থ হল আলো, জ্যোতি। নূর শব্দটি প্রকৃত অর্থে 'দৃশ্যমান' আলো আর রূপক অর্থে 'অদৃশ্যমান আলো' তথা হেদায়েত, জ্ঞান ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআন-হাদীছে উভয় অর্থে নূর শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। এ নূরদ্বয়ের মধ্য হতে অদৃশ্য নূরই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের প্রধান উপায়। তাইতো ফেরেশতাগণ বাহ্যিক নূরের সৃষ্টি হওয়ার পাশা-পাশি অদৃশ্য নূরেরও অধিকারী ছিলেন।

আর আদম (আঃ) মাটির সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতাদের থেকে অনেক বেশী অদৃশ্য নূরের অধিকারী ছিলেন বিধায় তাঁর মর্যাদাও ফেরেশতাদের উর্ধ্বে। আর বাশার (بشر) বা ইনসান শব্দের অর্থ হল মানবজাতি, আদম সন্তান।

নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাস ঃ

নবী করীম (সাঃ) সত্তাগত দিক থেকে বাশার বা মানুষ, তবে গুণাবলী ও কামালাতের দিক থেকে অদ্বিতীয় এবং নূর স্বরূপ। মাওঃ ইউসুফ লুধিয়ানভী সাহেব اختلاف امت اور صراط مستقیم গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ নবী করীম (সাঃ) শুধু একজন মানুষই নন বরং সর্বোত্তম মানুষ, সমস্ত মানব জাতির সর্দার এবং আদম (আঃ) ও বনী আদমের জন্য মহান গৌরব। স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

انا سيد ولد ادم يوم القيامة- (مشكوة شريف صـ ٥١١)

অর্থাৎ, আমি কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানদের সর্দার হব।

নবী করীম (সাঃ) যেমনিভাবে সত্তাগত দিক থেকে একজন মানুষ, তেমনিভাবে হেদায়েতের দৃষ্টিকোণ থেকে মানব জাতির জন্য নূরের সুউচ্চ স্তম্ভ। সেই স্তম্ভের আলোক রশ্মি থেকেই মানব জাতির জন্য সঠিক পথের সন্ধান লাভ হয়। যার কিরণমালা আজও দীপ্তিমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুতরাং নবী করীম (সাঃ) বাশার তথা মানুষ হয়েও নূর তথা হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। বস্তুতঃ নবী করীম (সাঃ) সহ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত ও হাদীছ উল্লেখ করা হল ঃ

(١) قل انما انا بشرمثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد -

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি বলে দাও আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় এই মর্মে যে, তোমাদের মা'বূদই একমাত্র মা'বূদ।' (সূরাঃ ১৮-কাহ্ফঃ ১১১)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

(٢) قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا - وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جائهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا - قل لو كان فى الارض ملئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا -

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি বলে দাও আমার প্রতিপালক পূত-পবিত্র সত্তা। আমিতো একজন মানব রাসূল মাত্র। লোকদের নিকট হেদায়েত এসে যাওয়ার পর এ উক্তি তাদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে যে, আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। ....। (সূরাঃ ১৭-বানী ইসরাঈলঃ ৯৪-৯৫)

অনুরূপ আরও বহু আয়াতে নবী করীম (সাঃ)কে মানুষ বলা হয়েছে। তবে সাথে সাথে তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, তিনি একজন মহান রাসূল। তাঁর উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়।

হাদীছে পাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

(١) عن ام سلمةؓ عن النبى صلى الله عليه وسلم - انه سمع خصومة بباب حجرته - فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه ياتينى الخصم - الى اخر الحديث (بخارى ج/١ صـ ٣٣٢ و مسلم صـ ٧٤)

এ হাদীছে নবী করীম (সাঃ) নিজের সম্পর্কে বলেছেন- আমি তো একজন মানুষ মাত্র।

অন্য আরেক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে ঃ

(٢) قال عبد الله صلى الله عليه وسلم ..... ولكن انما انا بشرمثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكرونى - (بخارى جـ/١ صـ ٥٨)

এ হাদীছেও নবী করীম (সাঃ) নিজের সম্পর্কে বলেছেনঃ আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ; তোমাদের যেমন ভুল হয় আমারও তেমন ভুল হয়। সুতরাং আমি যখন কোন জিনিস ভুলে যাব, তখন তোমরা আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিবে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে প্রমাণিত হল যে, নবী করীম (সাঃ) একজন মানুষ- ফেরেশতা, জিন, কিংবা অন্য কোন মাখ্লূক নন। নবী করীম (সাঃ)-এর শরীর নূরের তৈরী নয় বরং মানব জন্মের প্রাকৃতিক ধারা অনুসারেই নবী করীম (সাঃ)-এর সৃষ্টি হয়েছে। আর মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اذقال ربك للملئكة انى خالق بشرا من طين -

অর্থাৎ, আর স্মরণ কর যখন প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করব। (সূরাঃ ৩৮-সাদঃ ৭১)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন ঃ

هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا -

অর্থাৎ, ঐ সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর পানি দ্বারা, এরপর জমাট রক্ত দ্বারা, তারপর তোমাদেরকে শিশু রূপে বের করেন। এরপর তোমরা যৌবনে পদার্পন কর, তারপর বার্ধ্যকে উপনীত হও। (সূরাঃ ৪০-মু'মিনঃ ৬৭)

এ সব আয়াতে সামগ্রিকভাবে মানব সৃষ্টির ধারা বর্ণিত হয়েছে। আর নবী করীম (সাঃ) নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন ঃ

ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة - واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم - (مسلم جـ/٢ صـ ٢٤٥ و ترمذى جـ/٢ صـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর থেকে কিনানকে মনোনীত করেছেন। আর কিনানের বংশধর থেকে কোরাইশকে, কোরাইশের বংশধর থেকে বনূ হাশিমকে আর বনূ হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।

আবূ জা'ফর বাকের (রাঃ) থেকে বর্ণিত- নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ

انما خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن ادم ولم يصبنى من سفاح اهل الجاهلية شئ لم اخرج الامن طهره - (درر ضاخانيت)

অর্থাৎ. আমার জন্ম বিবাহের মাধ্যমে হয়েছে। কোন অবৈধ পন্থায় নয়। আদম (আঃ) থেকে নিয়ে (আমার মাতা-পিতা পর্যন্ত সমস্ত স্তর বৈধ বিবাহ-বন্ধনের মাধ্যমেই চলে আসছে।) জাহিলিয়্যাতের কোন অবৈধ পদ্ধতি আমাকে স্পর্শ করেনি। পবিত্র ও বৈধ পদ্ধতিতেই আমার জন্ম হয়েছে।

পূর্বোক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হল যে, মানব জন্মের প্রাকৃতিক ধারা অনুসারেই নবী করীম (সাঃ)-এর জন্ম হয়েছে। নূর থেকে নয়। এজন্যই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার সুপ্রসিদ্ধতম কিতাব 'শরহে আকাইদে নাসাফীতে' রাসূল-এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

انسان بعثه الله لتبليغ الرسالة والاحكام -

অর্থাৎ., রাসূল ঐ ব্যক্তি (মানুষ) কে বলা হয় আল্লাহ তা'আলা যাকে বান্দা পর্যন্ত স্বীয় বিধি-বিধান ও খবর পৌঁছানোর জন্য প্রেরণ করেছেন।"

বিদ'আতীদের দলীল ও তার খণ্ডন ঃ

১. রেজাখানী উলামায়ে কেরামের আকীদা-বিশ্বাস যদিও এই যে, 'নবী করীম (সাঃ) মানুষ (বাশার)। যে এটাকে অস্বীকার করবে সে কাফের।' কিন্তু তারা কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত নূর (نور) শব্দের ব্যাখ্যায় নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তা মুরাদ বলে ব্যক্ত করে থাকেন। যার দ্বারা সাধারণ মানুষগণ মনে করেন যে, নবী করীম (সাঃ) নূরের তৈরী, অর্থাৎ, তিনি মানুষ (বাশার) নন।[১]

আয়াতটি এই ঃ

قد جاء كم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام -

১. এরূপ করার পশ্চাতে মীলাদে কেয়াম করার বিষয়টার স্বপক্ষে দলীল দাঁড় করানোর চিন্তা-চেতনা কাজ করছে। সেটি এভাবে যে, তাদের বর্ণনা মতে রাসূল (সাঃ)-এর নামে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হলে তিনি তা জানেন। যেহেতু তিনি হাজির-নাজির বা সর্বত্র উপস্থিত। আর কোন রক্ত মাংসে গঠিত স্থূল দেহবিশিষ্ট্য মানুষের পক্ষে সর্বত্র হাজির-নাজির থাকা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা নবী (সাঃ)-এর সর্বত্র হাজির-নাজির থাকার বিষয়টির পক্ষে আনুকূল্য সৃষ্টির স্বার্থে নবী (সাঃ)কে নূর বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে থাকেন ॥

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নূর (আলো) এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে। যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে শান্তির পথ দেখান, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। (সূরা ঃ ৫-মায়িদা ঃ ১৬)

খণ্ডন ঃ

এ আয়াতে নূর (نور) দ্বারা বোঝানো হয়েছে "কুরআনে কারীম"কে। আর 'كتاب مبين' - 'نور' থেকে عطف تفسيرى হয়েছে। এর প্রমাণ হল-

(এক) আয়াতের পশ্চাদবর্তী অংশে 'يهدى به الله' বাক্যে 'به' তে একবচনের সর্বনাম (ضمير) ব্যবহার করা হয়েছে। যদি 'نور' ও 'كتاب مبين' দ্বারা পৃথক পৃথক দুটি বিষয় উদ্দেশ্য হত তাহলে একবচনের সর্বনাম ব্যবহার করা সহীহ হত না।

(দুই) নিম্নোক্ত দুই আয়াতে যেমনিভাবে তাওরাত এবং ইঞ্জিলকে নূর (نور) বলা হয়েছে, তদ্রূপ আলোচ্য আয়াতেও "নূর" দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য হওয়াটাই যুক্তি সংগত এবং তা দ্বারা নবী করীম (সাঃ)-এর সত্তা উদ্দেশ্য নেয়া ভুল।

(١) انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور -

অর্থাৎ, আমি নাযিল করেছি তাওরাত, যাতে রয়েছে হেদায়েত ও নূর। (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ৪৪)

(٢) واتينه الانجيل فيه هدى ونور -

অর্থাৎ, আমি তাকে দান করেছি ইঞ্জীল, যাতে রয়েছে হেদায়েত ও নূর। (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ৪৬)

২. আর একদল রয়েছেন যারা বলেন নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ তা'আলার নূর সমূহের একটি নূর। যিনি বাশারিয়্যাতের তথা মানবের আবরণে আবির্ভূত হয়েছেন। অর্থাৎ, তারা বলতে চান যে, নবী (সাঃ) আল্লাহ্র প্রকাশ (ظهور) ছিলেন। আর অনেকে এ পর্যন্তও বলে যে, আহাদ (احد) তথা আল্লাহ আর আহ্মদ (احمد) তথা নবী (সাঃ)-এর মাঝে শুধু 'ميم' -বর্ণের পার্থক্য। (নাউযুবিল্লাহ)।

খণ্ডন ঃ

এটা হুবহু ঐ আকীদা যা, খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে পোষণ করে থাকেন যে, তিনিই খোদা তবে তিনি মানুষের রূপে আগমন করেছেন। এ আকীদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা সৃষ্টি আর সৃষ্টিকর্তা কখনো এক হতে পারে না। উম্মত কর্তৃক এ ধরনের বাড়াবাড়ির আশংকা ছিল বিধায় নবী করীম (সাঃ) এ ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন ঃ

لا تطرونى كما اطرت النصارى عيسى بن مريم.. - (صحيح بخارى ج/٢ ص ١٠٠)

অর্থাৎ, আমার প্রশংসায় তোমরা এতটা বাড়াবাড়ি কর না, যেমনটি খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে করেছিল। তারা ঈসা (আঃ)কে খোদা এবং খোদার বেটা বানিয়ে দিয়েছিল। আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহ্র বান্দা এবং রাসূলই বলবে।

৩. বাতিলপন্থীরা তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে কয়েকটি জাল হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। যা লোক মুখে হাদীছ বলে প্রসিদ্ধ হলেও প্রকৃত পক্ষে সেগুলো জাল হাদীছ। নিম্নে সেরূপ কয়েকটি প্রদত্ত হল ঃ

(১) اول ما خلق الله نوری -

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।

(২) عن جابر قال - سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول شئ خلقه الله - قال هو نور نبيك يا جابر -

অর্থাৎ, জাবের (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূল (সাঃ)কে আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বললেন, "হে জাবের! সেটা হল তোমার নবীর নূর"।

(৩) انا من نور الله وكل شئ من نوری -

অর্থাৎ, আমি আল্ল'হ তা'আলার নূর থেকে (সৃষ্ট) আর সব কিছু আমার নূর থেকে (সৃষ্ট)

(৪) انا من نور الله والمؤمنون منی -

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ তা'আলার নূর থেকে আর মু'মিনগণ আমার থেকে।

(৫) انا من الله والمؤمنون منی -

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ তা'আলা থেকে আর মু'মিনগণ আমার থেকে।

(৬) আর একটি হাদীছে বলা হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে তাঁর বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন- একটি তারকা প্রতি ৭০ হাজার বছর পর পর উদিত হয়; আমি সেটিকে ৭০ হাজার বার উদিত হতে দেখেছি। এতে আপনি আমার বয়স আন্দায করে নিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- সেটিই ছিল আমার নূর।

(৭) আর একটি হাদীছে বলা হয়েছে ঃ হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির ১৪ হাজার বছর পূর্বে আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূর আকারে বিদ্যমান ছিলাম।

খণ্ডন ঃ

বাতিলপন্থীদের দলীল হিসেবে প্রদত্ত এ হাদীছগুলোর ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সিদ্দীক আল গুমারী (রহঃ), শায়খ আহমদ ইব্‌নে আব্দুল কাদের শানকীতী; হাফেজ ইব্‌নে তাইমিয়া (রহঃ) সহ অন্যান্য হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ মন্তব্য করেছেন যে, এসবগুলিই জাল, মিথ্যা ও বানোয়াট।[১]

---

১. দ্র ঃ নিম্নোক্ত কিতাবাদিঃ
(১) المرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر. الغمری
(২) تنبيه الحذاق على بطلان ما شاء بين الانام فی حديث النور المنسوبی لمصنف عبد الرزاق
(৩) مجوعه فتاوی ابن تيميه جـ/١٨ প্রভৃতি কিতাব। বরাত - মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেবের তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় প্রকাশিত "প্রচলিত জাল হাদীছ" ॥

৪. নবী করীম (সাঃ) নূর ছিলেন - এ প্রসঙ্গে বিদআতীগণ ঐ রেওয়ায়েত দ্বারাও দলীল দিয়ে থাকেন যাতে বলা হয়েছে নবী করীম (সাঃ)-এর ছায়া ছিল না।

খণ্ডন ঃ

মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ) বলেছেন ঃ[১] এ সম্পর্কিত কোন সহীহ রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) তাঁর خصائص كبری গ্রন্থে এ রেওয়ায়েতটি হাকিম তিরমীযী-র বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তবে নিম্নোক্ত কারণ সমূহের ভিত্তিতে সে রেওয়ায়েতটি গ্রহণযোগ্য নয়ঃ

(১) উক্ত রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন আব্দুর রহমান ইব্‌নে কায়ছ যা'ফরানী, যিনি গ্রহণযোগ্য রাবী নন। এমনকি তার সম্বন্ধে জাল হাদীছ রচনা করারও অভিযোগ রয়েছে। তার সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যসমূহ লক্ষ্যণীয়ঃ

١. قال فی الميزان كذبه ابن مهدی وابو زرعة -

٢. قال البخاری : ذهب حديثه -

٣. قال احمد لم يكن شئ -

(২) উক্ত রেওয়ায়েতটি মুরসাল (مرسل), যা মুহাদ্দিছীনে কেরামের অনেকের নিকট দলীলযোগ্য নয়। বিশেষতঃ এরূপ হাদীছ দিয়ে আকাইদের বিষয়ে দলীল দেয়া চলে না।

(৩) রাসূল (সাঃ) কর্তৃক রৌদ্রে এবং চাঁদের আলোতে চলার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল রাসূল (সাঃ)-এর ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র বিষয়ও বর্ণনা করা। যদি রাসূল (সাঃ)-এর ছায়া না পড়ার মত একটি অলৌকিক বিষয় ঘটত, তাহলে তা অসংখ্য সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হত। কিন্তু সেখানে মাত্র একটি রেওয়ায়েতে তা বর্ণিত হওয়া তাও একটি জয়ীফ রেওয়ায়েতে - এ বিষয়টি উপরোক্ত রেওয়ায়েতকে অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।

৫. বিদআতীগণ ঐ রেওয়ায়েত দ্বারাও দলীল দিয়ে থাকেন যাতে নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক নিজেকে নূর বানিয়ে দেয়ার দু'আ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলতেন ঃ اللهم اجعلنی نورا -
অর্থাৎ, হে আল্লাহ ! আমাকে নূর বানিয়ে দাও।

খণ্ডন ঃ

তিনি নিজেকে নূর বানিয়ে দেয়ার দু'আ করতেন - এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি নূর ছিলেন না। আর বস্তুতঃ এখানে নূর অর্থ হল হেদায়েতের নূর। তিনি নিজেকে নূর বানিয়ে দেয়ার দু'আ করতেন তথা তাঁর হেদায়েতের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে দেয়ার দু'আ করতেন।

নূর ও বাশার প্রসঙ্গে দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে রেজাখানীদের একটি মিথ্যা অভিযোগ ও তার খণ্ডন ঃ

রেজাখানী বা রেজভীগণ মাওঃ শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ ও আকাবীরে দেওবন্দের ব্যাপারে একটি মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন যে, তারা নবী করীম

---

١. جواهر الفقه . جـ/٣ ॥ ٢. ايضا ॥

(সাঃ)কে নিজেদের মত মানুষ মনে করেন এবং নবী করীম (সাঃ)-এর মর্যাদা বড় ভাইয়ের মত বলে মনে করেন।

খণ্ডন ঃ

এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের যে আকীদা, দেওবন্দ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এরও সেই আকীদা। (দ্রঃ عقائد علماء دیوبند و المهند علی المفند)

স্বয়ং হযরত মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) 'تقوية الايمان' গ্রন্থের ৫৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

سب انبیاء اولیاء کے سردار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور لوگوں نے انہیں کے بڑے بڑے معجزے دیکھے، انہیں سے سب اسرار کی باتیں سیکھیں اور سب بزرگوں کو انہیں کی پیروی سے بزرگی حاصل ہوئی۔

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) সমস্ত আম্বিয়া এবং আউলিয়ায়ে কেরামের সর্দার ছিলেন। আর মানুষ তাঁর বড় বড় মু'যিজা দেখেছে, তাঁর থেকেই সমস্ত সুক্ষ্ম বিষয়াদী শিখেছে এবং সমস্ত বুযুর্গদের বুযুর্গী অর্জন হয়েছে তাঁরই অনুসরণ অনুকরণের মাধ্যমে।

ওরশ প্রসঙ্গঃ

ওরশ-এর অর্থ ঃ

ওরশ (عرس)-এর আভিধানিক অর্থ বিবাহ, বাসর। পরিভাষায় ওরশ বলতে বোঝায় বৎসরান্তে কোন ওলী ও বুযুর্গের মাযারে সমবেত হয়ে ধুমধাম সহকারে ফাতেহাখানী, ঈসালে ছওয়াব, ভোজ ইত্যাদির আয়োজন করা।

ওরশ-এর হুকুম ঃ

ওরশ-এর ক্ষেত্রে দুটো বিষয় পালিত হয়ে থাকে।

(এক) বৎসরান্তে নির্দিষ্ট দিনে কোন ওলী ও বুযুর্গের কবর যিয়ারতে সমবেত হওয়া এবং ঈসালে ছওয়াব করা অর্থাৎ, মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করা।।

(দুই) সংশ্লিষ্ট ওলী ও বুযুর্গের কবর দূরে হলে প্রয়োজনে সেই উদ্দেশ্যে সফর করা।

এখন ওরশের হুকুম বুঝতে হলে এই দুটো বিষয়ের হুকুম পৃথক পৃথক ভাবে বোঝা আবশ্যক।

১ম বিষয়ের হুকুম ঃ

বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি সুধারণা রাখা এবং মহব্বত পোষণ করা, যথাযথভাবে তাঁদের পদাংক অনুসরণ অনুকরণ করে চলা এবং তাঁদের মৃত্যুর পর নিয়মানুসারে ইছালে সাওয়াব করা, তাঁদের মর্যাদা বুলন্দির জন্য দু'আ করা- এসবই প্রশংসনীয় কাজ এবং উত্তম আমল সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তবে কবর যিয়ারাতের জন্য কোন দিনকে নির্দিষ্ট করে সকলেই সেদিনে

সমবেত হওয়াকে শরী'আত আদৌ সমর্থন করে না। বিশেষ করে বৎসরান্তে এক দিনকে নির্দিষ্ট করা যাকে পরিভাষায় ওরশ বলা হয়- শরী'আতে এর কোনই ভিত্তি নেই। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

لاتجعلوا قبری عیدا -(نسائی - مشکوة جـ١/ صـ ٨٦)

অর্থাৎ, তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিও না।

মুহাদ্দিছীনে কেরাম এর বিভিন্ন অর্থ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন-

এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে - "لاتجعلوا للزيارة اجتماعكم للعيد" অর্থাৎ, তোমরা ঈদে সমবেত হওয়ার মত যিয়ারতের জন্য সমবেত হয়ো না। আর ওরশের মাঝে এমন সমাবেশই ঘটানো হয়ে থাকে- যা থেকে নবী করীম (সাঃ) নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ

المراد الحث علی کثرة الزیارة ای لاتجعلوا کالعید الذی لایأتی فی السنة الامرة - (ذکره فی المرقات - هامش مشکوة جـ١/ صـ ٨٦)

অর্থাৎ, এর দ্বারা মানুষকে বেশী বেশী যিয়ারাতের উপর উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, তোমরা আমার কবরকে ঈদের মত বানিও না, যা বৎসরে একবার পালন করা হয়। বরং বেশী বেশী আমার কবর যিয়ারাত কর। আর ওরশও বৎসরে একবার উদযাপীত হয়। সুতরাং ওরশ করা হাদীছ পরিপন্থী। আর নবী করীম (সাঃ)-এর কবরেই যখন ওরশ করা জায়েয নেই, তখন অন্য কারও কবরে তো এমনটি জায়েয হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) লিখেছেনঃ

لاتجعلوا زیارة قبری عیدا - اقول هذا اشارة الی سد مدخل التحریف کما فعل الیهود والنصری بقبور انبیائهم وجعلوها عیدا وموسما بمنزلة الحج - (حجة الله البالغة جـ٢/ صـ ٧٧ طبع مصر)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) যে বলেছেনঃ তোমরা আমার কবর যিয়ারাতকে ঈদ বানিও না। আমি বলব - এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যেন তাহ্‌রীফের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কেননা ইয়াহুদ নাসারারা তাদের আম্বিয়া (আঃ)-এর কবরকে হজ্জের মতো ঈদ এবং মওসূমী বানিয়ে নিয়েছে।

যেমনিভাবে হজ্জের জন্য বিশেষ সময়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তা আঞ্জাম দেয়া হয়, ঠিক তেমনিভাবে ইয়াহুদী নাসারারা তাদের নবীদের কবরের সাথেও এমন করে থাকে। আর নামকে ওয়াস্তে মুসলমানরা আম্বিয়ায়ে কেরামের পরিবর্তে আউলিয়া কেরামের কবরের সাথে বরং বানাওয়াটি কবরের সাথে এমনটি করে থাকে। যা দেখে ইয়াহুদী নাসারাগণও লজ্জিত হয়।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) আরও লিখেছেন ঃ

ومن اعظم البدع ما اخترعوا فی امور القبور واتخذوها عیدا - (تفهیمات الهیه جـ٢/ صـ ٦٤)

অর্থাৎ, ঐ সকল বিষয়ও বড় বিদ'আত সমূহের অন্তর্ভুক্ত, কবরের ব্যাপারে মানুষ যা উদ্ভাবন করেছে এবং কবরকে তারা ঈদের মত মেলায় পরিণত করেছে।

হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেনঃ কবর যিয়ারাতের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা বিদ'আত। মূলতঃ যিয়ারত করা জায়েয কিন্তু তার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা (যা উলামায়ে সালাফের মাঝে ছিল না) বিদ'আত।[১]

হযরত কাজী ছানাউল্লাহ হানাফী বলেন ঃ

لايجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولياء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السرج والمساجد عليها ومن الاجتماع بعد الحول كا لاعياد ويسمونه عرسا - (تفسير مظهرى جـ/٢ صـ ٦٥)

অর্থাৎ, অজ্ঞ, মূর্খরা আউলিয়া ও শুহাদাদের কবরের সাথে যা করে থাকে, এসব নাজায়েয। তথা- কবরকে সাজদা করা, কবরের চতুর্পাশে তওয়াফ করা, বাতি জ্বালানো, তাদের দিকে ফিরে সাজদা করা এবং বৎসরান্তে ঈদের মত সেখানে সমবেত হওয়া যাকে তারা ওরশ বলে।

আর ارشاد الطالين এর ১২ নং পৃষ্ঠায় লিখেন ঃ

قبور اولیاء بلند کردن و گنبد بر آن ساختن و عرس وامثال آں و چراغاں کردن ہمہ بدعت است بعض ازاں حرام است وبعض مکروہ پیغمبر خدا ہر شمع افروزاں نزد قبر وسجدہ کنندگاں را لعنت گفتہ ـ

অর্থাৎ, আউলিয়ায়ে কেরামের কবরকে উঁচু করা, কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা, ওরশ করা, বাতিজ্বালানো- এ ধরনের আরও যা আছে সব বিদ'আত। কতকতো হারাম আর কতক মাকরূহ। নবী করীম (সাঃ) কবরের পাশে বাতি প্রজ্বলনকারী এবং সাজদাকারীদের উপর লা'নত করেছেন।

হযরত শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক (রহঃ) লিখেন ঃ-

مقرر ساختن روز عرس جائز نیست ـ (مسائل اربعين صـ ٣٨)

অর্থাৎ, ওরশের দিন ধার্য করা জায়েয নেই।

২য় বিষয়ের হুকুম ঃ

পূর্বে বলা হয়েছে বুযুর্গানে দ্বীনের কবর যিয়ারাত করা, মৃত্যুর পর নিয়মানুসারে তাঁদের উদ্দেশ্যে ঈছালে ছওয়াব করা, তাঁদের মর্যাদা বুলন্দির জন্য দু'আ করা এসবই প্রশংসনীয় এবং উত্তম কাজ। সেমতে যদি কোন বুযুর্গের কবর ধারে কাছে হয়, তাহলে সেখানে উপস্থিত হয়ে দু'আ করা ও শরয়ী তরীকায় সালাম পৌঁছানো এসব জায়েয। তবে যদি কোন বুযুর্গের কবর অনেক দূরে হয়-তাহলে যিয়ারতের জন্য সেখানে সফর করা

১. فتاوى عزيزى صـ١٧٢ ॥

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট বিতর্কিত বিষয়। যারা নিষেধের পক্ষে তারা নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।[১]

لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد . الحديث -

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমার কাছে কবর, কোন আল্লাহর ওলীর এবাদতখানা এবং তূর পর্বত এ সবগুলোই উপরোক্ত হাদীছের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।[২]

তিনি আরো বলেনঃ কেউ যদি আজমীর শরীফে খাযা মুঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (রহঃ)-এর কবরে কিংবা হযরত সালার মাসউদ গাজীর কবরে অথবা এ ধরনের অন্য কোন কবরে গিয়ে কোন প্রয়োজন পূরণের তলব করে, তাহলে সে হত্যা এবং যিনার চেয়ে মারাত্মক গুনাহ করল।[৩]

হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নৌরী (রহঃ) হযরত আনওয়ার শাহ কাশমীরী-র বরাত দিয়ে বলেছেন আওলিয়ায়ে কেরামের কবর যিয়ারতের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সফরের পক্ষে স্বতন্ত্র দলীল চাই। উপরোক্ত হাদীছ যথেষ্ট নয়। যদিও ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেছেন উপরোক্ত হাদীছে তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের অতিরিক্ত কোন ফযীলত না থাকায় তার উদ্দেশ্যে সফর করতে নিষেধ করেছেন তবে বিভিন্ন ওলীর সাথে বিভিন্ন জনের মুনাসাবাত থাকার কারণে তাদের কবর যিয়ারাতের দ্বারা ভিন্ন ফায়দা হতে পারে এ হিসেবে তার জন্য সফর করাতে কোন ক্ষতি না থাকা চাই।

আল্লামা শামী নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা কোন ওলীর কবর দূরে হলে তার জন্য সফর করা যেতে পারে বলে মত দিয়েছেন।

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يأتى قبور الشهداء بأحد على رأس كل سنة - (مصنف ابن ابى شيبة)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক বৎসরের মাথায় ওহুদ প্রান্তরে শহীদগণের কবরের কাছে আসতেন।

তবে এই ইস্তিদলাল পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা, রাসূল (সাঃ) শুহাদায়ে ওহুদের কবর যিয়ারতের জন্য মদীনা থেকে ওহুদের পাদদেশে গিয়েছিলেন। এটাকে কোন সফর বলা যায় না। মদীনা থেকে ওহুদ মাত্র তিন মাইলের পথ।

ওরশ-এর পক্ষে দলীল ও তার খণ্ডন ঃ

মৌলভী আব্দুস সামী' সাহেব, মুফতী আহ্‌মদ ইয়ার খান সাহেব ও সুরেশ্বরীর পীর সাহেব প্রমুখ ওরশপন্থী অনেকেই উপরোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা ওরশ পালন তথা নির্দিষ্ট দিনে কবরের কাছে গমন ও ঈছালে ছওয়াব করার পক্ষে দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) বৎসরান্তে শুহাদায়ে ওহুদের কবরের পাশে যেতেন। অর্থাৎ, সেখানে যেয়ে সালাম বলতেন ও দু'আ করতেন। তাদের এ দলীল ঠিক নয়। কেননা এ

১. এ হাদীছ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৪৪৮ ॥ ২. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯২ ॥ ৩. تفهيمات الهيه جـ/٢ صـ ٤٥ ॥

রেওয়ায়েতে বৎসরান্তে নবী (সাঃ)এর গমনের কথা উল্লেখ আছে তবে সেটি নির্দিষ্ট তারিখেই হত এমনটি হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট নয়। তদুপরি সেখানে ওরশের মত সমবেত হওয়া এবং কুরআন তেলাওয়াত ও ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদির কথা -প্রচলিত ওরশ বলতে যা বোঝায় তার- উল্লেখ নেই। উপরোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা শুধু এতটুকু বলা যেতে পারে যে, কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর হতে পারে। যদিও এই ইস্তিদলাল পূর্ণাঙ্গ নয় কেননা, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) শুহাদায়ে ওহুদের কবর যিয়ারতের জন্য মদীনা থেকে ওহুদের পাদদেশে গিয়েছিলেন। এটাকে কোন সফর বলা যায় না। মদীনা থেকে ওহুদ মাত্র তিন মাইলের পথ।

মোটকথা- এমন কোন সহীহ্ আকলী (যুক্তিগ্রাহ্য) ও নকলী (কুরআন হাদীছে বর্ণিত) দলীল নেই যা ওরশের বৈধতার পক্ষে দলীল হতে পারে।

ওরশ-এর কথিত ফায়দা ও তার খণ্ডন ঃ

মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেব ওরশ পালন তথা নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হওয়ার উপকারিতা সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ ওরশের সময় নির্দিষ্ট করা হলে মানুষের জমায়েত হওয়া সহজ হয়। তারা সমবেত হয়ে, কুরআন তেলাওয়াত, কালিমায়ে তাইয়্যিবা এবং দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে থাকে। এতে অনেক বরকত ও ছওয়াব অর্জিত হয়।[১]

মুফতী সাহেবের একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা শায়খ আলী মুত্তাকী হানাফী লিখেছেনঃ

الاجتماع لقراء ة القرآن على الميت با لتخصيص فى المقبرة او المسجد او البيت بدعة مذمومة - (رسالة رد بدعت)

অর্থাৎ, বিশেষ করে কবরস্থানে, মসজিদে এবং বাড়ীতে মৃত ব্যক্তির উপর কুরআন তেলাওয়াতের জন্য সমবেত হওয়া বিদ'আত।

সুতরাং সমবেত হওয়াটাই যখন বিদ'আত তখন কুরআন তেলাওয়াতের জন্য জমায়েত হওয়ার কোন অর্থই হতে পারে না।

কবরে বাতি জ্বালানো প্রসঙ্গে

কবরে কোন ধরনের প্রদীপ, মোমবাতি, কিংবা আলো জ্বালানোর কোন ভিত্তি শরী'আতে নেই। বরং শরী'আত এগুলোকে অত্যন্ত কোপের দৃষ্টিতে দেখে। এগুলি নিষিদ্ধ। নিম্নে এ ব্যাপারে কয়েকটি দলীল প্রদান করা হল ঃ

১ নং দলীল ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج - (ابوداؤد جـ٢ صـ ١٠٥ - نسائى جـ١ صـ ٢٢٢ - موارد الظمان صـ ٢٠٠ - مشكوة جـ١ صـ ٧١ طيالسى صـ ٣٥٧)

১. جاء الحق صـ ٣٠٩ ॥

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) কবর যিয়ারাতকারিনী মহিলা, কবরকে সাজদার স্থান বানানে ওয়ালা এবং কবরে বাতি প্রজ্জলনকারীর উপর লা'নত করেছেন।

উপরোক্ত হাদীছে নবী করীম (সাঃ) আলেম এবং জাহেলের কবরের মাঝে কোন পার্থক্য করেননি বিধায় সব ধরনের কবরেই বাতি প্রজ্জলিত করা লা'নত জনক বলে প্রমাণিত।

সুতরাং যে কাজের জন্য নবী করীম (সাঃ) লা'নত বা অভিসম্পাত করেছেন, সেকাজ কিছুতেই জায়েয কিংবা মুস্তাহাব হতে পারে না এবং তাতে কোন ধরনের বকরত ও কল্যাণ থাকতে পারে না।

উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে বিদ'আতীদের একটি অপব্যাখ্যা ও তার উত্তর ঃ

বিদ'আতীগণ এ হাদীছের অপব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, উক্ত হাদীছে যেহেতু 'على' (যার অর্থ উপরে) শব্দ এসেছে, তাই তার দ্বারা কবরের উপর বাতি জ্বালানো নাজায়েয প্রমাণিত হবে, কবরের আশ-পাশে বাতি জ্বালানো না জায়েয প্রমাণিত হবে না।

এরূপ ব্যাখ্যা অজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা على বর্ণটি উপর ও আশ-পাশ উভয় অর্থই জ্ঞাপন করে থাকে। যেমনঃ 'او كالذى مر على قرية - الاية' -এ আয়াতে على বর্ণটি উপরের অর্থে আসেনি যে, উযায়র (আঃ) বস্তিবাসীর ঘর-বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছেন। বরং অর্থ হল বস্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছেন। অনুরূপ মে'রাজের হাদীছে এসেছে- নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ فمررت على موسى (متفق عليه) অর্থাৎ, মূসা (আঃ)-এর কাছ দিয়ে আমার যাত্রা হয়েছে। অনুরূপ কুরআনে এসেছেঃ ولا تقم على قبره অর্থাৎ, তুমি মুনাফিকের কবরের পাশে দাঁড়াবে না।

এসব স্থানে 'على' বর্ণটি আশ-পাশের অর্থে এসেছে। সুতরাং উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা কবরের উপর বাতি দেয়া যেমনি ঘৃণিত কাজ বলে প্রমাণিত হবে, তেমনি কবরের আশ-পাশে বাতি দেয়াও। বরং দ্বিতীয়টি মানুষের মাঝে বেশী প্রচলিত ছিল এবং এখনো আছে। তাই এটিই নিষেধাজ্ঞার মূল লক্ষ্যবস্তু হওয়ার কথা। অতএব এটিই বেশী ঘৃণিত বলে প্রমাণিত হবে।

২ নং দলীল ঃ

হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) মৃত্যুকালে ওসিয়্যাত করে বলেছিলেন ঃ

فاذا انا مت فلا تصاحبنى نائحة ولا نار - (مسلم جـ١ صـ ٧٦)

অর্থাৎ, আমি যখন মৃতুবরণ করব, তখন কোন মাতমকারিনী মহিলা এবং আগুন যেন আমার সাথে না যায়।

হযরত আসমা বিন্তে আবি বকর (রাঃ)ও এই ওসিয়্যাত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

ولا تتبعونى بنار - (موطأ امام مالك صـ ٧٨)

অর্থাৎ, তোমরা আমার সাথে আগুন নিয়ে যাবে না।

এভাবে সাহাবায়ে কেরাম মৃতুর সময় ওসিয়্যাত করে গেছেন যে, তাদের সাথে যেন আগুন নিয়ে যাওয়া না হয়। অথচ আজকাল ধুমধাম করে কবরে বাতি দেয়া হচ্ছে।

বাতি জ্বালানোর একটি কথিত ফায়দা ও তার জওয়াব ঃ

বলা হচ্ছে- এর মাধ্যমে বুযুর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু আমাদের জেনে রাখা দরকার হুজুর (সাঃ)-এর লা'নত কৃত কাজ করে এবং হাদীছের বিরুদ্ধাচরণ করে কোন সম্মান প্রদর্শন হতে পারে না।

কবরে বাতি জ্বালানো সর্বস্তরের উলামায়ে কেরামের নিকট নিষিদ্ধ ঃ

ইমাম নববী (রহঃ) লিখেনঃ

واما اتباع الميت بالنار مكروه للحديث ثم قيل سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية وقال ابن حبيب المالكى كره تفاولا بالنار -

অর্থাৎ, মাইয়্যেতের সাথে আগুন নিয়ে যাওয়া হাদীছের আলোকে মাকরূহ বা অপছন্দনীয়। আর মাকরূহ হওয়ার কারণ হল এটা জাহেলিয়্যাতের শি'আর বা প্রতীক। ইব্নে হাবীব মালেকী বলেনঃ বদফালী বা কুলক্ষণ জনক হওয়ার দরুন (যেন তার মু'আমেলাও আগুনের সাথে না হয়) এটা মাকরূহ।

হাফেজ ইবনুল কাইয়েম লিখেছেন ঃ

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وايقاد السرج عليها -

(زاد المعاد جـ١ صـ ١٧٩)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) কবরকে সাজদার স্থান বানানো এবং তাতে বাতি জ্বালানোকে নিষেধ করেছেন।

ফতওয়ায়ে আলমগিরীতে আছে-

وايقاد النار على القبور فمن رسوم الجاهليه والجهل والغرور - (عالمگيرى جـ١ صـ ١٦٧)

অর্থাৎ, কবরে বাতি জ্বালানো জাহিলিয়্যাতের প্রথা/রুসূম, ভ্রান্তি এবং ধোকা।

আর নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্র কছে সর্ব নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে, ইসলামের মাঝে জাহিলিয়্যাতের রুসূম তালাশ করে।[১]

মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেবও বর্ণনা করেছেন হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) কবরে বাতি জ্বালানোকে নিকৃষ্টতর বিদ'আত মনে করেন।[২]

হযরত শাহ রফিউদ্দীন (রহঃ) লিখেছেন ঃ

واما ارتكاب محرمات از روشن كردن چراغها وملبوس ساختن قبور وسرودها ونواختن معازف بدعات شنيعه اند وحضور چنيں مجالس ممنوع است - (فتاوى شاه رفيع الدين. صـ ١٤)

১. جاء الحق صـ ٢٨٨ - ٢٨٩ ২. مشكوة جـ١ صـ ٢٧ عن البخارى

অর্থাৎ, হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া যেমনঃ কবরে বাতি জ্বালানো, কবরে পর্দা টানানো এবং গান-বাজনার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা নিকৃষ্টতর বিদ'আত এবং এ ধরনের আসরে অংশ গ্রহণ করাও নিষেধ।

সুতরাং এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে বুঝা গেল নবী করীম (সাঃ) থেকে নিয়ে অদ্যাবধি সমস্ত আহ্লে হক উলামায়ে কেরাম কবরে বাতি জ্বালানোকে লা'নত জনক, হারাম, মাকরূহ, বিদ'আত, নিকৃষ্টতর বিদ'আত বলে আখ্যা দিয়েছেন। অতএব কবরে বাতি জ্বালানোর মাঝে কোন ধরনের কল্যাণ থাকতে পারে না।

* * * * *

পঞ্চম অধ্যায়

(রাজনৈতিক মতবাদ বিষয়ক)

রাজতন্ত্র

(Monarchy [মনার্কি])

"রাজতন্ত্র" বলতে সাধারণতঃ অবাধ ক্ষমতার অধিকারী বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত রাষ্ট্র বা উক্ত পন্থায় রাজ্য শাসন পদ্ধতিকে বুঝায়। নির্বাচিত বা বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী কোন একমাত্র লোক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও তার শাসনকে রাজতন্ত্র বলা হয়।

আইনানুগ নিয়ম দ্বারা রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে "সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র" বলে। গণপ্রতিনিধিদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা চলে যাওয়ায় রাজা কেবল নামমাত্র রাষ্ট্র প্রধানে পরিণত হলে তাকে "নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র" বলে। গণপ্রতিনিধিদের নিকট বা অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা চলে গেলে প্রকৃতপক্ষে তা রাজতন্ত্র নয় বরং গণতন্ত্র বা "অভিজাততন্ত্র"। ইংল্যাণ্ডে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হতে হতে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজা (বা রাজপদে আসীনা রাণী) সেখানে জাতীয় একতার প্রতীক মাত্র; তিনি মন্ত্রিসভার বা পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে সব দলীল-পত্রই সই করতে বাধ্য। নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব ছাড়া রাজা (বা রাণী) হিসেবে তার কোনই বাস্তব শাসন ক্ষমতা নেই।

সম্ভবতঃ রাজতন্ত্রই পৃথিবীর প্রাচীনতম সরকার বা রাজ্যশাসন পদ্ধতি। কোন না কোন কালে প্রায় সব দেশেই কমবেশ এটা ছিল। রাজা বিধিদত্ত ক্ষমতায় শাসন করেন - এই বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল। জাতীয় রাষ্ট্রগুলি প্রথম শক্তিশালী রাজতন্ত্ররূপে গড়ে ওঠে। রোম সাম্রাজ্যে, মধ্যযুগে সর্বত্র, বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্সে, এবং ১৯শ শতক পর্যন্ত রাশিয়া, তুরস্ক, প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া ও হাংগেরিতে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্র ছিল। এখনও এশিয়া এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশে এরূপ পদ্ধতি টিকে আছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে রাজতন্ত্র সম্বন্ধে পর্যালোচনা ঃ

ইসলামে রাজ্যশাসন পদ্ধতি কি হবে তা নির্দিষ্ট। তা হল কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে রাজ্য পরিচালনা পদ্ধতি তথা ইসলামী খেলাফত পদ্ধতি। তবে সরকার প্রধান নির্বাচনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ ইসলামে কয়েকটা পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হয়। যথা ঃ

১. পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক পরবর্তী খলীফার মনোনয়ন। যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসেবে হযরত ওমর (রাঃ) কে মনোনীত করে যান। উম্মতের সর্বসম্মত মতে এটা জায়েয। তবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে এটা করেছিলেন।

এ ক্ষেত্রে মনোনয়নকৃত পরবর্তী খলীফা যদি মনোনয়ন দানকারী খলীফার পুত্র হন, তাহলে প্রচলিত রাজতন্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী সেটা রাজতন্ত্র আখ্যায়িত হবে, কেননা সেটা বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত রাষ্ট্র হয়ে যায়। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে ইসলামে তার অবকাশ রয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন এটা যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে হতে হবে। যেমন হযরত মু'আরিয়া (রাঃ) তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে পরামর্শক্রমে মনোনয়ন দিয়ে যান এবং সাহাবাগণ কর্তৃক এই মনোনয়নের বিরোধিতা করা হয়নি। এতে এ পদ্ধতির ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মৌন ইজ্‌মা (ঐক্যমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে যুবায়ের ও হযরত হুসাইন (রাঃ) ইয়াযীদের বিরোধিতা এ কারণে করেননি যে, ইয়াযীদ রাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা কখনও এ কথা বলেননি যে, ইয়াযীদের মনোনয়ন শুদ্ধ নয়। বরং তারা বিরোধিতা করেছেন অন্য কারণে। হযরত হুসাইন (রাঃ)কে কূফার লোকেরা খলীফা বানাতে চেয়েছিলেন এবং তিনি মনে করেছিলেন ইয়াযীদের তুলনায় তিনি খলীফা হওয়ার অধিক যোগ্য। এ দৃষ্টিভংগিতে তিনি কুফায় রওয়ানা দিয়েছিলেন। তারপর পথিমধ্যে তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। জিহাদের নিয়তও তাঁর ছিল না, নতুবা নারী ও শিশুদেরকে তিনি সঙ্গে নিতেন না। তদুপরি জিহাদের নিয়ত থাকলে মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় যেসব সাহাবী তাকে বাঁধা দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদেরকে বলতে পারতেন যে, জিহাদে বাঁধা দেয়া অন্যায়; তোমরা কেন সে অন্যায় করছ ? হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে যুবায়ের (রাঃ)ও ইয়াযীদের তুলনায় নিজেকে খেলাফতের অধিক যোগ্য বিবেচনায় ইয়াযীদের বিরোধিতা করেন। এই বিরোধিতার ক্ষেত্রে তিনিও এ কথা কখনও বলেননি যে, ইয়াযীদের মনোনয়ন অবৈধ, তাই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

২. খলীফা তার পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য বিশেষ জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করে দিয়ে যেতে পারেন। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠন করে দিয়ে যান।

৩. খলীফা তাঁর পরবর্তী খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের বিষয়টি জনগণের উপর ছেড়ে দিয়ে যাবেন। তারপর জনগণই তাদের খলীফা মনোনীত করবে। যেমন হযরত উছমান (রাঃ) তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি পরবর্তীদের উপর ছেড়ে দিয়ে যান।

উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির সারকথা হল খলীফা মনোনয়ন করবে সাধারণ জনগণ অথবা জনপ্রতিনিধিগণ তথা যথাযথ কর্তৃত্ব সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ (اہل حل وعقد)। যথাযথ কর্তৃত্ব সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ (اہل حل وعقد) বলতে বোঝায় রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, সেনা কর্মকর্তা ও জাতীয় কর্তৃত্ব সম্পন্ন নেতৃবৃন্দ। যথাযথ কর্তৃত্ব সম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে কাউকে মনোনয়ন দেয়া হলে সেটা প্রচলিত গণতন্ত্র বিরোধী এবং রাজতন্ত্র বলে মনে হলেও ইসলামে সেটার অবকাশ রয়েছে। যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর বেলায় করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, কেউ বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতা সুসংহত করে নিতে পারলে এবং কিছু লোক তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করে নিলে অর্থাৎ, তাকে খলীফা হিসেবে স্বীকার করে নিলে অন্যরা তাকে খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি দিবেন। ইসলামের ইতিহাসে এরূপ দেখা যায় বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করার পর কিছু লোক তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করলে অর্থাৎ, তাকে খলীফা হিসেবে স্বীকার করে নিলে অন্যরা তাকে খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তখনকার উলামা, ফুকাহা ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন তার খেলাফতকে অবৈধ ঘোষণা দেননি। প্রচলিত গণতন্ত্রবাদীদের কাছে এটা রাজতন্ত্রের বা সৈরতন্ত্রের কাছাকাছি বলে মনে হলেও এটা খলীফা মনোনয়নের কোন বিধিবদ্ধ পদ্ধতি নয়। এটা শুধু ফিতনা থেকে রক্ষার একটা সাময়িক পদ্ধতি।[১]

নাৎসীবাদ
(Nazism/জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ)

"নাৎসীবাদ" বা Nazism বলতে বোঝানো হয় জার্মানির "ন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি" (জাতীয় সমাজতন্ত্রী শ্রমিক দল)-এর আদর্শকে। একে "জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ" (National Socialism/ন্যাশন্যাল সোশ্যালিজম)ও বলা হয়। নাৎসী (Nazi) কথাটি এই দলের নামের সংক্ষিপ্ত আকার (NSDAP) থেকে উৎপন্ন। জার্মান-একনায়ক নেতা এ্যাডলফ্ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫?)এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৩-৪৫ খৃষ্টাব্দে এই মতবাদ হিটলারের একদলীয় একনায়কত্বাধীন শাসনের কর্মসূচী হয়। তার ক্ষমতা দখল করার পর একমাত্র নাৎসী দলই আইন সঙ্গত দল বলে স্বীকৃত হয়।

১. তথ্যসূত্র ঃ মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, الاحكام السلطانية للماوردى , تاریخ ملت (خلافت راشده) ও অন্যান্য ॥

এ্যাডলফ হিটলারের জন্ম উত্তর অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ-য়ে। তিনি ছিলেন জনৈক অস্ট্রীয় শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীর পুত্র। লেখাপড়া শিখেন মিউনিকে। ১৯০৭ এবং তৎপর কয়েক বৎসর চরম দারিদ্রের মধ্যে কাটান। তার ইয়াহুদী বিরোধী মনোভাব তখন বেড়ে উঠে। ১ম বিশ্বযুদ্ধে বাভেরীয় সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হন; করপোরাল পদে উন্নীত হন, সাহসিকতার জন্য আয়রন কৃস লাভ করেন। যুদ্ধের পর তিনি এবং কতিপয় অসন্তুষ্ট ব্যক্তি মিউনিকে ন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি (NSDAP) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৮-৯ই নভেম্বর তথাকথিত "বিয়ার-হল পুচ" নামে পরিচিত বিদ্রোহের মাধ্যমে জোরপূর্বক বার্ভোয়ার উপর আধিপত্য লাভের প্রয়াস পান। পাঁচ বৎসরের জন্য লানৎস্‌বেক দুর্গে কারা-বাসের দণ্ডপ্রাপ্ত হন, সেখানেই তিনি নাৎসীবাদের বাইবেল-"মাইন কাম্‌প্ফ" (আমার সংগ্রাম) বইখানি লিখেন। ১৩ মাস পর তিনি মুক্তি পান। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী মন্দা হিটলারের পার্টির (NSDAP) বিস্ময়কর বিকাশে সাহায্য করে।

জাতীয়তাবাদ, ইয়াহুদী বিরোধী আন্দোলন এবং আরও কয়েকটি পুঁজিবাদ-বিরোধী মতের সমাহার থাকার ফলে নাৎসিবাদ জনমনকে আকর্ষণ করে। জার্মান সামাজিক গণতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্য ধনিক শ্রেণীর লোকেরাও নাৎসীবাদের সমর্থন করে। হিট্‌লারের গ্রন্থ "মাইন কাম্‌ফপ" ও অংশতঃ আলফ্রেট্ রোয়েন্ বের্ক্-এর ভুয়া দর্শনের উপর ভিত্তি করে এবং গোবিনো ও চেমবারলিনের জাতিভেদ মতবাদের সূত্রের উপর এই নাৎসীবাদ-মতবাদ গড়ে ওঠে। ইতালীয় ফ্যাসিবাদ ও নীচা (Nietzsche)-এর অতিমানব সম্পর্কিত মতবাদও এতে ইন্ধন যোগায়।

নাৎসীবাদের প্রধান নীতিগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. একজন অভ্রান্ত নেতার পরিচালনায় নর্ডিক বা আর্য "প্রভু" জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ;

২. তৃতীয় রাইশ (Third Reich) নামে প্যান জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপন এবং ইয়াহুদী ও কমিউনিষ্টদের মত জার্মানির "পরম শত্রুদিগকে" বিলোপ সাধন।

৩."জনগণের ইচ্ছা", "শক্তিই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে" এবং "জার্মানির নিয়তি" প্রভৃতি কথাগুলো সর্বদা আওড়ানো হত।

৪. অভ্যন্তরীণ দমননীতি ও পরদেশ আক্রমণ নাৎসীদের দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত বলে গণ্য হত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নাৎসীবাদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ নরনারীর হত্যার অভূতপূর্ব নৃশংসতা প্রকাশ পায়।[১]

ইসলামের দৃষ্টিতে নাৎসীবাদ সম্বন্ধে পর্যালোচনা ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন জাতির পার্থিব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য অপর কোন জাতির উপর চড়াও হওয়া এবং যুদ্ধের ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া নিছক জাতিগত বিদ্বেষ নিয়ে অপর কোন জাতিকে নিধনে অবতীর্ণ হওয়ার কোন বৈধতা নেই। কোন দলীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দমননীতি চালানোরও কোন অবকাশ নেই। "জনগণের ইচ্ছা"-র নামে স্বেচ্ছাচারিতা চালানো কোন অবস্থাতেই স্বীকৃতি পেতে পারে না। আর

১. তথ্যসূত্রঃ মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড ॥

"শক্তিই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে" ন্যায়নীতির কোন বালাই থাকবে না -এমন নীতি গোয়ার্তুমী বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। আর কোন জাতির নিয়তি তার নিজের হাতে, যেমন "জার্মানির নিয়তি" কথাটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে- এ কথাটি সন্দেহাতীত ভাবেই কুফ্‌রী কথা।

সাম্রাজ্যবাদ
(imperialism)

"সাম্রাজ্যবাদ" (imperialism) বলতে সাধারণভাবে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপর শাসনক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করাকে বুঝায়।

ইতিহাসের সূচনা হতে মিসর, মেসোপটেমিয়া, আসিরীয়া, এবং পারসিক সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন রোমক এবং বাইযেন্টাইন সাম্রাজ্যে এবং পরে উসমানীয় তুর্কী সাম্রাজ্যের আমলে সাম্রাজ্যবাদ চরম আকার ধারণ করে। পাশ্চাত্যে আধুনিক জাতীয় ভাব ধারা দ্বারা প্রণোদিত রাষ্ট্রসমূহ গড়ে উঠার ও নব নব দেশ আবিষ্কারের যুগ হতে সাম্রাজবাদের অভ্যুদয় ঘটে। উপনিবেশ কায়েম করে বলপূর্বক ইউরোপীয় নেতৃত্ব কায়েম করা হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উপর কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। হিটলারের নাৎসীবাদে এরূপ কল্পিত জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তা পরিলক্ষিত হয়। জার্মান জাতির কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাদের লক্ষ্য। স্পেন ও পর্তুগাল "বাণিজ্যিক" সাম্রাজ্য এবং ব্রিটিশ ও ফরাসীরা "ঔপনিবেশিক" সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির মূল কারণ ছিল বাণিজ্যবাদ। যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়, এটা ছিল "সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত লক্ষ্য বিশিষ্ট" (manifest de-siny) রাজ্যবিস্তার। পরে স্পেন-মার্কিন যুদ্ধের ফলে মার্কিন সাম্রাজ্য গড়ে উঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চিন্তাধারা প্রবল হয়; কিন্তু ফ্যাসিবাদী জার্মানী ও জাপান চরম সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ফিলিফাইনকে স্বাধীনতা দিতে থাকে, ল্যাটিন আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্মসূচী অবলম্বন করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শিথিল হয়ে কমনওয়েলথ অব নেশনস গঠিত হতে থাকে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেকাংশে স্বাধীনতার দাবিসূচক আন্দোলনসমূহ তীব্র হতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে সাম্রাজ্যবাদও অবসানের পর্যায়ে উপনিত হয়। ফরাসী অধিকৃত দেশসমূহের পূনর্গঠন, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন (বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত), বার্মা, মালয়েশিয়া, এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য বহু প্রাক্তন উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের স্বাধীনতা অর্জন ২য় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদ অবসানের ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রেখেছে। কমিউনিস্টদের অভিমত পাশ্চাত্য জাতিগুলি এখনও সাম্রাজ্যবাদী, কারণ তারা এখন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা লাভবান হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে পর্যালোচনা ঃ

ইসলাম বৈষয়িক স্বার্থে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপর শাসনক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারকে অনুমোদন দেয় না। ইসলাম মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ

সাধনের লক্ষ্যে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রদান করে। এই দাওয়াতে সাড়া দিলে ইসলাম কারও দেশ দখল, কারও উপর প্রভূত্ব কায়েমকরণ ও কারও উপর কোনরূপ বৈষয়িক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে যায় না। তবে ইসলামের আহবানে সাড়া না দিলে ইসলাম জিহাদের বিধান প্রদান করেছে এবং বিজিত অমুসলিম জনপদের লোকগণ ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করার বিধান রেখেছে। এর উদ্দেশ্য হল যেন সত্য ও সঠিক ধর্ম ইসলামের ঝাণ্ডার মাথা উঁচু হয়ে থাকে এবং সঠিক ধর্ম ইসলাম প্রচারিত ও পালিত হওয়ার পথে কোনরূপ বাঁধা অবশিষ্ট না থাকে।

গণতন্ত্র
(democracy)

"গণতন্ত্র" শব্দটি গ্রীক শব্দ- democracy (ডিমক্র্যাসি)-এর অনুবাদ। পরিভাষায় গণতন্ত্র/democracy বলা হয় জনসাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা সাম্যের নীতি অনুসারে রাষ্ট্রশাসন করা। গণতান্ত্রিক সরকার বলা হয় কোন শ্রেণী, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক শাসনের পরিবর্তে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত সরকারকে।

খৃষ্টপূর্ব ৫ম ও ৪র্থ শতকে গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলিতে সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে। রোমান প্রজাতন্ত্রে জন-প্রতিনিধিত্ব নীতির উদ্ভব হয়। শাসিত ও শাসকের মধ্যে চুক্তি বিদ্যমান থাকার নীতি মধ্যযুগে উদ্ভুত। পিউরিট্যান বিপ্লব, মার্কিন স্বাধীনতা বিপ্লব, ও ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে আধুনিক গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে। জন লক, জে. জে. রূশো, ও টমাস জেফারসন গণতন্ত্রবাদের প্রভাবশালী তাত্ত্বিক ছিলেন। প্রথমে রাজনৈতিক ও পরে আইন সম্পর্কীয় সমান অধিকারের দাবী উত্থাপনের ফলে গণতন্ত্র বর্ধিত হয়। পরবর্তীকালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের দাবিও গণতন্ত্র সম্প্রসারণের সহায়ক হয়। প্রতিযোগিতাশীল রাজনৈতিক দলসমূহের অস্তিত্বের উপর আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কারণ প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধি নির্ধারণের জন্য নির্বাচন আবশ্যক, আর নির্বাচনের জন্য প্রতিযোগিতাশীল রাজনৈতিক দলসমূহের অস্তিত্ব আবশ্যক। গণতান্ত্রিকগণ মনে করেন একমাত্র রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মাধ্যমেই জনগণের সুযোগ সুবিধার সাম্য রক্ষা সম্ভব। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিকদের অভিমত হল অর্থনৈতিক গণতন্ত্রই একমাত্র ভিত্তি, যার উপর সত্যিকার রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সৌধ নির্মান করা যেতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র সম্বন্ধে পর্যালোচনা ঃ

* প্রচলিত গণতন্ত্রে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি মাত্র একটাই। আর তা হল সাধারণ নির্বাচন। পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফত পদ্ধতিতে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি বহুবিধ, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

* প্রচলিত গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের ছোট-বড়, যোগ্য-অযোগ্য, বুদ্ধিমান-নির্বোধ নির্বিশেষে সকলের রায় বা মতামত (ভোট) সমান ভাবে মূল্যায়িত হয়ে থাকে। কিন্তু রাসূল (সাঃ), খোলাফায়ে রাশেদা ও আদর্শ যুগের কর্মপন্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইসলাম

মতামত গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃত্ব সম্পন্ন যোগ্য কর্তৃপক্ষ (ارباب حل وعقد)-এর মতামতের মূল্যায়ন করে থাকে। ঢালাওভাবে সকলের মত গ্রহণ ও সকলের মতামতের সমান মূল্যায়ন দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কুর-আনের একটি আয়াতে এদিকে ইংগিত পাওয়া যায়। আয়াতটি এই ঃ

وان تطع اكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله ـ

অর্থাৎ, যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। (সূরা ঃ ৬-আন্‌আমঃ ১১৬)

* প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা হয়। জনগণকে আইনের উৎস মানা ঈমান পরিপন্থী। কেননা ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে আল্লাহ্‌কেই সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করা হয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قل من بيده ملكوت كل شئ ؟

অর্থাৎ, তুমি বল সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব (সর্বময় ক্ষমতা) কার হাতে ? (সূরা ঃ ২৩-মু'মিনূন ঃ ৮৮)

قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . الاية ـ

অর্থাৎ, তুমি বল হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। (সূরা ঃ ৩-আলু ইমরানঃ ২৬)

* প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকেই সকল ক্ষমতার উৎস এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইন বা বিধানের অথরিটি বলে স্বীকার করা হয়। অথচ বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। তাই প্রচলিত গণতন্ত্র-এর ধারণা ঈমান-আকীদার পরিপন্থী। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ان الحكم الا لله ـ

অর্থাৎ, কর্তৃত্বতো আল্লাহ্‌রই। (সূরা ঃ ৬-আনআম ঃ ৫৭)

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكفرون ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয়না তারা কাফের। (সূরা ঃ ৫-মায়িদাঃ ৪৪)

الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ـ

অর্থাৎ, তুমি তাদেরকে দেখনি যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তাদেরকে তা প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা ঃ ৪-নিসাঃ ৬০)

* গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্রমন্ত্রকে মুক্তির পথ মনে করা এবং একথা বলা যে, ইসলাম সেকেলে মতবাদ, এর দ্বারা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এই যুগে উন্নতি অগ্রগতি সম্ভব নয়- এটা কুফ্‌রী।[১]

ইসলামী গণতন্ত্র

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই। এক মাত্র জনগণ কর্তৃকই নির্বাচিত হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বরং যথাযথ কর্তৃত্ব সম্পন্ন জনপ্রতিনিধি দ্বারাও সরকার প্রধান নির্বাচিত হতে পারে। এর বিপরীত প্রচলিত গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে একমাত্র পদ্ধতি হল জনগণ কর্তৃকই নির্বাচিত হওয়া। অতএব প্রচলিত গণতন্ত্র এবং ইসলামের মধ্যে এই একটি বিরাট মৌলিক ব্যবধান রয়েছে। তদুপরি প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা হয় এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইনের অথরিটি মনে করা হয়। আর পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, জনগণকে আইনের উৎস মানা ঈমান পরিপন্থী। কেননা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে আল্লাহ্‌কেই সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করা হয়। আর জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইন বা বিধানের অথরিটি বলে স্বীকার করা ঈমান-আকীদা বিরোধী। তাই প্রচলিত গণতন্ত্র-এর ধারণা কোন ভাবেই ইসলামে স্বীকৃত নয়। অতএব "ইসলামী গণতন্ত্র" বলে কোন কথা ইসলামে নেই। "গণতন্ত্র" একটি ঈমান-আকীদা ও ইসলামী নীতিমালা বিরোধী ধ্যান-ধারণা সমৃদ্ধ পরিভাষা। এ পরিভাষার সাথে ইসলাম শব্দটি যোগ করলেই তা ইসলামে স্বীকৃত বলে গণ্য হতে পারে না। আর ঈমান-আকীদা ও ইসলামী নীতিমালা বিরোধী ধ্যান-ধারণায় সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে এটিকে কিছু ব্যাখ্যা সাপেক্ষেও ইসলামী পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
(Secularism)

আভিধানিক অর্থ ঃ

Secularism "সেকিউলারিজম"একটি ল্যাটিন শব্দ। Saecularis থেকে উদ্ভূত। তার অর্থ বৈষয়িক, অস্থায়ী এবং প্রাচীন। গীর্জার কোন পাদ্রী যদি বৈরাগ্যবাদী জীবন পরিহার করে বৈষয়িক জীবন যাপনের অনুমতি লাভ করে, তাহলে তাকে "সেকিউলার" বলা হয়। বাংলায় এর অনুবাদ করা হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অথবা বৈষয়িকতাবাদ কিংবা ধর্মহীনতাবাদ।

আভিধানিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা (ধর্ম+নিরপেক্ষতা=ধর্মনিরপেক্ষতা)-এর অর্থ দাঁড়ায় 'নিরপেক্ষতা' অর্থ-স্বতন্ত্র, স্বাধীন, পক্ষপাতশূণ্য ইত্যাদি, সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতা বা ধর্মের পক্ষপাতশূণ্যতা।

---

১. মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, আহকামে যিন্দেগী ও الاحكام السلطانية للماوردى প্রভৃতি থেকে গৃহীত। ॥

এখানে উল্লেখিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বা ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতা-র অর্থ যদি হয় কাউকে কোন ধর্ম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য না করা, তাহলে ইসলামের সাথে এ অর্থের কোন সংঘাত নেই। কারণ ইসলাম জোরপূর্বক কাউকে ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে সে অক্ষুন্ন রেখেছে এবং ইসলামে কোন পক্ষপাতিত্বও নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদেরই তাদের নিজস্ব ধর্ম-কর্ম পালন করার অধিকার রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার প্রত্যেকের সমান। এ অর্থে ইসলামে ধর্মীয় পক্ষপাতশূণ্যতা বিদ্যমান।

পারিভাষিক অর্থ ঃ

পরিভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতা বা Secularism অর্থ ধর্মের প্রভাব থেকে রাজ্য, নীতি, শিক্ষা ইত্যাদিকে মুক্ত রাখা।[১] যারা এই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা, ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম-কর্ম করার বিরুদ্ধে তাদের কোন আপত্তি নেই। তারা সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। ধর্মকে তারা নিতান্ত ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া ব্যাপার-স্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে ধর্মকে নির্বাসিত করাই তাদের লক্ষ্য। এক শ্রেণীর প্রগতিশীলরা এটাকে আধুনিক মতাদর্শের মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

"সেকিউলারিজম"-এর উৎপত্তি ইউরোপে। উনবিংশ শতকে একজন ইংরেজ চিন্তাবিদ "সেকিউলারিজম"কে একটা বিশ্বজনীন আন্দোলনে রূপ দেয়ার চেষ্টা চালান। এরা নিজেদেরকে সেকিউলারিষ্ট, বৈষয়িকতাবাদী-ধর্মবিমুক্ত চিন্তাবিদ পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। এদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন জি. জে. হলিউক (১৮৫৪ খ্রীঃ)। সেকিউলারিজমকে প্রতিষ্ঠিত করণ প্রচেষ্টায় হলিউকের সহকর্মীদের মধ্যে চার্লস সাউথ ওয়েস, থমাস কুপার, থমাস পিটার্সন ও উইলিয়াম বিল্টন প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়। হলিউক ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে "সেকিউলারিজম" পরিভাষাটি রচনা করেন।

ইউরোপে পাদ্রীদের মনগড়া মতামতের সাথে যখন গবেষক ও বৈজ্ঞানিকদের গবেষণালব্ধ মতামতের দ্বন্দ্ব দেখা দিল এবং তারই ভিত্তিতে পাদ্রীদের উৎখাত করার জন্য 'গীর্জা বনাম রাষ্ট্রের লড়াই' নামক দু'শ বৎসর ব্যাপী ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পরিচালিত হল, তখন সংস্কারবাদীরা একটা আপোষ রক্ষার জন্য মার্টিন লুথারের নেতৃতে প্রস্তাব দিল যে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকুক আর সমাজের ও পার্থিব জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যাস্ত থাকুক। এখান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' মতবাদের যাত্রা শুরু হয়। এরপর থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে খৃষ্টান ধর্মযাজক ও পাদ্রীদের প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন ধর্মীয় প্রবনতা থেকে মুক্ত

১. ইংরেজীতে বলা হয় ঃ the doctrine that state, morality, education, etc. should be separated from religion.॥

হয়ে পড়ে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। হলিউক এই আন্দোলনকে নাস্তিকতাবাদের উত্তম বিকল্প হিসেবে অভিহিত করেন।

ঐতিহাসিকভাবে সেকিউলারিজম সব সময় নাস্তিকতাবাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতা ব্রেডলেফ-এর মত ছিল ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস প্রতিহত করাই সেকিউলারিজম এর কর্তব্য। তিনি মনে করতেন ধর্মের এই সব কুসংস্কারমূলক ধারণা বিশ্বাস যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশিত হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত বস্তুগত উন্নতি লাভ করা সম্ভব হবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতা-র পারিভাষিক অর্থ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আচরিত অর্থে ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি কুফ্‌রী মতবাদ। কারণ ধর্মের ব্যাপকতায় রাজ্যনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছু আওতাভুক্ত। ইসলাম জীবনের সব ক্ষেত্র এবং সব কিছুর জন্য আদর্শ। এমন কিছু নেই, যার আদর্শ ইসলামে অনুপস্থিত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى . الاية -

অর্থাৎ, আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এই কিতাব যা সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা ও হেদায়েত। (সূরা ঃ১৬-নাহ্‌লঃ ৬৯)

وقال تعالى : ما فرطنا فى الكتاب من شئ -

অর্থাৎ, আমি এই কিতাবে কোন কিছু বর্ণনা করতে ছেড়ে দেইনি। (সূরা ঃ ৬-আনআমঃ ৩৮)

কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদে ইসলামের এই ব্যাপকতাকে অস্বীকার বা অপছন্দ করা হয়। আর ইসলামের কোন অংশকে অস্বীকার বা অপছন্দ করা কুফ্‌রী। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসকে কেউ যদি কুসংস্কারমূলক ধারণা বিশ্বাস বলে আখ্যায়িত করে, তাহলে তার ঈমান থাকে না।

খৃষ্টান ধর্মযাজকদের মতবাদে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কর্মকান্ড পরিচালনার মত কোন সুষ্ঠু আদর্শ বর্তমান ছিল না। ফলে তাদের সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলন হয়তোবা যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য শাশ্বত আদর্শ রেখেছে এবং তা স্বয়ং সর্বজান্তা সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত আদর্শ। তাই ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতার কোন যৌক্তিকতা বা কোন অবকাশ নেই।

জাতীয়তাবাদ
(nationalism)

জাতীয়তাবাদ কথাটি ইংরেজী nationalism (ন্যাশনালিয্‌ম্‌)-এর অনুবাদ। nation অর্থ জাতি। আরবীতে "কওম" (قوم) অর্থ জাতি। আর "কওমিয়্যাত" (قوميت) অর্থ জাতীয়তা।

এই কওম ও কওমিয়্যাত তথা জাতি ও জাতীয়তা-এর কোন একক ও দ্ব্যর্থহীন বা সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। অভিধানে তাই "জাতি" অর্থ লেখা হয় ধর্ম, জন্মভূমি, রাষ্ট্র, আদিমবংশ, ব্যবসা প্রভৃতির ভিত্তিতে বিভক্ত শ্রেণী বিশেষ। কোন কোন

অভিধানে "জাতীয়তা" বা nationalism-এর অর্থ করা হয়েছে স্বদেশানুরাগ বা দেশাত্মবোধ। এটা একটা মোটামুটি অর্থ, নতুবা আমাদের দেশেও জাতীয়তা নির্ধারিত হয় কি ভৌগলিক সীমারেখার ভিত্তিতে না ভাষার ভিত্তিতে অর্থাৎ, বাংলাদেশী জাতীয়তা না বাঙালী জাতীয়তা তা নিয়ে এখনও মতবিরোধ বিরাজমান। অথচ উভয় মতাবলম্বীই স্বদেশানুরাগ বা দেশাত্মবোধ-এর প্রবক্তা, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কেউ কেউ "জাতীয়তা"-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে - জাতীয় মঙ্গলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক এবং সামাজিক মতবাদ। কিন্তু এ সংজ্ঞায় উল্লেখিত "জাতীয় মঙ্গল" কথাটার মধ্যে "জাতীয়" কথাটার কি অর্থ তাইতো অস্পষ্ট রয়ে গেল। সংজ্ঞার মধ্যে এটা স্পষ্ট করাইতো মূল প্রতিপাদ্য ছিল। তদুপরি এতে জাতীয়তার ভিত্তি কি (ধর্ম, না ভাষা, না ভৌগলিক সীমারেখা, না সাংস্কৃতিক ঐক্য, না অন্য কিছু) তারও কোন দ্ব্যর্থহীন সমাধান বের হয়ে আসেনি।

প্রাচীন আরবদের নিকট কওমিয়্যাত বা জাতীয়তার ভিত্তি ছিল রক্ত সম্পর্ক ও বংশীয় পরিচয়ের ঐক্য। যাদের রক্ত সম্পর্ক ও বংশ পরিচয় এক, তারা এক কওম এবং তাদের এই স্বতন্ত্র পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য কওমিয়্যাত বলে অভিহিত হত। এ অর্থে কওম বা জাতি হল একই পূর্ব পুরুষ হতে উদ্ভূত জনগোষ্ঠি বা গোত্র। কুরআনে কারীমে "কওম" শব্দটি এ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত নূহ, হুদ, সালেহ প্রমুখ নবীদের দাওয়াত প্রসঙ্গে তাঁরা তাদের আদর্শ অমান্যকারীদেরকে يا قومى অর্থাৎ, হে আমার জাতি! বলে আহবান করতেন বলে উল্লেখিত হয়েছে। তারা নবীদের আদর্শিক ঐক্যে একিভূত জাতি ছিল না বরং তারা ছিল রক্ত সম্পর্ক ও বংশ পরিচয়গত ঐক্যে একিভূত জাতি।

নিম্নোক্ত আয়াতেও উপরোক্ত অর্থেই "কওম" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

يقومنا اجيبوا داعى الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم-

অর্থাৎ, (রাসূল [সাঃ]-এর নিকট ইসলাম গ্রহণকারী জিনগণ তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল) হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আহবানকারীর আহবানে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। তাহলে তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। (সূরাঃ ৪৬-আহ্‌কাফঃ ৩১)

আবার আদর্শিক ঐক্যে একিভূত জাতি অর্থেও কুরআন-হাদীছে "কওম" বা জাতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন হাদীছে এসেছে ঃ

اولئک قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحيوة الدنيا - (بخارى)

অর্থাৎ, তারা (কাফেরগণ) এমন সম্প্রদায় যাদের ভাল কাজের বদলা তাদেরকে পার্থিব জীবনেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। (বোখারী)

من تشبه بقوم فهو منهم - (احمد و ابو داؤد)

অর্থাৎ, যে অন্য জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে।

কুরআনে কারীমে জাতি কথাটার আরও এক রকম প্রয়োগ দেখা যায়। হযরত লূত (আঃ) মূলতঃ ছিলেন ইরাকের অধিবাসী। তাঁর জ্ঞাতি-গোষ্ঠি ছিল ইরাকে। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সাদূম এলাকার অধিবাসীদের নিকট। সেখানে তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠির কেউ ছিল না। তার নিকট বালকের আকৃতিতে ফেরেশতারা আগমন করলে সে এলাকার লোকেরা অসদুদ্দেশ্যে তাদের নিকট আসে। তখন হযরত লূত (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেনঃ হে আমার জাতি! তোমরা প্রয়োজনে আমার কন্যাদেরকে বিবাহ কর, তবুও আমার মেহমানদেরকে তোমরা অপমানিত করনা। আয়াতটি এই ঃ

قال يقوم هؤلاء بناتى هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى . الاية -

অর্থাৎ, হে আমার জাতি, এই আমার কন্যাগণ রয়েছে, তারা তোমাদের জন্য (নিয়মানুসারে) অধিক পবিত্র (হতে পারে)। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আমাকে তোমরা আমার মেহমানদের বিষয়ে অপমানিত কর না। (সূরা ঃ ১১-হুদঃ ৭৮)

স্পষ্টতঃই তিনি তাদেরকে আদর্শিক ঐক্য বা রক্ত সম্পর্ক ও বংশ পরিচয়গত ঐক্যের ভিত্তিতে নিজের জাতি বলে আখ্যায়িত করেননি। বরং বলা যায় আঞ্চলিক বা ভৌগলিক সীমারেখা ভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতেই তিনি তাদেরকে নিজের জাতি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

কুরআন-হাদীছে জাতি ও জাতীয়তার এবংবিধ বহুরূপী প্রয়োগ থাকার কারণে দ্ব্যর্থহীনভাবে এটা বলা যায় না যে, জাতীয়তার ভিত্তি হল ধর্ম। আবার এটাও বলা যায় না যে, জাতীয়তার ভিত্তি বংশ, বর্ণ, বা ভৌগলিক সীমারেখা বা অন্য কিছু। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্‌মীরী (রহঃ) ও হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) বলতেন ঃ জাতীয়তার ভিত্তি ধর্ম নয়, অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকেও মুসলমান তার জাতি বলে অখ্যায়িত করতে পারে।[১]

মূলতঃ ইসলাম 'জাতি' বা 'জাতীয়তা'-কে কোন দ্ব্যর্থহীন অর্থবোধক পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করেনি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জনগোষ্ঠি বিভিন্ন এ্যাঙ্গেলে এ দুটোকে পরিভাষায় রূপ দিয়েছে এবং জাতীয়তার ভিত্তি কি সে বিষয়ে নিজ নিজ স্বার্থ বা অবস্থা ভিত্তিক মতামত প্রদান করেছে। বিংশ শতাব্দির প্রথম কয়েক দশক উছমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে আরব দেশসমূহের জাগরণ ও আরব জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনের অর্থে আরব জাতীয়তাবাদ কথাটার ব্যবহার শুরু হয়। তারপর আরবদের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ও সামাজিক বিপ্লবের উপায় হিসেবে তারা আরব জাতীয়তাবাদ (القومية العربية) শব্দের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করে। তখন থেকে আরব জাহানের চিন্তাবিদগণ আরব জাতীয়তাবাদকে একটি দৃঢ় মতবাদের রূপ দিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। ১৯৩৬ সালে ফিলিস্তীনে আরব মুসলিম ও ইয়াহুদীদের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদ নব শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বর্তমানকালে আরব জাতীয়তাবাদের প্রধান উদগাতা হল বাথ (Bath) পার্টি। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে এ পার্টি গঠিত

১. علماء حق . مولنا سيد محمد ميان، قوميت اور اسلام . مولنا حسين احمد مدنى -

হয়। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য কি তা আজও অস্পষ্টতার ধুম্রজালে আচ্ছন্ন রয়ে গেছে। এভাবে বিভিন্ন সময় উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায়, তুরস্কে, ইরান ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অর্থে জাতীয়তাবাদ কথাটার ব্যবহার করা হয়।[১] ভারত বর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের প্রশ্নকে মুখ্য বিবেচনায় সব ধর্মের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বহু উলামায়ে কেরাম মুসলিম হিন্দু ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মাবলম্বী এক জাতি-এরূপ এক জাতিতত্ত্বের ধারণা পেশ করেন। আবার মুসলিম স্বাতন্ত্র ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রয়েজনীয়তা-বোধকে উদ্বুদ্ধ করার চেতনায় অনেকে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার দর্শন পেশ করেন। তারা হিন্দু মুসলিম দুই জাতি-এরূপ দ্বিজাতিতত্ত্ব-এর ধারণা পেশ করেন। এর পাশাপাশি পাশ্চাত্য বরাবরই রাজনৈতিক ও কৃষ্টি-কালচার ভিত্তিক এক জাতীয়তার দর্শন পেশ করে আসছে।

কেউ কেউ ন্যাশনালিয্‌ম্ বা জাতীয়তাবাদ কথাটিকে জাতীয় মঙ্গল ও উন্নতির জন্য উৎসাহব্যঞ্জক বিবেচনা করে এর পক্ষ নিয়ে থাকেন। তাদের ধারণায় এর বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতার মধ্যে রয়েছে স্বদেশ প্রেম, রাজনৈতিক এবং কৃষ্টিগত মুল্যবোধ ও জাতীয় লক্ষের উপর বিশ্বাস। তারা বলেনঃ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাতীয়তাবাদ কথাটার দ্বারা সুফল পাওয়া যায়। তারা মনে করেন এটা জাতিকে শক্তিশালী করে তোলে। আবার কেউ কেউ জাতীয়তাবাদ কথাটাকে অপছন্দ করেন এ কারণে যে, এর দ্বারা এক ধরনের উগ্রতাবোধ জাগ্রত হয়, যা অবাঞ্ছিত পরিণতি ডেকে আনে। ১৯শ শতকে বিভিন্ন দেশে উদ্ভব হওয়া উগ্র জাতীয়তাবোধের ফলে বহু দেশের অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অনেক সংঘর্ষ সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। হিটলার মুসোলিনী যে উগ্র জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেছিল, তার ক্ষতি জগতবাসী স্পষ্টতঃই প্রত্যক্ষ করেছে। এ কারণে তারা জাতীয়তাবাদকে পৃথিবীতে বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তি বলে মনে করেন।

সারকথা জাতি বা জাতীয়তা কোন ইসলামী পরিভাষা নয়। এ পরিভাষা কোন দ্ব্যর্থহীন অর্থবোধকও নয়। এটা অস্পষ্টতার ধুম্রজালে আচ্ছন্ন। তাই এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা বা এটাকে ভিত্তি করে কোন দর্শন ও আন্দোলন দাঁড় না করানোই শ্রেয়।

* * * * *

ষষ্ঠ অধ্যায়

(অর্থনৈতিক মতবাদ বিষয়ক)

* প্রাচীন অর্থনৈতিক মতবাদ সমূহ ঃ

সামন্ততন্ত্র ও জায়গীর প্রথা

"সামন্ততন্ত্র" একটি সামাজিক ভূমি-ব্যবস্থা। "সামন্ত" শব্দের অর্থ প্রজা, মোড়ল, প্রধান, অধিনায়ক ইত্যাদি। মোড়ল ও প্রধান গোছের জনগণ (অর্থাৎ, সর্বোচ্চ সামন্তগণ) কর্তৃক সরাসরি রাজার নিকট থেকে ভূ-সম্পত্তি লাভ এবং তাদের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের প্রজাবর্গের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প ভূমি বন্টনের যে ব্যবস্থা, তাকেই বলা হয় "সামন্ততন্ত্র"। শারলামেন-এর সাম্রাজ্যের অবসানের পর হতে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বকাল পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল এই সামন্ততন্ত্র।

এই প্রথায় সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক থাকত রাজা। রাজা তার অধীন বিভিন্ন সামন্ত জমিদারদের মধ্যে সেই জমি বণ্ঠন করে দিতেন। জমিদারেরা সেই জমি তাদের অধীনস্ত নিম্ন ভূস্বামীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে বন্টন করে দিতেন। সাধারণতঃ অনির্দিষ্টকালের জন্য এভাবে ভূমি বন্টন করা হত। এভাবে সর্বশেষে কৃষকদের মধ্যে সেই জমি বিতরিত হত। কৃষক ও মজূরগণ সেই জমি আবাদ করত। তারা জমি চাষ করত তবে জমিতে তাদের কোন অধিকার থাকত না। তারা চাষের মালিক ছিল কিন্তু গ্রাসের মালিক

নয়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে তারা ফসল উৎপন্ন করত, কিন্তু সে ফসলের অতি সামান্যই তারা ভোগ করতে পারত। তাই কৃষকদের কষ্টের অবধি ছিল না। এই প্রথায় স্বেচ্ছাতন্ত্রীদের অত্যাচারে প্রজাকূল অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। সর্বসাধারণের অভাব-অভিযোগের নিবৃত্তি হত না। কালক্রমে এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দেয়। রুশো ও ভলটেয়ার প্রমুখ ফরাসী মনীষী এই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা শুরু করেন। তাদের লেখনীতে নিপীড়িত মানুষের মনে বিপুল প্রেরণার সঞ্চার হয়। ফলে ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়। এতে স্বৈরতন্ত্র ও জমিদারী প্রথার জুলুম কিছুটা প্রশমিত হয় কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না।

দেশের অনিশ্চিত অবস্থায় সামন্তপ্রভূ (লর্ড)দের সশস্ত্র যোদ্ধার প্রয়োজন হত। এই প্রয়োজন থেকেই জায়গীর প্রথার প্রবর্তন ঘটে। সামন্তপ্রভূ (লর্ড)গণ সশস্ত্র যোদ্ধার প্রয়োজনে সামরিক চাকুরির বিনিময়ে সৈন্য, সেনাপতি প্রমুখকে ভূমিদান করত। এরূপ ভূমিপ্রাপ্তগণ জায়গীরদার বলে পরিচিত। জায়গীরদারেরা বেতনের পরিবর্তে জায়গীরের আয় ভোগ করত এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ কালে সামন্তপ্রভূ তথা সরকারকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকত। জায়গীরদারের মৃত্যুর পর তা সরকারের হাতে ফিরে যেত। সরকারও সুযোগ পেলে জায়গীর খাস করে নিত। এভাবে জায়গীর পুনঃ পুনঃ হস্তান্তরিত হত। মধ্যযুগে মুসলিম জগত ও ইউরোপের সর্বত্র এই জায়গীর প্রথা প্রচলিত ছিল।

রোমান সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ধ্বংস হওয়া এবং আকস্মিক জার্মান-হামলা ও সেই সঙ্গে তাদের উপনিবেশ স্থাপনের ফলেই সম্ভবতঃ সামন্ততন্ত্র ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। প্রথমে ফ্রান্স হতে স্পেন, তারপর ইতালি এবং পরে জার্মানি ও পূর্ব ইউরোপে এই সমাজ ব্যবস্থা প্রসার লাভ করে। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্সে, ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত জার্মানি ও জাপানে এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ায় সামন্ততন্ত্র কায়েম ছিল। মোগল শাসনক্ষমতা হ্রাস ও ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনায় অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেই ভারতীয় উপমহাদেশে ক্রমশঃ এক ধরনের সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পর সামন্তরাজতন্ত্র ও জমিদারী প্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এই উপমহাদেশ হতেও সামন্তপ্রথার শেষ চিহ্ন অবলুপ্ত হয়ে যায়।[১]

ইসলামের দৃষ্টিতে সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধে পর্যালোচনা ঃ

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকৃতি দেয়। আবার কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পত্তিতে অন্য কেউ জোর পূর্বক দখল স্থাপন করতে পারে না। অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সকল ভূমির অধিকার রাজার উপরে ন্যস্ত থাকার বিষয়টি স্বীকৃত নয়। রাজা কর্তৃক জোর দখল পূর্বক সকলের ভূমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হলে তা জুলুম বলে বিবেচিত হবে।

১. তথ্যসূত্রঃ মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, ইসলাম ও কমিউনিজম, কবি গোলাম মোস্তফা প্রভৃতি।।

* আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ সমূহ ঃ

পুঁজিবাদ
(Capitalism)

পুঁজিবাদের সংজ্ঞা ঃ

"পুঁজিবাদ" (Capitalism) বলতে বোঝায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, মুনাফার উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদন এবং ব্যাংক ঋণের ভিত্তিতে পরিচালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। (বাংলা বিশ্বকোষ)

পুঁজিবাদ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট ঃ

প্রায় শিল্প বিপ্লবের আগ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল সামন্ততন্ত্র। এই প্রথায় সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক থাকত রাজা। রাজা তার অধীন বিভিন্ন সামন্ত জমিদারদের মধ্যে সেই জমি বণ্ঠন করে দিতেন। জমিদারেরা সেই জমি তাদের অধীনস্ত নিম্ন ভূস্বামীদের মধ্যে বিলি করত। এ ভাবে সর্বশেষে কৃষকদের মধ্যে সেই জমি বিতরিত হত। কৃষক ও মজূরগণ সেই জমি আবাদ করত। তারা জমি চাষ করত তবে জমিতে তাদের কোন অধিকার থাকত না। তারা চাষের মালিক ছিল কিন্তু গ্রাসের মালিক নয়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে তারা ফসল উৎপন্ন করত কিন্তু সে ফসলের অতি সামান্যই তারা ভোগ করতে পারত। কালক্রমে এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দিল। সে আন্দোলনের ফল স্বরূপ ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হল। এতে স্বৈরতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র তথা জমিদাবী প্রথার জুলুম কিছুটা প্রশমিত হল কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না।

এদিকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দিতে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে বহু কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়। বহু শিল্পকেন্দ্র ও ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে ওঠে। এতদিন যে সমস্ত জিনিস হাতে তৈরি হত এখন তা মেশিনে তৈরি হতে শুরু করল। জমিদার ও পুঁজিপতিগণ এতে সুবিধা দেখে এতেই তাদের মূলধন বিনিয়োগ করতে শুরু করল। তারা বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করে কল-কারখানা গড়ে তুলল। সে সব কল-কারখানায় শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দিল। গরীব লোকেরা যারা এতদিন কুঠির শিল্প বা ছোট খাট গৃহ শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত তাদের শিল্পগুলো যান্ত্রিক কলকারখানার দ্রুত উৎপাদনের সন্মুখে মার খেয়ে গেল। তারা বড় ধরনের ব্যবসা করার মত পুঁজি না থাকায় অসহায় হয়ে পড়ল। বাস্পীয় যানবাহনাদির সহায়তায় সমস্ত বাণিজ্য পথগুলিও পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। এতে করে যারা বাণিজ্য পণ্য বহন করে জীবিকা নির্বাহ করত তারাও বেকার হয়ে পড়ল। ফলে অভাবের তাড়নায় এই সব লোকেরা পুঁজিপতিদের সে সব কল-কারখানায় কাজ করতে শুরু করল। কিন্তু এখানেও কল-কারখানার মালিকেরা অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদেরকে নাম মাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে নিজেরা প্রচুর লাভ করতে থাকল। অল্প সংখ্যক লোক বড়লোক হতে থাকল আর লক্ষ লক্ষ লোক দীনদরিদ্রই রয়ে গেল। ধন-বৈষম্য ক্রমেই তীব্রতর হতে লাগল। এভাবেই সামন্তবাদের পরে পুঁজিবাদের সৃষ্টি হল এবং আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ গুরুত্ব লাভ করল।

পুঁজিবাদের ক্ষতিকর দিকসমূহ ঃ

১. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতির অবাধ স্বাধীনতা থাকে- সে যথেচ্ছা মূল্য নির্ধারণ করতে পারে এবং যথেচ্ছা মুনাফা লুটে নিতে পারে। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের কাছে জিম্মী হয়ে যায় এবং তারা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

২. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতির অবাধ স্বাধীনতা থাকার ফলে সে আত্মসর্বস্য হয়ে ওঠে এবং শ্রমিকদের অসহায়ত্বের সুযোগ বহাল রাখার জন্য টাকার জোরে নানান ফন্দি-ফিকির করে সাধারণ মানুষকে পুঁজিহীন ও নিঃস্ব করে রাখতে পারে। পুঁজিবাদের প্রবক্তা ম্যানডেভিল বলেন ঃ

"গরীবদের থেকে কাজ নেয়ার একটাই মাত্র পথ, আর তা হল এদেরকে দরিদ্র থাকতে দাও। এদেরকে পরনির্ভরশীল করে তোল। এদের প্রয়োজন খুব অল্প করেই পূরণ করা দরকার। আপন প্রয়োজন পূরণে এদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলা চরম বোকামী।"[১]

৩. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতির অবাধ মুনাফা লুটে নেয়ার সুযোগ থাকার ফলে সে এতখানি অর্থগৃধ্নু হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদেরকেও সে সহ্য করতে পারে না। বরং যন্ত্র দ্বারা শ্রমিকের প্রয়োজন পূরণ করতে চায়। যাতে মজুরির ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, সাথে সাথে শ্রমিকদের দাবী দাওয়া ইত্যাদির ঝামেলা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। পুঁজিবাদের সমর্থক ইরিকলিস বলেন ঃ

"আমাদের বড় কথা হল পণ্য উৎপাদনে কি করে মানুষের শ্রম কম লাগানো যায় আর পক্ষান্তরে এমন লোকের সংখ্যা কি করে বাড়ানো যায় যারা আমাদের পণ্য ক্রয় করবে। এ-ই আমাদের মূল কথা, এ-ই আমাদের প্রথম ও শেষ কথা।[২]

৪. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থগৃধ্নু হয়ে যাওয়ার ফলে মানুষ এতখানি নিষ্ঠুর হয়ে যায় যে, চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশী হয়ে গেলে সে অধিক মুনাফা লাভের আশায় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করার জন্য সম্পদ বিনষ্ট করে দিতেও দ্বিধা করে না। যাতে মুনাফা লাভের হার হ্রাস পেতে না পারে। একবার ব্রাজিলে ফলন বেশী হওয়ায় মুনাফা ঘটে যাওয়ার আশংকায় পুঁজিপতিরা পরামর্শ করে পেট্রোল দিয়ে সমস্ত শষ্য ক্ষেত্র পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল। এতে প্রায় দু লাখ পাউণ্ড তেল ব্যয় হয়েছিল। এমনিভাবে বেশ কয়েক বৎসর তারা তা করেছিল।[৩]

৫. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা এতখানি স্বার্থপর ও লোভী হয়ে ওঠে যে, তারা নারী এমনকি শিশুদেরকে দিয়েও মানবেতর পরিশ্রম করিয়ে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। সম্প্রতি শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ভাবে সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ঘৃণ্য মানসিকতা থেকে সৃষ্ট জটিলতার কারণেই দেখা দিয়েছে।

১. ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, বরাত- اشتراکیت اور نظام اسلام. مظہر الدین صدیقی ॥ ২. প্রাগুক্ত, বরাত- Money and morals. ॥ ৩. প্রাগুক্ত, বরাত- Inside Latin America.॥

৬. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধনী আরও ধনী হতে থাকে, গরীব আরও গরীব ও নিঃস্ব হতে থাকে। এভাবে ধন-বৈষম্য ক্রমেই তীব্রতর হতে থাকে। ধনী-গরীবের ভেদাভেদ বাড়তে থাকে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটই তার জ্বলন্ত সাক্ষী।

তবে উল্লেখ্য যে, পুঁজিবাদের উপরোক্ত ক্ষতিসমূহের প্রতিবিধান কল্পে বিশ্বের বহু দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিষ্টদের চিৎকারে পুঁজিবাদীদের নীতিতে কিছুটা হলেও পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ইদানিং নানা সমাজ সংস্কারমূলক কাজ এবং সমষ্টিগত অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পুঁজিবাদের অবাধ শোষণের পথ বাধাগ্রস্থ হয়েছে। যেমন প্রায় সর্বত্রই এখন শ্রমিক সংঘ কায়েম হয়েছে। বোনাস দান, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ও কার্যকাল হ্রাস করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ছুটিসহ অন্যান্য আরও অনেক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এর ফলে পুঁজিবাদের দোষ-ত্রুটি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে এতকিছু সংস্কারের পরও শ্রমিকদের যে সব সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, ইসলাম বহু পূর্বে তার চেয়েও অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধার বিধান প্রবর্তন করেছে।

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ
(Socialism & Communism)

সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম-এর সংজ্ঞা ঃ

"সোশ্যালিজম" (Socialism) তথা "সমাজতন্ত্র" বা "সমাজবাদ" বলতে বোঝায় সমাজে সকলের অধিকার সমান হওয়ার মতবাদ। কেউ কেউ "সোশ্যালিজম" তথা "সমাজতন্ত্র"-এর পরিচয় এভাবে দিয়েছেন যে, সমাজভূক্ত সকল ব্যক্তির হীতার্থে ভূমি ও কল-কারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের সহায়ক সমস্ত কিছুই রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত-এই মতবাদ। আর "কমিউনিজম" (Communism) তথা "সাম্যবাদ" হল সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্র-এর চরম রূপ।

সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম-এর পার্থক্য ঃ

(এক) সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম উভয়েরই লক্ষ্য হল একটি স্বপ্নরাজ্য বা ইউটোপিয়া (Utopia) স্থাপন। অর্থাৎ, দেশের যাবতীয় ধন-সম্পত্তি থেকে ব্যক্তিগত অধিকার তুলে দিয়ে সমবায় করণ। এভাবে এমন একটি দেশ গড়ে উঠবে, যেখানে সকলের অধিকার সমান থাকবে। এটাকেই তারা বলে থাকে স্বপ্নরাজ্য বা ইউটোপিয়া (Utopia)।

তবে উভয়েরই লক্ষ্য এক হলেও এই লক্ষ্যে পৌঁছার উপায় ও পদ্ধতি উভয়ের নিকট ভিন্ন ভিন্ন। সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্র চায় শান্ত উপায়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই লক্ষ্যে পৌঁছতে, আর কমিউনিজম বা সাম্যবাদ চায় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে। এ হিসেবে বলা যায় কমিউনিজম হল সোশ্যালিজমে পৌঁছার মাধ্যম। আবার বলা যায় কমিউনিজম হল সোশ্যালিজম-এর চরম রূপ।

(দুই) কমিউনিজম এমন একটি রাষ্ট্র বা সমাজ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে কোন শাসক থাকবে না। নিজেরাই নিজেদের দেশের জন্য কাজ করবে এবং এভাবে দেশবাসীদের

দ্বারা পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ বৃদ্ধি করে রাখা হবে, তারপর সেই সম্পদ হতে প্রয়োজনমত যার যা খুশী তা সে নিয়ে নিতে পারবে। তাই এ অর্থে কমিউনিজম পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। পক্ষান্তরে সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্র বলেঃ রাষ্ট্র থেকে সকলকেই দেয়া হবে, তবে যে যত চায়, তাকে ততই দেয়া হবে না বরং যে যেরূপ কাজ করবে, তাকে সেরূপ দেয়া হবে।

তবে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ তথা সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম-এর মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্যসমূহ থাকলেও সমাজতন্ত্র (Socialism) ও সাম্যবাদ (Communism) শব্দ দুটি প্রায়শঃই সমার্থবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দেশে দেশে সমাজতন্ত্রী যে সব দল রয়েছে তারা মূলতঃ বিপ্লবের মাধ্যমেই তাদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা। এ ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র কথাটাকে তারা সাম্যবাদ অর্থে ব্যবহার করছে।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ঃ

পূর্বে সামন্তপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রথায় সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক থাকত রাজা। রাজা তার অধীন বিভিন্ন সামন্ত জমিদারদের মধ্যে সেই জমি বণ্ঠন করে দিতেন। জমিদারেরা সেই জমি তাদের অধীনস্ত নিম্ন ভূস্বামীদের মধ্যে বিলি করত। এভাবে সর্বশেষে কৃষকদের মধ্যে সেই জমি বিতরিত হত। কৃষক ও মজূরগণ সেই জমি আবাদ করত। তারা জমি চাষ করত তবে জমিতে তাদের কোন অধিকার থাকত না। তারা চাষের মালিক ছিল কিন্তু গ্রাসের মালিক নয়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে তারা ফসল উৎপন্ন করত কিন্তু সে ফসলের অতি সামান্যই তারা ভোগ করতে পারত। তাই কৃষকদের কষ্টের অবধি ছিল না।

এটা ছিল এক ধরনের জায়গীর প্রথা। এই প্রথায় স্বেচ্ছাতন্ত্রীদের অত্যাচারে প্রজাকূল অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সর্বসাধারণের অভাব-অভিযোগের নিবৃত্তি হল না। কালক্রমে এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দিল। রুশো ও ভলটেয়ার প্রমুখ ফরাসী মনীষী এই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা শুরু করেন। তাদের লেখনীতে নিপীড়িত মানুষের মনে বিপুল প্রেরণার সঞ্চার হয়। ফলে ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়। এতে স্বৈরতন্ত্র ও জমিদারী প্রথার জুলুম কিছুটা প্রশমিত হল কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না।

এদিকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দিতে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে বহু কলকারখানা ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়। বহু শিল্পকেন্দ্র ও ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে ওঠে। এতদিন যে সমস্ত জিনিস হাতে তৈরি হত এখন তা মেশিনে তৈরি হতে শুরু করল। জমিদার ও পুঁজিপতিগণ এতে সুবিধা দেখে এতেই তাদের মূলধন বিনিয়োগ করতে শুরু করল। সেসব কল-কারখানায় শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দিল। গরীব লোকেরা অভাবের তাড়নায় সেসব কল কারখানায় কাজ করতে শুরু করল। কিন্তু এখানেও কল-কারখানার মালিকেরা শ্রমিকদেরকে নাম মাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে নিজেরা প্রচুর লাভ করতে থাকল। এভাবে অল্প সংখ্যক লোক বড়লোক হতে থাকল আর লক্ষ লক্ষ লোক দীনদরিদ্রই রয়ে গেল। ধন-বৈষম্য ক্রমেই তীব্রতর হতে লাগল। এভাবে সামন্তবাদের পরে পুঁজিবাদের সৃষ্টি হল।

আবার পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দি ধরে এই আন্দোলন চলতে থাকল। পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই তখন চিন্তাশীলদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়াল। এই চিন্তা থেকেই সৃষ্টি হল সমাজতন্ত্র বা সোশ্যালিজম। যে মতবাদে বলা হল যে, ধনী-গরীব কোন ভেদাভেদ থাকবে না, সকলে দেশের জন্য কাজ করবে আর প্রয়োজন মত সকলেই রাষ্ট্র থেকে সম্পদ নিতে পারবে। কোন ব্যক্তি মালিকানা থাকবে না। প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী খেটে যাবে, আর তার বিনিময়ে রাষ্ট্র তার সকল অভাব-অভিযোগ ও সুখ-শান্তি বিধান করবে। এভাবে সমাজের ধন-বৈষম্য ও শ্রেণী-বৈষম্য দূরিভূত হবে । সমাজের ঐশী আলোক বঞ্চিত মেহনতী জনতার শ্রেণী (Proletariat/প্রোলেটারিয়েট) তখন এ মতবাদটিকে আশির্বাদ স্বরূপ মনে করল। তারা সমাজের ধনিক ও অভিজাত সম্প্রদায় তথা "বুর্জোয়া সম্প্রদায়"-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হল এবং তাদের সংগ্রামে এ মতবাদটি প্রতিষ্ঠা লাভ করল। সার কথা পুঁজিবাদকে ধ্বংস করার জন্যই সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব হল।

সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম-এর প্রতিষ্ঠাতা ঃ

সোশ্যালিজম তথা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিখ্যাত জার্মান মনীষী কার্ল মার্কস। তিনি ১৮১৮ সালে জার্মানির অন্তর্গত Treves নগরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি খ্যাতনামা জার্মান দার্শনিক হেগেলের শিষ্য ছিলেন। তবে পরবর্তীকালে তিনি হেগেল থেকে এক স্বতন্ত্র মতবাদ প্রচার করায় জার্মানীর তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তির সাথে তার বিরোধ হওয়ায় তিনি জার্মান থেকে বিতাড়িত হন। তিনি ফ্রান্সে গমন করেন। পরে সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়ে ইংল্যাণ্ড গমন করেন এবং এখানেই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মার্কস ফ্রান্সে অবস্থান কালীন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (Frederich Engels) তার সাথে এসে যোগ দেন এবং মার্কসের মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেন। তারা উভয়ে মিলে নিজেদের মতবাদ প্রচার করার জন্য গোপনে একটি পার্টি বা সেল গঠন করেন। এই পার্টি বা সেল-এর নাম দেন লীগ অব কমিউনিষ্ট। তারপর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তারা উভয়ে নিজেদের মতবাদের ব্যাখ্যা দিয়ে একটি ইশতেহার[১] প্রচার করেন, যার নাম "মেনিফেষ্টো অব কমিউনিষ্ট পার্টি"। এখান থেকেই "কমিউনিজম" ও "কমিউনিষ্ট"কথার প্রচলন হয়।

১.এই ইশতেহারে ধনতন্ত্রের নানা কুফলের দিক তুলে ধরা হয় এবং শ্রমিকরা বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক কিভাবে শোষিত হচ্ছে তা তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয় এই ধন-বৈষম্য দূরিকরণের জন্য শ্রমিক আন্দোলন বা শ্রমিক বিদ্রোহ অপরিহার্য। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কমিউনিজমের নিয়ম-নীতি সম্বলিত দশটি উপায় তুলে ধরা হয় এবং সবশেষে বিপ্লবের মাধ্যমে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলে কমিউনিজমের প্রসিদ্ধ শ্লোগান - Working men of all countries, unite অর্থাৎ, " দুনিয়ার মজদূর এক হও" লিখে উপসংহার টানা হয়॥

মার্কসই 'শ্রমিকদের বাইবেল' নামে খ্যাত "ডাস ক্যাপিটাল" (Das Kapital) রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি জড়বাদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের কারণ, কমিউনিজমের প্রয়োজনীয়তা, বস্তুর মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করেন। এ জন্য তার প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রকে "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" (Scientific Socialism) ও বলা হয়।

মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৮৮৯ সালে তার উদ্যোগে লণ্ডনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে যোগদানকারী শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। একদল নরমপন্থী আর একদল উগ্রপন্থী। নরমপন্থীদের বক্তব্য ছিল শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও প্রচারণা দ্বারা পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং যে দেশে এটা প্রতিষ্ঠিত হবে সে দেশের মধ্যেই এটাকে সীমাবদ্ধ রাখা। আর উগ্রপন্থীদের বক্তব্য ছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র আসবে না বরং বিপ্লবের মাধ্যমে আনতে হবে এবং সারা পৃথিবীতে এই বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে হবে।

১৯০৩ সালে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টিতে মতভেদ দেখা দিলে দুইটি শাখার উদ্ভব হয়। একটি হল মেনশেভিক আর একটি বলশেভিক। মেনশেভিকেরা ছিল নরমপন্থী। আর বলশেভিকরা ছিল উগ্রপন্থী। লেনিন[১] ছিলেন উগ্রপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি মার্কসের অনেকগুলো মূলনীতি এড়িয়ে একটি কার্যোপযোগী ধারা বের করে তার ভিত্তিতে বলশেভিক দলকে চালিত করেন এবং পরে এর নাম পরিবর্তন করে কমিউনিষ্ট পার্টি রাখেন। বিভিন্ন ছোট খাট বিদ্রোহ এবং অনেক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তিনি কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রাশিয়ার জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এ সময়ে রুশ নেতা ট্রট্স্কী (Trotsky) তার সাথে যোগ দেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ স্বৈরাচারী সরকার এক হুকুম নামা জারি করে ধর্মঘটি শ্রমিকদের কাজে ফিরে আসার আদেশ দিলে বিপ্লবের গতি আরও বেগবান হয়। ধর্মঘটিরা এই আদেশ মানতে অস্বীকার করে। এর ফলে সেনাবাহিনী জারের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। তারা তখন সৈন্য ও শ্রমিকদের মিলিতভাবে এক বৈপ্লবিক পরিষদ বা সোভিয়েট গঠন করে। তারপর ১৪ই মার্চ প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জার সম্রাট নিকোলাস ক্ষমতাচ্যুত হয়। রাশিয়ার জারতন্ত্রের অবসান ঘটে। সামরিক সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম না হওয়ায় দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে

১. ভি আই লেনিন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার অন্তর্গত Simbrisk নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন স্কুল মাষ্টার। শিক্ষা শেষ করে লেনিন আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। এ সময়েই তিনি রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেন। গোপনে গোপনে তিনি শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। পরে রাশিয়াতে বলশেভিক দল গঠন করেন। ১৯০৩ সালে বলশেভিক দলে বিরোধ দেখা দেয়ার পর তিনি মেনশেভিকে না গিয়ে বলশেভিক দলেরই নেতৃত্ব দিতে থাকেন ॥

ভি আই লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সংখ্যাগুরু বলশেভিক পার্টি সামরিক সরকারকে পদচ্যুত করে দেশের গদী দখল করে নেয়। এ হিসেবে লেনিনই কমিউনিজমের কার্যকরী প্রতিষ্ঠাতা। কমিউনিজমকে তাই অনেক সময় "লেনিনিজম" (Leninism) বলা হয়। এবং বলশেভিক দল কর্তৃক কার্যকরী ভাবে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা লাভ করায় "বলশেভিজম" ও "কমিউনিজম"কে সমার্থবোধক আখ্যায়িত করা হয়। তবে কার্ল মার্কস হলেন কমিউনিজমের আদি প্রবর্তক। এ হিসেবে কমিউনিজমকে "মার্কস ইজম" (Marxism)ও বলা হয়।

লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্স্কী ও মার্শাল ষ্ট্যালিনের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। ষ্ট্যালিন রাশিয়াতেই কমিউনিজমকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান, পক্ষান্তরে ট্রট্স্কী অন্যান্য দেশেও বিপ্লবের মাধ্যমে কমিউনিজমকে ছড়িয়ে দিতে চান। এই মতানৈক্য বিরোধ ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। অবশেষে ষ্ট্যালিন বিজয়ী হন এবং ট্রট্স্কী ককেশাস প্রদেশে তারপর ফ্রান্সে নির্বাসিত হন এবং এক সময় গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন।

ষ্ট্যালিনের মাধ্যমে রাশিয়ার অগ্রগতি সাধিত হতে থাকে এবং লেনিনের কাল হতে মার্কসের মূলনীতিতে যে পরিবর্তনের ধারা চালু হয় ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে তা আরও পুষ্টতা লাভ করে। ষ্ট্যালিনের সাথে সম্পৃক্ত এই কমিউনিজমকে বলা হয় "ষ্ট্যালিনবাদ"।

বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের বিস্তার ঃ

রাশিয়াই ছিল তথাকথিত মেহনতী জনতার প্রথম স্বর্গরাজ্য একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সমাজতন্ত্রের প্রথম বিপ্লবী নায়ক ভি আই লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সংখ্যাগুরু বলশেভিক পার্টি কর্তৃক সামরিক সরকারকে পদচ্যুত করে দেশের গদী দখল করে নেয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে চেকোশ্লাভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ এবং চীন ও কিউবাতে সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম হয়।

কমিউনিজম দর্শনের সারকথা ঃ

১. কমিউনিজম বিশ্বাস করে যে, অর্থই হল জীবন যাত্রার মূল। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হলেই অন্য সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

২. কাউকেই অর্থের জন্য তথা খাওয়া-পরার জন্য ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না। বরং রাষ্ট্রই সকলের অর্থ তথা খাওয়া-পরার যোগান দিবে। সকলে কাজ করবে যোগ্যতা অনুসারে আর উপভোগ করবে প্রয়োজন মত।

৩. যেহেতু কাউকে খাওয়া-পরার জন্য ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না, তাই ব্যক্তি চিন্তারও প্রয়োজন নেই, তাই ব্যক্তি মালিকানারও বিলুপ্তি ঘটবে।

৪. যেহেতু ব্যক্তি মালিকানার বিলুপ্তি ঘটবে, তাই সম্পত্তির মালিক থাকবে রাষ্ট্র। ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তিকে তুলে দিয়ে সেগুলোকে সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে। আর যারা বিদেশী অথবা কমিউনিজমের বিরোধী তাদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৫. যেহেতু ভূ-সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার বিলুপ্তি ঘটবে, তাই ভূ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন তুলে দিতে হবে।

কমিউনিজম ও ইসলামের মধ্যে বিরোধ ঃ

১. কমিউনিজম নিছক জড়বাদী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কমুনিষ্টগণ ইন্দ্রীয়গাহ্য বস্তু ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে স্বীকার করেন না। তারা বলেন যা ইন্দ্রীয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, তার কোন অস্তিত্ব নেই, তা অলীক। যদিও বা তার অস্তিত্ব থাকে তবে তা নিয়ে বিব্রত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এঞ্জেলস বলেন ঃ "এই পৃথিবীতে পদার্থই মাত্র প্রকৃত।" এ কারণে কমিউনিজম আল্লাহ্‌র সাথে কোন সম্পর্ককে স্বীকার করে না। নাস্তিকতাই মার্কসবাদ তথা কমিউনিজমের মূল প্রাণ। লেনিনের লিখিত Religion গ্রন্থের গোড়াতেই বলা হয়েছে ঃ " নাস্তিকতা মার্কসবাদের স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য অঙ্গ। নাস্তিকতা ছাড়া মার্কসবাদ কিছুতেই বোঝা যেতে পারে না।" কার্লমার্কস বলেছেন, " আমাদের কাছে এ জড়জগৎ ছাড়া আর কোন সত্তা নেই।" তিনি আরও বলেছেন, " পৃথিবী বস্তুর নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়- এজন্য কোনও সার্বজনীন সত্তা বা খোদার প্রয়োজন নেই।"

কমিউনিজম নাস্তিক্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার ফলে রাশিয়াতে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গোটা সাংস্কৃতিক কাঠামোকে নাস্তিক্যবাদী রূপে গড়ে তোলার প্রয়াস নেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকও নিয়োগ করা হয় নাস্তিক। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ মাদ্রাসা ধ্বংস করে দেয়া হয়। প্রখ্যাত কমিউনিষ্ট আনাতোল লুনাকারস্কী বলেনঃ "কমিউনিষ্ট রাশিয়ার শিক্ষককে নাস্তিক হতেই হবে। এ সামাজিক ব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাসী শিক্ষকের কথা চিন্তাই করা যায় না। মোল্লাদেরকে পয়সা দেবার (পুরোহিত তন্ত্র ধর্ম?) আর কেউ নেই।"[১] সোভিয়েত লেখকগণ স্পষ্টত স্বীকার করেছেন যে, অনেকগুলো মসজিদকে নাট্যশালা ও নৃত্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে।[২]

নাস্তিক্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার ফলে কমিউনিজম ধর্ম বিরোধী। ষ্ট্যালিন-কনষ্টিটিউশনের ১২৪ ধারায় লিখিত আছে ঃ[৩] "ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করায় বাধা নেই কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে প্রচার করায় বাধা আছে।" লেনিনের লিখিত Religion গ্রন্থে আছে ঃ[৪] "মার্কসবাদী হতে হলে তাকে জড়বাদী হতেই হবে, অর্থাৎ, তাকে হতে হবে ধর্মের শত্রু।" চীনা কমিউনিষ্ট নেতা মাও সেতুংও বলেছেন ঃ দার্শনিক ভাববাদ বা ধর্মের সাথে আমাদের কোন কারবার থাকতে পারে না।

১.কমিউনিষ্ট শাসনে ইসলাম, ডঃ হাসান জামান বরাত- Anatole Lunacharsky, Pravda, March 25, 1929. ॥

২. কমিউনিষ্ট শাসনে ইসলাম, ডঃ হাসান জামান বরাত- Yefremov and Gabarov: The Land of Soviets : Muslims in the Soviet Union, Mosciw, 1959, p 15.॥

৩.ইংরেজী কথাগুলি নিম্নরূপ ঃ Anti-religious propaganda is free, Religious not free. (Soviet Strength, by Hewlett jahnson) ইসলাম ও কমিউনিজম, কবি গোলাম মোস্তফা ॥

৪.ইংরেজী কথাগুলি নিম্নরূপ ঃ The Marxist must be a materialist, i.e. an enemy of Religion. p.21 - ইসলাম ও কমিউনিজম, কবি গোলাম মোস্তফা ॥

সারকথা- এভাবে তারা কমিউনিজমকে নিছক জড়বাদী ভাবতত্বে সীমাবদ্ধ করেছে যা সকল প্রকার আধ্যাত্মবাদকে অবৈজ্ঞানিক বলে উপহাস করে। আল্লাহ, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি কোন কিছুকেই কমিউনিষ্টগণ বিশ্বাস করে না। তারা কোন ওহী এবং ঐশী ধর্মকে বিশ্বাস করে না। লেনিনের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে (মে, ১৯২৯) নাস্তিকতাকে রাজধর্ম হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয় এবং গীর্জার স্বাধীনতা নষ্ট করা এবং কোন রকম ধর্ম বিষয়ক প্রচারণা যেন কেউ চালাতে না পারে- তা তত্ত্বাবধান করার জন্য ইন্সপেক্টর বিভাগ খোলা হয়।[১]

এর বিপরীত ইসলামে জড়বাদিতার কোন স্থান নেই। ইসলামে আল্লাহ্, ফেরেশতা, পরকাল ইত্যাদি আধ্যাত্মবাদী বিশ্বাস সমূহই ধর্মের মূল ভিত্তি। ধর্মবিরোধিতাকে ইসলাম চরম অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলাম কোন ধর্মের স্বাধীনতাকে খর্ব করে না। তাছাড়া জড়বাদ এখন বৈজ্ঞানিক জগতেও অচল। বহু বৈজ্ঞানিক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে নিশ্চয়ই একজন নিয়ন্তা রয়েছেন।

২. কমিউনিজমে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে কোন মত ও পথ গ্রহণ করতে পারে না।

এর বিপরীত ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্বীকৃত। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম ব্যক্তিও স্বাধীনভাবে পূর্ণ মত ও পথ গ্রহণ করতে পারে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই ইরশাদ হয়েছে ঃ

لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى -

অর্থাৎ, ধর্ম (গ্রহণ)-এর ব্যাপারে কোন জবরদস্তী নেই। গোমরাহী থেকে হেদায়েত স্পষ্ট হয়ে গেছে। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ২৫৬)

৩. কমিউনিজম ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার মনে করে। অথচ ইসলাম ধর্ম শোষণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার। ইসলাম চায় মানবতা ও সুবিচার মূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে।

৪. কমিউনিজম চিন্তার স্বাধীনতাকে নষ্ট করেছে। কমিউনিজমে মানুষকে মূল্যায়ন করা হয়েছে একটি নিষ্ক্রিয় জীব হিসেবে - জড় এবং প্রয়োজনের শক্তির সন্মুখে যার ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। কার্লমার্কস বলেছেন ঃ জড় অস্তিত্বের উৎপত্তির প্রণালী সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায়। এটা মানুষের চেতনা শক্তি নয়, যা তার অস্তিত্বের বোধ জন্মায়। কিন্তু বিপরীতক্রমে এটা তাদের সংঘবদ্ধ অবস্থান যা তাদের চেতনাবোধ জন্মায়।" এভাবে কমিউনিজম মানুষকে মূল্যায়ন করেছে একটা যন্ত্র বিশেষ হিসেবে। ফলে মানুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় কিছুই করতে পারে না। সব সময়ই সে তার নিজের মনের উপর একটা চাপ অনুভব করে। প্রশান্ত অবসর বা সহজ মনের আনন্দ সে কখনই পায় না। একটা কঠিন বন্ধনের অনুভূতি তার মনকে সব সময় পীড়া দেয়।

১. ইসলাম ও কমিউনিজম, কবি গোলাম মোস্তফা ॥

সারকথা কমিউনিজমে ব্যক্তি চিন্তা-চেতনাকে স্থান দেয়া হয়নি। কমিউনিজমে মুক্ত বুদ্ধির কোন স্থান নেই। এ জন্যেই কোন মার্কসবাদী রাষ্ট্রেই মার্কসবাদ বিরোধী কোন মত বা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বরদাশ্‌ত করা হয়নি।[১] এর বিপরীত ইসলামী বিধানে সকলকে যে কোন মত ও পথ গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যার ফলে মানুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় সব কিছুই করতে পারে। কখনই সে তার নিজের মনের উপর কোন অবাঞ্ছিত চাপ অনুভব করে না। কোন কঠিন বন্ধনের অনুভূতি তার মনকে কখনও পীড়া দেয় না। যার ফলে মানুষের কমনীয় সহজাত বৃত্তিগুলির বিকাশ ঘটে। তার সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার বিকাশ ঘঠে। তার নব নব পথে আত্মপ্রকাশ করার স্বাভাবিক আকাঙ্খাগুলো শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায় না। কুরআনের বহু আয়াতে "হে বোধসম্পন্ন লোকেরা তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর" বলে মানুষের ব্যক্তি চিন্তা-চেতনার স্বীকৃতি প্রদান ও তাকে ক্রিয়াশীল করে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. কমিউনিজমে ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকার করা হয়েছে। কমিউনিজম বলেঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলেই শোষণের সৃষ্টি হয়।

এর বিপরীত ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত না হলে কোন উপার্জনে কারও আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় না, সকলেই তখন শুধু আইনের চোখকে বুঝ দেয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে যায়, আর ফাক পেলেই ফাকি দেয়। এভাবে আন্তরিকতাহীন কর্ম অর্থনৈতিক উন্নতির গতিকে শ্লথ করে দেয়। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলো এই বাস্তবতার সন্মুখীন হয়েই শ্রমিকদের থেকে কাজ নেয়ার জন্য তাদের উপর বন্দুকের নল উঁচু করে রাখতে বাধ্য হয়। ইসলামের মতে ব্যক্তির হাতে সম্পদ থাকলেই শোষণ হয় না, তার দ্বারা অন্য মানুষের উপকারও হয়। ইসলাম টাকা-পয়সা রোজগারের পথকে সৎ ও সঠিক করার ব্যবস্থা করে এবং একজনের হাত থেকে অন্যের হাতে যেন অর্থ আবর্তিত হয় তার ব্যবস্থা করে; যাতে সাধারণ লোকদের অসুবিধা না হয়। যাকাত, সদকা, ফিতরা প্রভৃতির প্রবর্তন ধনীদের থেকে গরীবদের মাঝে অর্থ আবর্তিত হওয়ার কাজ করে থাকে। তাছাড়া নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার প্রতি ইসলাম উৎসাহ প্রদান করে এ ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপকতর করেছে। কুর-আনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يسئلونک ما ذا ينفقون قل العفو -

১. The World on the Brink of Abyss নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়- কমিউনিজমকে স্বীকার না করার অপরাধে অথবা কমিউনিজম-বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত থাকার কোনরূপ সত্য বা অমূলক সন্দেহে বলশেভিকরা মোট ১৮,৬০,০০০ লোককে হত্যা করেছে। তন্মধ্যে ২৮ জন বিশপ, ১২০০ জন পাদ্রী, ৬০০০ শিক্ষক, ৮৮০০ জন ডাক্তার, ১৯২,০০০ জন শ্রমিক এবং ৮১৫,০০০ জন কৃষক। -ইসলাম ও কমিউনিজম, গোলাম মোস্তফা ॥

অর্থাৎ, তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় কি পরিমাণ ব্যয় করবে। তুমি বলে দাও প্রয়োজনাতিরিক্ত সব কিছু ।[১] (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ২১৯)

৬. কমিউনিজমে কোন রকম ধন-বৈষম্য তথা ধনী-গরীবেব ব্যবধান থাকতে পারবে না বলা হয়েছে। কিন্তু এটি একটি অপ্রাকৃতিক দর্শন। আর কোন অপ্রাকৃতিক দর্শনকে গায়ের জোরে সাময়িক চাপিয়ে দেয়া গেলেও তা স্থায়িত্ব লাভ করে না। এ কারণেই কমিউনিজম সমগ্র পৃথিবী থেকে বিতাড়িত হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে কোন ধর্ম, কোন সমাজ ও কোন রাষ্ট্র দাঁড়াতে পারে না।

প্রাকৃতিক নিয়ামানুসারে ছোট-বড়, উপরস্থ-অধীনস্ত-এর তামতম্য না থাকলে কেউ কাউকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, কোন চেইন অব কমাণ্ড থাকে না। একটা অফিসের সকলেই কর্মকর্তা হয়ে গেলে কর্মচারী হবে কে? আর সকলেই এক মানের হয়ে গেলে কেউ কারও বশ্যতা স্বীকার করবে না, কেই কারও নির্দেশ মেনে চলবে না, তাহলে অফিস চলবে কি করে? সকল প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রের ব্যাপারেই এ কথাটি প্রযোজ্য। সকল কাজে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার তথা সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার স্বার্থেই তারতম্য থাকা একটা অপরিহার্য বিষয়। জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে তারতম্য থাকার এই অপরিহার্যতার রহস্য বর্ণনা করে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে ঃ

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا -

অর্থাৎ, আমি পার্থিব জীবনে তাদের মধ্যে রিযিক বণ্ঠন করি এবং একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদায় উন্নিত করি যাতে একে অপরকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে। (সূরাঃ ৪৩-যুখরুফঃ ৩২)

৬. কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা কালে ব্যক্তি থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়। অথচ ইসলাম বলেছে কারও সম্পদ তার ইচ্ছার বাইরে গ্রহণ করা বৈধ নয়। হাদীছে বলা হয়েছে ঃ

لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه -

অর্থাৎ, কোন মুসলমানের আন্তরিক ইচ্ছা ব্যতীত তার সম্পদ হালাল নয়।

কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র জনগণ থেকে নেয়। অথচ ইসলামী রাষ্ট্র জনগণকে প্রদান করে। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র জনগণ থেকে নিয়ে ভারসাম্যতা বিধান করতে চায়, আর ইসলামী রাষ্ট্র জনগণকে প্রদান করে ব্যালেন্স রক্ষা করার প্রয়াস নেয়।

১. সম্ভবতঃ কম্যুনিজম প্রবর্তনকারীগণ এ আয়াত ও ইসলামের এ জাতীয় নীতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না; নতুবা কম্যুনিজম প্রবর্তনের কোন প্রয়োজন ছিল না। ভারতের প্রখ্যাত মনীষী মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী বলেন, "আমার রাশিয়া অবস্থান কালে লেনিনের সাথে সাক্ষাত হয়। কথা প্রসঙ্গে তার কাছে কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটি বিশ্লেষণ করি। তখন লেনিন অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন- আরো আগে যদি এই সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতাম, তাহলে আমাদের কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কোন আবশ্যকতাই ছিল না। -ইসলামে শ্রমিকের অধিকার ॥

৭. কমিউনিজমের সামাজিক দর্শনে সমাজের একটি অংশ হওয়া ব্যতীত একক ব্যক্তিত্বের কোন মূল্য নেই। অথচ ইসলাম ব্যক্তির উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলাম ব্যক্তিকেই সমাজের মূল বুনিয়াদ হিসেবে মূল্যায়ন করেছে এবং ব্যক্তিকেই অভ্যন্তর থেকে সূচী ও সভ্য করে গড়ে তোলার নীতি অবলম্বন করেছে। যাতে ব্যক্তি সমাজের একজন সভ্যরূপে তার সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারে। এভাবে ইসলাম ব্যক্তিকে সমাজের একজন সচেতন সভ্যপদে উন্নীত করে এবং জাতির নৈতিক কার্যকলাপের একজন অভিভাবক রূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

৮. কমিউনিজম বিশ্বাস করে যে, অর্থনৈতিক উপাদানই বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ নিরূপন বা গঠনের মূল। অর্থই হল জীবন যাত্রার মূল। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হলেই অন্য সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এভাবে কমিউনিজম শুধু পার্থিব সম্পদের কথাই ভাবে, শুধু অন্ন-বস্ত্রের সুখ-সুবিধার কথাই চিন্তা করে। অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা জীবনের কোন উচ্চতর লক্ষ্য নেই তাদের।

কিন্তু ইসলাম এরূপ মনে করে না যে, অর্থই জীবন যাত্রার মূল এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হলেই অন্য সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ইসলামী দর্শনে ভাত-কাপড়ের কথা ভাবা ছাড়াও আরও অনেক কিছু ভাববার রয়েছে। মানুষ শুধু খেতে আসেনি, তার জীবনের লক্ষ্য অনেক উচ্চতর। ইসলাম শুধু পার্থিব সম্পদের কথাই ভাবে না, পরলোকের সম্পদও তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলাম আর্থিক মূল্যমানের উপর জোর দেয়নি বরং ইসলাম অ-আর্থিক মূল্যমানের উপর; যেমন নৈতিক মূল্যমানের উপরই গুরুত্ব প্রদান করে। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, অ-আর্থিক মূল্যমানই জীবনের ভিত্তি রচনা করে এবং আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের মধ্যকার আধ্যাত্মিক বন্ধনই জীবনের নৈতিক মূল্যমানের উন্নতি বিধানের প্রকৃষ্ঠ উপায়।

সারকথা- কমিউনিজম চুড়ান্ত গুরুত্ব প্রদান করে অর্থনৈতিক শক্তি ও আর্থিক মূল্যমানের উপর, আর ইসলাম চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করে আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈতিক মূল্যমানের উপর।

৯. কমিউনিজম নারী জাতিকেও নরের তুল্য শ্রম দিতে বাধ্য করে। কিন্তু ইসলাম নারী জাতিকে শ্রম দিতে বাধ্য করেনি বরং পুরুষদের উপর তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দিয়েছে। আর তাদেরকে আদর্শ সন্তান জন্মদান ও তাদের সুষ্ঠ লালন-পালনের সাথে সাথে গৃহের কর্মকাণ্ড পরিচালনার মহৎ দায়িত্ব সমূহ পালনে নিয়োজিত করেছে। সারকথা ইসলাম নারীকে শুধু শ্রমদাত্রী হিসেবে মূল্যায়ন করেনি, যা করেছে কমিউনিজম।

১০.কমিউনিজম পরিবার প্রথা ধ্বংস করে দেয়। কমিউনিজম বলে পরিবারে বাস করলে মানুষের মনে সাধারণ লোকের প্রতি কোন সহানুভূতি জাগতে পারে না। এর বিপরীত ইসলাম পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে তোলার নীতি প্রবর্তন করে। ইসলামের মতে পরিবারে বাস করেই মানুষের মনে মানবিকতার উন্মেষ ঘটে।

বাস্তবতার আলোকে সমাজতন্ত্র ঃ

সমাজতন্ত্র মেহনতী জনতা ও বঞ্চিত শ্রেণীকে সুখ-শান্তির যে মোহনীয় স্বপ্ন দেখিয়েছিল, ধনী-গরীবের মধ্যকার ধন-বৈষম্য তুলে দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে, সংক্ষেপে তার একটি খতিয়ান তুলে ধরা হল।

সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য ছিল দুইটি।

(এক) ধন-বৈষম্য তথা ধনী-গরীবের ভেদাভেদ তুলে দেয়া।

(দুই) পুঁজিবাদের উচ্ছেদ সাধন। কিন্তু বাস্তব হল এ দুটি ক্ষেত্রেই তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তার কিঞ্চিত বর্ণনা দেয়া হল।

১. ধন-বৈষম্য তথা ধনী-গরীবের ভেদাভেদ তুলে দেয়ার ক্ষেত্রে কমিউনিজমের ব্যর্থতা ঃ

সর্ব প্রথম ও সবচেয়ে আদর্শ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র-রাশিয়ায় কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে ধন-বৈষম্য দূর হয়নি। বরং সেখানকার ডিক্টেটরী শাসন ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে এক ভয়াবহ আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। যারা পুঁজিপতীদের মতই, এমনকি তাদের চেয়েও ভয়াবহভাবে সর্বহারাদের উপর অত্যাচার চালাত। তাদের জীবন যাত্রার মান শ্রমিকদের তুলনায় অনেক উচ্চ ছিল। বিখ্যাত সোশ্যালিষ্ট এম, ওয়াইন ইউয়ন ১৯৩৭ সালের মজুরী পার্থক্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ

সাধারণ মজুর	১১০ হতে ৪০০ রুবল
মধ্যস্থানীয় অফিসার	৩০০ হতে ১,০০০ রুবল
বড় অফিসার	১,৫০০ হতে ১০,০০০ রুবল।

পরে ক্রুশ্চেভের আমলে সংশোধনী আনার পরও সেখানে ফ্যাক্টরী-ডিরেক্টর ও সাধারণ মজুরের মধ্যে বেতনের হারে পার্থক্য ছিল ১৪ ঃ ১ অনুপাতে।[১]

আরও উল্লেখ্য যে, তখনকার সময়ে শ্রমিকরা সর্বোচ্চ যে ৪০০ রুবল বেতন পেত, তা দিয়ে কোনক্রমেই তাদের মধ্যম ধরনেরও জীবন যাপন সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। নিম্নের বিবরণ থেকে তা স্পষ্ট হবে। তখনকার পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী জনাব আলতাফ হোসেন রাশিয়ায় সফর করে এসে লিখেছিলেন ঃ মধ্যম ধরনের এক জোড়া জুতা পাঁচশ রুবল, সোয়া সের দুধ চার রুবল এবং এক ডজন ডিম চৌদ্দ রুবলে সেখানে পাওয়া যায়।

এভাবে দেখা যায় কমিউনিজম মজুরদের সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। তারা মজুরীর তারতম্য তুলে দিতে ব্যর্থ হয়। তাদের অর্থনৈতিক সাম্যের শ্লোগান ভেস্তে যায়।

২. পুঁজিবাদের উচ্ছেদ সাধনে কমিউনিজমের ব্যর্থতা ঃ

পূর্বের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়েছে যে, কমিউনিজম পুঁজিবাদের উচ্ছেদ সাধনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বরং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো পুঁজিবাদের দিকেই তাদের উল্টো রথ চালিয়ে নিয়ে গেছে। সাম্যবাদী লেখক লুই ফিশার রাশিয়া ভ্রমন করে এসে বিবৃতি দিয়েছিলেন ঃ

---

১. তথ্যসূত্র ঃ ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ ॥

"ষ্ট্যালিনতো রুজভেল্টের মতই আয়াসে থাকেন, কিন্তু সেখানে মজুরদের অবস্থা পুঁজিবাদী আমেরিকার মজুরদের চেয়েও নিম্নমানের।"

১৯৬০ সনের ৫ই মে সুপ্রীম সোভিয়েটে বক্তৃতা দানকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভতো ঘোষণা করে ফেললেন যে, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নয়। তিনি বললেন ঃ

"আমরা মজুরির মধ্যে তারতম্য অবসানের বিরোধিতা করি। আমরা মজুরীতে সমতা এবং তাকে একই সমতলে আনার স্পষ্ট বিরোধী। আর এটাই লেনিনের শিক্ষা।[১]

* * * * *

১. কমিউনিজম সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যসূত্র ঃ
(১) ইসলাম ও কমিউনিজম, কবি গোলাম মোস্তফা,
(২) ইসলাম কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ, মোহাম্মাদ কুতুব,
(৩) কমিউনিষ্ট শাসনে ইসলাম, ডঃ হাসান জামান,
(৪) ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ,
(৫) বাংলা বিশ্বকোষ, মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত,
(৬) বিবিধ ॥

সপ্তম অধ্যায়

(দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ বিষয়ক)

গ্রিক দর্শন

(فلسفۂ یونانی)

"দর্শন"(فلسفہ) বলতে বোঝায় কল্পনার উপর প্রভাব বিস্তারকারী প্রজ্ঞাকে। প্রজ্ঞা যখন কল্পনার উপর প্রভাব বা আধিপত্য বিস্তার করে তখনই দর্শনের উদ্ভব হয়। স্বাধীন নিরপেক্ষভাবে প্রজ্ঞার কষ্টিপাথরে যাচাই করে বিজ্ঞের মতো বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করাই হল দর্শনের কাজ। এখানে আমরা গ্রীক দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। "গ্রীক দর্শন" (فلسفۂ یونانی) বলতে বোঝায় ইউরোপের প্রাচীন দেশ গ্রীস (یونان)কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দর্শনকে।

প্রথমদিকে গ্রিকদর্শনে পদার্থ বিজ্ঞান, সৌরবিজ্ঞান, খোদাতত্ত্ব বিজ্ঞান, পরিবার বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি অনেক শাস্ত্রই অন্তর্ভুক্ত ছিল। একই সাথে সবগুলি বিষয়ই এতে আলোচিত হত। পরবর্তীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞানে বিস্তৃতি ঘটায় এক এক শাখা স্বতন্ত্র শাস্ত্রে রূপ নিয়েছে।

বস্তুজগতের মূলতত্ত্বের স্বরূপ কি-এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই গ্রিকদর্শনের শুরু। গ্রিক দর্শনের আগাগোড়া যে সমস্যা গুরুত্ব লাভ করেছে, তা হল এই সত্তা বিষয়ক সমস্যা। গ্রিক দর্শনে গ্রিকদের দ্বারা জগৎ ও বস্তুর উৎপত্তি কিভাবে তা বিশ্লেষণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা শুরু হয়। যদিও তাঁদের যুক্তি ও বিশ্লেষণে অসংগতি ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা খুবই স্পষ্ট, সাথে সাথে জগৎ সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ইসলামী ধারণার সাথে সংঘর্ষ বিদ্যমান, তবু প্রাথমিক ভাবে জীবন ও জগতকে জানার তাদের আগ্রহকে ঐতিহাসিক ভাবে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এদের প্রাথমিক চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করেই আজকের বৈজ্ঞানিক দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে।

সমগ্র গ্রিক দর্শনের যুগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. আদি যুগ বা প্রাক-সক্রেটিস দর্শনের যুগ।
২. মধ্য যুগ বা সক্রেটিস দর্শনের যুগ ।
৩. শেষ যুগ বা এরিস্টটলের পরবর্তী দর্শনের যুগ ।

নিম্নে উপরোক্ত তিন যুগের প্রসিদ্ধ কয়েকজন দার্শনিক ও তাদের দর্শনের বিশেষ বিশেষ কিছু ধারা উল্লেখ করা হল।

১. আদি যুগের কয়েকজন দার্শনিক ও তাদের দর্শনের বিশেষ কিছু ধারা ঃ

খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ৪৩০ অব্দ পর্যন্ত যুগকে আদি যুগ বা প্রাক-সক্রেটিস দর্শনের যুগ বলা হয়। এই আদি যুগ বা প্রাক সক্রেটিস যুগের প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছেন দার্শনিক থেলিস (Thales) এ্যানাক্সিমেনডার (Anaximender) এবং এ্যানাক্সিমেনিস (Anaximenes)।

এই আদি যুগ বা প্রাক-সক্রেটিস যুগকে প্রাক সফিষ্ট ও সফিষ্ট এই দুই যুগে ভাগ করা হয়। সফিষ্টরা (سوفسطائيه/Sophists) ছিল গ্রিসের একটি কুটতার্কিক সম্প্রদায়। এদের আবির্ভাব হওয়ার আগ পর্যন্ত হল প্রাক সফিষ্ট যুগ। জড় ও মানস-সত্তার মধ্যে দ্বন্ধ শুধু জড় ও মানস-সত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না-এ বিরোধ প্রকৃতি ও মানবের (Natute and Man) মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মানব এবং প্রকৃতির মধ্যে যদি এ বিপরীতধর্মী ভাব বিদ্যমান থাকে, তবে এই বিশ্ব-প্রকৃতিতে মানবের কি স্থান- এ প্রশ্ন নিয়েই যাত্রা শুরু হয় দর্শনের দ্বিতীয় পর্ব এবং গ্রিসের তার্কিক গোষ্ঠীই এর উদ্যোক্তা। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। গ্রিসের কুটতার্কিক বা সফিস্টরা মানুষের জ্ঞান ও আচরণের সমস্যার প্রতি মনোযোগী হয়ে একটা নতুন দর্শন চিন্তার সূচনা করেন। প্রখ্যাত সফিস্টদের মধ্যে রয়েছেন প্রোটাগোরাস, জর্জিয়াস, হিপ্পিয়াস, প্রোডিকাস প্রমুখ।

সফিস্টগণের মতে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব স্ব কার্যের মানদণ্ড। নিজ বিচার ব্যতিরেকে নৈতিকতার কোন সার্বজনীন মানদণ্ডকে তারা অস্বীকার করত। যেমন প্রোটাগোরাস (Protagoras) ছিলেন একজন খ্যাতনামা সফিস্ট। তিনি বলতেন, মানুষ নিজেই সব কিছুর মাপকাঠি। ব্যক্তি অনুভূতি হচ্ছে জ্ঞান-এই ছিল প্রোটাগোরাসের মতবাদ। কিন্তু তার এই মতবাদ স্ববিরোধাত্মক। আমার নিকট যা সত্য তাই যদি জ্ঞান হয়, তাহলে যুক্তি অবতারণা করে বলা যায় যে, আমার নিকট এ-ই সত্য যে, প্রোটাগোরাসের মতবাদ মিথ্যা, তাহলে তিনি তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

এই সফিস্টগণ যে শুধু নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রেই কোন সার্বজনীন মানদণ্ডকে অস্বীকার করত তা নয়। এমনকি তারা জগতের কোন বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি (حقيقة الشئ) আছে বলেও অস্বীকার করত। তারা বলত জগতের কোন বস্তুর حقيقة الشئ বা বাস্তব প্রকৃতি আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই শ্রেণীর দার্শনিক (সফিস্টস্)দের মধ্যে আবার ৩টি উপদল ছিল। যথা ঃ

১. যারা জিদ ও হটকারিতা পুর্বক বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি (حقيقة الشئ)কেই অস্বীকার করত। তারা বলতঃ কোন বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি বলতে কিছু নেই, এগুলো সব কল্পনা। এদেরকে বলা হত হটকারী (عنادية)।
২. যারা বস্তুর বাস্তব প্রকৃতিকে সমূলে অস্বীকার না করলেও তারা বলত বস্তুর প্রকৃতি কোন প্রতিষ্ঠিত বিষয় নয় বরং তা আমাদের বিশ্বাসনির্ভর। অর্থাৎ, তারা মনে করত প্রত্যেক বস্তু তাই, আমরা যেটাকে যা মনে করি। যেমন বৃক্ষকে আমরা মানুষ মনে করলে সেটাই মানুষ ইত্যাদি। এদেরকে বলা হয় অত্মবিশ্বাসবাদী/আত্মকল্পনাবাদী (عندية)।
৩. যারা বলত কোন্টার বাস্তব প্রকৃতি কি তা আমরা নিশ্চিত জানি না। বরং সবকিছুর মধ্যে আমাদের সন্দেহ রয়েছে। এমনকি তারা বলত আমাদের সন্দেহের ব্যাপারেও আমাদের নিশ্চিত জানা নেই, বরং সন্দেহের ব্যাপারেও আমরা সন্দিহান (شاک فی انه شاک)। এদেরকে বলা হত সংশয়বাদী (لاادرية)। ইলিসের পির্হো ছিলেন একজন সুসংবদ্ধ সংশয়বাদী। সংশয়বাদী দার্শনিকগণ মনে করেন- মানুষের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান লাভ মোটেই সম্ভব নয়। তাদের মতে মানব জ্ঞান আপেক্ষিক ও বিশেষ। আর এমন আপেক্ষিক ও বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা জগৎ-সত্তা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। প্রখ্যাত সংশয়বাদী হিউম মনে করেন, যা প্রত্যক্ষের বিষয়, তাকেই শুধু আমরা জানতে পারি। আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয় বা সংবেদনেই সীমাবদ্ধ। মন ও ঈশ্বর ইন্দ্রীয়গাহ্য নয় বলে সংশয়বাদীগণ তাদের সম্পর্কে কোনো জ্ঞান লাভ সম্ভব নয় বলে মনে করেন।

আদিতে যে দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল, তা ছিল নিতান্তই স্থূল। প্রাচীন দার্শনিক থেলিস, এ্যানাক্সিমেনডার এ্যানাক্সিমিনিস সকলেই প্রকৃতির স্থূলরূপের মধ্যে তার শাশ্বত মূল তত্ত্বের সন্ধান করেছিলেন।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক থেলিস (Thales) এ্যানাক্সিমেনডার (Anaximender) এবং এন্যানাক্সিমিনিস (Anaximenes) এই তিন দার্শনিক বাহ্য জগতের মূল রহস্য সন্ধানে তিনটি মতবাদ প্রচার করেন। দৃষ্টিগ্রাহ্য পৃথিবীর মূল উপাদান কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে থেলিস বলেন, 'পানিই' হচ্ছে সমস্ত বস্তুর মূল উপাদান। এ্যানাক্সিমিনিসের মতে তা হচ্ছে 'বায়ু' এবং এ্যানাক্সিমেন্ডার বলেন যে, এর নির্দিষ্ট কোন আকার নেই- এ হচ্ছে অনন্ত, অনির্দিষ্ট নিরাকার বস্তু। তিনি একে 'সীমাহীন' বলে উল্লেখ করেন। শাশ্বত সত্য আবিষ্কারে তাদের এ প্রয়াস নিতান্তই জড়মূলক।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে লিউকিপাস ও তার শিষ্য ডিমোক্রিটাস ছিলেন পরমাণুবাদী। তাদের পরমাণু দর্শনও ছিল জড়বাদী দর্শন। পরমাণূবাদীদের মতে সব কিছুর মূল উপাদান হল পরমাণূ। এই পরমাণু বা অবিভাজ্য অণু (الجزء الذى لا يتجزى) থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। পরমাণূ হচ্ছে মৌলিকভাবে নির্গুণ। তবে তারা বলত পরমাণুর ওজন রয়েছে এবং অনবরত মহাশূন্যে ভারি পরমাণুগুলোর উপর থেকে নীচে দ্রুত পতিত হওয়ার কারণে গতি এবং আবর্তের সৃষ্টি হয়। এ আবর্তের মাধ্যমেই সদৃশ পরমাণুগুলো সদৃশ

পরমাণুগুলোর সাথে একত্রে মিলিত হয়। আর এসব পরমাণুর সংযোগেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে পরমাণুমতবাদে জড়বাদী মতবাদের ন্যায় খোদার সৃষ্টিকর্তা হওয়ার বিষয়-টি অস্বীকৃত হয়ে পড়ে।

এর পরবর্তী দার্শনিক হচ্ছে পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায়। পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত দার্শনিক পীথাগোরাস (فيثاغورس/Phythagoras)। তাঁর মতে 'সংখ্যা'ই (Number) হচ্ছে যাবতীয় দ্রব্যের ও বাহ্য জগতের সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্ব। স্থূলরূপে প্রকাশমান জড়কে জগতের মূলতত্ত্ব না বলে তারা সংখ্যাকে মূলতত্ত্ব বলে গ্রহণ করে। তবে চিন্তার দিক দিয়ে অগ্রগতি সাধিত হলেও পীথাগোরীয়ানগণ জড়কে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেননি।

পীথাগোরীয়ানগণের পর ইলিয়াটিক্স দার্শনিকগণের আবির্ভাব। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের অনুসরণ করেই ইলিয়াটিক্সগণ জীবন সত্তা (Being)কে মূলাধার বলে মনে করেন। জগৎ শুধু গুণ বা পরিমাণগতই নয়; গুণ ও পরিমাণ এ দু'টো নিয়েই জগতের সৃষ্টি। আইওনীয় দার্শনিকগণ আদি-সত্তাকে গুণগত ও পরিমাণগত বলেই মনে করেন। অর্থাৎ, তাঁদের মতে জড়ই হচ্ছে আদি সত্তা। জড়ের গুণ এবং পরিমাণ উভয়ই আছে। কিন্তু পীথাগোরীয়ানগণ বস্তুর গুণগত দিকটাকে বাদ দিয়ে শুধু পরিমাণ বা সংখ্যার দিকটার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করেন। ইলিয়াটিকসগণ এসে আবার বস্তুর পরিমাণ বা সংখ্যার দিকটাকেও সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেন। কারণ ইলিয়াটিকসগণ 'বহু' কে (Multiplicity) অস্বীকার করেন এবং 'বহু' কে অস্বীকার করার অর্থই হল পরিমাণকে অস্বীকার করা। ইলিয়াটিক্সগণ গুণ ও পরিমাণ (Quality and Quatilty) উভয়কে বাদ দিয়ে এক অনন্ত, অবিভক্ত, অবিভাজ্য জীবন সত্তা (Being)-এর অস্তিত্বকে গ্রহণ করে নেয়। আইওনীয় থেকে ইলিয়াটিক্সদের ক্রম-উত্তরণ ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয়ের চিন্তাধারারই একটা প্রবহমান গতি। এতদসত্ত্বেও, ইলিয়াটিক্সগণ জড় থেকে নিজেদেরকে বিমুক্ত করতে পারছেন না। ইন্দ্রিয় বা অনুভূতির জগৎকে 'দৃশ্যমান' বা 'মায়া' বলে অস্বীকার করলেও 'মায়ার' জটিল পাক থেকে তাঁরা উদ্ধার পাচ্ছে না। 'প্রকৃত' এবং 'অবভাস' (Real and Appearance) এই দ্বৈত-সত্তা ইলিয়াটিকসদেরকে অক্টোপাশের ন্যায় আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

২. মধ্য যুগের কয়েকজন দার্শনিক ও তাদের দর্শনের বিশেষ কিছু ধারা ঃ

খৃষ্টপূর্ব ৪২০ অব্দ থেকে ৩২০ অব্দ পর্যন্ত যুগকে মধ্য যুগ বা সক্রেটিস দর্শনের যুগ বলা হয়। এই মধ্য যুগ বা সক্রেটিস দর্শনের যুগের প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছেন সক্রেটিস (سقراط/Socraties), প্লেটো (افلاطون/Plato) প্রমুখ।

সফিস্ট আন্দোলনের যুগেই সক্রেটিসের[১] আবির্ভাব। আপনাকে জানো (Know thyself) -এই ছিল তার নীতি। প্রত্যয় (cencept) থেকে সমস্ত জ্ঞানের উদ্ভব হয়,

১. সক্রেটিসের জন্ম এথেন্সে। প্রথম জীবনে তিনি ভাস্কর্যবিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে দর্শনালোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি জাতীয় দেব-দেবীকে অস্বীকার করে নিজস্ব দেবমত প্রতিষ্ঠা করেন। এথেন্সের যুবকদেরকে ভ্রষ্ট করার অভিযোগে তাকে কারারুদ্ধ করে বিষপানে তার মৃত্যু ঘটানো হয় ॥

সংবেদন থেকে নয়। প্রজ্ঞা[১] হল প্রত্যয়[২] বা সার্বিক ধারণার ধী-শক্তি (faculty)। সমস্ত জ্ঞানকে প্রত্যয়ের উপর ছেড়ে দিয়ে সক্রেটিস প্রজ্ঞাকেই জ্ঞানের মুখপত্র হিসেবে ধরে নেন। এখানেই সফিস্টস বা তার্কিক গোষ্টির সঙ্গে সক্রেটিসের মূল পার্থক্য। যেখানে তার্কিক গোষ্ঠী ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা সংবেদনকে জ্ঞানের প্রধান উপায় হিসেবে ধরে নেন, সক্রেটিস সেখানে প্রজ্ঞা বা বোধ-কে (Understanding) জ্ঞানের প্রধান উৎস হিসেবে ধরে নেন। সক্রেটিসের মতে আবেগ, অনুভূতি দ্বারা নয় বরং সব কাজই প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হয়। তার মতে বিজ্ঞতা, পরিণামদর্শিতা, সদিচ্ছা, দয়া প্রভৃতি যাবতীয় পূণ্যের উৎপত্তি ঘটে জ্ঞান থেকে। জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের ভেতরই লুকিয়ে থাকে অন্যসব পুণ্য। তার মতে জ্ঞান অর্থাৎ, পাণ্ডিত্য হল চরম পুণ্য যা অন্যসব পুণ্যকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। এটাকে সক্রেটিসের "জ্ঞান-মতবাদ" বলা হয়। আর একটি রয়েছে সক্রেটিসের নীতি-দর্শন। এই নীতি-দর্শনেও সক্রেটিস জ্ঞান ও ইচ্ছাকেই প্রধান নিয়ামক হিসেকে মূল্যায়ন করেছেন। তার মতে মানুষ যতই চিন্তা করবে এবং বুঝতে চাইবে, ততই সে কর্তব্য পালন করতে পারবে। মানুষের অনুভূতি ও সংবেদনের দিকটাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র প্রজ্ঞাকে প্রাধান্য দেয়ায় তার নীতি-দর্শনও সমালোচনা থেকে মুক্তি পায়নি।

সক্রেটিসের সমালোচনা করতে গিয়ে এরিস্টটল বলেন যে, সক্রেটিস মানবাত্মার ভাবাবেগ, অনুভূতি এবং সংবেদনের দিকটাকে একেবারে অবহেলা করেছেন, কিংবা আদৌ এ দিকটা আলোচনা করতে ভুলে যান। সক্রেটিস ভুলে যান যে, সাধারণ মানুষের কাজগুলো প্রায়শই আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে পরিচালিত। এরিস্টটলের সমালোচনা সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় মানুষ একটা কাজকে অন্যায় জেনেও ইচ্ছাকৃতভাবে সেই অন্যায় কাজটা করে।

সক্রেটিসকে আস্তিক বলা যায়, তবে ইসলামের গ্রহণযোগ্য অর্থে আস্তিক নয়। কেননা তিনি যদিও মনে করতেন তার সব কর্মের মূলে এক বিরাট শক্তি ইন্ধন যোগাচ্ছেন, তবে তিনি এ শক্তিকে দৈত্য বা ডেমন্ (Demon) নামে অভিহিত করতেন। উল্লেখ্য-ইংরেজী Demon শব্দটি "দৈত্য" অর্থ ছাড়াও শয়তান, ভূত, প্রেত, নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর লোক ইত্যাদি নেতিবাচ্যতামূলক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অথচ ইসলাম যে খোদার রূপরেখা প্রদান করে তাঁর ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা প্রযোজ্য নয়।

মধ্যযুগের দার্শনিকদের মধ্যে সক্রেটিসের পর প্লেটো[৩] বিখ্যাত দার্শনিক। গবেষকদের মতে প্লেটোই একটা সুস্পষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন দিয়ে যেতে পারেন। সক্রেটিসের 'প্রত্যয়'-ই[৪] প্লেটোর ধারণা। সক্রেটিসের প্রত্যয়-কে ভিত্তি করেই প্লেটো

১. প্রজ্ঞা হল সার্বিক ধারণার ধী-শক্তি। প্রজ্ঞা অবরোহ এবং আরোহ-এই দু পদ্ধতিতে হতে পারে। দেখুন পরবর্তী পৃষ্ঠার টীকা নং ২ ॥ ২. প্রত্যয়, সার্বিক ধারণা ও সামান্য ধারণা সমার্থবোধক। দেখুন পরবর্তী পৃষ্ঠার টীকা নং ১ ॥ ৩. আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৪২৯-৭ অব্দে এক এথেনীয় পরিবারে প্লেটোর জন্ম এবং খৃষ্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে ৮২ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন ॥ ৪. প্রত্যয়, সার্বিক ধারণা ও সামান্য ধারণা সমার্থবোধক। দেখুন পরবর্তী পৃষ্ঠার টীকা নং ১ ॥

তাঁর সামান্যবাদ[১] (Theoty of Ideas) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামান্যগণ অবিনশ্বর এবং সনাতন। জাগতিক বস্তুজাত তাদেরই নশ্বর প্রতিবন্ধ-এই ছিল তাঁর মত। এরিস্টটল (ارسطو/ارسطاطالیس/Aristotle) প্লেটোর সামান্যবাদ গ্রহণ করেন নি। তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন বিশেষের উপর। বিশেষকে (Particular) তিনি সত্য বলে গ্রহণ করে আরোহ পদ্ধতির[২] মাধ্যমে সামান্যে (کلیہ/universal) উপনীত হয়েছেন। এরিস্টটল প্লেটোর সামান্যবাদ গ্রহণ না করলেও তাঁর 'রূপ'[৩] ও প্লেটোর সামান্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। বিশেষের বাইরে রূপের অস্তিত্ব নেই, এই মাত্র প্রভেদ। প্লেটো ও এরিষ্টটল উভয়েই বস্তুর অভৌতিক সারভাগকে দর্শনের বিষয় বলে গণ্য করেছিলেন এবং বস্তুর বাহ্য প্রকাশ হতে এই সার (Essence), রূপ উভয়েই দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্যকে দেহ হতে ভিন্ন বলেছিলেন।

১. 'সামান্যবাদ' শব্দটি সামান্য থেকে উদ্ভূত। কোন শ্রেণী বা জাতিসকলের মধ্যে যে সাধারণ ও আবশ্যক গুণ বিদ্যমান থাকে, তাদের সমষ্টিকে সার্বিক বা সামান্য ধারণা বলে। সার্বিক ধারণা জাতি নামের মানসিক প্রতিরূপ। স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, সামান্য ধারণা জাতি বা শ্রেণীর বেলায় ব্যবহার-যোগ্য; ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের বেলায় নয়। 'মানুষ' ধারণাটি একটি সার্বিক বা সামান্য ধারণা। কারণ, সমগ্র মানুষ-শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ ও আবশ্যিক গুণ নিয়েই 'মানুষ' ধারণাটি গঠিত। এখানে মানুষ বলতে কোন ব্যক্তি মানুষকে না বুঝিয়ে সমস্ত মানুষ শ্রেণীকেই বুঝায়। -গ্রিক দর্শন ঃ প্রজ্ঞা ও প্রসার ॥

২. "আরোহ" ও "অবরোহ" দুটি বিশেষ পরিভাষা। বিশেষ কয়েকটি দৃষ্টান্ত বা ঘটনা (جزئیہ) কে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে যখন আমরা একটা সমগ্র সার্বিক সিদ্ধান্ত (کلیہ)-তে উপনীত হই, তখন সেটাকে বলা হয় 'আরোহ' (استقراء)। আর এর বিপরীত অর্থাৎ, আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে উপনীত সমগ্র সার্বিক সিদ্ধান্ত (کلیہ) কে যখন কোনো ব্যক্তি বিশেষ (جزئیہ)-এর বেলায় প্রযোজ্য করি, তখন সেটা হয় অবরোহ (قیاس)। যেমন ওমর, বকর, যায়েদ নামক কয়েক ব্যক্তির মৃত্যুকে পর্যবেক্ষণ করে যখন আমরা একটা সমগ্র সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, "সব মানুষই মরণশীল", তখন সেটা হয় আরোহ পদ্ধতি। আর "সব মানুষই মরণশীল"-এই সমগ্র সার্বিক ধারণা থেকে যখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, 'খালেদও মরণশীল', তখন সেটা হয় অবরোহ পদ্ধতি ॥

৩. 'রূপ' বা 'আকার' একটি পরিভাষা। এরিস্টটলের মতে বস্তুর প্রকৃতি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে. তার মধ্যে দুটো দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে তার জড়ের দিক, অন্যটি তার রূপ বা আকারের দিক। এরিস্টটলের মতে 'আকার' (Form) হল দ্রব্য, বস্তুর মূলতত্ত্ব। এ আকার নিত্য বা অপরিবর্তনীয়। জগতের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে এ আকারের মূর্ত সম্পর্ক রয়েছে। জগতে যে কোন বস্তুর পরিবর্তন লক্ষ্য করলেই এ সত্য ধরা পড়ে। প্রথমতঃ প্রতিটি বস্তুতে একটা কিছু পরিবর্তিত হচ্ছে এবং দ্বিতীয়তঃ এই একটা কিছু কোনো একটা কিছুতে পরিবর্তিত হচ্ছে। তাকেই এরিস্টটল নাম দিয়েছেন জড় (Matter) এবং যে অন্তর্নিহিত শক্তি এই একটা কিছুকে (জড়কে) নির্দিষ্ট কোনো পথে চালিত করছে, তার নাম হলো আকার (বা রূপ)। যেমন বট-বীজ হচ্ছে বটবৃক্ষের জড়। বট-বীজের অন্তর্নিহিত শক্তি যা বট-বীজকে বটবৃক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা হল বটবৃক্ষের আকার বা রূপ (صورۃ) ॥

উভয়ের মতেই মানুষের মধ্যে এবং প্রকৃতির মধ্যে উভয় এই বিশেষের মধ্যে আদর্শ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি উপাদানকে (Matter) স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রূপের অধিষ্ঠানরূপে ব্যবহার করছে এবং তার মধ্যে রূপকে প্রকাশ করছে। মানুষের উচ্চতার প্রকৃতি, (তার প্রজ্ঞা) বিকাশপ্রাপ্ত হয়ে নিম্নতর প্রকৃতিকে শাসন করতে চাচ্ছে। সক্রেটিসের পূর্বে গ্রিক দর্শনে এরূপ কোন মতের অস্তিত্ব ছিল না।

এরিস্টটল প্লেটোর দর্শনকে তর্ক (Logic), ভৌতিক বিজ্ঞান (Physics) ও চরিত্রনীতি (Ethics)-এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ ছাড়াও রয়েছে প্লেটোর জ্ঞান-মতবাদ। প্লেটো প্রোটাগোরাস ও সফিস্টদের ব্যক্তি অনুভূতির জ্ঞান হওয়ার মতবাদকে অস্বীকার করতেন। প্লেটোর এই জ্ঞান-মতবাদের উপর গড়ে ওঠে তার ভাববাদ[১]।

প্লেটো একত্ববাদী না বহুশ্বরবাদী-এ প্রসঙ্গে 'গ্রিক দর্শন ঃ প্রজ্ঞা ও প্রসার' গ্রন্থের লেখক লিখেছেন ঃ প্লেটো অনেকবার অনেক জায়গায় ভগবান শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কখনও এক বচনে কখনও বহুবচনে। ভগবানকে এক বচনে ও বহু বচনে ব্যবহার করার সুবিধে হল যে, প্লেটো এর মারফতে অতি সহজেই একেশ্বরবাদ থেকে বহুশ্বরবাদে চলে যেতে পারেন। বহু দেবত্ববাদ ব্যতিরেকেও তিনি জগতের এক পরম সৃষ্টিকর্তার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন।[২]

'বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টাতত্ত্ব' গ্রন্থকার বলেন ঃ প্লেটো খোদা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন। তার কিছু গ্রহণযোগ্য, কিন্তু কিছু মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি খোদাকে ভালোর (মঙ্গলের) ধারণা বলেছেন। আবার কখনও খোদাকে ভালোর ধারণার নিম্নবর্তী একটি সত্তা বলেছেন। আর খোদা একটি সম্পূর্ণ (Perfect) বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারেননি, (কারণ তিনি নিজেই ভালোর নিম্নবর্তী একটি সত্তা) তিনি আবার বলেন যে, খোদার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থও সময়কালীন। আর পদার্থ খোদার কর্মকে বাঁধা প্রদান করে। কখনও কখনও প্লেটো খোদাকে ভালোর ধারণার চেয়ে উন্নত মনে করেন।[৩]

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলাম প্রদত্ত খোদা-ধারণা অনুসারে খোদা কোনক্রমেই ভালোর নিম্নবর্তী সত্তা হতে পারেন না। যিনি সর্বগুণে গুণান্বিত, সর্বময় ক্ষমতা ও সর্বময় কল্যাণময়তার অধিকারী তিনি মঙ্গলের নিম্নবর্তী সত্তা হন কিভাবে ? তদুপরি পদার্থ আর খোদা কখনও সমপর্যায়ের হতে পারে না। পদার্থ হল খোদার সৃষ্টি। আর স্রষ্টা ও সৃষ্টি কখনও সমপর্যায়ের হতে পারে না।

এরিস্টটলের দর্শনের মূল বিষয় হল উপাদান ও রূপ। এ উপাদান ও রূপ নিয়ে এরিস্টটল সমগ্র জগতকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এরিস্টটলের মতে জগতে রূপ

১. ভাববাদের সারকথা হল - জ্ঞেয় বস্তু মন বা চেতনার উপর নির্ভরশীল। মন বা চেতনাই পরম সত্য ও সত্তা। জাগতিক বস্তুগুলোর মন-নিরপেক্ষ কোন সত্তা নেই। মন ব্যতিরেকে বিষয় বা বস্তু ভাবাই যায় না। বাহ্য বস্তু সসীম বা অসীম মনের বিষয়বস্তুরূপে বিদ্যমান। এ মতবাদের নাম ভাববাদ। -গ্রিক দর্শন ঃ প্রজ্ঞা ও প্রসার ॥ ২. পৃষ্ঠা নং ৮৯, লেখক মোহাম্মাদ আবদুল হালিম, প্রকাশনায় বাংলা একাডেমী, মুদ্রণ ২০০১ ॥ ৩. পৃষ্ঠা নং ২৫০ ॥

বর্জিত কোন জড় নেই আবার জড় বিবর্জিত কোন রূপ নেই। জড় ও রূপ অবিচ্ছিন্ন, এককে ছেড়ে অপরের নিরপেক্ষ সত্তা কল্পনাহীন। জগতের সমস্ত বস্তুই রূপ ও জড়ের যৌগিক ফল। এরিস্টটলের রূপ স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিরাজ করে না। খোদা/ঈশ্বর ভাবনার ক্ষেত্রেও এরিস্টটলের এই রূপ ভাবনা কার্যকরী। তার মতে খোদা/ঈশ্বর হল চরম রূপ। যিনি সমস্ত গতি ও সৃষ্টির আদি কারণ।

আপাতঃ দৃষ্টিতে এরিস্টটলের খোদা-দর্শন গ্রহণযোগ্য বলেই অনুভূত হয়। কেননা খোদা এমন এক সত্তা, যিনি সমস্ত জগতের মূল কারণ। কিন্তু এরিস্টটল খোদাকে চরম রূপ বলে আখ্যায়িত করেছেন, আর তার বর্ণিত "রূপ" স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিরাজ করে না। অথচ ইসলাম প্রদত্ত খোদা ধারণায় আল্লাহ্ তাঁর স্বাধীন সার্বভৌম সত্তা নিয়ে সদা সর্বদা বিরাজমান।

৩. শেষ যুগের কয়েকজন দার্শনিক ও তাদের দর্শনের বিশেষ কিছু ধারা ঃ

গ্রিক দর্শনের শেষ যুগ হলো এরিস্টটল পরবর্তী দর্শন যুগ। খৃস্টপূর্ব ৩২০ থেকে ৫২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই যুগ বিস্তৃত। এথেন্স, রোম, আলেকজান্দ্রিয়া এই দার্শনিকদের কেন্দ্রস্থল। এই শেষ যুগ বা এরিস্টটলের পরবর্তী দর্শনের যুগের প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছেন জেনো (Zeno), এপিকিউরাস (Epicurus) প্রমুখ।

গ্রিক দর্শনের শেষ যুগে ধর্মীয় এবং নৈতিক এই দুই ধারা দর্শন-চিন্তায় আলোচিত হতে আরম্ভ করে। 'সততাই মানব-জীবনের পরমার্থ- এই নীতিতে জেনো (Zeno) স্টোয়িক (Stoic) দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। জেনো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক সম্প্রদায়কে স্টোয়িক[১] সম্প্রদায় বলা হত। জেনো ছিলেন বৈরাগ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তার মতে ঘটনা মাত্রই স্বভাব বা নিয়তির অধীন। আর স্বভাব বা নিয়তির মূলে অনন্ত প্রজ্ঞা। বিশ্বব্যাপী একমাত্র বিধি নিত্য বিরাজমান। সৃষ্টি মাত্রই এ বিধির অনুবর্তন করতে বাধ্য। এ বিধির বিধানে মানবের বুদ্ধি বিবেক নিয়ন্ত্রিত। এটাই ছিল জেনোর তত্ত্ব দর্শনের প্রকৃত কথা। এভাবে স্টোয়িক দর্শনে ইসলামের বিধিবদ্ধ খোদার ধারণা অস্বীকৃত হয়েছে। স্টোয়িকদের মতে জগৎ স্থিত প্রজ্ঞাবাদ খোদা/ঈশ্বরের প্রকাশ।

এপিকিউরাস (Epicurus) 'সুখ মানুষের একমাত্র কাম্য' বলে এপিকিউরীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। এপিকিউরীয় দার্শনিকবৃন্দ জড়বাদী (Materialistic) এবং যান্ত্রিকবাদী ছিলেন। ইন্দ্রীয়-প্রত্যক্ষ এপিকিউরাসের জ্ঞানতত্ত্বের মূল ভিত্তি ছিল। তার মতে ইন্দ্রীয় প্রত্যক্ষই যথার্থ জ্ঞানের উৎস। আমরা যা দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, স্বাদ ভোগ করি তাই বাস্তব ও সত্য। এপিকিউরীয়গণ কোন বিমূর্ত গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাদের এ দর্শন থেকেই তারা প্রচলিত খোদায়ী বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেন। এপিকিউরাসের মতে

১. স্টোয়িক (Stoic) শব্দটি থেকে উৎপন্ন। তার অর্থ অলিন্দ। এথেন্সে জেনোর চিত্র শোভিত অলিন্দে তার শিষ্যগণ দর্শন শেখার জন্য আগমন করত বিধায় এরূপ নামকরণ হয়েছে। তার শিষ্যদেরকে 'স্টোয়ার দার্শনিক' বলা হত। তাদের দর্শন 'স্টোয়িক দর্শন' নামে অভিহিত ॥

খোদা/ঈশ্বর মানুষের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। মানুষের উপর তাদের কোন আধিপত্যও নেই। তিনি খোদা/ঈশ্বরে বিশ্বাসকে কুসংস্কার মনে করতেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্লেটোনিকবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রিক দর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটে।[১]

বিবর্তনবাদ

জগতের উৎপত্তি কিভাবে হল- এ সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধানে প্রধানতঃ দুই ধরনের মতবাদ পরিলক্ষিত হয়, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ। যারা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী, তাঁদের বিশ্বাস হল সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে জগতের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে জগৎ ধাপে ধাপে এগিয়ে চলছে, পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসীরা মনে করে জগৎ এরূপ কোন অতিপ্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নয় বরং বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে, বিবর্তনের মাধ্যমেই এগিয়ে চলছে। তাদের ধারণায় বিবর্তন হচ্ছে একটি সুশৃঙ্খল পরিবর্তন। ধাপে ধাপে সেটা অগ্রসর হচ্ছে এবং ক্রমশ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিবর্তনবাদের শ্রেণী বিভাগঃ

১. উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদ।
২. উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ।
৩. সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ।
৪. যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ।

এর মধ্যে যান্ত্রিক বিবর্তনবাদটি সমকালীন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বিশেষ স্থান দখল করে আছে। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করে জগতের বিবর্তনের মূলে কোন প্রকার উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনার স্থান নেই; বরং জড়, গতি ও শক্তির অন্ধ আলিঙ্গনে জগত প্রতিনিয়ত এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে। আর এই পরিবর্তন কোন বিশৃঙ্খল পরিবর্তন নয়, বরং একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া। এটাকে যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। বিবর্তন প্রক্রিয়ার এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যা জড়জগৎ ও প্রাণী জগত উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রথম ক্ষেত্রের যান্ত্রিক বিবর্তনকে জড়জগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রের বিবর্তনবাদকে

১. গ্রীক দর্শন সম্পর্কিত তথ্যের সূত্র ঃ
(১) বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ও মোহাম্মাদ আবদুল হালিম কর্তৃক রচিত "গ্রিক দর্শন ঃ প্রজ্ঞা ও প্রসার"
(২) তারকচন্দ্র কর্তৃক রচিত "পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস"
(৩) তাফতাযানী রচিত شرح عقائد
(৪) মুহাম্মাদ সিদ্দিক রচিত বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টাতত্ত্ব, প্রকাশনায় মদীনা পাবলিকেশান্স, প্রভৃতি ॥

প্রাণীজগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ বলা হয়। জড়জগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদের প্রবক্তা হল বৃটিশ দার্শনিক হারবাট স্পেন্সার। আর প্রাণীজগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদের প্রবক্তা হল চার্লস ডারউইন। সাধারণ ভাবে বিবর্তনবাদ বলতে ডারউইনের বিবর্তনবাদকেই বোঝা হয়ে থাকে।

হারবাট স্পেন্সারের জড়জগত সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ

এই বিবর্তনবাদের প্রবক্তা হল দার্শনিক হারবাট স্পেন্সার। তিনি ১৮২০ সালে বৃটেনের ডার্বিতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে তার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ First Priciples (প্রথম মূলনীতি) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি জড়জগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। স্পেন্সারের জড়জগৎ সম্পর্কিত এই যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ "নিহারিকা প্রকল্প" (Nebular hypothesis) নামে পরিচিত। তার মতে গোটা মহাবিশ্ব জড় উপাদান দ্বারা গঠিত হয়েছে। জগতের আদি উপাদানগুলো নিহারিকার মত উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ আকারে মহাশূন্যে ভাসমান ছিল। সেই জড় উপাদানগুলো ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাদেরকে একত্রে মেঘের মত দেখাত। মেঘের মত ভাসমান সেই নিহারিকার মধ্যে যে জড় উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাদের মধ্যে ছিল গতি ও শক্তি। এই গতি ও শক্তির প্রভাবে তারা ছিল ঘুর্ণায়মান। এ সকল জড় উপাদান নিহারিকার কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হত, আবার নিজে নিজেও ঘুরত। ক্রমশঃ ঘুরতে ঘুরতে জড় উপাদানগুলো নিহারিকার কেন্দ্রের দিকে আসতে লাগল এবং এক পর্যায়ে নিহারিকার কেন্দ্রে তা ঘনীভূত হতে লাগল। নিহারিকার যত কাছাকাছি তারা আসল, তাদের গতিবেগ তত দ্রুত হতে থাকল। এক সময় তারা নিহারিকার কেন্দ্র থেকে হঠাৎ করে ছিটকে দূরে পড়ে গেল। তবে কেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণের প্রভাবে কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকল। এরা হল গ্রহ। আবার গ্রহের নিজস্ব আবর্তনের কারণে তা থেকেও কোন কোন অংশ দূরে নিক্ষিপ্ত হল এবং তা ঐ গ্রহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকল। এভাবে সৃষ্টি হল উপগ্রহ। মূল নিহারিকার কেন্দ্রে যে অংশ বিদ্যমান ছিল তা হল সূর্য। এভাবে স্পেন্সার দেখাতে চান গোটা সূর্য এবং এর মধ্যে সকল বস্তুনিচয় এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জড় থেকে বিবর্তিত হয়েছে। এটাকেই বলা হয়ে থাকে জড়জগৎ সম্পর্কিত যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ।

হারবাট স্পেন্সারের জড়জগৎ সম্পর্কিত যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের বিশেষ ত্রুটিসমূহ ঃ

১. তিনি নিহারিকা সাদৃশ্য জড়িয় অবস্থাকে জগতের আদি উপাদান বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই আদি উপাদানগুলো কোত্থেকে আসল বা পূর্বে এগুলি কোন অবস্থায় ছিল এর ব্যাখ্যা তার মতবাদে পাওয়া যায় না। তাই এক্ষেত্রে তার মতবাদ অজানা বা অজ্ঞেয়বাদের স্বীকার।

২. স্পেন্সারের মতে গতি ও শক্তির মাধ্যমে জগতের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ আদি নিহারিকা থেকে আলাদা হয়েছিল। তাদের মধ্যে গতি ও শক্তির কারণ কি, গতি ও শক্তি কোত্থেকে এল -এসব প্রশ্নের উত্তর তার মতবাদ দিতে পারেনি।

৩. স্পেন্সার জড়জগতের জাগতিক প্রক্রিয়ার ধারাভাষ্য পেশ করেছেন বটে, কিন্তু তিনি তার স্বপক্ষে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতামূলক বা গণিতিক প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেননি। এ সবের প্রেক্ষিতে স্পেন্সার সম্পর্কে হেনরী বার্গসোঁ মন্তব্য করেন যে, স্পেন্সার যেন জোড়া-তালিই দিয়েছেন মাত্র, কিন্তু কোন কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারেননি।[১]

ডারউইনের প্রাণীজগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ

এ মতবাদটিকে বলা হয় ডারউইনের প্রাণী জগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ বা জৈবিক বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution)। এই মতবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন ছিলেন একজন বৃটিশ দার্শনিক। তিনি একজন জীব বিজ্ঞানী ছিলেন। ১৮০৯ সালে বৃটেনে তার জন্ম হয়। জীব বিজ্ঞান শেখার পর তিনি বিভিন্ন উদ্ভিদ ও পশু-পাখি সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং এগুলোর উপর গবেষণা করে জীব জগতের উৎপত্তি, বিকাশ ও অস্তিত্বের ব্যাপারে এক ধরনের অভিনব সিদ্ধান্তে উপনিত হন। তার গবেষণা প্রসূত এই অভিনব সিদ্ধান্তই হল প্রাণীজগত সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ বা জৈবিক বিবর্তনবাদ। ১৮৫৯ সালে Origin of Specis (প্রজাতির উৎপত্তি) নামক গ্রন্থে প্রাথমিক ভাবে তিনি তার গবেষণার ফল প্রকাশ করেন। এর এক যুগ পর ১৮৭১ সালে Decent of Men (মানুষের আগমন) নামক অপর একটি গ্রন্থের মাধ্যমে তার এ মতবাদকে আরও প্রসারিত করেন।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের সারকথা ঃ

১. ডারউইনের মতে আমরা বর্তমানে যে সকল বৈচিত্রময় প্রাণীকূল লক্ষ করছি তাদের উৎপত্তি কোন এক বিশেষ সময় হয়নি, বরং একটি দীর্ঘ সময় ধরে পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে জীবকূল এ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

২. এমনকি মানুষও এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফসল। ডারউইন মনে করেন মানুষের আবির্ভাব হয়েছে নিম্ন শ্রেণীর জীব থেকে ধীরে ধীরে এক দীর্ঘ ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে। তার মতে নিম্ন শ্রেণীর জীব উন্নতি লাভ করে এক পর্যায়ে বানরের সীমারেখায় উপনীত হয় অতঃপর তা তাদের আকার পরিবর্তন করে মানুষে পরিণত হয়।

৩. এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ধারা বা পর্যায় অতিবাহিত হয়েছে; তবে গোটা প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক, কোন অতি প্রাকৃতিক হস্তক্ষেপ এখানে নেই। কোন উদ্দেশ্যবাদিতার অবকাশ এখানে নেই, বরং বিষয়টি আগাগোড়া যান্ত্রিক।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের বৈশিষ্ট্য ঃ

ডারউইন তার জীবজগৎ সম্পর্কিত যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ তত্ত্বে জীবের আবির্ভাব, অগ্রগতি ও বিনাশ সাধনের ক্ষেত্রে কিছু পর্যায় বা ধাপের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোকে তার বিবর্তনবাদের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। তার বিবর্তনবাদ বোঝার জন্য এ বৈশিষ্ট্য সমূহ বোঝা আবশ্যক।

১."সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা" গ্রন্থ, লেখক ঢাকা তেজগাঁও কলেজের প্রভাষক মোঃ শওকত হোসেন- অবলম্বনে লিখিত ॥

১. আত্ম বিভাজনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি ঃ

ডারউইনের মতে জগৎ সংসারে প্রাথমিকভাবে এক ধরনের জীবনের উৎপত্তি ঘটে। এ ছিল এক ধরনের এককোষী জীব। তবে এমন হতে পারে এটা ইশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। এই আদিম এক বা একাধিক কোষ নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে দুই কোষ সৃষ্টি হয় এবং দুই কোষ আবার বিভক্ত হয়ে আরও দুটি করে জীবকোষ সৃষ্টি হয়। এভাবে ক্রমশঃ জগৎ সংসারে বহু কোষের আবির্ভাব ঘটে। এবং এসব জীবকোষগুলো থেকে বংশবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে ডারউইন "আত্মবিভাজনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি" (Multiplication by cell division) বলে চিহ্নিত করেছেন।

২. আকস্মিক পরিবর্তন ঃ

ডারউইনের মতে প্রতিটি জীবকোষই পরিবর্তনশীল। তারা বিভাজন প্রক্রিয়ার পর যে অবস্থায় পরিণত হয় সে অবস্থায় থাকে না। আর জীবকোষগুলো দেখতে সরল হলেও মূলতঃ বেশ জটিল প্রকৃতির। কখনও কখনও এই জটিল প্রকৃতির জীবকোষের মধ্যে দেখা দেয় আকস্মিক পরিবর্তন (Fortuinous of charce variation)। এই পরিবর্তন জীবদেহেও পরিবর্তনের সূচনা করে। এভাবে জীবকোষগুলো ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জীবদেহে বিবর্তিত হতে থাকে। জীবকোষের মধ্যে তখন বিভিন্ন রকমের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়ে উঠতে থাকে। তবে এই যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা কিন্তু কোন উদ্দেশ্যমূলক ভাবে গড়ে উঠে না। বলা হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়াটি একটি আকস্মিক পরিবর্তন। তাই হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আকস্মিক ভাবেই গড়ে উঠে এবং এগুলো উদ্ভবের পরে এগুলোর এক একটির কার্য নির্ধারিত হয়। ডারউইনের মতে চোখের সৃষ্টির পরই তা দেখার কাজে নিযুক্ত হয়, কানের সৃষ্টির পরই তা শ্রবণ করার কাজে নিযুক্ত হয়। এভাবে প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আকস্মিক ভাবে সৃষ্টির পর প্রয়োজন দেখা দেয়ায় নিজ নিজ কাজে তারা নিযুক্ত হয়। তিনি বলেন এরূপ যে পরিবর্তন জীবদেহের অনুকূল হয় সে জীবগুলো টিকে থাকে আর যে জীবদেহের প্রতিকূল হয় তার প্রজাতি লোপ পেতে থাকে।

৩. বংশানুক্রমে অর্জিত পরিবর্তন সঞ্জাত বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণঃ

আকস্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবদেহ যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী লাভ করে থাকে তা বংশানুক্রমিক ভাবে সংক্রমিত হয়। বংশানুক্রমিক ভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের এই সংক্রমণকে বলা হয় Transmission of acquired characters by heredity। এই সংক্রমণের দ্বারা পরিবর্তনের মাত্রা বিভিন্ন মাত্রায় হতে পারে। তাই সংশ্লিষ্ট জীবের পূর্বপুরুষের মধ্যে দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী যেমন ছিল সংক্রমণের দ্বারা ঠিক তেমনটিই থাকবে তা নয়। তবে এই সংক্রমণ সবক্ষেত্রে সুবিধাজনক হয় না। কোন কোন জীবের মধ্যে সেটা খাপ খায় আবার কোন কোনটার মধ্যে সেটা খাপ খায় না। খাপ খেলে সে প্রজাতিটি বেচেঁ থাকে, আর খাপ না খেলে সে প্রজাতিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৪. অস্তিত্বের লড়াই ঃ

পৃথিবীতে প্রজাতির সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। কিন্তু প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পৃথিবীর খাদ্য-দ্রব্যের সংখ্যা সে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই প্রকৃতিতে খাদ্য

ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। আর প্রতিটি প্রজাতিকে বেঁচে থাকতে হলে খাবার সংগ্রহ করতে হয়। ডারউইন মনে করেন তাই সীমিত খাবারের জন্য প্রাণীকূলের মধ্যে বেধে যায় তুমুল প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতা এত তীব্র হয় যে, তা দ্বন্দ্বের আকারে প্রকাশ পায়। ডারউইন এই দ্বন্দ্বের নাম দিয়েছেন জীবন সংগ্রাম বা অস্তিত্বের সংগ্রাম (Struggle for existence)।

৫. যোগ্যতরের বাঁচার অধিকার ঃ

প্রাণীকূলের জীবন মানেই সংগ্রাম। তবে জীবন সংগ্রামে সব প্রজাতিই জয়ী হয় না, কিছু কিছু প্রজাতি হেরে যায়। যারা জয়লাভ করে তারা টিকে থাকে, আর যারা হেরে যায় তারা ধ্বংস হয়। জগৎ সংসারে তাই একমাত্র যোগ্যতমদেরই রয়েছে বাঁচার অধিকার।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের ত্রুটিসমূহ ঃ

"সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা"- গ্রন্থকার বলেনঃ "ডারউইনের মতবাদের যে সকল বিশেষ বিশেষ ত্রুটি উল্লেখ করার মত তা হলঃ

১. ডারউইন তার বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রথমেই এক কোষী জীবের কথা স্বীকার করেন। তার মতে সেই এক কোষ ভেঙ্গে বহুকোষের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এই কোষ কিভাবে সৃষ্টি হল এর যথার্থ কোন ব্যাখ্যা ডারউইনের মতবাদে পাওয়া যায় না।

২. ডারউইন তাঁর বিবর্তন প্রক্রিয়ার সূচক আদি কোষের উৎপত্তির ক্ষেত্রে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সম্ভবতঃ ইশ্বর একে সৃষ্টি করে থাকতে পারেন। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে তার মতবাদের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেয়ার দরকার কি ছিল ? ইশ্বর যদি আদি কোষ সৃষ্টি করতে পারেন, তবে সে ক্ষেত্রে তাঁর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদকে উদ্দেশ্যহীন এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই তাঁর মতবাদ স্ববিরোধিতায় পর্যবসিত হয়েছে।

৩. ডারউইন জীবকোষের যে আকস্মিক পরিবর্তনের কথা বলেছেন, তা কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক ব্যাখ্যা হতে পারে না। কেননা কোন কিছুকে আকস্মিক বলা মানেই হল সে বিষয়টিকে যুক্তি দ্বারা প্রমাণের প্রচেষ্টা না করে তাকে সরাসরি এড়িয়ে যাওয়া। তাছাড়া বিজ্ঞান কখনও আকস্মিকতায় বিশ্বাস করে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ আবশ্যক।

৪. ডারউইনের মতবাদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি যেন কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান না করে হয় শুধু প্রকল্প প্রণয়ন করেছেন অথবা কোন প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন, তা না হলে তিনি বিবর্তনের পুরো ব্যাপারগুলো দেখেছেন। এটা এজন্য বলা চলে, কেননা ডারউইনের আলোচনার ভঙ্গিমা দেখে মনে হয়েছে তিনি যেন সবকিছুকে প্রমাণের অপেক্ষাধীন রাখতে চান না। তাছাড়া অপর্যাপ্ত প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও ডারউইনকে আমরা বেশ নিশ্চিত ভঙ্গিতে তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করতে দেখি।

৫. ডারউইন তাঁর জৈবিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বংশানুক্রমিক ভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ তত্ত্ব বর্তমান জীব বিজ্ঞানে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে জীব বিজ্ঞানী ভাইসম্যান প্রমাণ করেছেন যে, সর্ব প্রকার অর্জিত

বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় সংক্রমিত হয় না, কেবলমাত্র জননকোষের বৈশিষ্ট্যগুলিই বংশানুক্রমে সংক্রমিত হতে পারে।

৬. সমকালীন বিজ্ঞানের 'প্রজনন তত্ত্ব' থেকে আমরা জানি যে, প্রাণীর ডি, এন, এ এবং আর, এন, এ মিলে নতুন সন্তানের জন্ম হয় এবং সন্তানের মধ্যে পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকার ক্ষেত্রেও সর্বদা একই রকম হয় না। এছাড়া মানুষের জীব কোষের গঠন, ডি, এন, এ ও আর, এন, এ-এর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের পর প্রমাণ হয় যে, অন্য কোন প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষ প্রজাতির সৃষ্টি হয়নি।

৭. বর্তমান প্রাণী বিজ্ঞানে ক্লোনিং একটি অবিস্মরণীয় উৎকর্ষতা। বৃটিশ বিজ্ঞানীরা সর্ব প্রথম ভেড়ার উপর এই ক্লোনিং প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে 'ডলি' নামের একটি নতুন ভেড়া তৈরী করেছেন। যাহোক, আমরা জানি, ক্লোনিং হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে করে কোন প্রাণী দেহের কোন কোষ সংগ্রহ করে তা থেকে অন্য একটি প্রাণী তৈরী করা হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, ক্লোনিং-এর দ্বারা এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণী তৈরী হয় না, একই প্রাণী তৈরী হয়। ঠিক যে প্রজাতির কোষ সংগ্রহ করা হয়, সেই প্রজাতিই হুবহু জন্মলাভ করে। কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও এ ক্ষেত্রে সংঘঠিত হয় না। তাই এর থেকে মোটামুটি ভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণী যেমন বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়নি।

৮. ডারউইন তাঁর বিবর্তনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাণী প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেছেন তার সবগুলোকে সঠিক ভাবে সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। যেমন তিনি বলেছেন জীবকূল সর্বদা অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্তে পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত থাকে। তারা নির্মমভাবে একে অন্যকে প্রতিহত করে বিজয়ী হয়ে বেঁচে থাকে এবং পরাজিতদের জগৎ থেকে বিতাড়িত করে। ডারউইনের এই বক্তব্য অবাঞ্চিত। কেননা, প্রাণীকূলের মধ্যে কেবল দ্বন্দ্ব-সংঘাতই নয় পরস্পর সহানুভূতি, সহযোগিতা ও আদান প্রদান মূলক বৈশিষ্ট্যও আমরা লক্ষ্য করি। এমনকি এই গুণাবলী কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই নয় বরং অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করি।"[১]

সবশেষে চূড়ান্ত কথা হল-ডারউইনের মতবাদে ধর্মীয় বিশ্বাসকে চরম ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ কর্তৃক জগৎ সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসকে অস্বীকার করায় এ মতবাদটি একটি সন্দেহাতীত কুফ্‌রী মতবাদে পরিণত হয়েছে। জগতের সবকিছুই আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টিকৃত -এ বিষয়ে উল্লেখিত বহু আয়াতের মধ্যে একটি আয়াত হল ঃ

خالق كل شئ-

অর্থাৎ, তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। (সূরা ঃ ১৩-রা'দঃ ১৬)

আর সবকিছু আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এ বিষয়ের বহু কুরআনী আয়াতের মধ্যে একটি আয়াত হল ঃ

وسخرلكم ما فى السموت وما فى الارض جميعا منه -

১.সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা, মোঃ শওকত হোসেন, পৃষ্ঠা নং ১৫৬-১৫৮ ॥

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন যা কিছু রয়েছে আকাশসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে পৃথিবীতে। সবকিছুই তাঁর থেকে। (সূরা ঃ ৪৫-জাছিয়াঃ ১৩)

মানুষ যে বিবর্তনের মাধ্যমে নয় বরং সরাসরি আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে মনুষ্য জাতির বিস্তৃতি ঘটেছে সে সম্পর্কে সূরা নেছা-র শুরুতে স্পষ্টতঃ বিবরণ পেশ করা হয়েছে। সূতরাং বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষ সৃষ্টির আকীদা কুর-আনের স্পষ্ট ভাষ্য বিরোধী হওয়ায় তা সন্দেহাতীত ভাবেই একটি কুফ্‌রী মতবাদ।

পরিশেষে আর একটি কথা বলতে হয়। 'বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টাতত্ত্ব' গ্রন্থকার বলেন ঃ "সাধারণ জ্ঞানী মানুষেরা ধারণা করেন যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদ বলতে চায় যে, মানুষ এপ্ অর্থাৎ, বানর জাতীয় জন্তু থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে এসেছে, মানুষকে সরাসরি পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্ট নয়, বিবর্তনের ফল। তাই স্রষ্টা নেই।

মানুষ যদি সৃষ্ট না হয়, বিবর্তনের ফলাফল হয়, তাহলে কিভাবে বলা যাবে যে, স্রষ্টা নেই? সরাসরি সৃষ্ট ও বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট, সর্বপ্রকারের সৃষ্টিই তো সার্বভৌম স্রষ্টার পক্ষে সম্ভব।[১]

ফ্রয়েড ইজম/যৌনবাদ

সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund freud) ছিলেন একজন মনোচিকিৎসক। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার মুরাভিয়া জেলার ফ্রেইলবার্গ নামক ক্ষুদ্র জনবসতির এক মধ্যবিত্ত ইয়াহুদী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বংশগতভাবে তিনি ইয়াহুদী হলেও আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী ছিলেন। তার জীবনীকার ডঃ জোন্স লিখেছেনঃ তিনি ছিলেন এমন নাস্তিক যে, কোনদিনই আল্লাহ্ বিশ্বাসী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।[২]

চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করলে ডাক্তার ফ্রয়েডের হিস্ট্রিয়া রোগীর প্রতি বেশী আগ্রহ ও কৌতুহল সৃষ্টি হয়। এসব রোগীর চিকিৎসা পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপায়ে সম্মোহন পদ্ধতিতে (Hypnotism/হিপনোটিজম) রোগীর মধ্যে মোহনিদ্রার সঞ্চার ঘটানো হত। রোগীকে একথা বিশ্বাস করানো হত যে, সে সুস্থ ও নিরোগ হচ্ছে, তার রোগ ক্রমশঃ দূর হয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে ফ্রয়েডের মনে প্রশ্ন জাগল যে, সম্মোহনের সাহায্যে চিকিৎসকের চিন্তাধারা যদি রোগীর রোগ নিরাময় করতে সক্ষম হয়, তাহলে রোগকে রোগীর বিশ্লিষ্ট জটিল চিন্তার উৎপাদন মনে করা যাবে না কেন? ফ্রয়েড তখন মনের প্রকৃত স্বরূপ কি তা নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন এবং এক অভিনব মনস্তত্বের জন্ম দিলেন। ফ্রয়েডের এই মনস্তত্বই জ্ঞানীজনদের নিকট ফ্রয়েডের কাম সর্বস্ববাদ বা ফ্রয়েডের যৌনবাদ বলে সু-পরিচিত। একমাত্র কাম-প্রবৃত্তির দ্বারা ফ্রয়েড মানুষের সবরকম আচরণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন বলে তার মতবাদকে "সর্বকামবাদ" এবং তাঁকে সর্বকামবাদী (Pansexualist) মনোবিজ্ঞানী বলা হয়।

১. বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টাতত্ত্ব, মুহাম্মাদ সিদ্দিক, মদীনা পাবলিকেশান্স, পৃষ্ঠা নং ২৭ ॥ ২. পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি, বরাত- The life and works of Sigmund freud.॥

ফ্রয়েডের যৌনবাদের বিশেষ কয়েকটি মূলকথা ঃ[১]

নিম্নে ফ্রয়েডের মনস্তাত্বিক মতবাদ তথা কামসর্বস্ববাদের বিশেষ ৫টি মূলকথা ও তার খন্ডন পেশ করা হলঃ

১. ফ্রয়েডের মতে কাম-প্রবৃত্তি বা যৌনানুভূতি মানুষের সব চিন্তা-ভাবনা এবং কার্যকলাপের নিয়ামক। তার মতে মানুষের সব আচরণ মূলতঃ কামজ। মানুষ আদি কাম দ্বারা পরিচালিত। সেই আদি কাম-প্রবৃত্তি[২] থেকেই তার সবরকম আচরণ উদ্ভূত। কামকে চরিতার্থ করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

খণ্ডন ঃ

মানুষের সব আচরণ কাম-প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত- ফ্রয়েডের এই মতবাদ গ্রহণযোগ নয়। কারণ -

(এক) মানুষ সামাজিক জীব। তার আচরণে সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবও অনস্বীকার্য। আধুনিক মনোজ্ঞান ও চরিত্র বিজ্ঞানে মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও আচরণে পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, এমনকি বংশগতিরও প্রভাব রয়েছে বলে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে।[৩] অতএব সব আচরণ কাম প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফ্রয়েডীয় দর্শন একদেশদর্শীতা ও অপূর্ণতার দোষ থেকে কোনক্রমেই অব্যাহতি পেতে পারে না।

(দুই) সব আচরণ ও শক্তিগুলো যদি মূলতঃ কামজ হয়ে থাকে এবং আদি কাম থেকে তা উদ্ভূত হয়ে থাকে, তাহলে অবদমন শক্তি ও অবদমন মূলক আচরণগুলোর উৎপত্তিও হবে আদি কাম থেকে। আর তা হলেই বলতে হবে পাপ থেকে পাপ দমনের শক্তি জন্মলাভ করেছে। এটা স্পষ্টতঃ বৈপরিত্য বৈকি ?

(তিন) ফ্রয়েড স্নেহ, প্রীতি, সন্তান-বাৎসল্য প্রভৃতিকেও কাম-প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ স্নেহ, সন্তান-বাৎসল্য ইত্যাদি এবং কাম-প্রবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য থাকার বিষয়টি একজন গেয়োঁ মূর্খও অনুধাবন করতে পারে। এভাবে সব ধরনের চেতনাকে কাম আখ্যায়িত করার পশ্চাতে অবাধ যৌনাচারিতার পক্ষে মানসিকতা গঠন ব্যতীত অন্য কোন সদুদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না।

২. ফ্রয়েড-এর মতে মানুষের অবাধ যৌনাচারিতার পক্ষে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের বাধাই দৈহিক ও মানসিক বিকার ঘটার কারণ। মানুষের যৌন জীবনের যথাযথ বৃদ্ধি ও

---

১. ফ্রয়েডের মূল কথাগুলির সিংহভাগ গ্রহণ করা হয়েছে "মন ও মনোবিজ্ঞান" গ্রন্থের "ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে কাম" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে। লেখক ঃ ড. আব্দুল খালেক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আর বিজ্ঞানীদের উক্তির উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে মাওলানা আব্দুর রহীম কর্তৃক রচিত "পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি" নামক পুস্তক থেকে ॥

২. ফ্রয়েড কাম-প্রবৃত্তি বলতে শুধুমাত্র যৌনাকাঙ্খা বা প্রজনন প্রেষণা বুঝান নি। কাম-প্রবৃত্তিকে তিনি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, যৌনাকাঙ্খা, সন্তান-বাৎসল্য প্রভৃতিকে তিনি কাম-প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করেছেন ॥

৩. ইসলামী চরিত্র বিজ্ঞানেও মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও আচরণে পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও বংশগতির প্রভাব স্বীকৃত। এ সম্পর্কে দলীল-প্রমাণসহ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আমার রচিত "ইসলামী মনোবিজ্ঞান" গ্রন্থ ॥

সুষ্ঠু বিকাশের উপরই তার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভরশীল। তিনি বলেন, "নিম্নতর প্রাণীদের পক্ষে যৌন-বৃত্তি চরিতার্থ করায় তেমন কোন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নেই। কিন্তু সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য মানুষকে বহুকাল পর্যন্ত যৌনাবেগ সংবরণ বা অবদমন করে রাখতে হয়। যৌনকামনা ও প্রতিবন্ধকতার দ্বন্দ্বে মানুষের মন উদ্বেগ ও অশান্তিতে ভরা থাকে। ফ্রয়েডের মতে এই চাপাচাপির কারণেই মানুষের নানা রকম দৈহিক ও মানসিক বিকার ঘটে থাকে। যেমন নিউরোসিস, হিস্ট্রিয়া প্রভৃতি মানসিক রোগ এ থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

খণ্ডন ঃ

অবাধ যৌনাচারিতার পক্ষে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের বাধা মানুষের দৈহিক ও মানসিক বিকার ঘটার কারণ হওয়া সম্পর্কিত ফ্রয়েড সাহেব কথিত দর্শন বাস্তব সম্মত নয় এবং তা নেতিবাচক যৌন উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী। কেননা ঃ

(এক) ফ্রয়েডের কথা মেনে নিলে সব ধর্মপ্রাণ মানুষেরই ফ্রয়েড সাহেব কথিত নানা রকম দৈহিক ও মানসিক রোগে আক্রান্ত থাকার কথা। কারণ ধর্মীয় অনুশাসনের বাধা অবশ্যই তাদের ক্ষেত্রে রয়েছে। অথচ তেমনতো দেখা যায় না। আর যারা ধর্মপ্রাণ নয় তাদের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনের বাধা না থাকলেও যেহেতু কমবেশ সামাজিক অনুশাসনের বাধাতো অবশ্যই রয়েছে; কাজেই কারুরই ফ্রয়েড সাহেব কথিত নানা রকম দৈহিক ও মানসিক রোগ থেকে মুক্ত থাকার কথা নয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের জ্বলন্ত বাস্তবতা কি এ বিষয়ে ফ্রয়েড সাহেবকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করছে না ?

(দুই) ফ্রয়েড সাহেব নিম্নতর প্রাণীদের পক্ষে যৌন-বৃত্তি চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে তেমন কোন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা না থাকার উদাহরণ তুলে ধরে কি আশরাফুল মাখ্লূকাত মানব সমাজকেও নিম্নতর প্রাণীর মত মা, মেয়ে, বোন, ভাগ্নি, খালা, ফুফু, নানী, দাদীর মধ্যে পার্থক্যহীন যৌন-বৃত্তি চরিতার্থ করার মত জংলী যৌন পরিবেশ গড়ে তোলার সবক দিতে চান ? তার উপরোক্ত দর্শন থেকেতো তেমনই উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে!

৩. ফ্রয়েড-এর মতে মানুষের মানসিক গঠন ও বিকাশের ভিত্তি হল শৈশবকালীন যৌনবোধ। তিনি ব্যক্তির প্রাথমিক জীবনের মানস-যৌন (Psycho-sexual) বিকাশকে ব্যক্তিত্বের কাঠামো হিসাবে ধরেছেন। পরবর্তী পর্যায়ের বৃদ্ধি ও বিকাশ হচ্ছে এই মূল কাঠামোর সম্প্রসারণ। ফ্রয়েড ব্যক্তির মানস-যৌন বিকাশের কতগুলি স্তর বিন্যাস করেছেনঃ

(এক) মুখকাম স্তর (Oral erotic stage)ঃ

এই মুখকাম-স্তরে শিশুর সুখকর অনুভূতি ও যৌন তৃপ্তি মুখে কেন্দ্রীভূত থাকে। স্তন পানে শিশু সুখ অনুভব করে। সুখকর অনুভূতি ব্যাহত হলে বা অতৃপ্ত থাকলে শিশু আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। স্তন-বৃন্ত কামড়ে দিয়ে মায়ের প্রতি হিংসা ও নৈরাশ্য প্রকাশ করে। শিশুর এই আক্রমণাত্মক মনোভাব তার জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে ধর্ষকামে (sadism) রূপান্তরিত হতে পারে। ধর্ষকামীরা প্রেমাস্পদকে নিপীড়িত করে যৌন সুখ লাভ করতে চেষ্টা করে।

খণ্ডন ঃ ফ্রয়েড সাহেব কথিত এই দর্শন অবাস্তব সম্মত ও বিকৃত। কেননা-

(এক) বাস্তবে আমরা দেখতে পাই স্তন পানে শিশুর সুখকর অনুভূতি ব্যাহত না হলেও বা অতৃপ্ত না থাকলেও অনেক সময় শিশু মায়ের স্তন-বৃন্তে কামড় দিয়ে থাকে।

সন্তানকে দুগ্ধ দানকারিনী যে কোন জননীর কাছে জিজ্ঞেস করলেই এর সত্যতা যাচাই করা যাবে।

(দুই) মুখের রসনা তৃপ্তিকে যৌনতৃপ্তি আখ্যা দেয়া বিকৃত ধারণা বৈকি? মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করলেও কি ফ্রয়েড সাহেবের যৌনতৃপ্তি লাভ হত ?

(দুই) পায়ুকাম-স্তর (anal erotic stage)ঃ

এই পায়ুকাম স্তরে সুখকর অনুভূতি পায়ু বা মলদ্বারে কেন্দ্রীভূত থাকে। মল ত্যাগে শিশু দৈহিক স্বস্তি অনুভব করে। মলত্যাগের ব্যাপারে মায়ের কঠোর ও দমনমূলক আচরণে মনের দিক থেকে শিশু একঘেয়ে, বেয়াড়া বা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে পার।

খণ্ডন ঃ ফ্রয়েড সাহেব মলত্যাগের মাধ্যমে দৈহিক স্বস্তি লাভের মত বিষয়কে কোন্ হিসেবে যৌন-বিকাশের স্তর নির্ধারণ করলেন তা বোধগম্য নয়। পাগলের মত আবোল-তাবল বক্তব্য ছাড়া আর কিছু বলে বোধ হয় এটাকে আখ্যা দেয়া যাবে না। কিংবা বলতে হবে সবকিছুকে কাম আখ্যায়িত করার পশ্চাতে অবাধ যৌনাচারিতার পক্ষে মানসিকতা গঠনই তার উদ্দেশ্য ছিল।

(তিন) লিংগ-স্তর (phallic stage) ঃ

এই লিংগ-স্তরে শিশু তার যৌনাঙ্গ সম্বন্ধে সজাগ এবং আত্মকামী (autoerotic) হয়। সে তার নিজের দেহকে ভালবাসে। এই আত্মকামিতাকে ফ্রয়েড বলেছেন আত্মপ্রেম (Nareissism)। এই স্তরে কাম প্রবৃত্তি দুইভাবে প্রকাশ পায়। প্রথমটি হল পুরুষ শিশুর মাতার প্রতি যৌনাকর্ষণ অনুভব করা এবং পিতাকে ঈর্ষা করা। এটাকে ফ্রয়েড বলেছেন ইডিপাস কমপ্লেক্স (edipus complex)। দ্বিতীয়টি হল মেয়ে শিশুর পিতার প্রতি যৌনাকর্ষণ অনুভব করা এবং মাতাকে ঘৃণা করা। ফ্রয়েড এর নাম দিয়েছেন ইলেক্ট্র কমপ্লেক্স (Electra complx)।

খণ্ডন ঃ ফ্রয়েড সাহেব কথিত এই দর্শনও অবাস্তব সম্মত, বিকৃত এবং অবৈজ্ঞানিক। কেননা -

(এক) এই স্তরে শিশু তার দেহকে ভালবাসে কথাটা কি বাস্তব সম্মত ? তাহলে সব শিশুই তার দেহের ব্যাপারে যত্নবান হত। কিন্তু বাস্তবে কি তা দেখা যায়? এমনি ভাবে সব পুরুষ শিশু মায়ের প্রতি আকর্ষণ আর পিতার প্রতি বিকর্ষণ তথা ঈর্ষা, পক্ষান্তরে সব মেয়ে শিশু পিতার প্রতি আকর্ষণ ও মায়ের প্রতি বিকর্ষণ তথা ঘৃণা অনুভব করে- এ কথাটিও বাস্তব সম্মত নয়। সন্তান ধারিনী মাতা-পিতার মধ্যে জরিপ চালিয়ে যে কেউ এর সত্যতা যাচাই করতে পারেন।

(দুই) মাতা-পিতার প্রতি শিশুর আকর্ষণ যদি যৌনাকর্ষণ হয়ে থাকবে, তাহলে পুরুষ শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তির পর অন্যান্য নারীদের তুলনায় মায়ের সাথেই তার যৌনকুকর্মে বেশী আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত হওয়ার কথা। তদ্রূপ কন্যা শিশুর বেলায়ও বয়ঃপ্রাপ্তির পর পিতার সাথে তার যৌনকুকর্মে বেশী আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তার বিপরীত। বাস্তব হল দু' একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ব্যতীত মার্জিত স্বভাবের কোন মানুষের মধ্যে

মাতা-পিতার সাথে যৌন কর্মের চাহিদাই জাগ্রত হয় না। ফ্রয়েডের জনৈক অনুসারী ডঃ রামোস ফ্রয়েডের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও লিখেছেন, "মা-সন্তানের পারস্পরিক আন্তরিক ও একনিষ্ঠ সম্পর্ককে যৌন স্পৃহার আবেগ নামে অভিহিত করা -জেনে শুনেই করা হোক কিংবা অজ্ঞাতসারে- সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং ইচ্ছামূলক ব্যাপার।" প্রখ্যাত আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ অধ্যাপক যোসেফ জ্যেস্ট্রো তার সমালোচনা গ্রন্থ Freud : his Dream and sex Theories -তে লিখেছেন, "জীব বিজ্ঞান, শরীর বিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের কোথাও এই অস্বাভাবিক সম্পর্কের এক বিন্দু বৈধতা আমি খুঁজে পাই না।"

(তিন) বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে এ কথা ভুল প্রমাণিত। কেননা যৌনবৃত্তির উদ্দীপনা যৌবন প্রাপ্তির পূর্বে কখনই সৃষ্টি হয় না। জীববিদ্যার যে কোন ছাত্র জানে যে, বিভিন্ন আবেগ বা বৃত্তি বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্রীর আলাদা আলাদা রাসায়নিক পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে। এবং অন্য কোন বৃত্তি বা আবেগ উদ্দীপক স্নায়ুতন্ত্রী যৌনবৃত্তিকে উদ্দীপিত করতে পারে না। অন্য সকল প্রকার আবেগ সংশ্লিষ্ট মাংসগ্রন্থী ও স্নায়ুতন্ত্রী শিশুর জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যৌনস্পৃহা সংশ্লিষ্ট মাংসগ্রন্থী ও স্নায়ুতন্ত্রী শিশুর জন্মকালে অসম্পূর্ণ থাকে, ফলে তা তখন কাজের উপযোগী হয় না। অতএব যৌবন প্রাপ্তির পূর্বে কোন শিশু যৌন আবেগ প্রকাশের যোগ্যই হয় না।

(চার) ফ্রয়েডের 'শিশুর যৌনস্পৃহা' সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করার জন্য মনস্তাত্বিকগণ বহু সংখ্যক অল্প বয়স্ক বালক ও বালিকাদের দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অধ্যয়ন অধীন রেখে সাক্ষ্য প্রমাণ সহকারে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, 'শিশুর যৌনস্পৃহা' ভিত্তিহীন কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। ঈডিপাস কমপ্লেস একটা মনগড়া কল্পকাহিনী মাত্র।

(চার) জনন-স্তর (gental stage)ঃ

এই জনন-স্তর মানস-যৌন বিকাশের সর্বশেষ স্তর, যৌবন প্রাপ্তির সাথে সাথে এই স্তর শুরু হয় এবং প্রজনন ক্রিয়ার দ্বারা যৌনবৃত্তি চরিতার্থের ফলে এর পরিণতি ঘটে।

এই চারটি স্তরের প্রথম তিনটি শৈশব জীবনের প্রথম পাঁচ বছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এরপর কিছুকাল যৌনবোধ সুপ্তাবস্থায় থাকে। বয়োপ্রাপ্তির সাথে সাথে জনন স্তর দেখা দেয়। ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তির মানসযৌন বিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সুখকর ও বিরক্তিকর অনুভূতি, পিতা-মাতার অনুকূল ও প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া, মানসিক দুশ্চিন্তা, ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত তার ব্যক্তিত্বের ধারা নির্ধারণ করে।

৪. ফ্রয়েডের মতে তিনটি সত্তার সমন্বয়ে ব্যক্তিত্বের কাঠামো গঠিত। এগুলো হচ্ছে ঃ আদিসত্তা, অহম ও অধিসত্তা।

(এক) আদিসত্তা বা ইগো (ego) ঃ

আদিসত্তা ব্যক্তিত্বের প্রাথমিক সত্তা। এটি জন্মগত। এর উপর ভিত্তি করেই অহম এবং অধিসত্তার উন্মেষ ঘটে। সহজাত প্রবৃত্তি এবং বংশগতির সূত্রে প্রাপ্ত সকল মানসিক প্রক্রিয়াই আদিসত্তার অন্তর্ভুক্ত। আদিসত্তা ব্যক্তির সকল মানসিক শক্তির আধার। এই সত্তাটি ব্যক্তির শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, বাহ্যিক জগতের সাথে এর কোন সম্পর্ক

নেই। আদিসত্তা সুখনীতির দ্বারা পরিচালিত। অর্থাৎ, সব সময় আনন্দ পেতে চায়। আদিসত্তার আনন্দ লাভের প্রক্রিয়া হচ্ছে অন্ধভাবে জৈবিক প্রেষণা চরিতার্থ করা। ব্যক্তির আদিসত্তা আনন্দ লাভের ব্যাপারে ন্যায়-অন্যায় বা নৈতিকতার ধার ধারে না।

খণ্ডন ঃ ফ্রয়েডের এই বক্তব্য অবৈজ্ঞানিক এবং ইসলামী দর্শন পরিপন্থী। কেননা-

(এক) ফ্রয়েড ব্যক্তিত্বের কাঠামো তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন, এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তিনি পেশ করে যেতে পারেননি।

(দুই) তিনি একদিকে বলেছেন সহজাত প্রবৃত্তি এবং বংশগতির সূত্রে প্রাপ্ত সকল মানসিক প্রক্রিয়াই আদিসত্তার অন্তর্ভুক্ত, আবার বলেছেন ব্যক্তির আদিসত্তা আনন্দ লাভের ব্যাপারে ন্যায়-অন্যায় বা নৈতিকতার ধার ধারে না। তার এই দুটো কথার মধ্যে বৈপরিত্য রয়েছে। কেননা সহজাত প্রবৃত্তি এবং বংশগতির সূত্রে প্রাপ্ত সকল মানসিক প্রক্রিয়াই ন্যায়-অন্যায় বা নৈতিকতার ধার ধারে না- এমন নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞান[১] ও চরিত্র বিজ্ঞানে এখন স্বীকৃত যে, বংশগতির সূত্রেও মানুষের অনেক ভাল চরিত্র অর্জিত হয়ে থাকে।

(তিন) ফ্রয়েড যে বলেছেন ঃ ব্যক্তির আদিসত্তা আনন্দ লাভের ব্যাপারে ন্যায়-অন্যায় বা নৈতিকতার ধার ধারে না। এ কথাটি হাদীছে বর্ণিত তথ্যেরও পরিপন্থী। হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী প্রত্যেকটা নবজাত শিশু নির্মল ও স্বচ্ছ মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর তার মধ্যে মাতা-পিতার শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকতার ফলে নেতিবাচক মনোবৃত্তি জাগ্রত হতে থাকে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

كل مولود يولد على الفطرة وابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه -

অর্থাৎ, প্রত্যেক নবজাতক স্বচ্ছ প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। আর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী বানায়, খৃষ্টান বানায় এবং মাজূসী (অগ্নি পূজারী) বানায়।

(দুই) অহম বা ঈদ (id)ঃ

ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় সত্তা হচ্ছে অহম্। বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি সাধন করে আদি সত্তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করাই অহমের কাজ। আদিসত্তা এবং অহমের ভিতর মূল পার্থক্য এই যে, আদিসত্তা শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জগৎ নিয়েই সন্তুষ্ট। পক্ষান্তরে বাস্তব জগতের সাথে অহমের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। তাছাড়া আদিসত্তা পরিচালিত হয় সুখনীতির দ্বারা। অন্যদিকে অহম্ পরিচালিত হয় বাস্তবধর্মী নীতির দ্বারা। বাস্তবধর্মী নীতির উদ্দেশ্য হল সঠিক বস্তু এবং প্রক্রিয়ার দ্বারা অস্বস্তি দূর করা এবং স্বস্তি বা সুখ লাভ করা। অহমকে ব্যক্তির কার্যনির্বাহী কর্ণধার বলা যেতে পারে। কারণ ব্যক্তির কোন্ সহজাত প্রবৃত্তি কিভাবে পরিতৃপ্তি হবে তা অহম নির্ধারণ করে থাকে। অহম এমনভাবে আদিসত্তা, অধিসত্তা এবং বাহ্যিক জগতের ঘটনাবলীর ভিতর সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে, যাতে এই সত্তাগুলোর চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি না হয়। অহমের সকল শক্তির উৎস আদিসত্তা এবং এর কামনা-বাসনা পূরণের জন্যই অহমের উদ্ভব ঘটেছে। ফ্রয়েডের মতে

১. এ সম্পর্কে জানার জন্য আমার রচিত "ইসলামী মনোবিজ্ঞান" দ্রঃ ॥

আদিসত্তাকে বাদ দিয়ে অহমের কোন অস্তিত্ব নেই এবং অহম্ কখনও আদিসত্তা থেকে স্বাধীন হতে পারে না।

খণ্ডন ঃ ফ্রয়েডের এই বক্তব্য তার মূল বক্তব্যের সাথে বৈপরিত্যে ভরা ও অবৈজ্ঞানিক। কেননা-

(এক) তিনি এখানে বলছেন অহমের কাজ হল বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি সাধন করে আদি সত্তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা। অথচ তিনি পূর্বে তার মূল বক্তব্যে সব ধরনের চিন্তা-চেতনাকে কামজ বলে আখ্যায়িত করে এসেছেন। তাহলে প্রশ্ন হল অহমের চিন্তা-চেতনাগুলি বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি সাধন করবে কিভাবে? সেটিওতো কামজ। আর কামজ চিন্তা-চেতনা কোন সমঝোতা বোঝে না। যদি বলেন অহম সঙ্গতি সাধন করতে বোঝে, তাহলে প্রশ্ন দেখা দিবে আদিসত্তা কেন তা বুঝবে না ? এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করার বৈজ্ঞানিক কোন প্রমাণ তিনি পেশ করে যেতে পারেননি।

(দুই) ফ্রয়েডের বক্তব্য অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের অহম স্তর অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিবেক সম্পন্ন, যার ফলে সেটি বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি সাধন করে চলতে সক্ষম এবং সবগুলি চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বসংঘাতকে এড়িয়ে সুচারু রূপে কাজ সম্পাদন করে যেতে সক্ষম। তাহলে ফ্রয়েড সাহেবের বক্তব্য থেকেই এ কথা বলা যাবে যে, অহম তার বিবেকের তাড়নায়ই ব্যক্তিকে সব রকম অশ্লীল কাজকর্ম থেকে বিরত রাখে এবং ব্যক্তির ধর্মীয় চাওয়া-পাওয়ার মধ্যকার সংঘাত তথা ধর্মীয় বিধি-বিধানের সাথেও দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে পর্যন্ত এড়িয়ে চলে। এমন বলা হলে নিশ্চিতভাবেই ফ্রয়েড সাহেবের অবাধ যৌন স্বাধীনতা প্রমাণের প্রয়াস ভেস্তে যাবে।

(তিন) অধিসত্তা বা সুপার ইগো (super- ego) ঃ

ব্যক্তিত্বের তৃতীয় বা শেষ সত্তা হল অধিসত্তা। ফ্রয়েডের মতে অধিসত্তা হচ্ছে ব্যক্তির চিরাচরিত মূল্যবোধ এবং সামাজিক আদর্শের অভ্যন্তরীণ প্রতিভূ। তিনি একে ব্যক্তির বিবেক বা নৈতিকতার ধারক-বাহকরূপে অভিহিত করেছেন। পারিবারিক আদর্শ এবং সামাজিক মূল্যবোধের আত্মীকরণের ফলেই ব্যক্তির ভিতরে অধিসত্তার উদ্ভব হয়। অধিসত্তা চায় পরিপূর্ণতা। আনন্দের প্রতি এর কোন মোহ নেই। অধিসত্তার প্রধান প্রধান কাজ হলঃ

(১) ন্যায়-অন্যায়ের ভিতর পার্থক্য নির্ণয় করা এবং সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা;

(২) আদিসত্তার কাম এবং আক্রমণাত্মক প্রেষণাকে অবদমন করা;

(৩) অহমকে আদর্শ ধর্ম লক্ষ্যবস্তু নির্ণয়ে প্রভাবিত করা; এবং

(৪) পরিপূর্ণতা অর্জনে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। ফ্রয়েডের মতে আদিসত্তা, অহম এবং অধিসত্তা একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়, এরা পরস্পর নির্ভরশীল। তবে সাধারণভাবে, আদিসত্তাকে ব্যক্তিত্বের জৈবিক সত্তা, অহমকে মানসিক সত্তা এবং অধিসত্তাকে

সামাজিক সত্তা বলা যেতে পারে। এই তিনটি সত্তার সুষম সমন্বয়েই সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে।

খণ্ডন ঃ ফ্রয়েডের এই বক্তব্য তার মূল বক্তব্যের সাথে চরম ভাবে সাংঘর্ষিক। কেননা তিনি এখানে বলছেন অধিসত্তা ব্যক্তির চিরাচরিত মূল্যবোধ এবং সামাজিক আদর্শের আভ্যন্তরীণ প্রতিভূ। অধিসত্তা ব্যক্তির বিবেক বা নৈতিকতার ধারক-বাহক। অধিসত্তা পারিবারিক আদর্শ এবং সামাজিক মূল্যবোধরক্ষা করে। আনন্দের প্রতি অধিসত্তার কোন মোহ নেই। অধিসত্তার প্রধান প্রধান কাজ হল ন্যায়-অন্যায়ের ভিতর পার্থক্য নির্ণয় করা এবং সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা; আদিসত্তার কাম এবং আক্রমণাত্মক প্রেষণাকে অবদমন করা; অহমকে আদর্শ ধর্ম লক্ষ্যবস্তু নির্ণয়ে প্রভাবিত করা ইত্যাদি। অথচ তিনি পূর্বে তার মূল বক্তব্যে সব ধরনের চিন্তা-চেতনাকে কামজ বলে আখ্যায়িত করে এসেছেন। আর কামজ চিন্তা-চেতনা কোন মূল্যবোধ, আদর্শ ও নীতি নৈতিকতার ধার ধারে না।

যদি বলা হয় ফ্রয়েড সাহেব কথিত "কাম বা যৌন" কথাটি ব্যাপক; যার মধ্যে সব ধরনের চিন্তা-চেতনা অন্তর্ভুক্ত। অতএব এখানকার বক্তব্য তার মূল কথার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তাহলে বলতে হবে তিনি সব ধরনের চিন্তা-চেতনাকে কাম বা যৌন আখ্যা দিয়েছিলেন যে উদ্দেশ্যে অর্থাৎ, অবাধ যৌনাচারিতার অনুকূলে মানসিকতা সৃষ্টির প্রয়াসে এখানকার বক্তব্য তার সে উদ্দেশ্যকে নিশ্চিতই নস্যাৎ করে দিয়েছে।

৫. ফ্রয়েডের মতে মানুষের সব কার্যকলাপ অচেতন মনের অবদমিত কামনার দ্বারা পরিচালিত। এর ব্যাখ্যা বোঝাতে যেয়ে তিনি কাল্পনিকভাবে মানব মনের তিনটি স্তর নির্ধারণ করেছেন।

(এক) চেতন। (Conscious)

(দুই) অনবচেতন/প্রাকচেতন। (pri conscious)

(তিন) অবচেতন/অচেতন। (Un conscious)

মানুষের যেসব কামনা-বাসনা বা মনোবৃত্তি সমাজে অবৈধ বা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়, সেগুলো শাস্তির ভয়ে অবদমিত হয়ে অচেতন মনে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবদমিত কামনাই অবচেতন মনের উপাদান। অবচেতন মনে অবস্থিত অবদমিত কামনাগুলোর ছদ্ম বা বিকৃত প্রকাশই দৈনন্দিন জীবনের ভুল-ভ্রান্তি, স্বপ্ন এবং মানসিক বিকাশের নানা রকম লক্ষণরূপে দেখা দেয়।

কিন্তু অবদমিত কামনাগুলো মনের নির্জ্ঞান বা অবচেতন স্তরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে না। কারণ কামনার স্বভাবই হচ্ছে সক্রিয়তা। সবসময় এগুলো চেতন মনে আত্মপ্রকাশ করে চরিতার্থতার সুযোগ খোঁজে। জাগরণে অবদমিত কামনার এই উদ্দেশ্য সফল হয় না। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় অধিসত্তা আচ্ছন্ন এবং শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং তার শাসন শিথিল হয়ে যায়। যেসব কামনা-বাসনা সমাজ-অনুমোদিত পথে স্বাভাবিকভাবে চরিতার্থ হতে পারে না,

এই সুযোগে তারা আত্মগোপন করে ছদ্মবেশে চেতন মনে প্রকাশিত হয়। ফ্রয়েডের মতে অতৃপ্ত ও অবদমিত কামনার চেতন মনে এ ধরনের বিকৃত প্রকাশই হচ্ছে স্বপ্নের মূল কারণ।[১]

স্বপ্ন ছাড়াও, মানব-জীবনের উচ্চতর আদর্শ বা মূল্যবোধ (যেমন, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি)-এর মাধ্যমে অবচেতন মনের অবদমিত কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির অবদমিত কামনাগুলো বিবিধ মানসিক রোগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু মানসিকভাবে মোটামুটি স্থুল লোকের অবদমিত কামনাগুলো প্রধানত ঃ তিনটি পন্থায় চেতন মনে আত্মপ্রকাশ করে। যথা ঃ

(১) উদ্‌গতি (sublimation) ঃ

এক্ষেত্রে অবদমিত কামনা তার স্বাভাবিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে কোন সৃজনশীল কাজে রূপান্তরিত হয়। যথা, ব্যর্থ প্রেমিকের প্রেমের কবিতা রচনা। উদ্‌গতির ফলেই সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, জনকল্যাণ, দেশপ্রেম, সৌন্দর্যপ্রীতি, ধর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শগুলোর বিকাশ ঘটে। কোন সেবাব্রতী নার্সের সেবানিষ্ঠার কারণ হয়ত তার বাল্য-বৈধব্য বা সন্তানহীনতা। তার অবদমিত মাতৃত্বই হয়ত তাকে সেবাব্রতী করেছে। সেবার মাধ্যমে সে তার অবদমিত কামনার পরিপূর্তি লাভ করতে চায়।

(২) অভিক্রান্তি (displacement) ঃ

এক্ষেত্রে অবদমিত কামনা কোন কল্যাণের পথে পরিচালিত না হয়ে বিশেষ খেয়াল বা আসক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন, কোন বালিকার মা হওয়ার বাসনা অবদমিত হয়ে পুতুল খেলায় অভিক্রান্ত হতে পারে, অথবা কোন নিঃসন্তান মহিলার অবদমিত মাতৃত্ব বিড়াল, কুকুর বা পাখী পোষার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে।

(৩) প্রতিক্রিয়া গঠন (reaction formation) ঃ

এক্ষেত্রে অবদমিত ইচ্ছা বিপরীতরূপ ধারণ করে। যেমন, লঘু, পাপে গুরুদন্ড পেয়ে কোন সৎলোক অসৎ হয়ে যেতে পারে। বিনম্রস্বভাবের কোন লোক প্রিয়জনের নিকট থেকে আঘাত পেয়ে প্রতিহিংসা পরায়ন ও নৃসংশ হয়ে উঠতে পারে।

---

১. এখানে ফ্রয়েড যে স্বপ্ন দর্শন পেশ করেছেন তার সারকথা হল স্বপ্ন হচ্ছে অতৃপ্ত ও অবদমিত কামনার প্রতিফলন। বা বলা যায় স্বপ্ন হল উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার ফসল। কিন্তু এ কথাও চির সত্য ও স্বীকৃত যে, স্বপ্নের মাধ্যমে বহু লোক চিন্তা গবেষণার অনেক সূত্র লাভ করেছেন, স্বপ্নের ঘোরে বহু লোক উচ্চমানের কবিতা ও সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন, স্বপ্নের মাধ্যমে ভবিষ্যতের অনেক বিষয়ে তথ্য লাভ করেছেন, অনেক গায়েবী জ্ঞানের উদঘাটন করেছেন। তাই স্বপ্ন শুধু অতৃপ্ত ও অবদমিত কামনার ফল নয়, স্বপ্ন শুধু উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার ফসল নয়। বরং স্বপ্ন একটি ব্যাপক বিষয়, যার রয়েছে বহুবিধ কারণ। স্বপ্নের নিগুঢ় রহস্য আজও সম্যকভাবে উদঘাটন হয়নি। ইসলাম বলেছে ঃ স্বপ্ন ব্যক্তিঘটিত হতে পারে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হতে পারে, আবার হতে পারে শয়তানের পক্ষ থেকেও। ইসলামের এই স্বপ্ন দর্শন অনেক ব্যাপক। এটাকে মেনে নিলে সব ধরনের স্বপ্নকেই এই তিন শ্রেণীর কোন না কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে ॥

খণ্ডন ঃ মানব মনের এই তিনটি স্তর নির্ধারণ ও এতদসম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সারকথা হল ফ্রয়েড সাহেবের মতে মানুষের সব কার্যকলাপ অচেতন মনের অবদমিত কামনার দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু ফ্রয়েডের এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা-

(এক) মানুষের সজ্ঞান কামনা-বাসনার দ্বারা তার কার্যকলাপ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। এটা এমন সুস্পষ্ট বাস্তবতা যার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। আমরা শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করেইতো পৃথিবীর লক্ষ কোটি কার্যকলাপ আয়ত্ব করি এবং আমাদের মন অবলিলায় তা করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

(দুই) ফ্রয়েড সাহেবের কথা মেনে নিলে পৃথিবী থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিতে হয়। কেননা শিক্ষা দ্বারা যদি মানুষের কার্যকলাপ পরিচালিত না হবে বরং অচেতন মনের অবদমিত কামনার দ্বারা পরিচালিত হবে, তাহলে শিক্ষার প্রয়োজন কি?[১]

(তিন) উল্লেখ্য যে, অবচেতন মন ফ্রয়েডীয় মতাদর্শের ভিত্তিগত প্রকল্প। ফ্রয়েডের গোটা আন্দোলনই চলেছে এর উপর ভিত্তি করে। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ অধ্যাপক যোসেফ জ্যেস্ট্রো তার সমালোচনা গ্রন্থ Freud: his Dream and sex Theories এ লিখেছেন, "আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হয়েছি যে, ফ্রয়েডের 'অবচেতন' একটি ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী মাত্র।"

* * * * *

১. শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিলেই ফ্রয়েড সাহেবের মিশন সহজে বাস্তবায়িত হবে। তখন মানুষ শিক্ষা-দীক্ষাহীন অবলা প্রাণীর মত যথেচ্ছা যৌনগমন করতে আর কোন দ্বিধা করবে না॥

অষ্টম অধ্যায়

(ভ্রান্ত ধর্ম ও তার গ্রন্থ সমূহ)

ইয়াহুদী ধর্ম

(اليهودية/judaism)

"ইয়াহুদী" বলতে বোঝায় হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতকে। আর তাদের ধর্মমতকে বলা হয় "ইয়াহুদী ধর্ম"। কেউ কেউ "ইয়াহুদী ধর্ম"-এর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেনঃ "ইয়াহুদী ধর্ম" ঐ আসমানী ধর্মকে বলা হয় যা হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক বনী ইসরাঈলের হেদায়েতের জন্য আনিত হয়েছিল।

"ইয়াহুদ" (يهود) কথাটি আভিধানিকভাবে هاد يهود هودا থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা, তাওবা করা, বিনীত হওয়া ইত্যাদি। হযরত মূসা (আঃ)-এর انا هدنا اليك اى رجعنا وتضرعنا (অর্থাৎ, আমরা তোমার দিকে ফিরে এসেছি) উক্তিকে ইয়াহুদ নামকরণের উৎস বলা হয়।

ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থের নাম "তাওরাত" (تورات)। তাওরাত বর্তমান বাইবেল এর একটি অংশ। এটা বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Ttestament) বলে পরিচিত তবে সমগ্র পুরাতন নিয়ম তাওরাত নয়। কেননা পুরাতন নিয়মে তাওরাত ব্যতীত "আম্বিয়ায়ে কেরাম-এর সহীফাসমূহ" (Prophets) এবং "পবিত্র সহীফাসমূহ" (Hagiographa অথবা কেবল Writings) নামের সহীফাসমূহও অন্তর্ভুক্ত। যেগুলি পুরাতন নিয়ম তথা ইয়াহূদীদের পবিত্র গ্রন্থের অপরিহার্য অংশ, তবে তাওরাত নয়।

ইয়াহুদীদের কয়েকটি ধর্মমত ঃ

১. শরী'আত মাত্র একটি। আর তা হযরত মূসা (আঃ) থেকে শুরু হয়ে তার দ্বারাই সমাপ্তি লাভ করেছে। তার পূর্বে কোন শরী'আত ছিল না। আর তারপরেও কোন শরী'আত আসবে না। হযরত মূসা (আঃ)-এর পূর্বে যে সব সহীফা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শরী'আত ছিল না বরং তা ছিল কিছু বিবেক সঞ্জাত নিয়ম-নীতি (حدود عقلية) ও কল্যাণজনক বিধি-বিধান (احكام مصلحية)।

২. হযরত মূসা (আঃ)-এর শরী'আত রহিত (منسوخ) হবে না। ইয়াহুদীগণ শরয়ী বিধান রহিত হওয়া (نسخ)কে যুক্তি সংগত মনে করেন না।

৩. ইয়াহুদীদের রাব্বানী (الربانيون) নামক দল তাক্‌দীরকে অস্বীকার করেন, যেমন মুসলমানদের মধ্যে কাদরিয়া/মু'তিযালাগণ তা অস্বীকার করেন। আর তাদের কুর্‌রা (القرائون) নামক দল মনে করেন মানুষ তাক্‌দীরের সামনে সম্পূর্ণ অসহায়, যেমন মুসলমানদের মধ্যকার জাব্‌রিয়া ফির্‌কা মনে করে থাকেন।

৪. ইয়াহুদীগণ দুনিয়াতে পুনঃআগমন (عقيدة الرجعة)-এ বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ, কারও মৃত্যুর পর পুনরায় তার দুনিয়াতে ফিরে আসাকে তারা সম্ভব মনে করেন। তারা হযরত উযায়র (আঃ)-এর ঘটনা থেকে এ বিষয়ে দলীল দিয়ে থাকেন।[১]

৫. তারা হযরত হারূন (আঃ) সম্পর্কে এই ধারণা রাখেন যে, তীহ্ প্রান্তরে মুসা (আঃ) তাঁকে তাওরাতের ফলক দ্বারা আঘাত করলে তাঁর মৃত্যু হয়। মূসা (আঃ) এটা করেছিলেন তার প্রতি হিংসাবশতঃ। কারণ হারূনের প্রতি বনী ইসরাঈলের আকর্ষণ বেশী দেখে তাঁর প্রতি মূসা (আঃ) হিংসান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। তবে হারূন (আঃ)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেনঃ তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, অচিরেই তিনি ফিরে আসবেন। আর কেউ কেউ মনে করেন তিনি আত্মগোপন করেছেন, অচিরেই ফিরে আসবেন।

৬. ইয়াহুদীগণ মানুষের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সাদৃশ্য বিধান করে থাকে। তারা বলে আল্লাহ তা'আলা যখন আসমান-যমীন সৃষ্টি থেকে ফারেগ হন, তখন আরশের উপর চিৎ হয়ে এক পায়ের উপর আর এক পা তুলে শয়ন করেন। ইয়াহুদীদের একদলের মতে আল্লাহ তা'আলা যে ছয় দিনে আসমান-যমীন সৃষ্টি করেন, এই ছয় দিন হল ছয় হাজার বৎসর। কেননা আল্লাহ তা'আলার কাছে একদিন মানুষের গণনার এক হাজার বৎসরের সমান।

ইয়াহুদীদের দল উপদল ঃ

ইয়াহুদীদের একাত্তরটি দল। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হল চারটি দল। অবশিষ্ট দলগুলি এদেরই শাখা-প্রশাখা। উক্ত চারটি দল হল -

১. এটা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে আল্লাহ তা'আলা সক্ষম তা বোঝানোর জন্য সাময়িক একটা ঘটনা ছিল। এর দ্বারা কোন শাশ্বত নীতি প্রমাণিত করা ভুল ॥

১. ইনানিয়্যাহ (العنانية) ঃ

তারা ইনান ইব্‌নে দাঊদ-এর অনুসারী। তারা শনিবারের ব্যাপারে অন্যান্য ইয়াহুদীদের সাথে বিরোধ করত। তারা পাখি, হরিণ ও টিড্ডি খেতে নিষেধ করত। তারা জানোয়ারের ঘাড়ের পিছন দিকে জবাই করত। তারা হযরত ঈসা (আঃ)কে উপদেশ ও নসীহতের ক্ষেত্রে মান্য করত, তবে তাঁর নবুওয়াতকে স্বীকার করত না।

২. ঈসাবিয়্যাহ (العيسوية) ঃ

তারা আবূ ঈসা ইসহাক ইব্‌নে ইয়া'কূব ইসফাহানী-র অনুসারী। মতান্তরে তাদের নেতার নাম উফীদ উলূহীম। তিনি খলীফা মানসূরের যুগের লোক। ইয়াহুদীদের মধ্যে তার প্রচুর অনুসারী ছিল। আবূ ঈসা মনে করতেন যে, তিনি নবী এবং প্রতিক্ষিত মাসীহের দূত। তিনি দাবী করতেন যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলেছেন এবং তাকে পাপী ও যালেম সম্রাটদের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি হযরত ঈসা (আঃ)কে বনী আদমের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে দাবী করতেন। তিনি সব ধরনের প্রাণী জবাই করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি দশ ওয়াক্ত নামায ওয়াজিব করেন। তিনি আরও বহু বিষয়ে ইয়াহুদীদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

৩. মুকারাবাহ ও ইউযআনিয়্যাহ (المقاربة واليوذعانية) ঃ

তারা হামাদান-এর অধিবাসী ইউযআন (يوذعان) মতান্তরে ইয়াহুযা (يهوذا)-এর অনুসারী। তিনি সাধারণ ইয়াহুদীদের ব্যাখ্যা থেকে স্বতন্ত্র সব ব্যাখ্যা দিতেন। তাক্‌দীরের প্রবক্তা ছিলেন। মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র সাদৃশ্য থাকার বিষয়েও তিনি সাধারণ ইয়াহুদীদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। মুকারাবাদের একটি দল বলত মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র কথোপকথন অসম্ভব। মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে যার সাথে কথা বলেছিলেন তিনি খোদা নন বরং একজন ফেরেশতা, যে ফেরেশতার মধ্যস্থতায় আল্লাহ তা'আলা নবীদের সাথে কথা বলে থাকেন।

মুশকানিয়্যাহ (الموشكانية) ঃ

মুশকানিয়্যাহ দলটি মূলতঃ পুর্বোক্ত দলেরই একটি শাখা। তারা মূশকান নামক জনৈক ব্যক্তির অনুসারী। এই মূশকান ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয মনে করতেন। এই মূশকানিয়্যাহ দলের কিছু লোক হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)কে ইয়াহুদী ব্যতীত অন্যান্য আরবদের নবী বলে স্বীকার করতেন।

৪. সামিরাহ (السامرة) ঃ

তারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও মিসরের অধীনস্ত কিছু গ্রামে বাস করত। এই সামিরাহদের মধ্যে উল্‌ফান (الالفان) নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, যিনি নবুওয়াতের দাবী করেন এবং বলেন তিনিই সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে মূসা (আঃ) সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। সামিরাহদের দুটি উপদল ছিল। (এক) দোস্তানিয়া, (দুই) কোস্তানিয়া। দোস্তানিয়া দলটি পরকালের ছওয়াব বা শাস্তিকে অস্বীকার করত। তারা বলত শাস্তি বা পুরস্কার যা হওয়ার তা দুনিয়ার বিষয়।[১]

১. مذهب يهود..بحر العلوم مولانا نعمت الله صاحب اعظمى ও الملل والنحل للشهرستانى গ্রন্থদ্বয় থেকে গৃহীত ॥

ইয়াহুদীদের ধর্মীয় গ্রন্থ ঃ তাওরাত

এ সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন ১০০ পৃষ্ঠা।

খৃষ্টীয় ধর্ম
(Chrisianity)

যিশু খৃষ্ট (عيسى مسيح)-এর শিক্ষার উপর নির্ভরশীল ধর্মকে বলা হয় খৃষ্টীয় ধর্ম। এই ধর্ম ও তার মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়সমূহ "খৃষ্টীয় সমাজ" নামে পরিচিত। ইন্সাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকায় খৃষ্টধর্মের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

"যে ধর্ম নাসিরার বাসিন্দা ঈসা মাসীহের সংগে তার মৌলিক সম্পর্ক রয়েছে বলে এবং তাঁকে (ঈসা মসীহকে) আল্লাহ্‌র মনোনীত বলে মানে।"[১]

খৃষ্টানদের দল-উপদল ঃ

খৃষ্টীয় সমাজ বহু দল-উপদলে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রধানতঃ দুটি দল প্রসিদ্ধ। যথা ঃ

(এক) "ঐতিহ্যবাহী" খৃষ্টীয় সমাজ ঃ

"ঐতিহ্যবাহী" খৃষ্টীয় সমাজ বলতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মসমাজ ও নিষ্ঠাবান প্রাচ্য চার্চ (অর্থোডক্স্ ইস্টার্ন চার্চ) প্রভৃতিকে বোঝানো হয়। যারা আদি কালের ধর্মমত, আচার ও অনুষ্ঠানসমূহকে রীতিমতভাবে সম্প্রসারিত ও উন্নত করে অনুসরণ করেন বলে দাবি করেন। তারা আদিকালের খৃষ্টীয় রীতিনীতির উপর রয়েছেন বলে তাদেরকে "ঐতিহ্যবাহী" খৃষ্টীয় সমাজ বলা হয়।

(দুই) "সংস্কারকৃত" খৃষ্টীয় সমাজ ঃ

"সংস্কারকৃত" খৃষ্টীয় সমাজ "প্রটেসট্যান্ট" (Protestant) নামে খ্যাত। তারা দাবি করে যে, তারা খৃষ্টীয় ধর্মের যাবতীয় মিথ্যা সংযোজন ও উদ্ভাবন বাদ দিয়ে আদি খৃষ্টীয় মতবাদ ও ধ্যান-ধারণাসমূহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। তারা ধর্মের মধ্যে সংস্কারের দাবী করে বলে তাদেরকে "সংস্কারকৃত (reformed) খৃষ্টীয় সমাজ" বলা হয়।

উপরোক্ত ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট ছাড়াও খৃষ্টানদের মধ্যে অসংখ্য ফিরকা বা দল উপদল রয়েছে। যেমন ঃ মুলকানিয়া, নাস্তুরিয়া, ইয়া'কূবিয়া, ইউযানিয়া, মুরকুলিয়া প্রভৃতি।[২]

খৃষ্টানদের আদিকালের আভ্যন্তরীণ পার্থক্যগুলি কেন্দ্রীভূত ছিল খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের অন্তর্ভুক্ত অপরাপর সত্তাদ্বয়ের সম্পর্কে খৃষ্টের প্রকৃতি সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের উপর। এ সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কাউনসিল (পরিষদ) আহূত হত; গৃহীত উত্তরগুলি নিষ্ঠাবান (orthodox)দের অভিমত এবং পরিত্যক্ত উত্তরগুলি ধর্মমত বিরোধী (heretical) বলে বিবেচিত হত।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এশিয়া মাইনর ও উত্তর আফ্রিকাতে খৃষ্টধর্মই প্রধান ধর্ম ছিল। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর এসব অঞ্চল থেকে খৃষ্টধর্ম গুটিয়ে ক্রমান্বয়ে ইউরোপ ও পাশ্চাত্য অঞ্চলে কেন্দ্রিভূত হয়ে যায়।

১. ইন্সাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৯ ॥ ২. كتاب الخطط للعلامة تقي الدين المقريزى ॥

আধুনিক খৃষ্টধর্মের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় দলের মধ্যে মতবিরোধ, মতানৈক্যের সম্মিলন প্রচেষ্টা এবং রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে স্থায়ী ও যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সংগ্রাম।[১]

খৃষ্টধর্মের বিশেষ কয়েকটি দর্শন ঃ

১. ত্রিত্ববাদ(عقيدة تثليث)ঃ

খৃষ্টবাদের প্রধান আকীদা তথা সবচেয়ে বহুল আলোচিত ও সর্বাধিক বিতর্কিত দর্শন হল ত্রিত্ববাদ দর্শন।[২] "ত্রিত্ববাদ" অর্থ হল তিন খোদার সমষ্টিকে খোদা বলার মতবাদ। খৃষ্টধর্মের মতবাদ অনুযায়ী পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা (রূহুল কুদ্‌স) এই তিনটি সত্তা (اقنوم/Person)-এর সমষ্টি হল খোদা (god)। মতান্তরে এই তিনটি সত্তা হল পিতা, পুত্র এবং কুমারী মরিয়ম। তারা 'পিতা' বলতে আল্লাহ, 'পুত্র' বলতে আল্লাহ্‌র কালামগুণ যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকৃতিতে আগমন করেছিল এবং 'পবিত্রাত্মা' বলতে পিতা এবং পুত্রের রূহ বা আত্মাকে বুঝিয়ে থাকেন।

আলফ্রেড এ গার্ভের দেয়া খৃষ্টধর্মের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- এটা একটি ধর্ম যা নৈতিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক একেশ্বরবাদিতা এবং কাফ্‌ফারার প্রতি ঈমান রাখে .....। এখানে বোঝানো হয়েছে খৃষ্টধর্ম একেশ্বরবাদিতা বা তাওহীদে বিশ্বাসী। তিন খোদার আকীদা সেই একেশ্বরবাদিতার পরিপন্থী হয়ে যায়। তাই খৃষ্টানজগত বলে থাকে ঃ তিনে মিলে এক এবং একে তিন। এভাবে তারা ত্রিত্ববাদের মধ্যে তাওহীদ বা একেশ্বরবাদ রক্ষা হয় বলে দেখানোর চেষ্টা করেন। এটাকে তারা নাম দিয়েছেন "ত্রিত্বের একত্ব" (توحيد فى التثليث)। ইন্সাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে ঃ

"পিতা গড্, পুত্র গড্, রুহুল কুদ্‌সও গড্ কিন্তু তারা মিলিতভাবে তিন খোদা বা তিন গড্ নন, বরং একই গড্। কেননা খৃষ্টধর্মের ভাবধারা অনুসারে আমরা এই তিন সত্তার প্রত্যেককেই গড্ মেনে নিতে যেমন বাধ্য, তেমনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম এই তিনজনকে তিন জন খোদা এবং গড্ মানতেও আমাদেরকে কঠিনভাবে নিষেধ করছে।[৩]

এই তিন সত্তার স্বতন্ত্র ভাবে মর্যাদা কি ? এবং সমষ্টির সাথে তাদের সম্পর্ক কি ? এ বিষয়টি নিয়ে খৃষ্টানজগতে মতভেদের অন্ত নেই। কেউ কেউ বলেন ঃ এই তিনের সমষ্টি খোদার যে মর্যাদা, স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকেরও সেই মর্যাদা। সমষ্টি যেমন খোদা, তেমনি তিন জনের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে এক এক জন খোদা। কেউ কেউ বলেন ঃ এই তিন জনের প্রত্যেকেই খোদা হলেও স্বতন্ত্রভাবে তাদের মর্যাদা সমষ্টির তুলনায় কম। কিছুটা ব্যাপক অর্থেই এদেরকে খোদা বলা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেনঃ স্বতন্ত্রভাবে এই তিন জন

১. মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড ॥

২. ত্রিত্ববাদকে ইংরেজিতে বলা হয় "ট্রিনিটেরিয়্যান ডকট্রিন" (Trinitarian Doctrine) ॥

৩. খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল, মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের সাহেব, ভারত। বরাত -ইন্সাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা, খণ্ডঃ ২২, পৃঃ ৪৭৯ ॥

খোদাই নন বরং তাদের সমষ্টি হল খোদা। "তিনের এক এবং একের তিন" হওয়ার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা না দিতে পেরে এবং কোন উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে কোন কোন খৃষ্টান ব্যাখ্যাকার মুখ বাঁচানোর একটি ফন্দী বের করে বলেছেন "ত্রিত্ববাদ" মানব জ্ঞানের অগম্য (متشابهات) পর্যায়ের একটি বিষয়। রোমান ক্যাথলিক চার্চের অধিকাংশ পণ্ডিত বলেছেন, "তিনের এক এবং একের তিন" হওয়া এমন একটি গোপনীয় সত্য যা বুঝবার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু এমন বললে যে কেউ ধর্মের নামে যে কোন অযৌক্তিক বিষয় উদ্ভাবন করে সেটাকে চালিয়ে দেয়ার একটা মোক্ষম অস্ত্র হাতে পেয়ে যাবে, তা বোধ হয় তারা ঠাহর করতে পারেননি। কিংবা পারলেও কোন উপায়ান্তর না থাকায় বুঝে শুনেই তারা এমন বেখাপ্পা বস্তু গলাধকরণ করেছেন। আর প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় যেকোন ব্যাখ্যা দিতে যাওয়া নিরাপদ নয় দেখে নিরবতাকেই নিজেদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছে।

সারকথা এরূপ অসংখ্য ব্যাখ্যা হেতু ত্রিত্ববাদ অদ্যাবধি হেয়ালীই হয়ে রয়েছে। তাই খৃষ্টানদের এবিউনী সম্প্রদায় শুরুতেই আত্মসমর্পন করে বলেছেন, "যাই বলুন না কেন "হযরত মাসীহ (আঃ)কে খোদা মেনে নিয়ে কিছুতেই আমরা তাওহীদ রক্ষা করতে পারব না।" পল ও লুসিয়ান প্রমুখ অনেকেই স্পষ্টতঃ বলে দিয়েছেন যে, হযরত মাসীহকে খোদা মানাই ভুল। তিনি শুধুমাত্র একজন মানুষ বৈ কিছু নন।[১] পল ও লুসিয়ানের অনুকরণে চতুর্থ শতাব্দির বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ আরিউস সমসাময়িক চার্চের বিরুদ্ধে বিরাট সংগ্রাম আরম্ভ করেন এবং সমগ্র খৃষ্টান জগতকে কাঁপিয়ে তোলেন।[২]

২. অবতার হওয়ার আকীদা (عقيدة حلول/incarnation) ঃ

পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, হযরত ঈসা মাসীহ (আঃ) সম্পর্কে খৃষ্টানদের আকীদা-বিশ্বাস এই ছিল যে, তিনি খোদার পুত্র ছিলেন। এই "পুত্র" কথার ব্যাখ্যায় তারা বলেন যে, পুত্র হল আল্লাহ্‌র কালাম বা বাণী-গুণ (অর্থাৎ, পুত্রের সত্তা) যা মানব কল্যাণের জন্য হযরত ঈসা মাসীহের মানবীয় সত্তায় অবতারিত হয়েছিল। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন এই খোদায়ী সত্তা তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ছিল। ইয়াহুদী কর্তৃক তাঁকে শুলীবিদ্ধ করার পর তার দেহ থেকে এই খোদায়ী সত্তা পৃথক হয়ে যায়। সারকথা- খোদার কালাম গুণ (صفت كلام) শরীরী রূপ ধারণ করে ঈসা মাসীহের রূপ নিয়ে আগমন করেছিল। "স্টাডিজ ইন খ্রিস্টিয়ান ডকট্রিন্‌স" গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ যে সত্তা খোদা ছিল, তিনিই খোদায়ীর গুণ পরিত্যাগ ব্যতিরেকে মানুষ হয়ে যান। অর্থাৎ, তিনি আমাদের মত অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে নেন, যা স্থান ও কালের গণ্ডিতে গণ্ডিবদ্ধ। তারপর একটা কাল পর্যন্ত আমাদের মধ্যে অবস্থান করেন।[৩]

১. খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল, মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের সাহেব, ভারত। বরাত -ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা, খণ্ডঃ ১৭, পৃঃ ৩৯৮ ॥ ২. খৃষ্টানদের এই ত্রিত্ববাদ কতটা অযৌক্তিক এবং তাদের অন্যান্য আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক, তা সামান্য চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তদুপরি এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য দেখুন মাওলানা আবু তাহের (মদনী নগর, কলিকাতা) কর্তৃক রচিত "খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল" ॥ ৩. ـ تقى عثمانى . بائبل سے قرآن تک ॥

৩. প্রায়শ্চিত্তের আকীদা (عقيدة كفاره/Atonement) ঃ

খৃষ্টবাদের দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ আকীদা হল প্রায়শ্চিত্তের আকীদা (Atonement/অ্যাটোন্‌মেন্ট)। খৃষ্টানদের ধারণা মতে যিশু খৃষ্ট শূলিতে বিদ্ধ হয়ে খৃষ্টজগতের সকলের ঐই পাপ মোচনের ব্যবস্থা করে গেছেন যা আদম (আঃ)-এর ভুলের কারণে তার প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে প্রবেশ করেছিল।[১] এভাবে জগতকে রেহাই দেয়াই পৃথিবীতে যিশু খৃষ্টের আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এটাই হল তাদের ভাষায় প্রায়শ্চিত্ত বা কাফ্‌ফারা (পাপমোচন)। এই প্রায়শ্চিত্ত তথা কাফ্‌ফারার আকীদা-বিশ্বাস খৃষ্টধর্মের একটি মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস। এমনকি খৃষ্টধর্মের সংজ্ঞার মধ্যে এই বিশ্বাসের কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। আলফ্রেড এ গার্ভে বলেন ঃ

"খৃষ্টধর্মের সংজ্ঞা এভাবেও দেয়া যায় - এটা একটি ধর্ম যা নৈতিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক একেশ্বরবাদিতা এবং কাফ্‌ফারার প্রতি ঈমান রাখে, যে ধর্মে ঈসা মাসীহের ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শ দ্বারা আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ককে পাকা-পোক্ত করে দেয়া হয়েছে।[২]

৪. ক্রুশারোহণের আকীদা (عقيدة مصلوبيت/Crucifixion) ঃ

প্রায়শ্চিত্তের আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, খৃষ্টানদের ধারণা মতে যিশু খৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।[৩] এটাকে বলা হয় ক্রুশারোহণের আকীদা বা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার আকীদা (Crucifixion/ক্রুস্‌ফিক্‌সন)। খৃষ্টানদের বিশ্বাস মতে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ঈসা মাসীহ মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁকে যথারীতি কবর দেয়া হয়। তার তিনদিন পর তিনি পুনরায় জীবিত হন এবং হওয়ারীদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দান করতঃ আকাশে আরোহন করেন।

৫. ক্রুশকে সম্মানের রীতি ঃ

ক্রুশারোহণের আকীদা থেকেই খৃষ্টান জগতের নিকট ক্রুশচিহ্ন (†) বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। তবে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দি পর্যন্ত এই ক্রুশচিহ্নের কোন সামাজিক গুরুত্ব ছিল না। সম্রাট কন্‌স্ট্যান্‌টিন সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, ৩১২ খৃষ্টাব্দে তিনি তার এক প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ চলাকালীন (সম্ভবতঃ স্বপ্নে) আকাশে একটা ক্রুশের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন। তারপর ৩২৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তার মাতা সেন্ট হেলেনা এক স্থানে একটা ক্রুশ পান, যার সম্পর্কে লোকদের ধারণা - এটিই সেই ক্রুশ (খৃষ্টানদের ধারণা মতে) যার উপর ঈসা মাসীহকে শূলি দেয়া হয়েছিল। এরপর থেকে ক্রুশ খৃষ্টান জগতের কাছে খৃষ্টধর্মের প্রতীক (Symbol) হিসেবে মর্যাদা লাভ করে এবং তারা উঠতে বসতে সর্বত্র এটি ব্যবহার করতে শুরু করে। এই ঘটনার স্মরণে প্রতি বৎসর ৩রা মে খৃষ্টানগণ অনুষ্ঠান করে থাকেন।[৪]

১. ايضا ॥ ২. খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল, মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের সাহেব, ভারত। বরাত- ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজনস এণ্ড এথিক্‌স, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫১৮ ॥ ৩. এখানে একথা স্মর্তব্য যে, খৃষ্টানদের অধিকাংশ দলের মতে ফাঁসী যাকে দেয়া হয়েছিল তিনি পুত্রের সত্তা (اقنوم ابن) নন, যিনি খৃষ্টানদের নিকট খোদা। বরং ফাঁসী যাকে দেয়া হয়েছিল তিনি ছিলেন পুত্র সত্তা (اقنوم ابن)-এর মানবীয় প্রকাশ (انسانى مظهر) অর্থাৎ, মাসীহ; যিনি মানবীয় দিক থেকে খোদা নন। ـ تقى عثمانى . بائبل سے قرآن تک ॥ ৪. بائبل سے قرآن تک . تقى عثمانى ـ ॥

৬. পুনর্জীবনের আকীদা (Resurrection) ঃ

পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, খৃষ্টানদের বিশ্বাস মতে হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার তিন দিন পর পুনরায় জীবিত হয়ে দুনিয়ায় আগমন করেন। এটা হল খৃষ্টানদের পুনর্জীবনের আকীদা (Resurrection/রেজারেক্শন)।

ক্যাথলিক খৃষ্টানদের আরও কিছু আকীদা-বিশ্বাস ঃ

১. আশায়ে রব্বানী (عشاء ربانی) ঃ

"আশায়ে রব্বানী" বা ঈশ্বরভোজ[১] খৃষ্টানদের একটি প্রসিদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। আজও ক্যাথলিকগণ অত্যন্ত বিশ্বাসের সাথে এই অনুষ্ঠানকে আকড়ে ধরে আছেন।

মিঃ জাষ্টিন মার্টিয়ারের বর্ণনা মতে আশায়ে রব্বানী অনুষ্ঠান নিম্নরূপ ঃ প্রতি রবিবারে গীর্জায় একটি সমাবেশ হয়। প্রারম্ভে কিছু দুআ, কিছু গান, অতঃপর উপস্থিতবৃন্দের একে অন্যকে চুম্বনপর্ব ও মুবারকবাদের পর রুটি এবং শরাব আনিত হয়। সভাপতি তা গ্রহণ করতঃ পিতা, পুত্র এবং রুহুল কুদস (পবিত্রাত্মা)-এর নামে দুআ প্রার্থনা করেন। উপস্থিতদের সকলেই তার সাথে আমীন আমীন বলেন। অতঃপর গীর্জার সেবায়েতগণ ঐ রুটি এবং শরাব উপস্থিতদের মধ্যে বিতরণ করেন। রুটি এবং শরাব বিতরণের সংগে সংগেই রুটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর দেহে এবং শরাব ঈসা (আঃ)-এর রক্তে পরিণত হয়ে যায়। উপস্থিতগণ ঐ রুটি এবং শরাব পানাহার করেন। (অর্থাৎ, প্রকারান্তরে তারা যেন যিশু খৃষ্টের রক্ত মাংস পানাহার করেন)। এভাবে পানাহার করে তারা প্রায়শ্চিত্য আকীদার পূণ্য-স্মৃতি রোমন্থন করেন।[২]

২. ক্যাথলিকদের পোপবাদ ঃ

পোপদের সম্পর্কে ক্যাথলিকদের আকীদা-বিশ্বাস নিম্নরূপ ঃ

(এক) পোপের প্রতি ঈমান না আনলে নাজাত বা মুক্তি পাওয়া যায় না। তা তিনি যত দুশ্চরিত্র এবং জঘন্য প্রকৃতির হন না কেন।

(দুই) ক্যাথলিকদের আকীদা হল- পোপ হাওয়ারীদের নেতা জনাব পিটার্সের নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত এবং পিটার্সের যাবতীয় অধিকারের অধিকারী। এমনকি পিটার্সের যে সমস্ত মর্যাদা তথা তিনি হযরত মাসীহ (আঃ)-এর মেষপালের রাখাল, (যোহন) গীর্জার মূলস্তম্ভ, তার হাতে আসমানের রাজ্যের সকল কুঞ্জিকা এবং চাবিকাঠি (মথি) রয়েছে, প্রত্যেক পোপেরও সেই সমস্ত মর্যাদা এবং ক্ষমতা রয়েছে।[৩]

(তিন) পোপ পাপ ও ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে পাক পবিত্র।

(চার) শুধু রোমের পাদ্রীই গ্রাণ্ড পোপ হতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কেউ গ্রাণ্ড পোপ হতে পারে না।

১. এই "আশায়ে রব্বানী" বা ঈশ্বরভোজ-কে ইংরেজিতে বলা হয় "Lords supper", "Euchirist", "Saered Meal", "Holy cormunion" প্রভৃতি ॥ ২. খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল, মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের সাহেব, ভারত। বরাত -The Christian Religion, p. 149, V.3. ॥ ৩. খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল ॥

(পাঁচ) পোপ পবিত্রতা অর্জনকারীদের নিকট থেকে নজরানা বা ভোট গ্রহণ করে বিনিময়ে তাদেরকে ক্ষমাপত্র দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ, টাকার বিনিময়ে পোপ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন। জন টিট্জেল নামক পাদ্রী ১৫১৭ সালে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, "কেউ যদি তার মায়ের সাথেও ব্যভিচার করে এবং পোপের মার্জনা বাক্সে কিছু অর্থ রেখে দেয়, তাহলে তার দুনিয়া আখেরাত ইহকাল পরকালের পাপ মার্জনা করে দেয়ার অধিকার পোপের রয়েছে। আর বলা বাহুল্য যে, পোপ যদি মার্জনা করে দেন, তবে আল্লাহ্কেও তা মেনে নিতে হবে।"[১]

(ছয়) গ্রাণ্ড পোপ যে পর্যন্ত ক্ষমা না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত 'সিদ্দীকীন' সাধু সন্তদের আত্মা জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকবে। এ আকীদায় বোঝানো হয়েছে যে, মৃতদের মার্জনা পোপদের হাতে। এ মর্মে দশম পোপ লিও ডকুমেন্টারী টিকেট চালু করেন। যা তিনি বা তার প্রতিনিধিরা পূর্বাপর সমস্ত পাপের মার্জনা প্রার্থীদের নিকট বিক্রয় করে থাকেন। ইন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় এই টিকেটের ভাষা ও বর্ণনার বিশদ বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

(সাত) বৈধকে অবৈধ এবং অবৈধকে বৈধ করার অধিকার পোপের রয়েছে।[২] ইন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছেঃ হারামকে হালাল বা জায়েয করার অধিকার গ্রাণ্ড পোপের রয়েছে।

(আট) পোপ, বিশপ এবং ডিকন-দের[৩] পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ। তাদেরকে চিরকুমার থাকতে হবে।[৪]

বিঃ দ্রঃ এতক্ষণ খৃষ্টানদের আকীদা-বিশ্বাস সম্বন্ধে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, তা তাদের ধর্ম সম্পর্কিত কিতাবী বর্ণনা। এ বর্ণনা মোতাবেক তারা আস্তিক বলে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বাস্তবে খৃষ্টজগতের অনেকেই বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী। সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে বিবর্তনবাদে বিশ্বাস, অর্থনৈতিক বিষয়ে পুঁজিবাদে বিশ্বাস এবং সমাজ-সামাজিকতায় ফ্রয়েডের অবাধ যৌনাচারিতার নীতি- এর উপরেই গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্য সভ্যতা।

খৃষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ ঃ ইঞ্জীল

এ সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন ১০৭ পৃষ্ঠা।

১. খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল, বরাত - Short History of the Chirch. ॥ ২. খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল বরাত - ব্রিটানিকা, ১৮ খণ্ড, ২২২ পৃষ্ঠা ॥ ৩. পোপ, বিশপ পাদ্রী, ডিকন প্রভৃতি খৃষ্টানদের বিভিন্ন স্তরের ধর্মপুরুষ বা ধর্মযাজকের নাম ॥ ৪. এ প্রসঙ্গে সেন্ট বার্ণার্ড তার লিখিত গীতি-বিতান গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "তারা চার্চ বিবাহের পবিত্র প্রথাকে নির্বাসন দিয়েছেন। যে সহবাস সর্বপ্রকার নোংরামী এবং অপবিত্রতা থেকে পাক-পবিত্র ছিল, এরা তাকেও বিসর্জন দিয়েছে: তৎপরিবর্তে ছেলেদের, মা বোনদের সঙ্গে ব্যভিচার দ্বারা নিজেদের শয়ন-শয্যাকে নাপাক করেছে, অপবিত্র করেছে, সর্বপ্রকার নোংরামিতে ভরে দিয়েছে।" ১৫০০ খৃষ্টাব্দের বিশপ জন সাট্স বার্গ বলেন, " আমি অল্প সংখ্যক পাদ্রীই দেখেছি যারা স্ত্রীলোকদের সংগে অত্যধিক পরিমাণে ব্যভিচারে অভ্যস্ত নন। পাদ্রী স্ত্রীলোকদের ধর্মালয় বেশ্যালয় এবং ব্যভিচারের আড্ডাখানায় পরিণত হয়ে রয়েছে ॥

বৌদ্ধধর্ম
(Budhism)

গৌতম বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে নীতি, বিধান ও মতবাদ গড়ে উঠেছে তাই "বৌদ্ধ দর্শন" বা "বৌদ্ধধর্ম"। বুদ্ধের উপদেশ, বাণী ও চিন্তা-ধারণাই বৌদ্ধ দর্শনের উৎস ও ভিত্তি।

প্রথমে গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলী মুখে মুখেই প্রচারিত হয়। এরপর সুত্র, বিনয় ও অভিধর্ম নামে তিনটি গুচ্ছতে সংকলিত হয়ে ত্রিপিটক নাম ধারণ করে। এই ত্রিপিটকই বৌদ্ধধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ। ভারতের সম্রাট অশোকের রাজত্ব কালে (খ্রিঃ পূঃ ৩য় শতকে) বৌদ্ধধর্ম চরম উন্নতি লাভ করে। পরবর্তীকালে ভারতে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও অন্যান্য স্থানে তা টিকে থাকে। বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড,নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে এখনও প্রচুর সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে তারা সংখ্যায় প্রধানতম।

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ঃ

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক হলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। পিতা শুদ্ধোদন শাক্যবংশের প্রধান বা রাজা ছিলেন। উত্তর প্রদেশের বস্তিজেলার পিপরাওয়ার মতান্তরে নেপালের তিলৌরা কোটে শাক্য রাজধানী কপিলাবস্তু অবস্থিত ছিল। শুদ্ধোদন পত্নী মায়াদেবীর পিত্রালয়ে যাওয়ার সময় কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী লুম্বিনী উদ্যানের শালবৃক্ষ মূলে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ সালে সিদ্ধার্থের/ গৌতমের জন্ম হয়। পরে বুদ্ধত্ব লাভের পর তার নামের সাথে বুদ্ধ কথাটা যোগ হয়। গৌতম রাজকীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হলেও বাল্যকাল থেকে সিদ্ধার্থ বা গৌতম চিন্তাশীল ও বৈরাগ্য ভাবাপন্ন ছিলেন। সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য গোপা বা যশোধরা নাম্নী সগোত্রীয় এক অনুপম সুন্দরী নারীর সাথে তার বিয়ে দেয়া হয়। এর কিছু দিনের মধ্যে তার একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। গৌতম বুদ্ধ তার নাম রাখেন রাহুল।

গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ প্রসঙ্গ ঃ

খৃষ্টপূর্ব ৫৯৪ অব্দের এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তীথির গভীর রাতে ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে গৌতম চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে সত্যান্বেষে বের হন। প্রথমে তিনি বৈশালী নগরীতে গিয়ে তিথীক, জটিল, মুন্ড, নির্গন্থ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সাথে পরিচিত হন। তৎকালীন সুবিখ্যাত মুনি ও ঋষি আরাড় কালাম ও রুদ্রকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি মুক্তির পথ সন্ধান করেন। কিন্তু কারো নিকট থেকে দুঃখের রহস্য উদ্ঘাটন তথা মুক্তির সন্ধান না পেয়ে শ্রাবন্তী হয়ে তিনি রাজগৃহে উপস্থিত হন। সেখানে মগধরাজ বিম্বিসারের সাথে তার পরিচয় ঘটে। পরে তিনি গয়ার নিকটে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনে প্রবৃত্ত হন। পাঁচজন সন্ন্যাসীকে সাথে নিয়ে নির্জন জঙ্গলে কঠোর সংযম পূর্বক দীর্ঘ ছয় বৎসর তপস্যা চালান। কিন্তু তাতে নিষ্ফল হন। তখন গৌতম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মধ্যম পন্থায় সাধনার উদ্দেশ্যে গয়ার নিকটবর্তী উরবিল্ব নামক গ্রামে চলে আসেন। তার এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দরুন তার পাঁচ

সহযোগী সন্যাসী তাকে ত্যাগ করেন। তিনি গয়ার নৈরাঞ্জনা নদী তীরে অশ্বত্থ বৃক্ষ তলে পুনরায় ধ্যানমগ্ন হন এবং সত্য সন্ধান পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধ্যান মগ্ন থাকার দৃঢ় সংকল্প করেন। অবশেষে প্রায় পঞ্চাশ দিন পর শ্রেষ্ঠী কন্না সুজাতা পায়সান্ন দিয়ে তাকে সেবা করেন। ৩৫ বৎসর বয়সে (৫৮৮ খ্রিঃ পূঃ) বৈশাখী পূর্ণিমা তিথির শেষ রাত্রে তিনি বোধি বা চরম জ্ঞান লাভ করেন। এভাবে আনন্দময় নির্বাণের অধিকারী হয়ে এবং বুদ্ধত্ব সম্যক জ্ঞান লাভ করে তিনি জগতবাসীর কাছে বুদ্ধ নামে খ্যাত হন।

বুদ্ধের ধর্ম প্রচার ও "পরিনির্বাণ" লাভ প্রসঙ্গ ঃ

বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ তার সাধনা লব্ধ জ্ঞান মানুষের কাছে প্রচার করতে থাকেন। ভিক্ষাপাত্র হাতে নগ্ন পদে ও পদব্রজে বুদ্ধ দীর্ঘ ৪৫ বৎসর ভারতের গ্রামে গ্রামে ও জনপদে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ভ্রমণ করে স্বীয় ধর্ম প্রচার করেন। এরপর ৮০ বৎসর বয়সে খৃষ্টপূর্ব ৫৪৩ সালে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কুশী নগরে মল্লদের শালবনে (বৌদ্ধদের মতে) গৌতম বুদ্ধ মহা পরিনির্বাণ লাভে করেন।

বৌদ্ধদের দুটি শাখা প্রসঙ্গ ঃ

বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পর একশত বিশ বৎসরের মধ্যে তারা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কালের বিবর্তনে এই একাধিক সম্প্রদায় দু'টি মূল শাখায় গিয়ে মিলিত হয়। এই দুটি মূল শাখা হল ঃ

১. হীনবানবাদ বা থেরবাদ।

২. মহাযানবাদ।

হীনবান বা থেরবাদ প্রসার লাভ করেছে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে। আর মহাযানের বিকাশ ঘটেছে নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে। ভৌগলিক দিক থেকে অনেকে মহাযানকে উত্তর মুখী বৌদ্ধধর্ম (Northern Buddism) এবং থেরবাদকে দক্ষিণমুখী বৌদ্ধধর্ম (Southern Buddism) বলেন। এদের মাঝে থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মকে মনে করা হয় বিশুদ্ধতর ও মৌলিক। আর মহাযান বৌদ্ধধর্মকে মনে করা হয় আংশিকভাবে মৌলিক আর আংশিকভাবে সংযোজিত। থেরবাদীদের ধর্ম সাহিত্য রচিত হয়েছে পালি ভাষায়, আর মহাযানীদের ধর্ম সাহিত্য রচিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়।

বুদ্ধ দর্শনের সারকথা ঃ ৪টি মহাসত্য ও দ্বাদশ নিদান প্রসঙ্গ ঃ

গৌতম বুদ্ধ মানব জীবন নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এ উপলব্ধি করেছিলেন যে, জগত 'সব্বং দুঃখময়' অর্থাৎ, জগত দুঃখময়। আর এ দুঃখ আট প্রকার-

জন্ম, ব্যাধি, বার্ধক্য, মরণ, অপ্রিয় সংগ, প্রিয়বিরহ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি, ও পঞ্চ স্কন্দ[১] জাত দুঃখ। গৌতম দুঃখের প্রভাব থেকে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং সে অবস্থায় জগতের মূল সত্য তার নিকট চার আর্য বা সত্য রূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল। বুদ্ধের সেই চারটি মহাসত্য হলঃ

১. রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই হল পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ ॥

(ক) রূপ ঃ চারি মহাভূত পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি।

(খ) বেদনা ঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা এদের সংস্পর্শে এসে যে সুখ দুঃখ বা অসুখ অদুঃখ অনুভব করা হয়।

(গ) সংজ্ঞা ঃ বেদনা বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অনুভূতির পর মনে যে প্রাথমিক ধারণা বা জ্ঞান জন্মে।

(ঘ) সংস্কার ঃ রূপ, বেদনা ও সংজ্ঞা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির যে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কের উপর রেখাপাত করে ও যা ভবিষ্যত জ্ঞানের সহায়ক হয় বা যা দ্বারা কোন কিছু জানা যায়। এই প্রক্রিয়ার সমষ্টিই হচ্ছে সংস্কার।

(ঙ) বিজ্ঞান ঃ চেতনা বা মনকে বিজ্ঞান বলে। এই পঞ্চস্কন্ধ যখন তৃষ্ণার বিষয় হয়ে ব্যক্তির সান্নিধ্যে আগমন করে, তখন এদেরকে উপাদানস্কন্ধ বলা হয়। উপাদানস্কন্ধকে বুদ্ধ দুঃখময় বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

১. অস্তিত্বই দুঃখের কারণ।
২. দুঃখের মূলে রয়েছে বাসনা।
৩. বাসনার নিবৃত্তিতেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়।
৪. এবং মহান 'অষ্টনীতি' (অষ্টপন্থা) অনুসরণেই বাসনা নিবৃত্তির উপায় নিহিত।

তথ্য বিচারে চার আর্য বা সত্য হচ্ছে বুদ্ধের সমগ্র ধর্ম ও দর্শনের সার কথা। আর বুদ্ধের ধর্ম ও চার আর্য সত্য-এই উভয়ের সারকথা হচ্ছে কার্যকারণ নীতি বা শৃঙ্খলা। বুদ্ধের ১ম ও দ্বিতীয় সত্যটি স্বাভাবিক কার্যকারণ নিয়ম হতে নিঃসৃত। যে স্বাভাবিক কার্যকারণ নিয়মকে বুদ্ধ 'প্রতীত্য সম্মুৎপাদ' বলেছেন। বৌদ্ধধর্মে কার্যকারণ শৃঙ্খলে ১২টি কারণ আছে। তাই একে দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্র বলে।[১]

কারণ হতে কার্যের দিকে অগ্রসর হলে- দ্বাদশ নিদানের সংক্ষিপ্ত রূপ দাঁড়ায় নিম্নরূপঃ

১. অবিদ্যা (ভ্রান্ত ধারণা) দুঃখের মূল কারণ। আর অবিদ্যা হতে-
২. সংস্কার (গত জীবনের পূর্বাভিজ্ঞতার ছাপ), সংস্কার হতে-
৩. বিজ্ঞান (চেতনা), চেতনা হতে-
৪. নাম-রূপ (দেহমন সংগঠন বা মন ও দৃশ্যমান শরীরী পদার্থ), নাম রূপ হতে-
৫. ষড়ায়তন (ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন), ষড়ায়তন হতে-
৬. স্পর্শ (জ্ঞেয়ের সংগে জ্ঞাতৃরূপী মনের সংযোগ), স্পর্শ হতে-
৭. বেদনা (অনুভূতি) বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, বেদনা হতে-
৮. তৃষ্ণা (আসক্তি বা ভোগ স্পৃহা), তৃষ্ণা হতে-
৯. উপাদান (জাগতিক বস্তুর সংযোগতা), উপাদান হতে-

১. এই কার্যকারণ পরম্পরার সংযোগে যেন একটি চক্র নির্মিত হয়েছে। যা মানুষকে জন্ম হতে জন্মান্তরে ঘুরায়। তাই এর নাম 'ভবচক্র' ॥

১০. ভব (জন্মের তীব্র বাসনা), ভব হতে-
১১. জাতি (সংসারে জন্ম গ্রহণ) এবং জাতি হতে-
১২. জরামরণ (জন্মের পরিণতি) স্বরূপ দুঃখের উৎপত্তি।

এই দ্বাদশ নিদানকে সংক্ষেপে লোভ, দ্বেষ ও মোহ রূপেও চিহ্নিত করা হয়। দুঃখের নিবৃত্তির ব্যাপারে বলা হয়ঃ জাগতিক প্রত্যেক ঘটনার ন্যায় দুঃখেরও কারণ আছে, সেই কারণগুলোকে যদি সমূলে উৎপাটন করা হয় তাহলেই দুঃখের অবসান ঘটে।

বুদ্ধ বর্ণিত বাসনা নিবৃত্তির অষ্ট পন্থা ও 'নির্বাণ' প্রসঙ্গ ঃ

বুদ্ধ বর্ণিত বাসনা নিবৃত্তির অষ্টপন্থা নিম্নরূপঃ

(১) সৎ দৃষ্টি[১]
(২) সৎ সংকল্প।[২]
(৩) সৎ বাক্য।[৩]
(৪) সৎ কর্ম,[৪]
(৫) সৎ জীবিকা।[৫]
(৬) সৎ প্রচেষ্টা।[৬]
(৭) সৎ স্মৃতি বা সৎ চিন্তা।[৭]
(৮) সৎ সমাধি বা সৎ সাধনা।[৮]

সৎ সমাধির মাধ্যমে সাধকগণ চরম মুক্তি বা 'নির্বাণ' লাভ করতে পারেন। বুদ্ধের মতে ধর্মপ্রাণ মানুষের পরম লক্ষ্য হল অস্তিত্ব হতে মুক্তি বা 'নির্বাণ' লাভ। বুদ্ধের এই নির্বাণ-তত্ত্ব সন্ন্যাসীগণ কর্তৃক দ্রুত জনসমাজে প্রচারিত হতে থাকে।

বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম লক্ষ হল 'নির্বাণ'। 'নির্বাণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিভে যাওয়া, প্রবাহের 'নিবৃত্তি ঘটা' বা তৃষ্ণার নিবৃত্তি। নির্বাণ বিষয়টা অবোধ্য ও জটিল। কেউ কেউ নির্বাণ বলতে জীবনের নিঃশেষ বা বিনাশকে বুঝেছেন। বৌদ্ধদের মতে এটা ঠিক নয়। কারণ বুদ্ধ জীবিতাবস্থায় নির্বাণ লাভ করেছিলেন। মূলতঃ পুনর্জন্মের নিরোধ হওয়া, তৃষ্ণা, ক্ষয়, রাগ, দ্বেষ ও মোহ এবং সর্ব প্রকার বন্ধন হতে মুক্তি লাভই 'নির্বাণ'। "নির্বাণ" চিত্তের

১. চারটি আর্য বা সত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হল সৎদৃষ্টি। বুদ্ধের মতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানই দুঃখের মূল কারণ ॥ ২. সৎ দৃষ্টির দ্বারা শুধু মহাসত্যগুলোর যথার্থ উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু তদানুযায়ী কাজ করার জন্য মনের তীব্র দৃঢ়তা একান্ত প্রয়োজন। একেই সৎ সংকল্প বলা হয় ॥ ৩. দুঃখ জয়ের জন্য বাকসংযম অত্যাবশ্যক। মিথ্যা কথা, চুকলি, কুটকথা, অসারকথা ইত্যাদি বর্জন করাই বাক সংযমের লক্ষণ ॥ ৪. মানুষের আচরণ হবে সম্পূর্ণ রূপে শুদ্ধ ও সত ভিত্তিক, তাই মুক্তিকামীকে প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ ইত্যাদি পরিহার করতে হবে ॥ ৫ সৎজীবিকা ঃ সদুপায়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করাই হল সৎ জীবিকা। অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, নেশা ও বিষ- এই পঞ্চ বাণিজ্য পরিহার করতে হবে ॥ ৬. সৎপ্রচেষ্টা ঃ মনে দৃঢ়মূল কুচিন্তার বিনাশ সাধন, নতুন ভাবে মনে কুচিন্তার উৎপত্তি নিবারণ, মনে সৎ চিন্তা আনয়ন এবং সৎ চিন্তাকে মনে সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টাকে 'সৎ প্রচেষ্টা' বলে ॥ ৭. সৎস্মৃতিঃ দৈহিক ও মানসিক সকল অবস্থা সন্তর্পণে পর্যবেক্ষণ বা স্মরণই সৎ স্মৃতি ॥ ৮. সৎসমাধি ঃ চিত্তের একাগ্রতাকে 'সমাধি' বলা হয়। সৎসমাধি দ্বারা মনের বিক্ষেপ ও চাঞ্চল্য দূর করা যায় ॥

এমন এক অবস্থা, যা সর্ব উপাধি বর্জিত ও সর্ব সংস্কার মুক্ত। বৌদ্ধরা কয়েকটি উপমা দ্বারা নির্বাণ সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যথা ঃ

নির্বাণ জলে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত। পদ্ম জলে উৎপন্ন ও বর্ধিত হলেও জলের কোন স্পর্শ যেমন পদ্মের গায়ে লাগে না, সেরূপ যাবতীয় জাগতিক দুঃখ বেদনা নির্বাণকেও স্পর্শ করতে পারে না।

শীতল জল উত্তাপ নিবারণ করে, কোন কোন ক্ষেত্রে এটা নির্বাণের অনুরূপ। কারণ নির্বাণ লোভ, দ্বেষ ও মোহরূপ অগ্নীর উত্তাপ নিবারণ করে মানুষের পরম শান্তি আনয়ন করে।

নির্বাণ সমুদ্রের মত বিশাল ও বিস্তৃত। সমুদ্রে যেমন বহু প্রাণী বাস করে, তেমনি নির্বাণও তৃষ্ণামুক্ত বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আবাসস্থল।

তাদের সারকথা হল- বৌদ্ধদের কাছে দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু, এ দুনিয়ার বাইরে জান্নাত ও জাহান্নাম বলতে কিছু নেই। তাই যে ভাল কাজ করবে, সে দুনিয়ার পূনর্জন্ম গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে এবং নির্বাণ লাভ করবে। আর অসৎ কাজ করলে এ দুনিয়ায় পূনর্জন্ম গ্রহণের মাধ্যমে দুঃখ দুর্দশায় নিপতীত হবে।

বৌদ্ধ ধর্মের কতিপয় আকীদা-বিশ্বাস

১. বৌদ্ধধর্মে নাস্তিক্যবাদ ঃ

মার্কস ও এঙ্গেলসের মতো বুদ্ধ সর্বতভাবে একজন বস্তুবাদী ছিলেন। তার প্রচারিত ধর্মে ইশ্বর নেই, আত্মা নেই, পরলোক নেই। আছে শুধু অবিরাম প্রবাহ, পরিবর্তন ও রূপান্তর। সমগ্র বিশ্ব চলছে এক নিয়মের অধীনে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের নামই ধর্ম। এ জগতে সৃষ্টি প্রবাহ অনন্ত গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে- এর আদিও নেই, অন্তও নেই। এ অনন্ত সৃষ্টি প্রবাহ আপনা আপনি প্রবাহিত হয়ে চলছে। এর প্রবর্তন বা পরিচালনা করার জন্য কোন সৃষ্টিকর্তা বা ইশ্বরের প্রয়োজন হয় না।

২. বৌদ্ধধর্মে কোন প্রার্থনা নেইঃ

বৌদ্ধদের ধারণা - প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কেউ মুক্তি পেতে পারে না। বৌদ্ধধর্মে মুক্তির জন্য ইশ্বর বা অতি জাগতিক শক্তির ভূমিকা নেই। বৌদ্ধধর্মমতে মানুষের মুক্তিদাতা মানুষ নিজেই এবং মানুষই মানুষের ভাগ্য বিধাতা। তাই তার কোন ইবাদত বা প্রার্থনার প্রয়োজন নেই।

৩. বৌদ্ধধর্মে প্রতীত্যসমুৎপাদঃ

"প্রতীত্য" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'এটাকে পেয়ে' আর "সমুৎপাদ" শব্দের অর্থ হল উৎপত্তি। সুতরাং প্রতীত্যসমুৎপাদের সহজ অর্থ হল কোন বস্তু বা ঘটনা পূর্ববর্তী বস্তু বা ঘটনা হতে সমুৎপন্ন। অর্থাৎ, প্রত্যেক কার্যেরই এক পূর্ববর্তী কারণ আছে। এই কার্যকারণ

নিয়মকেই বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ বলেছেন। সুতরাং মানুষের বর্তমান জীবনের কারণ হল তার অতীতের কৃতকর্ম এবং বর্তমানের পরিণতি হল ভবিষ্যত। মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে এবং কর্ম ফল অনুযায়ী বার বার জন্ম গ্রহণ করতে হবে। তবে বাসনাহীন, আসক্তিহীন ও মোহমুক্ত কর্মের মাধ্যমে নির্বাণ প্রাপ্ত হলে তাকে আর কর্মফলাধীন হতে হবে না। বুদ্ধের আবিস্কৃত চারটি আর্যসত্য ও অপরাপর দার্শনিক মতবাদ সমূহ এ তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাই প্রতীত্যসমুৎপাদ মতবাদের উপর বুদ্ধ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং একে ধর্ম নামে অভিহিত করেছেন।

৪. বৌদ্ধধর্মের অনিত্যবাদঃ

বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্র হল- অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম। বৌদ্ধধর্ম মতে পৃথিবীতে কোন জিনিসই নিত্য, শাশ্বত ও চিরন্তন নয়। তথা জগতে শাশ্বত সত্তা বলে কিছুই নেই। আছে শুধু উৎপাদ্যমান ও পরিবর্তমান।

৫. বৌদ্ধধর্মের অনাত্মাবাদঃ

প্রায় সব ধর্মাবলম্বীরা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হলেও বুদ্ধ মানুষের মধ্যে শাশ্বত ও চিরন্তন আত্মার অস্বীকার করেন। বুদ্ধের মতে এ জগতের সবকিছুই যখন ক্ষণিক ও অনিত্য, তখন কোন স্থায়ী ও শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সুতরাং জগতের যৌগিক ও মৌলিক সবকিছুই আত্মাহীন। মূলতঃ বুদ্ধের অনিত্যবাদ দর্শন থেকেই অনাত্মাবাদ সৃষ্টি হয়েছে।

৬. বৌদ্ধধর্মের পুনর্জন্মবাদঃ

মানুষ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান- এই পাঁচ উৎপাদনের সমন্বয় মাত্র। এই পাঁচ উৎপাদনের ভিতর ও বাইরে অথবা উভয় অন্তরবর্তী স্থানের কোথাও আত্মা নামে কোন অজড়, অমর, অক্ষয় কোন বস্তু নেই। বৌদ্ধধর্ম মতে আত্মাবলে কিছু নেই, তাই নাম রূপই পুন পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। বৌদ্ধরা পুনর্জন্মের স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেন ধন্মপদ গ্রন্থে এক পিতা-মাতার গল্প আছে, যারা একদিন গৌতম-বুদ্ধকে দেখে স্বীয় পুত্র বলে সম্বোধন করেছিলেন। বুদ্ধ তাদের চিনতে পেরে বলেছিলেন- অতীতে বহু জন্মে তারা তার পিতা-মাতা ছিলেন। বৌদ্ধরা পুনর্জন্মের স্বপক্ষে এরূপ উদ্ভট প্রমাণ পেশ করে থাকেন। মূলতঃ পুনর্জন্মবাদ বৌদ্ধদের প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শনের অনিবার্য ফল। (পূর্বে কার্যকারণ নীতি আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।)

৭. বৌদ্ধধর্মের বিশ্বতত্ত্ব ঃ

বৌদ্ধধর্মে ইশ্বরের কোন স্থান নেই। বরং প্রত্যেক কার্যেরই কারণ আছে, কিন্তু চূড়ান্ত কারণ (Final cause) বলে কিছু নেই। তাই তাদের মতে চূড়ান্ত কারণ রূপে ইশ্বরের

অস্তীত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপ বৌদ্ধধর্ম মতে নৈতিক অগ্রগতির জন্যও ইশ্বরের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই। বৌদ্ধরা বলেন ঃ ইশ্বর যদি সকল কিছুর কারণ হন, তিনি যদি সর্ব শক্তিমান হন এবং তাঁর ইচ্ছায় যদি সবকিছু হয়- তাহলে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না। তাদের মতে 'জগৎ একদা ছিল না এবং একদা থাকবে না' এটা বিজ্ঞ ব্যক্তির মতবাদ নয়। বরং তাদের মতে জগৎ হল অনাদি ও অসৃষ্ট। তাই সংসার কার্যকারণ প্রবাহ মাত্র। বৌদ্ধদের মতে মানুষ নিজেই তার নিজের স্রষ্টা, তার কর্মই তার সৃষ্টিকর্তা। তাই অপরাধ মুলক কাজের ক্ষমা করবার কেউ নেই। মৃত্যুর পর মানুষের ভাল-মন্দের তালিকা দেখে পুরস্কার বা শস্তি প্রদান করার জন্য স্বর্গে বা অন্য কোথাও ইশ্বর বসে নেই। (نعوذ بالله) তারা বলেঃ "অজ্ঞাত ইশ্বরের প্রতি ভালবাসা অর্থহীন প্রলাপের মত।"

বুদ্ধের বিশ্বতত্ত্বের মাঝে মূলতঃ দুই শ্রেণীর সত্তার স্বীকার করা হয়।

(১) যে সকল বিষয়ের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, একে বলা হয় জ্ঞেয়।

(২) আরেক শ্রেণীর সত্তা হল- যারা এদের উপলব্ধি করে। তাকে বলা হয় জ্ঞাতা।

বুদ্ধের মতে আত্মারূপে স্থায়ী বস্তু নেই। আর বুদ্ধের মতে আত্মারূপে স্থায়ী পদার্থ যেমন নেই, অন্য দিকে জ্ঞেয়রূপ কোন স্থায়ী বস্তু নেই। যা আছে- তা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে গ্রথিত কতকগুলি মানসিক অনুভূতি। সুতরাং বিশ্ব হল- কতকগুলি জ্ঞান, অনুভূতি ও চিন্তার পরস্পর গ্রথিত মালারমত বা চৈতন্যের প্রবাহ মাত্র। বুদ্ধ বলেনঃ

"ব্যক্তি জীবনের ন্যায় এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এবং জগৎ চক্রেরও উদয় লয় আছে। পৃথিবীও একদিন ধ্বংস হবে। পূর্ববর্তী পৃথিবীরও তা হয়ে আসছিল এবং পুনর্বার তা হবে। তবে যেভাবেই জগৎ ও প্রাণীর সৃষ্টি হোক না কেন তা সবই কার্যকারণ নিয়মের শৃঙ্খলে গ্রথিত। সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রাণ প্রবাহের মূলে প্রতীত্যসমুৎপাদের দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্রের কারণে প্রাণীর জন্ম পুনর্জন্ম হয়ে আসছে।"

৮. বৌদ্ধধর্মের বোধিসত্ত্ব ও পারমিতাঃ

বুদ্ধপূর্ববর্তী সত্ত্বকে বলা হয় "বোধিসত্ত্ব"। এটাকে এভাবে বলা যায়ঃ বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যত্নবান সত্ত্বকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়।

আর "পারমিতা" শব্দের অর্থ হল- পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়া। গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব জন্মে যে সমস্ত সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন তাকে পারমিতা বলা হয়। পারমিতা সমূহের পূর্ণতা ব্যতীত কেউ বুদ্ধ হতে পারে না।

বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক অবস্থায় দশ প্রকার পারমিতা পাওয়া যায়। পালি বুদ্ধবংশে ১০ প্রকার এবং চরিয়াপিটকে ৭ প্রকার পারমিতার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু মহাযান গ্রন্থাদিতে ৬ প্রকার পারমিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার পারমিতা বিভাগকে নিম্নে পাশাপাশি উল্লেখ করা গেল ঃ

পারমিতা

বুদ্ধবংশে	পালিতে	মহাযানগ্রন্থে
১. দান	১. দান	১. দান[১]
২. শীল	২. শীল	২.শীল[২]
৩. নৈষ্কম্য[৩]	৩. নেক্খম্	
৪. সত্য[৪]	৪.সচ্চ	৩. ক্ষান্তি[৫]
৫. ক্ষান্তি	৫. খন্তি	
৬. বীর্য	৬. বিরিয়	৪. বীর্য[৬]
৭. অধিষ্ঠান[৭]	৭. অধিট্ঠান	
৮. মৈত্রী[৮]	৮. মেত্তা	৫. ধ্যান[৯]
৯. উপক্ষো[১০]	৯. উপেক্খা	
১০. প্রজ্ঞা	১০ প্রঞ্ঞা	৬. প্রজ্ঞা[১১]

বৌদ্ধ পূর্ণিমা প্রসঙ্গ ঃ

"বৌদ্ধ পূর্ণিমা" বলা হয় বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের আলোচনা এবং প্রতিপালনের জন্য প্রচেষ্টা ও সৎ সংকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঋতুচক্রের বিভিন্ন সময়ে পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত আনন্দমেলা বা কল্যাণ সম্মেলনকে। পাক ভারতীয় ভিক্ষুদের গ্রন্থে প্রথম বৌদ্ধ পূর্ণিমার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা (মধুপূর্ণিমা) আশ্বিনী পূর্ণিমা (প্রচারণা পূর্ণিমা), কার্তিকী পূর্ণিমা এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমা- এরূপ নয়টি পুর্ণিমা বৌদ্ধ পূর্ণিমা নামে অভিহিত।[১২]

---

১. সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য নিজের সর্বস্ব এমন কি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা সমস্ত শরীর নিঃস্বার্থভাবে দান করা এবং দানের ফল পরিত্যাগ করাই দান পারমিতা ॥ ২. শীল পারমিতা হল কায় ও বাককর্মের সম্পূর্ণ সংযম করা ॥ ৩. ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করত সংসারের ভোগবিলাসের প্রতি অনাশক্ত থাকা ॥ ৪. জন্ম-জন্মান্তরে সদা সত্য কথা বলা এবং যা বলা হয় তা কার্যে পরিণত করা ॥ ৫. ক্ষ্যান্তির অর্থ হল ক্ষমা। অক্ষমা, দ্বেষ ও প্রতিঘ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা ॥ ৬. কুশল কর্মে উৎসাহী হওয়া আর কুৎসিত কর্মে অনাসক্তি হওয়াই হল বীর্য। ক্ষমাশীল হয়ে বীর্যের আচরণ করা উচিত, কারণ বীর্যের উপরই বোধি নির্ভর করে ॥ ৭. অধিষ্ঠান অর্থ হল দৃঢ় সংকল্প তথা শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও সংকল্পচ্যুত না হওয়া ॥ ৮. সমস্ত প্রাণীর অপরিসীম সুখ-শান্তি কামনা করাই মৈত্রী ॥ ৯. একালম্বন তথা সম্মকরূপে চিত্ত অচৈতসিক ধর্ম সমূহের কোন প্রকার বিক্ষেপ ব্যতীত স্থীর হওয়া ॥ ১০. লোভ ও দ্বেষ বর্জিত নিরপেক্ষ দর্শন ॥ ১১. কুশল চিত্ত সম্প্রযুক্ত বিদর্শন জ্ঞানকে বৌদ্ধমতে প্রজ্ঞা বলা হয়। প্রজ্ঞার অনুকুলবর্তী হলেই দান সহ অন্য পাঁচ পারমিতা সম্যক সম্বোধি প্রাপ্তিতে সমর্থ হয় ॥ ১২. বুদ্ধধর্ম সংক্রান্ত সিংহভাগ তথ্য জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া কর্তৃক রচিত ও বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত "বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা" নামক গ্রন্থ থেকে এবং কিছু তথ্য মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ থেকে গৃহীত ॥

যেন্- বৌদ্ধধর্ম
(Zen Budhism)

বিশেষভাবে জাপানে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের একটি অন্যতম শাখা হল যেন্- বৌদ্ধধর্ম। ভারতবর্ষে ধ্যানশাখা নামে এর প্রবর্তন হয়। পরে চান (Ch'an) ধর্মমত নামে এটা চীনদেশে প্রচলিত হয়। ১৪শ শতাব্দীতে জাপানে এটা "যেন্" (Zen) নাম গ্রহণ করে। জাপানী ভাষায় "যেন" সংস্কৃত ভাষার "ধ্যান" কথারই পরিবর্তিত আকার।

বৌদ্ধধর্মের এই শাখা তার অন্যান্য শাখা থেকে মূলতঃ ভিন্ন। যেন্ অনুসারীরা মনে করে পরম সত্য পাওয়া যায় আত্ম-জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বুদ্ধ-অন্তরে জাগরণের (জাপানী বশিন bushin) ফলে ; এটা প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে সুপ্ত থাকে। এই বুদ্ধ-অন্তর জাগরণের উদ্দেশ্যে যেন্ অনুসারীরা বিশেষ ধরনের ধ্যান (যেন্) অভ্যাস করেন।

যেন্ অনুসারীদের তিনটি শাখা

(এক) রিনযাই, (Rinzai,)

(দুই) সোতো, (soto,)

(তিন) ওবাকু (obaku)।

যেন্ মতবাদ জাপানের যোদ্ধ সম্প্রদায় সামুরাইদের মধ্যে প্রিয় হয়ে ওঠে। যেন্ সম্প্রদায় দৈহিক ও মানসিক শাসন-শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ও গভীর চিন্তায় সক্ষম বলেই সম্ভবতঃ সামুরাই নেতৃবর্গ এই মতবাদকে নিজেদের সুশিক্ষার সহায়ক বলে গ্রহণ করেন। বর্তমান সময়েও জাপানী সৈন্য বিভাগের কর্মচারিগণ তাদের ছুটির কতকাংশ যেন্ মঠে অধ্যয়নে কাটান।[১]

বৌদ্ধদের ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটক

বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম "ত্রিপিটক"। তিনটি "পিটক"-এর সমন্বয়ে গঠিত বলে একে ত্রিপিটক বলা হয়। এই তিনটি পিটকের নাম বিনয়, সূত্র, ও অভিধর্ম। বিনয় পিটকে বুদ্ধের আজ্ঞাদেশনা, সুত্র পিটকে ব্যবহার-দেশনা এবং অভিধর্ম পিটকে পরমার্থ দেশনা অন্তর্ভুক্ত। শীল বিষয়ক শিক্ষার প্রাধ্যান্য থাকায় বিনয় পিটক অধিশীল শিক্ষা; চিত্ত (ধ্যান-সমাধি) বিষয়ক শিক্ষার প্রাধান্য থাকায় সূত্রপিটক অধিচিত্ত শিক্ষা এবং প্রজ্ঞা বিষয়ক শিক্ষার প্রাধান্য থাকায় অভিধর্ম পিটক অধিপ্রজ্ঞতা শিক্ষা নামেও পরিচিত।

ত্রিপিটকের ভাষা "পালি"। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের[২] পর প্রথম সঙ্গীতিকাল হতে এর সংকলন শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতিতে পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে। তবে তৃতীয় সঙ্গীতির পর চতুর্থ সঙ্গীতির পূর্ববর্তী মাঝামাঝি সময়ে অর্হৎগণ প্রথম তালপত্রে লিপিবদ্ধ করেন। তারা ১ম ও ২ম সঙ্গীতিতে শুধু ধর্ম ও বিনয় নামে সঙ্গীতি কাজ সমাধা

১. তথ্যসূত্রঃ মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড ॥

২. তাদের পরিভাষায় সংসার ত্যাগীগণ অহংজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে সুদীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করলে নির্বাণ তথা জন্ম থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য! "বৌদ্ধধর্ম ঃ শীর্ষক আলোচনা ॥

করেন এবং তৃতীয় সঙ্গীতিতে বিনয় সূত্র ও অভিধর্ম নামে পৃথক নামকরণে ত্রিপিটক নাম করা হয়। অতঃপর ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান প্রধান স্থানে ত্রিপিটক রক্ষা করা হয়। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অভ্যুত্থানের সময় সমস্ত ত্রিপিটক ধ্বংস করা হয়।

তদন্ত স্থবির মহেন্দ্রই প্রথম সিংহলে লিপিবদ্ধ ত্রিপিটক নিয়ে যান। সেখান থেকে বার্মা (মিয়ানমার), শ্যাম (ভিয়েতনাম), ও ক্যামবোডিয়ায় তা প্রেরিত হয় এবং অদ্যাবধি সুরক্ষিত আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, অপভ্রংশ, পৈশাচী, খরোষ্ঠি, ও তৈলঙ্গী ভাষায়ও লিপিবদ্ধের উল্লেখ দেখা যায়। তাছাড়া বর্তমানে সিংহলী, বর্মী, শ্যামী, ক্যামবোডীয়, নেপালী, তিব্বতী, ভিয়েতনামী, মঙ্গোলীয়, কোরীয়, জাপানী, ও চীনা ভাষায় ত্রিপিটকের অর্থকথা ও টীকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বলে জানা যায়।[১]

জৈনধর্ম
(Jainism)

"জৈনধর্ম" ভারতের একটি ধর্ম। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ট শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রায় সমসাময়িক কালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আকারে এই ধর্মের উদ্ভব হয়। কথিত আছে, ২৪ জন তীর্থঙ্কর বা মহাপুরুষ এই ধর্ম প্রবর্তন করেন। সর্বশেষ তীর্থঙ্করের নাম বর্ধমান। পরে তিনি মহাবীর এবং জিন (জয়ী) নামে পরিচিতি লাভ করেন।[২] তার এই জিন নাম হতেই জৈন নামের উৎপত্তি। প্রথম দিকে মহাবীর প্রচারিত এই জৈনধর্ম বিহার অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তিকালে ভারতের অত্যন্ত প্রত্যন্ত প্রদেশেও তার বিস্তৃতি ঘটে।

জৈনধর্মের কয়েকটি দর্শন ও নীতি ঃ

১. জড় পদার্থসহ বিশ্বের যাবতীয় বস্তু অবিনশ্বর।

২. আত্মা সর্ববস্তুতে বিরাজমান; গাছপালা, এমনকি পাথরেরও আত্মা আছে। আত্মা অবিনাশী এবং তা ঈশ্বরেরও সৃষ্টি নয়।

৩. বারবার জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও আত্মার সত্তা বা স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন থাকে।

৪. জৈনধর্ম পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করে। জৈনধর্ম অনুসারে ৯ বার জন্মগ্রহণের পর নির্বাণ বা জন্ম হতে মুক্তি লাভ করা যায় এবং যতি বা সংসার ত্যাগীগণ অহংজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে ১২ বৎসর কঠোর সাধনা করলে নির্বাণ লাভ করতে পারেন।[৩]

১. তথ্যসূত্রঃ মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড ॥ ২. জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমান ওরফে মহাবীর বা জিন ছিলেন বিদেহ (বর্তমানে বিহার) নিবাসী ক্ষত্রিয় বর্ণোদ্ভূত এক ব্যক্তি। ২৮ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করে বনে চলে যান ও সেখানে সন্ন্যাস জীবন বরণ করে ধ্যান মগ্ন থাকেন। ১২ বৎসর ধ্যান করার পর তার মনে এক নতুন ধর্মের নীতি দানা বেঁধে ওঠে। সেই নীতিমালাই হল জৈনধর্ম। মহাবীর ৮০ বৎসরেরও বেশী জীবিত ছিলেন ॥ ৩. এ হিসেবে দেখা যায় বৌদ্ধ ও জৈন উভয় মতবাদই ব্রাহ্মণ্যবাদের কর্মবাদ (কর্মফলহেতু) এবং সংসারবাদ (অন্তহীন পুনর্জন্ম) দর্শনে বিশ্বাস করে। নির্বাণ তথা সংসার চক্র হতে মুক্তি উভয়েরই চরম লক্ষ্য ॥

৫. জৈনধর্ম মতে 'অর্হন্ত'গণ[১] দেবতাদের চেয়ে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। কেননা 'অর্হন্ত'গণই অস্তিত্বের সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের দাসত্বনিগড় ভেঙ্গে সর্ববন্ধনমুক্ত হয়ে যায়। আর সর্ববন্ধনমুক্ত এই সত্তা সবকিছুর উর্ধ্বে। সবকিছু থেকে সে শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে দেবতাগণ অর্হন্তত্ব লাভে অসমর্থ। পূর্ণ মুক্তি পেতে হলে দেবতাদেরও মানুষের ঘরে, মানুষের জগতে পুনর্জন্ম লাভ করা দরকার।

৬. জৈনধর্ম মতে সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান ও সৎ আচরণ এই ত্রিবিধ শিক্ষার (রত্ন) অনুসরণই সাধারণের মোক্ষ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

৭. অহিংসা তথা জীবন্ত প্রাণী হত্যা না করা জৈনধর্মের অপরিহার্য নীতি। জৈনসাধুরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকামাকড়ও যেন দৈবক্রমে পায়ে না মাড়িয়ে ফেলেন সে জন্যে অতিমাত্রায় সতর্ক থাকেন।

৮. উপরোক্ত অহিংসা নীতি সহ সত্যবাদিতা, সংযম, বৈরাগ্য প্রভৃতি ২৮টি আচরণবিধি জৈন সাধু সন্ন্যাসীদেরকে মেনে চলতে হয়। তবে জৈনধর্মের গৃহী অনুসারীদের জন্যে এ সব বিধি-নিষেধের কঠোরতার মাত্রা ও এদের সংখ্যা কম।

জৈনদের দুটি দল প্রসঙ্গ ঃ

জৈনদের মধ্যে তপস্যার পদ্ধতি নিয়ে অনৈক্যের কারণে তাদের মধ্যে দুটি দল হয়ে যায়। খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতকে, মতান্তরে খৃষ্টীয় ১ম শতকে এই বিভক্তি সংঘটিত হয়।

১. দিগম্বর জৈন ঃ মহাবীরের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যারা (সর্বত্যাগী হয়ে) নগ্ন থাকত, তারা দিগম্বর (বস্ত্রহীন) নামে পরিচিত হয়। এরা রক্ষণশীল জৈন বলে পরিচিত।

২. শ্বেতাম্বর জৈন ঃ তারা মহাবীরের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে শ্বেতবস্ত্র (অম্বর) পরিধান করে বলে তারা শ্বেতাম্বর নামে পরিচিত হয়। এরা অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল জৈন বলে পরিচিত দিগম্বর জৈন কর্তৃক সমালোচিত।

জৈনধর্ম পৃথিবীতে তেমন বিস্তার লাভ করেনি। ভারতীয় উপমহাদেশেই জৈনধর্ম সীমাবদ্ধ। এখনও ভারতে ছোট একটি দৃঢ়বদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে এর অস্তিত্ব টিকে আছে।[২]

শিখধর্ম

"শিখ" ভারতীয় পাঞ্জাব প্রদেশের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বিশেষ। পাঞ্জাব এলাকাতেই প্রধানতঃ শিখদের বসতি। তাদের জনসংখ্যা অর্ধ কোটির উপর।

শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গুরু হলেন নানক। গুরু নানকের জন্ম মুত্যু সাল আনুমানিক ১৪৬৯-১৫৩৯। লাহোরের নিকট তালবন্দী (আধুনিক নানকানা সাহেব) গ্রামের এক হিন্দু পরিবারে তার জন্ম। পিতার নাম কালু, মাতার নাম ত্রিপতা। বাল্যকালে বৈদ্যনাথ

১. 'অর্হন্ত' অর্থাৎ, যে জৈন সন্ন্যাসী পূর্ণ নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন ॥

২. জৈনধর্ম সংক্রান্ত তথ্যাবলী মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় ও ৪র্থ খণ্ড এবং কো. আন্তোনভা, গ্রি. বোনগার্দ-লেভিন ও কতোভস্কি কর্তৃক রচিত এবং প্রগতি প্রকাশনী মস্কো থেকে প্রকাশিত "ভারত বর্ষের ইতিহাস" থেকে সংগৃহীত ॥

পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত এবং কুতুবুদ্দীন মোল্লার কাছে ফার্সী শিক্ষা করেন। শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস নামে তার দুই পুত্র ছিল। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি গৃহ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন এবং নানা দেশে পর্যটন করেন। কথিত আছে তিনি মক্কায়ও গিয়েছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর নিজের ধর্মমত প্রচার করতে থাকেন। তিনি প্রধানতঃ পারসিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দুদের পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেন। সৃষ্টিকর্তার একত্ব ও মানুষের ভ্রাতৃত্ব তার শিক্ষার মূলনীতি। একেশ্বরবাদকে তিনি সকল ধর্মের মূল ভিত্তি বলে প্রচার করেন। তিনি মানুষকে ধর্মাচরণ ও ধ্যানের দ্বারা ঈশ্বর লাভের উপদেশ দেন। তিনি হিন্দুদের পুরোহিত-তন্ত্র, মূর্তিপূজা, ও বর্ণাশ্রম প্রথা তথা জাতিপ্রথার বিরোধিতা করেন। মানুষের নৈতিক জীবন সংস্কার করাই নানকের উদ্দেশ্য ছিল বলা হয়।

শিখদের নবম নেতা গুরু গোবিন্দ শিখদের পাগড়ী পরিধান ও কখনও চুল না-কাটার প্রথা প্রবর্তন করেন। শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের পুত্র ১০ম গুরু, গোবিন্দ (১৬৭৫- ১৭০৮) শিখদিগকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামরিক সম্প্রদায়রূপে সংগঠিত করেন।

শিখদের ধর্ম পুস্তকের নাম "গ্রন্থ সাহেব" এবং ধর্মস্থানের নাম "গুরুদ্বার"। শিখ ধর্মনেতাদের উপাধি হল "গুরু"। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নানক এই উপাধি গ্রহণ করায় তার উত্তরাধিকারীগণ এই উপাধি গ্রহণ করেন। তাদের সামরিক শ্রেণীর প্রত্যেকে "সিংহ" পদবী গ্রহণ করেন। শিখদের ১০ম গুরু, গোবিন্দ (১৬৭৫-১৭০৮) "দস্উইঁ বাদশাহ কা গ্রন্থ" নামক অতিরিক্ত একটি ধর্মীয় গ্রন্থ সংকলন করেন।

শিখ নেতা হরকিষণের মৃত্যুর পর তেগ বাহাদুর গুরু হন। তিনি স্বাধীন শিখ রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন ও পাঞ্জাবে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালান। সম্রাট আওরংগযেব তাকে বন্দী অবস্থায় দরবারে আনেন ও রাজদ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ড দেন। এখান থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শিখদের প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু হয় এবং বাহাদুর শাহের আমল পর্যন্ত তা চলতে থাকে। সিরহিন্দের ফৌজদার ওয়াযীর খানের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ, আহমদ শাহ আবদালীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ, সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভীর সাথে তাদের যুদ্ধ প্রভৃতি তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বশেষ ১৮৫৭-এর আযাদী সংগ্রামে শিখগণ জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় ও বিপদ-ক্ষণে বিদেশী শক্তির সাহায্য করে।[১]

হিন্দু ধর্ম
(Hinduism)

"হিন্দু ধর্ম" বলা হয় ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় আশ্রিত ধর্মকে। হিন্দুধর্ম প্রধাণতঃ বহু ঈশ্বরবাদী পৌত্তলিক ধর্ম। ব্রাহ্মণগণ হলেন এই ধর্মের ধর্মগুরু। তারা দেবতার উৎসর্গ, পূজা, ইতাদিতে পৌরোহিত্য করেন ও নিজেদেরকে নৈতিক চরিত্রের আদর্শ বলে দাবি করেন। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে তারা বৈদিক ধর্মের পরিবর্তে জটিল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি প্রবর্তন করেন।

১. তথ্যসূত্র ঃ মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম ও ৪র্থ খণ্ড ॥

হিন্দুধর্ম বহু প্রাচীন ধর্ম। বহু বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এ ধর্ম এ পর্যন্ত এসেছে। তবে ভারতের বাইরে এই ধর্ম কখনও উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রসার লাভ করেনি।

ইসলাম ধর্মের তাওহীদ তথা একেশ্বরবাদ ও সৌভ্রাতৃত্বের সংস্পর্শে এসে এবং পরবর্তী কালে পাশ্চাত্যের প্রভাবে হিন্দু ধর্মের বহুমুখী সংস্কার সাধিত হয়েছে। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব মতবাদ, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উদার ধর্মমত হিন্দুধর্ম সংস্কারের নজির। এই ধর্মের সংস্কারের আরও নজীর হল সতীদাহ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে ও বর্ণপ্রথা শিথিল হয়েছে। তবুও এখনও হিন্দুধর্ম প্রধানতঃ বহু ঈশ্বরবাদী পৌত্তলিক ধর্ম।

হিন্দুদের বিশেষ কয়েকজন দেবদেবীর পরিচয়

হিন্দুদের দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের স্থান অতি উচ্চ। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মা সৃজনকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা ও মহাদেব সংহার কর্তারূপে সাধারণতঃ কীর্তিত হয়ে থাকেন। এই তিন জন হলেন হিন্দুদের প্রধান দেবতা। নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া গেল।

ব্রহ্মা ঃ

ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা। তিনি চতুরানন তথা চার মুখ বিশিষ্ট। হিন্দুধর্ম গ্রন্থের বর্ণনা মতে বিশ্ব সৃষ্টি তত্ত্ব নিম্নরূপ ঃ

মহাপ্রলয়ের শেষে এই জগৎ যখন অন্ধকারময় ছিল, তখন বিরাট মহাপুরুষ পরমব্রহ্ম নিজের তেজে সেই অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলে সৃষ্টির বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। তখন ঐ বীজ সুবর্ণময় অণ্ডে পরিণত হয়। অণ্ড মধ্যে ঐ বিরাট মহাপুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান করতে থাকেন। তারপর অণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত হলে এক ভাগ আকাশে ও অন্য ভাগ ভূমণ্ডলে পরিণত হয়। এরপর ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ, নারদ-এই দশ জন প্রজাপতিকে মন হতে উৎপন্ন করেন। এই সকল প্রজাপতি[১] হতে সকল প্রাণীর উদ্ভব হয়।

বিদ্যাদেবী ময়ূরাসনা সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা তার দুই কন্যা।

ব্রহ্মা চতুর্ভুত, চতুরানন ও রক্তবর্ণ। প্রথমে তাঁর পাঁচটি মস্তক ছিল; কিন্তু একদা শিবের প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য উচ্চারণ করায় শিবের তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে ব্রহ্মার একটি মস্তক দগ্ধ হয়। সেই হতে ব্রহ্মা চতুর্মুখ। ব্রহ্মার বাহন হংস। বেদে কিংবা ব্রাহ্মণে ব্রহ্মার নাম পাওয়া যায় না, সেখানে সৃষ্টিকর্তাকে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি বলা হয়েছে।

---

১. হিন্দুধর্ম গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী প্রজাপতির পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

জীবসমুহের স্রষ্টা, জন্মদাতা ও পূর্ব পুরুষ। বেদে ইন্দ্র, সাবিত্রী, সোম, হিরণ্যগর্ভ ও অন্যান্য দেবতাকে প্রজাপতি বলা হয়। মানুসংহিতায় ব্রহ্মাকেই এই উপাধি দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনিই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং পৃথিবীর রক্ষক। ব্রহ্মার পুত্র বলে এবং দশ জন ঋষির সৃষ্টিকর্তা বলে স্বয়ম্ভুর মনুকেও প্রজাপতি বলা হয়। এই ঋষিরা ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং এই মানসপুত্র হতেই মানবের সৃষ্টি। সেই জন্য এই দশ জন ঋষিকেই সর্বত্র প্রজাপতি বলা হয়েছে।

মরীচি, অত্রি, অঙ্গরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, ভৃগু ও নারদ-এই দশ জন সপ্তর্ষিই প্রজাপতি ॥

বিষ্ণু ঃ

বিষ্ণ হলেন পালনকর্তা। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে আদিতির গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য, দেবতাদের সাহায্য করবার জন্য ও দানবদলের জন্য ইনি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে এঁর দশ অবতারের কথা লিখিত আছে; যথা- মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। তিন যুগে ইনি বহু দৈত্য-দানবকে বধ করেছেন; যেমন- মধু, ধেনুক, পুতনা যললার্জুন, কালনেমি, হয়গ্রীব, শটক, অরিষ্ট, কৈটভ, কংশ, কেশী, শাল্ব, বাণ, কালীয়, নরক, বলি, শিশুপাল প্রভৃতি। এঁর চার হস্ত-এক হস্তে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, দ্বিতীয় হস্তে সুদর্শন চক্র, তৃতীয় হস্তে কৌমোদকী গদা এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম। এঁর ধনুকের নাম শার্ঙ্গ ও অসির নাম নন্দক। এঁর বক্ষে কৌস্তুভ মণি বিলম্বিত এবং শ্রীবৎস নামে এক অদ্ভুত চিহ্ন অঙ্কিত। এঁর মণিবন্ধে স্যমন্তক মণি বর্তমান। বিষ্ণু ঋক্‌বেদের অনেক সুক্তে স্তুত হয়েছেন। কোন কোন স্থানে ইনি আদিত্যের সঙ্গে অভিরূপে বর্ণিত হয়েছেন, কোথাও বা তিনি সূর্যরশ্মির সঙ্গে ব্যাপ্ত বলে বর্ণিত হয়েছেন। ইনি সপ্তকিরণের সঙ্গে ভূ-পরিক্রম করেন। ইনি রক্ষক, ধর্ম ধারণ করেন। ইনি ইন্দ্রের সখা। ইনি ত্রিপদে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

আর্যদের তিন প্রধান দেবতার মধ্যে বিষ্ণু অন্যতম। তিনি সদ্‌গুণের আধার। সৃষ্টি জগতের পালনভার তাঁর উপর অর্পিত। তিনি পরমাত্মা, পুরুষ, অব্যয়, ঈশ্বর, অনাময়, বিশ্বব্যাপী ও প্রভু। প্রলয় মসুদ্রে ভাসমান অবস্থায় নারায়ণরূপে মনুষ্যদেহধারী হয়ে তিনি শেষনাগের উপর শায়িত আছেন। তাঁর নাভি-উদ্ভূত পদ্ম হতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। জগৎ সৃষ্টিকালে মধু ও কৈটভ নামক দুই দানবকে হত্যা করে তাদের মেদ হতে তিনি মেদিনী সৃষ্টি করেন।

মহাভারত ও পুরাণে বিষ্ণু প্রজাপতি ও শ্রেষ্ঠ দেবতা। প্রজাপতি হিসেবে তাঁর তিনটি অবস্থার উল্লেখ আছে। প্রথমে সক্রিয় সৃষ্টিকর্তারূপে ব্রহ্মা, যিনি নিদ্রিত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হতে উত্থিত হয়েছেন; দ্বিতীয় বিষ্ণু স্বয়ং রক্ষক হিসেবে অবতার, যথা- শ্রীকৃষ্ণ; তৃতীয় শিব বা রুদ্র, বিষ্ণুর কপাল-উদ্ভূত ধ্বংসের দেবতা।

ব্রহ্মা শঙ্খ, পদ্ম ও মুদগরধারী। তার দুই স্ত্রী-লক্ষ্মী ও সরস্বতী। লক্ষ্মী হলেন ঐশ্বর্যদেবী আর সবস্বতী হলেন বিদ্যাদেবী।

মহাদেব ঃ

মহাদেব হলেন ধ্বংসের দেবতা। সংহারকর্তা বলে তিনি অধিক পরিচিত। তাকে শিবও বলা হয়। 'রুদ্র' নামেও নানা স্থানে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে রুদ্রের বর্ণনায় দেখা যায়- তিনি ভয়াবহ হিংস্র পশুর ন্যায় ধ্বংসকারী। তিনি বৃষভ ও আকাশের লোহিত বরাহ, তিনি বিদ্বান্, জ্ঞানী এবং মর্ত্যের দেবগণের কর্মের স্রষ্টা ও সাক্ষী। তিনি সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধব এবং প্রমথগণ পরিবেষ্টিত হয়ে হিমালয়ে তপস্যা করেন। কৈলাস তার আবাসভূমি। স্বয়ং যোগী, কিন্তু কুবের তার ধনরক্ষক। মহাযোগীর বেশে তিনি দিগম্বর ধুর্জটি। তাঁর দেহ ভস্মাবৃত ও জটাজুটধার। সংহার শক্তি প্রবল হলে তিনি শ্মশানে

সর্পজড়িত মস্তকে, গলদেশে কঙ্কাল মাল্য ভূষিত হয়ে অনুচরের সঙ্গে ভ্রমণ করেন। উত্তেজক দ্রব্য পানের পর তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নৃত্য রত হন। এই নৃত্যের নাম 'তাণ্ডব'। অন্য মতে, বিশ্বধ্বংসের সময় তার নৃত্যকে তাণ্ডব নৃত্য বলা হয়। গজাসূর ও কালাসুর নিধন করেও মহাদেব তাণ্ডব নৃত্যে রত হয়েছিলেন। তিনি নৃত্যকলারও উদ্ভাবক বলে তাঁর নাম 'নটরাজ'।

ধ্যানমগ্ন মহাদেবের বর্ণনা এইরূপ- তিনি তিন নয়ন[১] বিশিষ্ট, তাঁর উপর অর্ধচন্দ্র, মাথায় জটা, পরিধানে রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণসার মৃগচর্ম, গলদেশে সর্পের উপবীত, হস্তে নানাবিধ অস্ত্র। বাহন নন্দী সর্বদা তাঁর সহচর। তাঁর হস্তে সর্বদা ডমরু ও দুর্জনের শাস্তির জন্য মুদগর। পার্বতীর সাথে বিবাহের জন্য মদন যখন তাঁকে প্রলুব্ধ করে তপস্যা ভঙ্গের চেষ্টা করেছিলেন, তখন মহাদেবের তৃতীয় নেত্রাগ্নিতে তিনি ভস্ম হন। প্রলয়কালে তাঁর এই তৃতীয় নেত্রাগ্নিতে পৃথিবী ধ্বংস হয় বলে কথিত আছে। কথিত আছে, ইনি মহির্ষ অত্রির কাছে যোগ শিক্ষা করেন। বিষ্ণুর সহায়তায় ইনি জলন্ধরকে বধ করেন। ইনি পরম ভক্ত অসুর বাণকে রক্ষা করতে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হওয়ায় বাণকে রক্ষা করতে অসমর্থ হন। সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্র হতে ভয়ঙ্কর বিষ উত্থিত হওয়ায় ভীত দেব ও অসুরগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়। ব্রহ্মা অনন্যোপায় হয়ে মহাদেবের স্তব করেন। স্তবে তুষ্ট হলে জগতের হিতার্থে ব্রহ্মা মহাদেবকে এই বিষ পান করতে বলেন। মহাদেব সম্মত হয়ে বিষ পান করে তাঁর কণ্ঠে তা ধারণ করেন। বিষের তেজে কণ্ঠ নীল বর্ণ হয়ে যায়; কিন্তু পৃথিবী ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। এই জন্যই তাঁর আর এক নাম নীলকণ্ঠ। অতি সহজ তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ইপ্সিত বর প্রদান করেন বলে তার অন্য নাম আশুতোষ। এ ছাড়াও মহাদেব ধূম্ররূপী বলে দুর্জটি, পশুদের অধিপতি ও পালনকর্তা বলে ইনি পশুপতি।

ত্রিপুর ধ্বংসের সময় শিব দেবতাদের অর্ধতেজ গ্রহণ করেন। এর ফলে তার বল অন্য সকল দেবতাদের অপেক্ষা অধিক হয় এবং তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হন। মহাদেবের প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল, তাই তিনি ত্রিশূলধারী। তাঁর ধনুকের নাম পিনাক। তাঁর বিশ্বধ্বংসী অস্ত্র পাশুপত, যা তিনি অর্জুনকে দান করেছিলেন। প্রলয়কালে তিনি বিষাণ ও ডমরু বাজিয়ে ধ্বংসকার্যে নিযুক্ত হন। ইনি ত্রিপুরাসুর বিনাশকারী বলে 'ত্রিপুরারি'। দুর্গা ও রক্ত পিপাসিনী

মহাদেব বা শিবের মোট তিন স্ত্রী - সতী, পার্বতী ও গঙ্গা। পার্বতী জগন্মাতা বলে পরিচিত। পার্বতীর বিভিন্ন রূপ: সুষমাময়ী নারীরূপে উমা, ভয়ঙ্কারী মূর্তিতে দশভূজা, মুণ্ডমালিনী মুর্তিতে কালী। শিবের পুত্র কার্তিকেয়। তিনি রণদেবতা। তার আর এক পুত্র

১. মহাদেব প্রথমে দুই নয়ন বিশিষ্ট ছিলেন। তার তৃতীয় নেত্র উদ্ভবের একটি কারণ এরূপ উল্লেখিত আছে যে, পার্বতী একবার পরিহাসচ্ছলে মহাদেবের দুই নেত্র হস্ত দ্বারা আবৃত করেন। এতে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আবৃত হয় এবং আলোকবিহীন পথিবীর সমস্ত মানব বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়। তখন পৃথিবীর লোকদের রক্ষা করার জন্য তিনি ললাটে তৃতীয় নেত্র উদ্ভব করেন। এই নেত্রের তীব্র জ্যোতিতে হিমালয় দগ্ধ হয়ে যায়; পরে পার্বতীর প্রীতির জন্য তিনি হিমালয়কে আবার পূর্বের ন্যায় রমণীয় করেন ॥

গণেশ। গণেশের খর্বাকৃতি দেহ, তিনটা চোখ, চারখানা হাত এবং হাতির মত শুড় বিশিষ্ট মাথা।[১] লক্ষী ও সরস্বতী তার কন্যা।

সতী হলেন প্রজাপতি দক্ষের কন্যা। ভৃগু-যজ্ঞে মহাদেব শ্বশুর দক্ষকে প্রণাম করেননি বলে ক্রুদ্ধ দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করেন। সতী অনিমন্ত্রিতা হয়েও এই যজ্ঞে উপস্থিত হন। সেখানে সতীকে দেখে দক্ষ শিবনিন্দা করায় সতী যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। এই সংবাদ পেয়ে মহাদেব সেখানে এসে ক্রোধে জটা ছিন্ন করলে শিবজট হতে বীরভদ্রের উদ্ভব হয়। আর তাঁর নিশ্বাস-বায়ূ হতে কোটি কোটি বৃতপরিবৃতা মহাকালীর আবির্ভাব হলো। বীরভদ্র দক্ষালয়ে গিয়ে দক্ষযজ্ঞ নাশ করে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। দক্ষের স্ত্রী প্রসূতির স্তবে তুষ্ট হয়ে মহাদেব দক্ষকে পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু শিবনিন্দার পাপে তার মুণ্ডে ছাগমুণ্ড যোগ করে দেন। সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে শিব যখন নৃত্য করছিলেন, তখন সুদর্শনচক্র দ্বারা বিষ্ণু ঐ দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলেন। ৫২ খণ্ডে বিভক্ত সতীদেহ যে যে স্থানে পতিত হয়েছিল, সেই সেই স্থানে ৫২টি পীঠস্থান বা পরম তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এরপর সতী হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। এদিকে তারকাসূরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতারা জানতে পারেন যে, মহাদেবের ঔরসে যে পুত্র জন্মাবে সেই পুত্রই তারকাকে বধ করবে। সেই জন্য পার্বতী ও মহাদেবের মিলন করতে এসে মদন মহাদেবের কৌপে ভস্মীভূত হন। তারপর পার্বতী ও মহাদেবের মিলন হলে মদন পুনর্জীবন লাভ করেন। পার্বতীর পুত্র কার্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করে তারকাসুরকে বধ করেন।

হিন্দুধর্মের বিশেষ কয়েকটি আকীদা-বিশ্বাস

১. বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস হিন্দুধর্মের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিস হতে শুরু করে গুরু ও সর্পকে পর্যন্ত দেবতা গণ্য করা হয়। তাদের দেবতাদের সংখ্যা হল ৩৩ কেটি।

১. গণেশের হস্তিমুখ হওয়ার কাহিনী নিম্নরূপ ঃ গণেশ হলেন শিব (মহাদেব) ও পার্বতীর পুত্র। মহাদেবের স্ত্রী পার্বতীর বিবাহের বহু বছর পরও কোন সন্তান হচ্ছিল না। এজন্য পার্বতী বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে পুণ্যক ব্রত অনুষ্ঠান করেন। বিষ্ণু প্রীত হয়ে পার্বতীকে পুত্রলাভের বর দেন। যথা সময়ে পার্বতীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নাম তার গণেশ। দেবতারা স্বর্গ, মর্ত, পাতাল ইত্যাদি সকল স্থান হতে নবজাত শিশুকে দেখার জন্য উপস্থিত হন। অন্যান্য দেবতার সঙ্গে শনি দেবতাও উপস্থিত হন। শনি দেবতা হলেন এমন যে, তিনি যার দিকে দৃষ্টি দেন তারই বিনাশ হয়। এখানেও তাই হল। তিনি যখন এই সদ্যজাত পুত্র গণেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তৎক্ষনাত নবজাতকের মুণ্ড দেহচ্যুত হয়ে গেল। এই সংবাদ বিষ্ণুর কাছে যাওয়া মাত্র তিনি এর ব্যবস্থা করতে এগিয়ে এলেন। তিনি পথিমধ্যে একটি নিদ্রিত হস্তি দেখে তার মস্তক কেটে নিয়ে আসলেন এবং গণেশের গলার সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। আর গণেশ যাতে এ জন্য সকলের কাছে অনাদৃত না হন, সেজন্য দেবতারা নিয়ম করে দিলেন যে, প্রথমে গণেশের পূজা না হলে তার কেউই কোন পূজা গ্রহণ করবেন না। তাই প্রত্যেক দেবকার্যে ও পিতৃকার্যেও প্রথমে গণেশ পূজিত হন ॥

২. হিন্দু ধর্মের ধারণা মতে ঈশ্বর মানবের মধ্যে অবতারিত হয়ে থাকেন। মৎস, কূর্ম, বরাহ, ইত্যাদিকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়। তাদের মধ্যে বিষ্ণুর আবির্ভাব কল্পনা করা হয়; বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার রাম ও কৃষ্ণ। রামের স্ত্রী সীতা লক্ষীর অবতার।

৩. হিন্দুগণ পুনঃজন্মবাদে বিশ্বাস করেন।

৪. ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য।

৫. যোগ সাধনা হিন্দুধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য। যোগ অভ্যাসকারী যোগিগণ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও নানা প্রকার দৈহিক কসরত অভ্যাস করেন।

৬. বর্ণভেদ হিন্দুধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য। হিন্দুদের ধর্মমতে হিন্দুগণ চার শ্রেণীর। যথা ঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। এর মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কারও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করার অধিকার নেই।

৭. হিন্দু ধর্মে গরু ও সর্পকে দেবতা গণ্য করা হয়। এ জন্য তারা আইন করে গো-রক্ষা পারকল্পনা কর্যকর করার উদ্যোগ নেন। এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে গো-মাংসভোজী অহিন্দুদের সাথে রক্তক্ষয়ী বিরোধের প্রচুর নজির রয়েছে।

৮. পাপমোচনের জন্য তীর্থযাত্রা ও গঙ্গাস্নানাদি হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৯. অসংখ্য দেবদেবীর পূজা হিন্দুধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি পূজা হতে শুরু করে জীব জন্তু এমনকি পাথরের[১] পর্যন্ত তারা পুজা করে থাকেন। এমনকি লিঙ্গের পর্যন্ত পূজা করা হয়।[২] নিম্নে তাদের পূজার কিছু ফিরিস্তী দেয়া গেল।

---

১. হিন্দুগণ সন্ধ্যা তর্পনাদি ছাড়া প্রত্যহ 'শালগ্রাম' শিলারূপী গোল পাথরের পূজা করে থাকেন। এই পূঁজা প্রবর্তনের ইতিহাস নিম্নরূপ ঃ ভগবান বিষ্ণু একবার শঙ্খচুড়ের স্ত্রী তুলশীর সাথে ব্যভিচার করেন। ফলে তুলশীর অভিশাপে ভগবান বিষ্ণু গোলাকার পাথরে পরিণত হয়ে যান। শালগ্রাম নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটেছিল বলে ঐ পাথরের নাম হয়েছে 'শালগ্রাম শীলা।' বিষ্ণু পাথরে পরিণত হওয়ার পরে দেবতাদের ভয়ে তুলশী দেবী গাছ হয়ে ঐ শীলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরে দেবতাগণ সবই জানতে পারেন এবং ঘোষণা করেন যে, প্রত্যহ পূঁজার সময় এই শীলার বুকে এবং পৃষ্ঠে তুলশী পাতা সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় ভগবান বিষ্ণুর পূজা সিদ্ধ হবে না। (স্কন্দ পুরাণ, নাগর খন্ডম, ৪৪৪১ পৃঃ ১-১৬ শ্লোক) ॥

২. হিন্দুগণ সন্ধ্যা তর্পনাদি ছাড়া প্রত্যহ শিব লিঙ্গের পূজা করে থাকেন। এই শিব লিঙ্গের পূজা প্রবর্তনের কাহিনী নিম্নরূপ ঃ ঋষী পত্নীদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঋষীগণ অভিশাপ দিয়েছেন বলেই মহাদেবের লিঙ্গপাত হয়েছিল (দেবী ভাগবত, নবম স্কন্দ, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)। এখান থেকেই লিঙ্গ পূজার প্রবর্তন হয়। তাছাড়া বাণলিঙ্গ (উভয় লিঙ্গের যুক্ত অবস্থা) পূজার কাহিনী নিম্নরূপ-এক সময় ভগবান মহাদেব যখন তার পত্নী পার্বতীর সাথে মিলিত হন, তখন মহাদেবের প্রমত্ত যৌন উত্তেজনার ফলে পার্বতী মরণাপন্ন হন এবং প্রাণ রক্ষার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে থাকেন। এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সুদর্শন চক্রের দ্বারা উভয় লিঙ্গকে কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতঃ পার্বতীর প্রাণ রক্ষা করেন এবং দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা লিঙ্গের সেই অবস্থা ও স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য প্রবর্তন হয় এই বাণলিঙ্গ পূজার ॥

এই শিব লিঙ্গের পূজার সময় নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে হয় ঃ

ঐং প্রমত্তং শক্তি সংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং
কামবাণান্বিত দেবং সংসার দহণক্ষমং
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম॥

অর্থাৎ, লিঙ্গটি প্রমত্ত, শক্তি সংযুক্ত এবং বাণ নামে আখ্যাত (বাণলিঙ্গ) ও মহাপ্রভা সমন্বিত। এ দেব কামপরায়ণ, সংসার দহনে সক্ষম, শৃঙ্গারাদি রসে উল্লসিত এবং বাণ নামে আখ্যাত পরমেশ্বর।

হিন্দুদের পূজার ফিরিস্তী ঃ

হিন্দুগণ তাদের প্রসিদ্ধ দুর্গা ও কালি পূজা ছাড়াও ধান্যাদির জন্যে লক্ষী পূজা, বিদ্যার জন্যে সরস্বতী পূজা, পুত্রলাভের জন্যে ষষ্ঠী পূজা, বৃষ্টির জন্যে ইন্দ্র বা বরুণের পূজা, স্বাস্থ্যের জন্যে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পূজা, শত্রুনাশের জন্যে কার্তিক-এর পূজা, সিদ্ধিলাভের জণ্যে গনেশ প্রভৃতির পূজা করে থাকেন। এছাড়া সাপের ভয়ে মনসাপূজা, বজ্র-বিদ্যুতের ভয়ে ইন্দ্রের পূজা, যক্ষার ভয়ে রক্ষাকালীর পূজা, নৌকাডুবির ভয়ে গঙ্গাপূজা, জ্বরের ভয়ে জ্বরাসুরের পূজা, কলেরা ও বসন্তের ভয়ে শীতলাপূজা, পাঁচড়া, চুলকানীর ভয়ে ইটে কুমারের পূজা, অমঙ্গলের ভয়ে শনিপূজা প্রভৃতি অসংখ্য ভয়ের দেবতা সৃষ্টি করে তাদের পূজা করে থাকেন।

হিন্দুধর্মের বর্ণনা মতে তাদের দেবদেবীদের বিভিন্ন বাহন রয়েছে। যেমনঃ লক্ষীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর রাজহাঁস, গণেশের ইদুঁর, দুর্গার সিংহ, মনসার সর্প, কার্ত্তিকের ময়ূর, শ্রীকৃষ্ণের গরুড় পাখী, মহাদেবের ষাঁড় বা বৃষ, যমরাজের কুকুর, ইন্দ্রের ঐরাবত, গঙ্গার মকর, ব্রহ্মার পাঁতিহাঁস, বিশ্বকর্মার ঢেকী, শীতলার গাধা ইত্যাদি। আর যেহেতু যান-বাহন ছাড়া দেব-দেবীদের আগমন-নির্গমন সম্ভব নয়, অতএব তাঁদের পূজায় বসে যান-বাহনরূপী পেঁচা, ইদুঁর, কুকুর, সাপ, গাধা, বলদ, রাজ হাঁস, পাতিহাঁস, প্রভৃতির পূজাও করতে হয়। ভক্ত গৃহে দেবদেবীদের আগমনকে সুনিশ্চিত এবং ত্বরান্বিত করার স্বার্থে এসব ইতর জীব-জন্তুর পূজা না করে তাদের কোন উপায়ও নেই।

আর পূজার সময় তাদের বিভিন্ন দেবদেবী যেসব খাদ্য-খাবার ভালবাসেন সেগুলিও সামনে উপস্থিত রাখতে হয়। উল্লেখ্য তাদের বর্ণনা মতে তাদের বিভিন্ন দেবদেবী বিভিন্ন রকম খাদ্য-খাবার ভালবাসেন। যেমন ঃ মহাদেব গাজা-ভাং ভালবাসেন, ভাং এর শরবৎ ভালবাসেন, ত্রিনাথ, শ্রীকৃষ্ণ ননী মাখনের লোভী, সত্য নারায়ণের লোভ ময়দা গোলা সিন্নীর প্রতি, শনিঠাকুর কলা খেতে ভালবাসেন, ভদ্রকালী ভালবাসেন পায়েস-পরমান্ন, নারায়ণ নাড়ু খাওয়ার অভিলাষী, মা মনসা দুধের পিয়াসী ইত্যাদি।

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ-বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ

হিন্দুদের কোন নির্দিষ্ট ঐশিগ্রন্থ নেই; তবে বেদ, পুরাণ ও গীতা-য় বিস্তৃত ধর্মীয় আলোচনা আছে বলে এগুলোকেই তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ বলা হয়। এছাড়া উপনিষদকেও তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। তবে উপনিষদ কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়; এটি

বেদের শিরোভাগ। বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার হলেন রাম। রামের স্ত্রী সীতা হলেন লক্ষীর অবতার। এই রাম-সীতার কাহিনী সংবলিত রামায়ণও হিন্দুদের নিকট ধর্মগ্রন্থ স্বরূপ মূল্যায়িত হয়ে থাকে। তবে সাধারণভাবে বলা হয় তাদের ধর্মগ্রন্থ তিনখানা- বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ। নিম্নে বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হল।

বেদ

বেদব্যাস সংকলিত বেদ ৪ খানি। অর্থাৎ, বেদ চার ভাগে বিভক্ত। একে চতুর্বেদ বলা হয়। যথা ঃ ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যজুঃর্বেদ ও অথর্ববেদ।

ক. ঋক্‌বেদ ঃ

ঋক্‌বেদ চারটি বেদের মধ্যে প্রাচীনতম বেদ; এটাকে জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। সূর্য, অগ্নি, ঊষা, বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের উদ্দেশ্যে রচিত প্রার্থনা-বাণীসমূহের যেগুলো গদ্য-ছন্দে রচিত, প্রধানত: সেগুলো এই বেদে স্থান পেয়েছে। গদ্য-ছন্দে রচিত বাক্যকে 'ঋক্' বলা হয় বলে এই বেদের নাম দেয়া হয়েছে 'ঋগ্বেদ'। প্রাচীন যুগে গুরুশিষ্য পরম্পরায় শ্রুত হয়ে এটা প্রচারিত হত বলে একে 'শ্রুতি'ও বলা হয়।

ঋক্‌বেদে ১০,৫৮০ ঋক্ আছে; কিন্তু বর্তমানে ১৬৩ ঋক্ লোপ পেয়েছে। ঋক্‌বেদের মন্ত্রগুলি অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ, উষা, অশ্বিনীদ্বয়, পৃথিবী, মরুৎ, মরু, রুদ্র, যম ও সোম প্রভৃতিদের স্তব-স্তুতিতে পরিপূর্ণ। এই সকল স্তব-স্তুতি ও মন্ত্রদ্বারা আর্যরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করে অভীষ্ট প্রার্থনা করতেন।

খ. সামবেদ ঃ

'সাম' অর্থ গান। যে মন্ত্রবাক্য গান করা যায় তাকে "সাম" বলা হয়। ঋক্ মন্ত্র সুর দিয়ে গাওয়া হলে তা সামে পরিণত হয়। সাধারণতঃ যেসব ঋক বা মন্ত্র সুর সহযোগে পাঠ করা হয় সেগুলো এই বেদে সন্নিবেশিত হয়েছে বলে এর নাম হয়েছে 'সামবেদ'। যজ্ঞসম্পাদনে কোন কোন ঋক্ কেবল উচ্চারিত না হয়ে গীতও হোত। এই গেয় ঋক্‌গুলিই সামবেদ।

গ. যজূর্বেদ ঃ

শত শাখাযুক্ত বেদ। এতে যজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্রসমূহ ও নিয়ম পালনের বিষয় আছে। "যজুন" অর্থ পূজার্চনা, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি। অতএব যজন-যাজনাদি সম্পর্কীয় মন্ত্রগুলোকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে বলে এ বেদের নাম দেয়া হয়েছে 'যজুর্বেদ'।

ঘ. অথর্ববেদঃ

"থর্ব" অর্থ সচল; আর "অথর্ব" অর্থ অচল। পৃথিবীর সর্বত্র অচল-অবিচল এবং হ্রাসবৃদ্ধিহীন অবস্থায় বিরাজমান পরমাত্মার অস্তিত্ব ও পরিচয়সূচক মন্ত্রসমূহ এই বেদে রয়েছে বলে এর নাম 'অথর্ববেদ' রাখা হয়েছে। এই বেদ ব্রহ্মার উত্তর দিকের, মতান্তরে পূর্ব দিকের মুখ হতে প্রকাশ হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে। অনেকে এই বেদকে বেদ বলে গণ্য করেন না। মনুসংহিতায় ও অমরকোষে ঋক্, সাম ও যজু, এই তিন বেদের উল্লেখ আছে। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে অথর্ববেদ চতুর্থ বেদ বলে উল্লেখিত আছে।

উপবেদ ঃ

বেদের চেয়ে এর স্থান নিম্নে। শ্রুতির সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। এই বেদ সাধারণতঃ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। সকল বেদেরই উপবেদ আছে। ঋক্ বেদের উপবেদ আয়ূর্বেদ, যজুর্বেদের ধনুর্বেদ, সামবেদের গন্ধর্ববেদ এবং অথর্ববেদের স্থাপত্যবেদ।

উপনিষদ

উপনিষদ বেদের শিরোভাগ। এ জন্য এর নাম বেদান্ত। উপনিষদ বিভিন্ন ঋষি কর্তৃক কথিত হয়েছে। এদের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে ১২ খানি প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলে গণ্য। এদের মধ্যেও পরস্পর মতভেদ আছে। প্রধান ১২ খানি উপনিষদের নাম - ১. ঐতরেয়, ২. কৌশীতকী; সামবেদীয়, ৩. ছান্দোগ্য, ৪. কেন; কৃষ্ণ যজুর্বেদীয়, ৫. তৈত্তিরীয়, ৬. কঠ, ৭. শ্বেতাশ্বতর; শুক্ল যজুর্বেদীয়, ৮. বৃহদারণ্যক, ৯. ঈশ, ১০. প্রশ্ন, ১১. মুণ্ডক ও ১২. মাণ্ডুক্য। অবশিষ্ট সবই অথর্ববেদীয়।

উপনিষদ আধুনিক হিন্দুদর্শনের মুলসুত্র। এতে পরমাত্মা বা পরম পুরুষের কথা বলা হয়েছে। পরমাত্মা সম্বন্ধে উপনিষদের বর্ননা হল ইহলোকের বন্ধন মায়া, মায়ামুক্তি বা মোহমুক্তির পর মানবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হবে।

পুরাণ

"পুরাণ" হল অতি প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, সমাজ ও ধর্ম ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা। সাধাণতঃ পুরাণ অর্থে বুঝায় ব্যাসাদি মুনি প্রণীত শাস্ত্র।

পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত- মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮। যথা-

১। ব্রহ্মপুরাণ ঃ সর্বপ্রথম এই পুরাণ রচিত হয়েছিল বলে একে 'আদি পুরাণ' বলা হয়। এই পুরাণের প্রথমাংশে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, দেবতা ও অসুরগণের জন্ম এবং সূর্য ও চন্দ্রবংশের বিবরণ আছে। এর পরেই বিশ্বের বর্ণনা এবং দ্বীপ, বর্ষ, স্বর্গ, নরক ও পাতালাদির বিবরণ আছে। পরে শ্রীকৃষ্ণের জীবন চরিত আছে। শেষ ভাগে যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আছে।

২। পদ্মপুরাণ ঃ যখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বর্ণপদ্মরূপে বিরাজিত ছিল, তৎকালজাত ঘটনাবলীর বিবরণ এই পুরাণে লিখিত আছে বলে এর নাম পদ্মপুরাণ। এই পুরাণের শ্লোক সংখ্যা ৫৫,৪৪৪। এই পুরাণ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত, যথা ঃ সৃষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, পাতালখণ্ড ও উত্তরখণ্ড।

৩। বিষ্ণুপুরাণ ঃ পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ পূর্ণভাবে এই পুরাণে দেখা যায়। এই পুরাণ ছয় ভাগে বিভক্ত- (১) বিষ্ণু ও লক্ষীর উৎপত্তি, ধ্রুবচরিত, প্রহলাদচরিত ইত্যাদি আখ্যান; (২) পৃথিবী, সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র; (৩) ব্যাস কর্তৃক বেদ বিভাগ, শাখা বিভাগ, আশ্রমধর্ম ইত্যাদি; (৪) সূর্য ও চন্দ্রবংশ এবং অন্যান্য রাজবংশের বর্ণনা; (৫) কৃষ্ণচরিত, বৃন্দাবনলীলা ইত্যাদি; (৬) বিষ্ণুভক্তি, যোগ ও মুক্তির কথা।

৪। বায়ুপুরাণ ঃ এই পুরাণ চার অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের সৃষ্টি; দ্বিতীয় অংশে কল্লাদি, ঋষি-বংশাবলি, ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা, মন্বন্তর ও শৈব আখ্যানাদি; তৃতীয় অংশে জীবজন্তু এবং চন্দ্র ও সূর্যবংশের বিবরণ; চতুর্থ ভাগে যোগশাস্ত্র, যোগী ও শিবের মাহাত্ম্য।

৫। ভাগবতপুরাণ ঃ এই পুরাণকে শ্রীমদ্ভাগবত বলা হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব, মায়াবাদ ইত্যাদির বর্ণনা, ব্রহ্মার সৃষ্টি, বিষ্ণুর বরাহাবতার, কপিলাবতার বেণ-রাজচরিত, ধ্রুবচরিত পৃথু ও ভারত উপাখ্যান, প্রহলাদচরিত, চন্দ্র ও সূর্য বংশের বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণচরিত, মথুরা ও বৃন্দাবনলীলা, যদুবংশ ধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু এবং শেষে ভবিষ্যত রাজাদের বিবরণ আছে।

৬। নারদীয় পুরাণ ঃ বৃহৎকল্পে যে সকল কর্তব্য পালন করা হয়েছিল তার বর্ণনা নারদ এই পুরাণে বিবৃত করেছেন। এই পুরাণে বিষ্ণুস্তুতি, বৈষ্ণবআখ্যান, হরিভক্তি, বৈষ্ণবর্ধম ও বৈষবআচরণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে।

৭। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ঃ এর শ্লোক সংখ্যা ৯,০০০। নানা রকম উপাখ্যানে এই পুরাণ পরিপুর্ণ। এই পুরাণে মার্কণ্ডেয় মুনি ধর্মাধর্মাভিজ্ঞ পক্ষিগণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে জৈমিনীর প্রশ্নসমূহের সম্পূর্ণ উত্তর দিয়ে তাঁর সন্দেহ দূর করেছিলেন। ব্যাসশিষ্য জৈমিনী মার্কাণ্ডেয়কে বাসুদেবের প্রকৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে মহর্ষি তাঁকে বিন্ধ্যাপর্বতবাসী শকুনপক্ষীর নিকট যেতে বলেন। জৈমিনী সেখানে গিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করে যে উত্তর পান, তাই নিয়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণের আরম্ভ। এতে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কলহ, চণ্ডী, দুর্গাকথা, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবস্থা কখন ইত্যাদি এবং হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, মদালসার উপাখ্যান, রুদ্রাদি সৃষ্টি, রামচন্দ্রের উপাখ্যান, কুশের বংশ নিরূপণ, পুরূরবার উপাখ্যান, যোগধর্ম প্রভৃতি আছে।

৮। অগ্নিপুরাণ ঃ এই পুরাণে অগ্নি কর্তৃক বশিষ্ট মুনিকে ইশানকল্প বৃত্তান্ত উপদেশচ্ছলে কথিত হয়েছিল। ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। প্রধানতঃ শিব-মাহাত্ম্য প্রচার করা এর উদ্দেশ্য হলেও এতে বিবিধ বিষয়ের প্রশ্ন পূর্বক অবতারের কথা ব্যাখ্যাত হয়েছে। বিষ্ণুপূজাদি নিয়ম, শালগ্রামলক্ষণ ও পূজা, তীর্থ মাহাত্ম্য, শ্রাদ্ধবিধি, প্রায়শ্চিত্তবিধি, গায়ত্রীর অর্থ, ধনুর্বিদ্যা ও ব্যবহারবিধি, শব্দানুশাসন, নরকবর্ণন, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ও এই পুরাণের অংশীভূত।

৯। ভবিষ্যপুরাণ ঃ এই পুরাণে সৃষ্টি প্রক্রিয়া, চুতবর্ণের সংস্কার, আশ্রমধর্ম ইত্যাদি কথিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ ও তার পুত্র শাম্ব, বশিষ্ঠ, নারদ ও ব্যাসের কথোপকথন এবং সূর্যের মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে।

১০। ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণ ঃ এই পুরাণ সাবর্ণি কর্তৃক নারদকে বর্ণিত হয়েছিল। এতে কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য কথা আছে। এই পুরাণ চার খণ্ডে বিভক্ত- ব্রহ্মা, প্রকৃতি, গণেশ ও কৃষ্ণখণ্ড। অন্যান্য দেবতার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও স্তুতিই বেশী আছে। প্রসঙ্গক্রমে সাবিত্রী সত্যবান, সুরভী, স্বাহা, স্বধা, সুরথ, পরশুরাম ইত্যাদির উপাখ্যান আছে।

১১। লিঙ্গপুরাণ ঃ এই পুরাণে মহেশ্বর অগ্নিলিঙ্গ মধ্য থেকে অগ্নি কল্পান্তকালে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ক কথা ব্যক্ত করেছেন। এই পুরাণে ১১, ০০০ শ্লোক আছে এটা

দুই ভাগে বিভক্ত। লিঙ্গোৎপত্তি, লিঙ্গ-পূজা, দধীচির উপাখ্যান, যুগধর্মনির্ণয়, লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, শিবব্রত, প্রায়শ্চিত্ত, কাশীবর্ণন, বরাহচরিত, নৃসিংহচরিত, শিবের সহস্র নাম, দক্ষযজ্ঞ-বিনাশ, মদনভস্ম পার্বতীর সহিত শিবের বিবাহ, বিনায়ক উপাখ্যান, শিবের নৃত্য, উপমন্যুউপাখ্যান, অম্বরীষ উপাখ্যান, শিব-মাহাত্ম্য, সূর্য-পূজাবিধি, শিব-পূজাবিধি, দান প্রকরণ, শ্রাদ্ধপ্রকরণ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত বিষয়।

১২। বরাহপুরাণ ঃ এই পুরাণ মানকল্প প্রসঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। তাই এর নাম বরাহপুরাণ। এতে ২৪,০০০ শ্লোক আছে। এই পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত এবং এটা বিষ্ণু-মাহাত্ম ব্যাখ্যানসূচক। পূর্বভাগে রভ্যচরিত, শ্রাদ্ধবিধি, গৌরীর উৎপত্তি, ব্রতনির্ণয়, মহিষাসুরবধার্থ ত্রিশক্তি হতে দেবীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য, বিধির প্রকার, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত, কর্ম-বিপাক, এবং উত্তরভাগে পুলস্তা-কুরুরাজ সংবাদ, সর্বতীথ মাহাত্ম্য, বহুবিধ ধর্মক্ষণ প্রভৃতি কীর্তিত হয়েছে।

১৩। স্কন্দপুরাণ ঃ এই পুরাণে ষড়ানন (স্কন্দ) তৎপুরুষকল্পের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। পার্বতী ষড়ানন কার্তিকেয়র নিকট, কার্তিকেয় নন্দীয় নিকট এবং নন্দী অত্রিকুমারকে এটা কীর্তন করেন। স্কন্দ তৎপুরুষকল্প প্রসঙ্গে নানা চরিত ও উপাখ্যান এবং মহেশ্বর নির্দিষ্ট ধর্ম প্রকাশ করেন। এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ৮১,৮০০। এটা মনেশ্বরণণ্ড, বৈষ্ণবখণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড, কাশীখণ্ড, নাগরখণ্ড এবং প্রভাসখণ্ড নামক ৭ খণ্ডে বিভক্ত। এই খণ্ডগুলির মধ্যে কাশীখণ্ডই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। এতে কাশী-মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১৪। বামনপুরাণ ঃ এই পুরাণে ১৪,৪৪৪ শ্লোক আছে। এতে বিষ্ণুর বামনমূর্তিতে বলিকে ছলনা, দান মাহাত্ম্য, দেব-দানবযুদ্ধ, মহিষাসুর-বধ, দক্ষযজ্ঞ, মদনভস্ম, শিব ও উমার বিবাহ, কুমারের জন্ম এবং বহু তীর্থের বর্ণনা আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণনাই এই পুরানের উদ্দেশ্য।

১৫। কর্মপুরাণ ঃ এই পুরাণে বিষ্ণু কমরূপে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষসমূহের মাহাত্ম্য পৃথক পৃথক ভাগে কীর্তন করেন। এই পুরাণের মধ্যে ভৃগুবংশচরিত, কালপরিমাণ, পার্বতীর সহস্রনাম, ব্যাসগীতা, ইশ্বরগীতা, তীর্থ-মাহাত্ম্য, বর্ণাচার প্রভৃতি ও জাতিসংকরের বিষয়ে বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়।

১৬। মৎস্যপুরাণ ঃ এই পুরাণের প্রধান বিষয় বিষ্ণু মৎস্যাবতারে মনুকে বর্ণনা করেছেন। ইহাতে মনুর সঙ্গে মীনরূপী বিষ্ণুর কথোপকথন, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, রাজবংশ বর্ণনা, নর্ধদা-মাহাত্ম্য, ধর্ম, নীতি, মন্দির ও প্রতিমা নির্মানাদির কথা আছে।

১৭। গরুড়পুরাণ ঃ এই পুরাণে বিষ্ণু কর্তৃক গরুড়কল্পে গরুড়ের বিনতাগর্ভে উৎপত্তি সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা আছে। গরুড়পুরাণও দুই খণ্ডে বিভক্ত-পূর্বখণ্ড ও রখণ্ড। পূর্বখণ্ডের মধ্যে বিষ্ণুর সহস্র নাম, বিবিধ পূজাবিধি, দীক্ষাবিধি, আয়ুর্বেদ, প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি এবং উত্তরখণ্ডে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, যমপুরীর বিষয় শ্রদ্ধাবিধি, প্রেতত্বের কারণ, মৃত্যুর পূর্বাপর বিষয় প্রভৃতি সম্বন্ধে কথিত আছে।

১৮। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ঃ এই পুরাণ চার পদে বিভক্ত- প্রক্রিয়াপাদ, অনুষঙ্গপাদ, উপাদ্‌ঘাত ও উপসংহারপাদ। ইহাতে সৃষ্টি, কল্প, যুগভেদ, মন্বন্তর, রাজবংশ, বর্ষ, ভারতবর্ষ ও দ্বীপাদি বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত পুরাণগুলি ব্যতীত অন্যান্য উপপুরাণের সংখ্যা ১৮। সেগুলির নাম- সনৎকুমার, নর-সিংহ, নারদীয়, শিব, দুর্বাসা, কপিল, মানব, ঔবনস, বরুণ, কালিকা, শাম্ব, নন্দী, সৌর, পরাশর, আদিত্য, মহেশ্বর, ভাগবত ও বিশিষ্ঠ।[১]

উপজাতিদের ধর্মকর্ম ও রীতি-নীতি

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু উপজাতি বাস করে। তন্মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ততম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, লুসেই পাংখুয়া, বম, খ্যাং, চাক ও খুমি নামক উপজাতি বাস করে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে গারো, হাজং এবং সিলেট অঞ্চলে ঘাসি উপজাতি বাস করে। এদের ধর্ম; সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ও জীবন যাত্রা সবকিছুই বৈচিত্রময়।

নিম্নে প্রত্যেকটির পরিচয় ও জীবন প্রণালী সংক্ষেপে তুলে ধরা হলঃ

চাকমা উপজাতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান উপজাতি চাকমা। চাকমারা বাইরের লোকদের কাছে চাকমা হিসাবে পরিচিত হলেও- নিজেদেরকে তারা চাঙমা (Changma) বলে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও এরা ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরহিল ও অরুণাচলে বসবাস করে। নৃতাত্ত্বিকদের মতে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। তাদের ভাষা বাংলা এবং অহমিয়ার মত হিন্দুআর্য (Indo-Aryan) শাখাভুক্ত, তবে চাকমাদের লেখার জন্য নিজেদের বর্ণমালা রয়েছে।

---

১. হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু ধর্মমত সম্পর্কিত তথ্যসমূহের সূত্র ঃ

(১) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত 'দেবীভাগবতম', নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা

(২) অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত 'কাশিদাসী মহাভারত'

(৩) অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত 'কৃত্তিবাসী রামায়ন'

(৪) শ্রীশিব চক্রবর্ত্তী কর্তৃক রচিত এবং নিউ লাইট ও মহেশ লাইব্রেরী কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত 'দেবদেবীর পরিচয় ও বাহন রহস্য'

(৫) সুবীর সরকার রচিত 'পৌরাণিক অভিধান'

(৬) মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত 'বিশ্বকোষ'

(৭) কো. আন্তোনভা, গ্রি. বোনগার্দ-লেভিন ও কতোভ্স্কি কর্তৃক রচিত এবং প্রগতি প্রকাশনী মস্কো থেকে প্রকাশিত 'ভারত বর্ষের ইতিহাস'

(৮) আবূল হোসেন ভট্টাচার্য রচিত 'আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ ॥

ধর্ম ঃ

চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের প্রায় গ্রামে ক্যাং (বৌদ্ধ মন্দির) রয়েছে। এরা তাদের ধর্ম মতে খুব জাক-জমকপূর্ণ ভাবে "বৈশাখী পূর্ণিমা" পালন করে। চাকমাদের মাঝে বিভিন্ন পূজা ও উৎসব প্রচলিত রয়েছে। এগুলোর মাঝে ভাত-দ্যা, হাল-পালনী, থান-মানা, ধর্মকাম ও বিঝু উৎসব ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জীবন চিত্র ঃ

চাকমারা গৃহকে 'ঘর' এবং গ্রামকে 'আদাম' বলে। সচারচর ছোট ছোট নদীর তীরে ছোট ছোট পাহাড়ের উপর খোলামেলা জায়গায় চাকমাদের গ্রামগুলো হয়ে থাকে।

এদের কোন শিশু জন্ম হলে তাকে মধু পান করায়, যাতে আগামীতে তার জীবন সর্বক্ষেত্রে মধুময় হয়ে উঠে। আর কোন লোকের মৃত্যু হলে তার মরদেহ শুভ্র কাপড়ে ঢেকে রাখা হয় এবং ঢোল বাজিয়ে এলাকার লোক জমায়েত করা হয়। অতঃপর আনুষ্ঠানিকতা সেরে মৃতদেহ চিতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্র বা রক্ত সম্পর্কের নিকটস্ত কোন আত্মীয় প্রথম তার চিতায় অগ্নি সংযোগ করে। পরে অন্যান্যরা চিতায় আগুন দেয়।

চাকমারা বর্তমানে পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত স্বগোষ্ঠীয় কাউকে বিয়ে করে না। আর বিয়েতে তাদের অনেক আনুষ্ঠানিকতা পোহাতে হয়।

চাকমা-সমাজে পিতা তার মেয়েদেরকে কিছু না দিয়ে গেলে পিতার মৃত্যুর পর মেয়েরা কোন সম্পত্তিই পায় না।

চাকমা ভাষায় গোত্র শব্দের প্রতিশব্দ হল গুথি। আর কয়েকটি গুথি মিলে হয় একটি গঝা (দল)। চাকমাদের ৩২টি গঝা (দল) রয়েছে। (বান্দরবনের অধুনালুপ্ত ত্রৈমাসিক পত্রিকা ঝরণা, ৩২ সংখ্যা, ১৯৬৭) চাকমা সমাজে প্রধান হলেন (১৯০০ খৃঃ থেকে) রাজা, তারপর হেডম্যান (মৌজা প্রধান), তারপর কার্বারী (গ্রামের প্রধান)। এরা ছাড়াও বৌদ্ধ ভিক্ষু, চারণ কবি এবং ওঝারাও চাকমা সমাজে সম্মানের অধিকারী হিসাবে বিবেচিত হন।

মারমা উপজাতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি হল মারমা। বর্মি ম্রানমা অথবা 'ম্রাইমা' শব্দ থেকে মারমা শব্দটি বর্মি বংশক অর্থে উদ্ভূত হয়েছে। তাদের আদি নিবাস বার্মা এবং আরাকানে। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে বর্মি এবং আরাকানিয়াদের গভীর যোগসুত্র রয়েছে। এদের সমগোত্রীয় কিছু লোক কক্সবাজার ও পটুয়াখালিতেও রয়েছে। তারা নিজেদেরকে 'রাখাইন' হিসেবে পরিচয় দেয়।

মারমারাও মোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠীর লোক এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। মারমা সমাজে বহু রীতিনীতি পালিত হয়। নিম্নে দু' একটি তুলে ধরা হল ঃ

মারমারা তাদের সন্তানের নামকরণ অত্যন্ত আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে করে। সন্তান যদি পরিবারের প্রথম সন্তান হয়, তাহলে পুত্র হোক বা কন্যা হোক তার নামের সাথে 'উ' যুক্ত করে দেয়। আর যদি সন্তানটি পরিবারের সকলের ছোট হয়, তাহলে তার নামের সাথে 'থুই' শব্দটি যুক্ত করে দেয়।

তারা নাচ-গান এবং আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে। বিভিন্ন উৎসবে মারমা তরুণ তরুণীরা অংশ গ্রহণ করে। সেখানে দেখা সাক্ষাৎ এবং মন দেয়া নেয়ার পালা চলে। এরপর একদিন নিজের মনমত জীবন সঙ্গীকে বেছে নেয়।

মারমা সমাজের কোন লোক মারা গেলে তাকে গোসল দিয়ে কাপড় পরানোর পর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মৃতের আত্মার সদগতি কামনা করে মন্ত্র পাঠ করে। এরপর চাকমাদের মতই চিতায় নিয়ে পোড়ায়। অতঃপর ছাইগুলো মাটি চাপা দেয়।

ত্রিপুরা উপজাতি

পাবর্ত্য চট্টগ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি হল ত্রিপুরারা। তাদের আদি নিবাস হল ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে। ত্রিপুরার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়াও সিলেট, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড পাহাড় অঞ্চলে বসবাস করে। ত্রিপুরারাও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির লোক। উপজাতিদের মধ্যে এরাই একমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী। অবশ্য তাদের নিজস্ব্য দেব-দেবীও রয়েছে। ত্রিপুরারা ৩৬ দলে বিভক্ত বলে প্রবাদ রয়েছে।

জীবনাচার ঃ

তাদের মাঝে কোন শিশু জন্ম নিলে তাকে উষ্ণজলে স্নান করানোর পর মুখে মধু দেয়া হয়। এরপর তার নামকরণের অনুষ্ঠানে ৫/৭টি প্রদীপ আনা হয় এবং প্রত্যেকটি প্রদীপের বরাবর এক একটি নাম প্রস্তাব করা হয়। যে প্রদীপটি বেশীক্ষণ জ্বলে, সে প্রদীপের বরাবর নামটি রাখা হয়। বিবাহের ক্ষেত্রে বহু সময় ছেলে মেয়েরাই নিজেদের জীবন সঙ্গী বেছে নেয়। কোন লোক মারা গেলে বহুবিধ আনুষ্ঠানিকতা সেরে চিতায় নিয়ে পোড়ানো হয়। মৃতদেহ পুড়ে গেলে ওঝা মৃতের খুলি থেকে সামান্য মগজ বের করে মৃতের পিছনে রেখে জলে ভাসিয়ে দেয়। আর কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধিতে কেউ মারা গেলে তাকে প্রথমে কবরস্ত করা হয়। পরে তার হাড়-গোড় মাটি থেকে তুলে আবার চিতায় পোড়ানো হয়।

তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি

পূর্বে তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে চাকমাদের একটি শাখা হিসেবে উল্লেখ করা হলেও বর্তমানে তঞ্চঙ্গাদেরকে একটি স্বতন্ত্র উপজাতি হিসাবে ধরা হয়। তঞ্চঙ্গ্যারা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার মানিক ছড়ি, রইস্যা বিল, বেতবুনিয়া, ওযাগগা, কাপ্তাই, রাজস্থলী, রাইংখ্যা, বৈগা ইত্যাদি স্থানে এবং বান্দরবন পার্বত্য জেলার বান্দরবন সদর, বালাখাটা, সুয়ালাক, রোয়াং ছড়ি, নোয়াপতং, কুক্ষ্যাং, পাইন্দু অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের ছয়টি বিশেষ দল রয়েছে। যথাঃ মো, কর্বোয়া- ধন্যা, মংলা, মেলং, লাং। এরাও ধর্মের দিক থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

ম্রো উপজাতি

বান্দরবান জেলার যানচি, লামা, ও নাক্ষৎং ছড়ীতে ম্রোদের বেশ কয়েকটি গ্রাম রয়েছে। ম্রোরা পার্বত্য চট্রগাম ছাড়া বার্মার আকিয়াব জেলায়ও বসবাস করে। এরা নিজেদেরকে মারুসা বলে। এর অর্থ মানুষ।

ম্রোরা বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী, তবে খৃষ্টান মিশনারীদের কারণে তাদের কিছু কিছু লোক সাম্প্রতিক কালে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের মাঝে এখনো বহু প্রকার জড়-উপাসনা দেখা যায়। তাদের বিশ্বাস থুবাই নামে একজন বিশ্ব-নিয়ন্তা রয়েছেন। তিনি একবার মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে একটি গরুকে দিয়ে ম্রোদের কাছে একটি ধর্মগ্রন্থ পাঠান। গরুটি ঐ ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে ক্ষুদার্থ হয়ে সেটি খেয়ে ফেলে এবং থুবাই ম্রোদের কাছে যে সমস্ত উপদেশ বাণী পাঠিয়ে ছিলেন সে সম্পর্কে মিথ্যা বলে। যার ফলে ম্রোদের খুব ক্ষতি হয়। তাই তারা আজও পূজা অনুষ্ঠানে গরুকে হত্যা করার পর গরুর জিহ্বাটি কেটে নেয়।

ম্রোদের ধর্মমতে কোন যুবতী যদি বিয়ের পূর্বে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তবে তাকে এবং তার প্রেমিককে দুটি শুকর জরিমানা করা হয়। যে গৃহস্তের বাড়ীতে যুবতী গর্ভবতী হয়, তাকে একটি শুকর দেয়া হয় এবং অন্যটি সবাই মিলে রান্না করে খায়। ম্রোদের বিশ্বাস ঐ গৃহস্তকে একটি শূকর না দিলে দিন দিন তার সম্পত্তি রসাতলে যাবে।

বম উপজাতি

বম উপজাতিয় লোকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবান জেলার রুমা খানাতে বসবাস করে। এককালে তারা জড় উপাসক ছিল। বর্তমানে তারা খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। যার ফলে তাদের সমাজ জীবন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব বিস্তারলাভ করেছে। অতীতে বমরা আরকান অঞ্চলে বসবাস করত। আরাকানিরা তাদেরকে 'লাংগিচ' বা 'লাংখে' বলে ডাকে। অতীতে বমরা নিজেদেরকে 'লাই' বা 'লাইমি' বলে পরিচয় দিত। এই শব্দগুলোর অর্থ হল মানুষ।

অতীতে বমদের বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পর লোকেরা মৃতের দেশে চলে যায়। সেখানে তারা নতুনভাবে জীবন লাভ করে এবং ইহলোকের অর্জিত সবকিছু সেখানে ফিরে পায়। তারা মৃতের পথ-যাত্রাকে সুগম করার জন্য মৃতকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানোর সময় উর্ধ্বাকাশে তীর বা বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে সানু নামক এক শ্রেণীর অপদেবতাকে তাড়িয়ে দিত।

লুসেই ও পাংখুয়া উপজাতি

কুকি-চীন ভাষা-ভাষী দুর্ধর্ষ উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল লুসেইরা। এখানে স্বল্প সংখ্যক লুসেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর পূর্বাংশে রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক এলাকায় বাস করে। ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে লুসেইদের সাথে পাংখুদের গভীর যোগাযোগ রয়েছে। উভয় উপজাতিই অতীতে লুসাই পাহাড় বা মিজোরামের দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে এসেছে। এ দুটি উপজাতির পুরুষেরা মাথায় লম্বা চুল রাখত এবং মাথার পিছন দিকে চুলগুলো ঝুঁটির আকারে বাধতো। তারা খৃষ্টান মিশনারিদের কাছে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করায় তাদের সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব রয়েছে। লুসেই মেয়েরা 'বাঁশনৃত্যে' খুব পটু। লুসেইরা তাদের সর্দারদেরকে 'লাল' বলে।

অতীতে গ্রামের লোকেরা সকলে মিলে উপযুক্ত ব্যক্তিকে 'লাল' নির্বাচিত করত। লাল যুদ্ধের সময় এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে গ্রামবাসীদেরকে নেতৃত্ব দিতেন।

অতীতে কোন লালের মৃত্যু হলে লুসেইরা মৃতের সাথে কবরে অস্ত্র শস্ত্রও মাটি চাপা দিত।

খ্যাং উপজাতি

খ্যাংরা একটি ক্ষুদ্র উপজাতি। তারা কাপ্তাইয়ের কাছে চন্দ্রঘোনার আশে পাশে এবং রাজস্থলী থানায় বাস করে। এখানে তাদের ৭/৮টি ছোট ছোট গ্রাম আছে। লোক সংখ্যাও কম ১৯৮১ সালের আদম শুমারী রিপোর্টানুযায়ী ১৫০১ জন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মধ্যে খ্যাংরা দেখতে বেশ সুন্দর। কথিত আছে অতীতে প্রায় উপজাতীয় লোকেরা খ্যাংদের আক্রমণ করে তাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যেত। এ কারণে তারা তাদের মেয়েদেরকে অসুন্দর করার জন্য মুখে নানা জাতীয় উল্কি এঁকে দিত। বার্মায়ও খ্যাংদের বসবাস রয়েছে। সেখানে তারা নিজেদেরকে শো (Sho) বা শু (Shu) বলে। আরাকানি ও বর্মিরা তাদেরকে খ্যাংচিন বা টেনচিন বলে।

পূর্বে তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। তবে সাম্প্রতিক কালে তাদের অনেকেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

খুমি উপজাতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি ক্ষুদ্র উপজাতির নাম খুমি। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবন জেলার রুমা ও খানচি থানাতে খুমিরা বাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্ধর্ষ উপজাতিয় লোকদের মধ্যে খুমিরাও অন্যতম। আরাকানের কোলাডাইন নদীর উপরাংশে এখনও খুমিদের বসবাস রয়েছে। আরাকানের খুমিরা নিজেদের মধ্যে কুমি হিসেবে পরিচিত। সেখানে তাদের দু'দল খুমি রয়েছে। একদল নিজেদেরকে কামি (Kami) বা কিমি (Kimi) বলে, অন্য দল তাদেরকে কুমি (Kumi) বলে। আরাকানিরা উপরোক্ত দুটি দলের একটিকে আওয়া কুমি (Awa Kumi) এবং অন্যটিকে অফ্যা কুমি (Aphya Kumi) বলে। উভয় দলই অতীতে কোলাডাইন নদীর তীরে বসবাস করত। খুমি পুরুষেরা মাথায় লম্বা চুল রাখে এবং মাথার পিছন দিকে ঝুঁটি আকারে বাঁধে। তারাও ম্রোদের মত নাচের আসরে গো হত্যা করে। তবে তারা গো হত্যা অনুষ্ঠানে দলবদ্ধ হয়ে নাচে না বরং একজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নাচে।

চাক উপজাতি

চাকরা পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবন জেলায় বাইশারি, নাক্ষাংছড়ী, আলিখ্যং প্রভৃতি মৌজাগুলোতে বাস করে। চাকরা নিজেদেরকে 'আসাক' বলে। আরাকানিয়া চাকদের 'সাক' বলে। আরাকানের আকিয়াব জেলায় চাকদের বেশ কিছু লোক 'সাক' নামে বসবাস করছে। বার্মায় কাডু (Kadu) এবং গানান (Ganan) নামে চাকদের সমগোত্রীয় চাকদের আরো দুটি উপজাতি রয়েছে। তারাও চাকদের মত নিজেদেরকে 'আসাক' বলে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকদের দুটি প্রধান গোত্র রয়েছে- (১) আন্দো (২) এবং ঙারেক। চাকদের রীতি অনুযায়ী তাদের সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, একজন আন্দো ছেলের জন্য আন্দো মেয়ে বিবাহ করা নিষেধ। বরং একজন আন্দো ছেলেকে বিয়ে করতে হবে একজন ঙারেক মেয়েকে। অনুরূপ ঙারেকদের ক্ষেত্রেও। এ নিয়মটি মৃত্যুর বেলাতেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ, আন্দো গোত্রের কোন লোক মারা গেলে তার মরদেহ রীতি অনুযায়ী সৎকার করার ভার পড়বে ঙারেক গোত্রে অবস্থানকারী তার ভাগ্নেদের উপর। মৃত লোকটি আন্দো গোত্রের মহিলা হলে দায়িত্ব পড়বে ঙারেক গোত্রে অবস্থানকরী তার ভাইপোদের উপর। অনুরূপ ঙারেক গোত্রের লোক মারা গেলে তার সৎকারের দায়িত্ব পড়বে আন্দো গোত্রীয়দের উপর। চাকরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধদের অনুষ্ঠানগুলো তারা শ্রদ্ধার সাথে পালন করে।

গারো উপজাতি

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় বসবাসকারী উপজাতিদের মধ্যে গারোরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এরা এখন ময়মনসিংহ ছাড়াও টাঙ্গাইল ও সিলেট জেলাতে বসবাস করে। হালুয়াঘাট, শ্রীবর্দী, কমলাকান্দা, বিরিশিরি, বারহাট্টা, মধুপুরের গড় ইত্যাদি স্থানে গারোরা অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। ভারতের মেঘালয়, কোচবিহার, ত্রিপুরা, আসাম ইত্যাদি রাজ্যেও গারোরা বাস করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে গারো এবং তাদের সমভাষী আসামের বোডো (Bodo) উপজাতির লোকেরা খৃষ্ট পূর্ব ৩০০ অব্দের দিকে তাদের আদি নিবাস চীনের ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াং হো নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের উপরাংশ থেকে ভারতের উত্তর পূর্বাংশের আসাম রাজ্যে এসেছিল।

গারো সমাজে পেশা ও এলাকা ভিত্তিতে গঠিত ১৭টি দল উপদল রয়েছে।

গারোরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অধিকারী এবং মেয়েরাই সকল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে থাকে। গারোদের সামাজিক কাঠামো গ্রাম কেন্দ্রিক। গ্রামের প্রধানকে তারা 'নাকমা' বলে। পূর্বে গারোদের বিশ্বাস ছিল যে, তাতারা রাগুবা নামক একজন স্রষ্টা অন্যান্য দেবতাদের সহায়তায় এই মহা বিশ্ব ও প্রাণীজগতের সৃষ্টি করেছেন। তারা আত্মার অবিনাশিকতা এবং পূণনঃজন্মে বিশ্বাস করত। বর্তমানে তারা খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। গারোদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের নাম 'ওয়ানগালা'। বাংলা আশ্বিন মাসে তিন থেকে সাতদিন ধরে এই উৎসব উদযাপিত হয়।

"কোন গারো মৃত্যুবরণ করলে তার আত্মীয়-স্বজনের খবর নিতে গেলে রীতি অনুযায়ী তার জন্য কাপড় নিয়ে যেতে হয়। তারা রীতি অনুযায়ী মৃত দেহকে দাহ করে। আর দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা গেলে তাকে কবর দেয়। অতঃপর মৃত ব্যক্তির সদগতির জন্য নকালচিকা, মিবাংকালা, দেলাং সওয়া ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদি পালন করে।

খাসি উপজাতি

খাসিরা বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বাস করে। ১৯৮২ সনে তাদের জন সংখ্যা বলা হয়েছে ১৩/১৪ হাজার। তবে খাসিদের মূল জনসংখ্যা বাস করে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে। সেখানে ১৯৬১ সনে ৪,৬২,১৫২ খাসি বাস করত। খাসিরা মঙ্গোলিয় জনগোষ্ঠির লোক। তাদের ভাষা বৃহত্তর অষ্ট্রিক পরিবারের মন-ক্ষেমর শাখার অন্তর্গত। সিলেটের সীমান্ত অঞ্চলে তারা পানের চাষ করে। আর মেঘালয়ের খাসিরা উন্নত মানের কমলার চাষ করে। পূর্বে তারা জড়ের উপাসনা করত। দেবতার উদ্দেশ্যে ছাগল, মোরগ ইত্যাদি বলি দিত। বর্তমানে তারা খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। পারিবারিক জীবনে খাসিরাও গারোদের মত মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অধিকারী। তাদের সমাজেও মেয়েরাই যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী হয়ে থাকে। তাদের মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদের নিয়ম হল- স্বামী তার স্ত্রীকে পাঁচটি কড়ি বা তাম্রমুদ্রা দেয়। স্ত্রী আরো পাঁচটি কড়ি বা তাম্রমুদ্রাসহ তার স্বামীর হাতে দেয়। এগুলো স্বামী ছুড়ে ফেলে দেয়, এতে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

হাজং উপজাতি

বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় গারোদের পাশাপাশি হাজং উপজাতীয় লোকেরাও বাস করে। তাদের ভাষার সাথে বাংলা ও অহমিয়া ভাষারও মিল দেখা যায়। তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিছু হাজং ময়মনসিংহ ছাড়াও জামালপুর এবং সিলেট অঞ্চলে বসবাস করে। হাজংরা গারোদের পাশাপাশি বাস করলেও তারা গারোদের মত মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অধিবাসী নয়। বরং তাদের সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক।[১]

রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম

"ব্রাহ্মধর্ম" বলতে বোঝায় রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মমতকে। রাজা রামমোহন রায় এই ধর্মমতের প্রবর্তক। তিনি ১৭৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে এক হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা রমাকান্ত বন্দোপাধ্যায়; মাতা তারিণী দেবী। তার পূর্বপুরুষ নওয়াব সরকার হতে "রায়" উপাধি পান।

তিনি গ্রামের মৌলভীর নিকট এবং পাটনা ও কাশীতে অধ্যয়ন করে আরবী, ফারসী, হিব্রু, উর্দু, হিন্দী, ও সংস্কৃতি ভাষা, এবং গ্রীক দর্শন আয়ত্ত করেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হন এবং এ কারণে পিতা ও সমাজ কর্তৃক গৃহ থেকে বহিস্কৃত হন। তারপর চার বৎসর যাবত তিনি তিব্বতসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে কাটান। দেশে ফিরে প্রায় ১০ বৎসর (১৮১৫ পর্যন্ত) ঈষ্ট কোম্পানীতে (প্রধানতঃ রংপুরে) দেওয়ান বা সেরেস্তাদারের চাকুরি করেন। পরে পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করে স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বসবাস করেন।

১. উপজাতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সুগত চাকমা কর্তৃক রচিত এবং বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশের উপজাতি" নামক পুস্তক থেকে গৃহীত ॥

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় নিজ গৃহে এক উপাসনালয় ("আত্মীয়সভা" বা "ব্রহ্মসভা") স্থাপন করে ব্রাহ্মধর্মের সূচনা করেন। পরে চিৎপুর রোডে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্মিত হয়। "আত্মীয়সভা" নামের স্থলেই "ব্রাহ্মসমাজ" নামটি গৃহীত হয়। ১৮৩৯ সালের ৬ই অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্বরঞ্জিনী' বা 'তত্ত্ববোধিনী' সভার সাথে যুক্ত করে এর নাম দেন ব্রাহ্মসমাজ।

রাজা রামমোহন রায় চিরাচরিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ফলে তাকে বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। এই সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম" বা একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেন। তার প্রবর্তিত এই ধর্মানুসারী সমাজকে বলা হয় "ব্রাহ্মসমাজ"।[১]

রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের যেসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তার মধ্যে হিন্দুনারীর সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোঁড়াপন্থীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তৎকালীন বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক-এর আদেশ ক্রমে নূতন আইন করে (১৮২৯) হিন্দুনারীর সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা হয়।

তিনি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারমূলক অনেকগুলো পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটির নাম হল ঃ ব্রহ্মোপাসনা, বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, ঈশোপনিষদ, কেনোপনিষদ, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, কঠোপনিষদ, মাণ্ডুক্যোপনিষদ, মুণ্ডকোপনিষদ, সংবাদ, কৌমুদী, গৌড়ীয় ব্যাকরণ। ১৮০৩ সালে তিনি ফারসী ভাষায় (আরবীতে ভূমিকাসহ) تحفة الموحدين (তুহ্ফাতুল মুওয়াহ্হিদীন) নামক বইটি রচনা করেন। ১৮২০ সালে তিনি খ্রীষ্টধর্মের নৈতিক ও মানবহিতৈষী শিক্ষার বিষয়াবলী সংবলিত ইংরেজীতে The Precepts of Jesus নামক বইটি রচনা করেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের অনেকে রামমোহনের লেখার প্রবল প্রতিবাদ করেন। সে সকলের উত্তরে তিনি ১৮১৭ সালে "ভট্টাচার্যের সহিত বিচার" বইটি লেখেন। হিন্দুধর্মের সংস্কার মানসে রচিত তার বইগুলি ১৮১৫ হতে ১৮১৯-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। আর রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রতিবাদের উত্তরগুলি ১৮১৭ হতে ১৮১৯-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়।

রামমোহনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সর্ব ধর্মের সমন্বয় করা। তার প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভার উদ্দেশ্য ছিল জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য একটি প্রার্থনা সভার সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্মাবলম্বীদের এক সাধারণ মিলন ভূমির প্রতিষ্ঠা করা। সর্বধর্ম সমন্বয় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি হিন্দুদের পৌত্তলিকতা, বহুত্ববাদ, জড়পূজা, প্রকৃতিপূজা ইত্যাদির বিরোধিতা এবং খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ ইত্যাদির বিরোধিতা সত্ত্বেও খৃষ্টান মিশনারী কর্তৃক হিন্দু ধর্মের সমালোচনার বিরেধিতা করেছেন আবার খৃষ্টধর্মের প্রশংসাও করেছেন। একদিকে তিনি ইসলাম ধর্মের নবুওয়াত, রেসালাতকে অস্বীকার করতেন আবার পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, সাকার পূজা প্রকৃতি পূজা ইত্যাদির বিরুদ্ধে কুরআনের আদর্শে মুগ্ধতা প্রকাশ করে

১. উল্লেখ্য যে, ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মণ এক কথা নয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যবাদ এক কথা নয়। ব্রাহ্মসমাজ হল রামমোহন রায় কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মানুসারী সমাজ। আর ব্রাহ্মণ হল হিন্দুদের পুরোহিত শ্রেণীর লোক। এই ব্রাহ্মণদের ধর্মমতকে বলা হয় ব্রাহ্মণ্যবাদ ॥

ইসলামের প্রতি আনুকূল্য প্রদানও করতেন। খৃষ্টান মিশনের সঙ্গেও ছিল তার সখ্যতা, আবার হিন্দুদের ব্যাপারেও ছিল এমন নীতি যে, পরবর্তী ব্রাহ্মরা বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ বারবার বোঝাতে চেয়েছেন যে, রামমোহন আদি হিন্দুধর্মই পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন।

রামমোহনের চিন্তাধারার বিশেষ কয়েকটি বিষয় ঃ

১. তিনি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করলেও মু'তাযিলাদের ন্যায় আল্লাহ্‌র গুণাবলী অস্বীকার করতেন। রামমোহনের মতে ব্রহ্ম (খোদা/ঈশ্বর) নির্গুণ, নিরাকার, অনির্বচনীয় ও অনির্ণীত। তবে দেবেন্দ্রনাথ সগুণ ব্রহ্মে বিশ্বাস করতেন।

২. তিনি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু উপাসকদের জন্য দেবদেবী পূজা সমর্থন করতেন। তবে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হতে মূর্তি পূজাকে অস্বীকার করেন।

৩. তিনি ওহী ও নবূওয়াতের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতেন। তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুওয়াতকেও অস্বীকার করতেন।

৪. তিনি ইসলাম, খৃষ্টধর্ম ইত্যাদি সব ধর্মেরই মু'জিযা তথা অলৌকিক বিষয়বস্তুকে অস্বীকার করতেন।

৫. তিনি ধর্মীয় বিধি-বিধানকে ধর্মগুরুগণ কর্তৃক যুগ যুগ ধরে সৃষ্ট বলে মনে করতেন।

৬. পীর মাশায়েখ ও সূফী দরবেশদের কথায় বিশ্বাস করাকে অন্ধ অনুকরণ, কুসংস্কার, অতীতমুখিতা ও পৌত্তলিকতা বলে মনে করতেন।

৭. রামমোহনের কথা ছিল জ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হও, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনকে আয়ত্ব কর, অতীতের সকল মোহ থেকে মুক্ত হয়ে সকল বন্ধনকে ডিঙিয়ে চল, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা সত্য আবিস্কার করে নব নব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে পূর্ণতার সন্ধান কর।

আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে অস্বীকার, নবুওয়াত-রেসালাতকে অস্বীকার, ধর্মীয় বিধি-বিধানকে অস্বীকার ইত্যাদি কুফ্‌রী মতবাদ সত্ত্বেও আমাদের দেশের সাহিত্য সমাজের চিন্তাবিদ বলে খ্যাত কাজী আব্দুল ওদূদ, আবুল হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল হক, আনোয়ারুল কাদির, কাজী মোতাহার হোসেন চৌধুরী প্রমুখ রামমোহনের আদর্শকে মুসলমান সমাজের নব জাগরণের জন্য অনুকরণযোগ্য বলে মনে করেছেন।

তিনি ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ডের ব্রিস্‌টল শহরের নিকটবর্তী স্টেপলটনহিল গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। ব্রিস্‌টলেই তাঁর মরদেহ সমাহিত হয়।[১]

রামকৃষ্ণের ধর্মমত-সার্বজনীন ধর্ম

রামকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬) একজন হিন্দু সাধক। হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, মাতা চন্দ্রমনি দেবী।দরিদ্র মাতা-পিতার দেওয়া নাম গদাধর। পুরোহিত বৃত্তির জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। রানী রাসমনি তাঁকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাদীর পুরোহিত নিযুক্ত করেন। আনুমানিক ১৮৫৫ সনে তিনি কালীর উপাসক হন। তাঁর দৃষ্টিতে কালীদেবী মানবজাতির স্নেহ-পরায়না মাতৃ-স্বরূপিনী।

১. রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের সূত্র ঃ মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ ও বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশে দর্শন ঃ ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান" নামক গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ ॥

তিনি ১৮৬৬ সনে ইসলাম ধর্ম এবং ১৮৭৪ সনে খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন এবং অনতিবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, অধিকাংশ লোকের জন্য শাশ্বত ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে সকল ধর্মই সমানভাবে নির্ভরযোগ্য, তবে খাঁটি মরমী সাধকদের ভগবৎ মিলনের জন্য (বিধিবদ্ধ) ধর্ম অনাবশ্যক। অনাসক্ত ও প্রশান্ত মনে ভগবদ্‌ধ্যানের দ্বারাই আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করা যায়- এই মতবাদকে খণ্ডন করে তিনি শিষ্যগণকে সক্রিয় পরোপকার ব্রতে প্রেরণা দান করেন।

রামকৃষ্ণ-গবেষকদের মতে রামকৃষ্ণের জীবন সাধনার একটা মূল লক্ষ্য ছিল সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন ধর্মমতের রূপরেখা নির্দেশ করা। অর্থাৎ, তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। রামকৃষ্ণ-গবেষকদের মতে এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি সব ধর্মের গভীরে প্রবেশ করে সব ধর্মের মৌলবাণীকে আত্মস্থ করেন। এর অংশ হিসেবে তিনি এক সময় ইসলাম ধর্মের দীক্ষা নিয়ে[১] যথারীতি ধর্মের অনুশীলন শুরু করেন। এক সময় তাকে খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে যিশুর ধ্যানে তন্ময় হতে দেখা যায়। সনাতন হিন্দু ধর্মমত অনুযায়ী সাধনাও করেন। ভৈরবীকে গুরু রূপে গ্রহণ করে দীর্ঘদিন তন্ত্র সাধনা করেন। বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী তোতাপুরীর সান্নিধ্যে থেকে অদ্বৈত সাধনাও করেন। বৈষ্ণব সাধনাও করেন

রামকৃষ্ণ প্রবর্তিত সার্বজনীন ধর্মের মূল কথা হল-ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে সকল ধর্মই সমান ভাবে নির্ভরযোগ্য। সব ধর্মের মূল লক্ষ্য অভিন্ন, তা হল সত্যের স্বরূপ অন্বেষা। পথের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র সত্ত্বেও গন্তব্যস্থল এক ও অভিন্ন। রামকৃষ্ণ বলেন যেমন ছাদের উপর উঠতে হলে মই, বাঁশ, সিড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন উঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই একটি উপায়। তার মতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইসলাম যে কোন একটি ধর্মকে বেছে নিয়েই সাধন পথে অগ্রসর হলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।[২]

রামকৃষ্ণের বিখ্যাত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন এবং রামকৃষ্ণের সার্বজনীন ধর্মের বাণী দেশ-বিদেশে প্রচার করেন। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরেও "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার" নামক একটি প্রতিষ্ঠান এরূপ প্রচারে ব্রতী রয়েছে। আমাদের দেশে ঢাকা রাজধানিতেও রামকৃষ্ণ মিশন রয়েছে। রাককৃষ্ণভক্ত সাধুগণ সংযম, দারিদ্র্য ও পরহিতের মাধ্যমে রামকৃষ্ণের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করেন।[৩]

১. তবে তিনি প্রকৃত মুসলমান হননি। এটা তার নিজস্ব বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন ঃ ঐ সময় আল্লাহ আল্লাহ জপ করতুম, মুসলমানদের মতো কাছা খুলে কাপড় পড়তুম, পাঁচবার নামাজ পড়তুম। ঐ ভাবে তিনদিন কেটে গেলে পর ঐ মতের সাধনফল সম্যক হস্তগত হয়েছিল। বাংলাদেশে দর্শন, বরাত - শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী অমৃতত্বানন্দ, পৃষ্ঠা ৫২ ॥

২.কিন্তু সেই সাধনা কিভাবে করতে হবে তার বিশদ কোন রূপরেখা তিনি নির্দেশ করে যেতে সক্ষম হননি। তদুপরি জীবনের আচার-আচরণ, ধর্মীয় রীতি-নীতির মধ্যে (বিশেষতঃ যার বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বৈপরিত্যও বিদ্যমান রয়েছে) সমন্বয়ের উপায় কি হবে তারও কোন সুস্পষ্ট রূপরেখা তিনি নির্দেশ করে যেতে পারেননি। স্বতন্ত্র জীবনাচরণ সম্বন্ধে দিক নির্দেশনাতো নয়ই ॥

৩.রামকৃষ্ণের সার্বজনীন ধর্ম সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের সূত্র ঃ মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ ও বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশে দর্শন ঃ ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান" নামক গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ ॥